ভালবাসার শিল্পকথা

[আধুনিক যুগ—প্রথম স্তবক]

অশোককুমার রায়

সম্পাদিত ও আলোচিত

প্রস্তাবনা

উপাচার্য্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই. সি. এস.

অজন্তা হাউজ

১এ রূপচাঁদ মুখার্জী লেন, ভবানীপুর, ক'লকাতা-২৫

প্রস্তাবনা

তরুণতম লেখক শ্রীমান অশোককুমার রায় সম্পাদিত ও আলোচিত এ
"ভালবাসার শিল্পকথা" হল সংকলন গ্রন্থ। কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য আছে। এ
কথাসাহিত্যের পরিচায়ক সংকলন। এতে আধুনিক যুগের পঁচিশ জন বিশি
লেখকের রচনা হতে নির্বাচিত প্রেমের গল্প আছে। নির্বাচিত লেখকদে
মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ। আর যাঁরা আছে
তাঁদের মধ্যে মণীন্দ্রলাল বসু, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যা
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায় ও মানি
বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। কেবল লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকরাই এতে স্থান পেলেও
এতে আছে একেবারে নতুন দু'জন রচয়িতার দুটি নতুন রীতির ও মধুর স্বাদে
গল্প।

এই সংকলনের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথম, এর বিষয়-বস্ত
কেবল প্রেমের গল্পের মধ্যেই রয়েছে সীমাবদ্ধ। সংকলনকারের নিজের কথা
এটি হল 'বাংলা শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প-সংকলন'। সাধারণত অন্য সব সংকলনে
গল্পের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ পক্ষপাত দৃষ্টিগোচর হয় না। সকল শ্রেণী
গল্পই তাতে স্থান পায়। এখানে প্রেমের গল্প ব্যতীত অন্য শ্রেণীর গল্প বর্জিত
এমন ব্যবস্থায় পাঠ্যবস্তুর বেশী চিত্তাকর্ষক হবারই কথা। কারণ বৈষ্ণ
পদকারদের মতে সাহিত্যে শৃঙ্গার বা মধুর রসই সব থেকে হৃদয়গ্রাহী। এ
সমর্থা নামে মধুরা রতির রসই হল সকল রসের রাজা। কাজেই তার প্রতি
পক্ষপাতে পাঠক সমাজের সম্মতি অবধারিত।

আর সংকলনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল—গ্রন্থের প্রথম অংশে আলোচকের
সাহিত্য-শিল্পী সম্বন্ধে "ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি" নামে একটা
সবিস্তার সন্দর্ভ আছে। তাঁর প্রধান আলোচনার বিষয় হল এখানের সাহিত্যিক
বিশেষের রচিত কথাসাহিত্যের সামগ্রিক ভাবে মূল্য নির্দ্ধারণ করা। এখানে
আমার তরফ থেকে প্রত্যেককে সানন্দে জানাবার মতো একটা কথা আছে
কেন না—আমার এই প্রস্তাবনা লেখা হয়েছে এই গ্রন্থ এবং এরই সম্পূরক
হিসাবে শ্রীমান অশোককুমার রায়ের সম্পূর্ণ স্বকীয় চিন্তায় রচিত সুবৃহৎ প্রবন্ধ-
গ্রন্থ "সাহিত্য-চেতনার সবুজ পান্না ও লাল চুনি" নামে যা কিছুদিনের মধ্যেই

কাশ পাচ্ছে, এবং এই প্রকাশ হওয়ার আগেই যার প্রতিটি প্রবন্ধ আমার ষ্টিগোচরে এনে দেখার সুযোগ হয়েছিল—সেই গ্রন্থটির জন্যও। এই গ্রন্থের থমাংশের এই আলোচনাটি কেবলমাত্র গল্পে সীমাবদ্ধ থাকে নি। উপন্যাসও য়েছে তার বিষয়-বস্তু। এমন কি বিশেষ বিশেষ সাহিত্যিকের অন্য শ্রেণীর রচনাও সঙ্গক্রমে আলোচনার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এই ভাবে কবিতা তো আলোচনায় ান পেয়েছেই, এমন কি প্রবন্ধও পেয়েছে। এই হিসাবে ধরতে গেলে তাঁর ালোচনার ক্ষেত্র খুব ব্যাপক। সংকলনকার এই সকল আলোচনায় একটা েশেষ পদ্ধতিও অবলম্বন করেছেন। দেখা যায় প্রতিটি লেখককে তিনি কান্ত শ্রদ্ধাভবে পাঠ করেছেন। যিনি আলোচনার বিষয়—তাঁর জীবন-বেদ, ার রচনা-শৈলীর বিশিষ্ট গুণ কি—এ সম্বন্ধে তিনি আলোকপাত করতে চেষ্টা রেছেন। নিজের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থনে বিভিন্ন গ্রন্থ হতে ভূরি ভূরি চনার অংশ উদ্ধৃত করেছেন।

তাই "ভালবাসার শিল্পকথা" এইভাবে একাধারে গল্প-সংকলন তথা থাসাহিত্যের সমালোচনার গ্রন্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই আলোচনা প্রতি াহিত্যিকের রচনার পূর্ণতর স্বাদ গ্রহণে সাহায্য করবে। সংকলনকার হণের আরও তিনটি সংকলনগ্রন্থ সম্পাদনার ইচ্ছা পোষণ করেন। তা সঁ লে অভিনবত্বে ও বিরাটত্বে তিনি সংকলন-গ্রন্থের ইতিহাসে নতুন নজি াপন করবেন নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এবার যিনি এই বিরাট দায়িত্বের ভার নিয়েছেন তার সম্বন্ধে কিছু বলার ময় হয়েছে। শ্রীমান অশোককুমার রায় বয়েসের দিক থেকে তরুণতম। বে যেমন বুঝি তিনি কৈশোর হতেই কথাসাহিত্যের সঙ্গে এমন প্রেমে ড়েছিলেন যে তার তুলনা হয় না। ছাত্রাবস্থায়ই সকল বিশিষ্ট সাহিত্যিকের চনা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করেছেন এবং তা উপভোগ করেছেন। ফলে প্রতিটি সাহিত্যিকের জন্য তাঁর আছে যেমন গভীর শ্রদ্ধা, তেমনি আছে প্রীতি। এরই যুগ্ম আকর্ষণে তিনি তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করেছেন. ঘনিষ্ঠরকম পরিচয় করেছেন। এই তার উদ্দেশ্য দুটি ছিল সম্ভবত। একটি—যাঁকে পড়ে শ্রদ্ধা করেছেন তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় লাভ করা। দ্বিতীয়ত তাঁকে আরও ভাল করে জানা যাতে তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্যকে আবিষ্কার করা সহজ হয়ে ওঠে। তিনি মুখবন্ধে 'বলতে কিছু চাই' বলে এক জায়গায় বলেছেন—তাঁর এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণের অধিকার এসেছে পাঠক হিসাবে।

কিন্তু শ্রীমান অশোক শুধু দরদী আর শ্রদ্ধাবান পাঠক নন—তিনি নিজেই শিল্পী। তার পরিচয় দেবে এই সংকলনের সবশেষে স্থাপিত তাঁর স্বরচিত "মিলন ত্রিযামা" নামক গল্পটি।

আর একটি বিষয় নজর করবার যে, আলোচকের প্রকাশিতব্য "সাহিত্য-চেতনার সবুজ পান্না ও লাল চুনি"র সমালোচনাগুলি আরম্ভ হয়েছে এই সুন্দর প্রস্তাবনার মতোই শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ নিয়ে, যেটি এই গ্রন্থের শেষেই আছে। আমি জেনেছি যে এই সংকলনেও তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা আছে। সাহিত্য ও প্রেম এবং তার প্রতীতির বিশ্লেষণে তাঁর অধিকার সম্বন্ধে তাঁর এই "সাহিত্য-ভালোবাসা-নায়কনায়িকা" নামী প্রবন্ধটি খুবই সুন্দর পরিচয় দেবে। এমন যোগ্য সাহিত্য-রসিকা সহযোগিতা নির্বাচনের উৎকর্ষ সাধন করেছে বলে মনে করি।

শেষ কথায় বলব, এমন শ্রদ্ধা ও অধ্যবসায়ের সহযোগে শ্রীমান অশোককুমার রায়ের এই "ভালবাসার শিল্পকথা" যে ভাবে ব্যাপকতার রণন নিয়ে গড়ে উঠেছে তা পাঠক সমাজে সমাদৃত না হয়ে পারে না। এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

বিজয়া দশমী, ১৩৭০ | হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ণর দায়—

আমাব এই গ্রন্থের সম্পাদনা, আলোচনা ও প্রকাশনাব ব্যাপাবে অশেষ ভাবে ঋণী হোয়েছি
ানেব কাছে। সে কথা না জানিযে থাকা যায় না—কেন না তাঁদেব প্রত্যেকের সঙ্গেই
ন্ন বকম স্নেহ-প্রীতির বাঁধনে আজ আমাব অবস্থা হোয়ে উঠেছে খুশী-সর্বস্ব। প্রথমেই
ব—আমার জীবনেব একান্ত আবাধ্যতম বাবা ও মা—শ্রীবিনযকুমাব বায় ও শ্রীমতী
া বায—এই তাঁদেব দু'জনাব অটুট উৎসাহ ও উদ্দীপনাদানেব কথাকে। সে সঙ্গে মনে
বাবাব বন্ধু, জাতীয় গ্রন্থাগাবেব অধ্যক্ষ শ্রীবি. এস্. কেশবনেব কথা—এই তিনিই প্রথম
াকে এই কাজে উৎসাহিত কোবেছিলেন। আর আমাব এই আলোচনাব ব্যাপাবে
া কাছে শিল্প-বিবেক সম্পর্কে ব্যক্তিগত পবিচযে হোযেছিলাম সর্বপ্রথম ওযাকিবহাল—তাঁরা
লন 'মেজকা' শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায, 'জ্যেঠামহাশয' শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু, ডাঃ বলাই
মুখোপাধ্যায, শ্রীচিবঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায আই. সি. স. ও শ্রীঅন্নদাশঙ্কব বায আই. সি.
। এ ছাড়া শ্রীতুষাবকান্তি ঘোষ, ডাঃ নবগোপাল দাশ আই. সি. এস, ডাঃ সুশীল বায,
বানী মুখোপাধ্যায, প্রাবন্ধিক শ্রীসুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায আই এ. এস, আমাব শিক্ষক
নাবাযণ গঙ্গোপাধ্যায, ডাঃ নবেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রাক্তন প্রধান বিচাবপতি শ্রীপি. বি.
ৌ, শ্রীঅচিন্ত্যকুমাব সেনগুপ্ত, শ্রীতাবাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায, শ্রীসবোজকুমাব বায চৌধুবী,
ত্রিপদ বাজগুরু, লীলা মজুমদাব, জ্যোতির্ময়ী দেবী ও শ্রীসুবোধ ঘোষেব সাহচর্য আমাকে
দনেব জন্য কৃতজ্ঞতাব পাশে বেঁধেছে।

এই তাঁদেব সকলেবই কৃপা আমাব জীবনেব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হোযে থাকলো ঋণেব
ন পবিশোধ কবাবাব জন্য হাজাব বকম ভাব-কুটিমে সাজানো আব বাঙানো স্মৃতিচাবণাব
ষব অবলম্বন। ইচ্ছা আছে সময়ান্তবে এই তাঁদেব শৈল্পিক-অভিধা বনাম ব্যক্তিগত
চযেব উজ্জ্বলাভা ঝবানো ঘবোযা-মানস-রূপারূপকে নিযে একটা রম্য-মধুব কথাযান
াব কবাব! আব কেননা এই ব্যাপাবে দেশের প্রতিটি সাহিত্যিকেব কাছ থেকেই
ছি কিছু না কিছু সাহচর্য—সেটাও ভুলে যাওযাব নয। এই বাইবেব বিবাট পৃথিবীব
া সে পবিচযেব ছোট্ট একটা পৃথিবী আছে, যেখানেব বন্ধুদেব কাছ থেকেও পেযেছি
যোগিতা—তাব কথায় প্রথমেই বলব, শুচিস্মিতা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যাযেব কথা—এই যাঁব
লস সহযোগিতা ছিল আমাব এই কাজেব পবিপ্রেক্ষিতে প্রথম থেকেই। এব পবেই মনে
ভ অনুজপ্রতিম শ্রীমান গৌব বাযচৌধুবী ও শ্রীমান অরুণকুমাব বাযকে। ওবা দু'জনে
ল এবং প্রিয় বন্ধুদেব মধ্যে অধ্যাপক তুষাব বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক অনিলকুমাব পাল,
ইঞ্জিঃ শৈলেশ গুহ, ইনজিনীযাব অশোক বসাক, বিচাবক অশোক পালিত আই এ এস,
ত্তাব আময় ঘোষ, শ্রীমতী গীতা সেন ও মুদ্রক শ্রীদুর্গাপদ ঘোষেব সাহচর্যেব কথা কোন দিনও
মৃতিব আঁধাবে হাবিয়ে যাওযাব নয। তাঁদেব প্রত্যেককেই আমাব আন্তবিক কৃতজ্ঞতা
নাই। আমাব একমাত্র স্নেহেব বোন কল্যাণীয়া জয়ন্তী কোন কোন লেখা কপি কোরে
যেছিল—সেটাও স্মর্তব্য। সেই সঙ্গে "বিশ্বভাবতী" "বার্ণস্ স্পোর্টস্ ক্লাব" ও "উদ্বোধন
্যালয়ে"ব প্রতিও আমাব কৃতজ্ঞতা জানাই।

১০.২.৬৪ —সম্পাদক।

'ভালবাসার শিল্পকথা'—বাংলা শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্পের সংকলন। সহৃদয় আলোচনা সমেত—স্রষ্টা শিল্পী ও তাঁদের শিল্প-বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এই খণ্ডে যাঁদের লেখা নেই পরবর্তী প্রকাশিতব্য 'আধুনিক যুগ-দ্বিতীয় স্তবকে' তা থাকছে। ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক।

বিনীত

সম্পাদক

This day is almost done. When the night and morning meet it will be only an unalterable memory. So let no unkind word; no careless, doubting thought; no guilty secret; no neglected duty; no wisp of jealous fog becloud its passing. For we belong to each other—to have and to hold—and we are determined not to lose the keen sense of mutual appreciation which God has given us. To have is passive, and was consummated on our wedding day, but to hold is active and can never be quite finished so long as we both shall live.

Now, as we put our arms around each other, in sincere and affectionate token of our deep and abiding love, we would lay aside all disturbing thoughts, all misunderstandings, all unworthiness. If things have gone awry let neither of us left no accusing finger nor become entangled in the rationalizations of self-defense. Who is to blame is not important; only how shall we set the situation right. Anb so, serving and being served, loving and being loved, blessing and being blessed, we shall make a happy, peaceful home, where hearts shall never drop their leaves, but where we and our children shall learn to face life joyfully, fearlessly, triumphantly, so near as God shall give us grace.

Goodnight, beloved.

F. ALEXANDER MAGOUN

যাঁদের লেখা আছে—

১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯৪—১৯৫০

২। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৮৯৬—

৩। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

১৮৯৬—১৯৩২

৪। মণীন্দ্রলাল বসু

১৮৯৭—

৫। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯৮—১৯৭১

৬। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

১৮৯৯—

৭। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯৯—

৮। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৯০১—

৯। সরোজকুমার রায়চৌধুরী

১৯০২—

১০। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৯০৩—

১১। অন্নদাশঙ্কর রায়

১৯০৪—

১২। জরাসন্ধ

১৯০৪—

১৩। প্রেমেন্দ্র মিত্র

১৯০৪—

১৪। লীলা মজুমদার

১৯০৪—

১৫। প্রবোধকুমার সান্যাল

১৯০৭—

১৬। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০৮—১৯৫৭

১৭। সুবোধ ঘোষ

১৯০৯—

১৮। আশাপূর্ণা দেবী

১৯০৯—

১৯। গজেন্দ্রকুমার মিত্র

১৯০৯—

২০। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

১৯১২—

২১। নরেন্দ্রনাথ মিত্র

১৯১৬—

২২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯১৮—

২৩। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২০—

২৪। সন্তোষকুমার ঘোষ

১৯২০—

২৫। রমাপদ চৌধুরী

১৯২২—

২৬। অশোককুমার রায়

১৯৩৮—

২৭। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

১৯৩৮—

আমার এই সম্পাদনার কাজ
বাবা ও মা-র
করকমলে অর্পিত হলো
"অশোক"

Gin a body, meet a body
Come in through the Rye,
Gin a body, kiss a body
Need the body cry ?

—**Robert Burns**

রাত্রে ও প্রভাতে

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি চেয়ে মোর আঁখি-'পরে
ধীরে পাত্র লয়েছ করে,
হেসে করিয়াছ পান চুম্বন ভরা সরস বিম্বাধারে
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে মধুর আবেশ ভরে।
তব অবগুণ্ঠনখানি
আমি খুলে ফেলেছিনু টানি,
আমি কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে তোমার কমল কোমল পাণি।
ভাবে নিমীলিত তব যুগল নয়ন, মুখে নাহি ছিল বাণী॥
আমি শিথিল করিয়া পাশ
খুলে দিয়েছিনু কেশরাশ,
তব আনমিত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি—
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে, সখী, হাসি মুকুলিত মুখে
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে নবীন মিলন সুখে॥
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায় নির্জন নদী তীরে
স্নান অবসানে শুভ্রবসনা চলিয়াছ ধীরে ধীরে।
তুমি বাম করে লয়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয়তলে উষার রাগিণী বাঁশীতে উঠেছে বাজি
এই নির্মলবায় শান্ত উষায় জাহ্নবীতীরে আজি।
দেবী, তব সিঁথিমূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদুর রেখা,
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খ বলয় তরুণ ইন্দু লেখা।
একি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি প্রভাতে দিতেছ দেখা!
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে—
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনত শিরে
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায় নির্জন নদী তীরে॥

গোবিন্দদাসের রাধা

আধক আধ-　　　　আধ দিঠি-অঞ্চলে
　　যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি　　　　কুসুম-শরে জর জর
　　রহত কি জাত পরাণ॥
　　সজনি, জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি　　　　যো হরি হেরই
　　তছু পায়ে মঝু পরণাম॥
সুনয়নী কহত　　　　কানু ঘন-শ্যামর
　　মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতী তাক　　　　পরশ-রসে ভাসত
　　হামারি হৃদয়ে জলু আগি!
প্রেমবতী প্রেম-　　　　লাগি জিউ তেজত
　　চপল জীবন মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে　　　　শ্রীবল্লভ জানে
　　রসবতী রস মরিযাদ॥

বিদ্যাপতির রাধা

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরী কৈছে, করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি জাত॥

এই গ্রন্থের পরিকল্পনা ও সহযোগীতায়

শুচিস্মিতা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
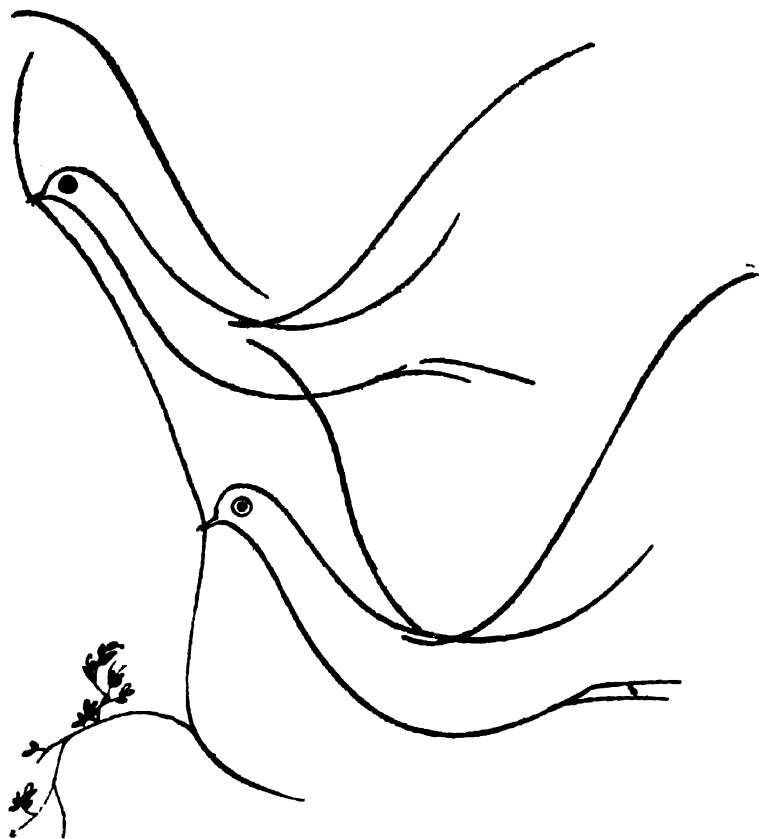
আমার এই সংকলন গ্রন্থের নাম রেখেছি—"ভালবাসার শিল্পকথা"। নামকরণটুকু বড বেশী স্নিগ্ধ আর লাজনম্র। শিল্পকথার কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না। আমি একজন পাঠক। এই আমার বলিষ্ঠতম পরিচয়। সব লেখকের শিল্প বৈভবের সঙ্গে আমার রূপতিয়াসী মনের মিলন ঘটেছিল শৈশব যৌবনের সন্ধ্যালগ্নে। সবুজ প্রাণের সবুজ সুখ কল্পনার পাল তুলে পঠনাভিসারে যাত্রা করেছিল প্রতিটি লেখকের আপন আপন স্বকীয়তায় ধ্বজাধারী রূপযানে চড়ে। আজো সেই অভিসারকের ভূমিকায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমি তাই আজও একজন পাঠক—আর সেই পাঠকের ছাডপত্র নিয়েই বাঙলাদেশের প্রিয় কথাশিল্পীদের লেখা নিয়ে এই সম্... কাজে অসম সাহস করে এগিয়েছি। একটা কথা আর একটা কৈফিয়ৎ প্র... জানিয়ে রাখতে চাই।

বলতে চাওয়া কথাটা হ'ল শৈশব যৌবনের রুমঝুম মুহূর্তে প্রতিটি লেখককে তাঁদের সৃষ্টির ভেতর দিয়ে ভালবাসতে পেরেছিলাম। সেই ভালবাসার অর্ঘ্য তাঁদের অর্পণ করবার জন্য সেদিন থেকে সচেষ্ট হয়েছিলাম। তখনি ভেবেছিলাম তাঁদের প্রত্যেককে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ধরে রাখব—কেন না পাঠকের ভাললাগার জগতের কাছে—লেখক মাত্রেই শুভ পরিণয়ে বিবাহিত।

এই কথার পরেও আমার তরফ থেকে একটি কৈফিয়তের উত্তর আছে। প্রিয় লেখকদের একটি জায়গায় তাঁদের এক একটি শ্রেষ্ঠ রচনার সহাবস্থানের ভেতর দিয়ে আবদ্ধ রাখাটুকুই বড কথা নয়, যদি না সেখানে পাঠকের তৃপ্ত ...লোকের সঙ্গে খুশীয়াল হৃদয় সংবাদ মিলে গিয়ে কিছু আলোচনা না করে। সেই অভিপ্রায় নিয়ে আমি এই সম্পাদনা কাজে এগিয়েছি। লেখক মাত্রেরি ...পার ঐশ্বর্য্যে আর মাধুর্য্যে ভরাট শিল্প সত্তার সুহৃদয় ও সশ্রদ্ধ আলোচনা করতে অভিলাষী হয়েছি। আমার এই আলোচনার প্রধানতম লক্ষ্য

নিবদ্ধ রয়েছে প্রতিটি লেখকের রূপস্নাত প্রতিভা লোকের অনিন্দ্য অনন্যতার মধ্যে—যেখানে প্রত্যেকে তাঁরা নিজের নিজের মহিমায় সাহিত্যের রাজদরবারে মণিমাণিক্যের হীরক আভায় সমুজ্জ্বল। উচ্ছল।

আর একটা কথা। আলোচ্য গ্রন্থের নাম এমনটি রেখেছি কেন? এরকমটি না হয়েও ত অন্য রকমটি হতে পারত। আমি নামকরণ করেছি—"ভালবাসার শিল্পকথা"। গৌণ দিক থেকে বোঝাতে চাই, যে শিল্পকথা পঠন-পাঠনের ভেতর দিয়ে এমন এক চির নতুন চিরন্তনী মানুষী লোকের হাজারো সুখ দুঃখের কথার জানান দিয়ে পাঠকের ভাল লাগার সার্থকতাকে শেষ পর্য্যন্ত ভালবাসা বাসতে শিখায়। মহামানবতার পূজারী দেবদূত শেলী আমাদের শ্রেষ্ঠতম নায়িকা শ্রীমতী রাধার মতই জীবন দর্শনের চিন্তারাজিকে জাগিয়ে তুলে বলে গেছেন—"আমাদের জীবনের বিষাদ গাথাই হ'ল জগতের সাহিত্য সত্যের শিল্পায়ণে মধুরতম কাহিনী।" আর তাই এ হেন শিল্পকথাকে ভালবাসতে পারি আপন নিভৃত মনের নিরালাকে রভস-মুখর করে তোলা প্রীতিময়ী গোপনচারিণীর মত। তাই গৌণদিকে এর নাম রেখেছি, "ভালবাসার শিল্পকথা"।

কিন্তু মুখ্যত এই সম্পাদনা কাজের মধ্যে দিয়ে আমি জানাতে চাই—(এ)রা পৃথিবীর হাজার হাজার বছর ধরে বিরাট পথ-পরিক্রমার চারধারে এক পুরুষ আর এক রমণী, কোন এক গোধূলী লগ্নে যৌবনের চোখে ভালবাসা (বে)সেছিল। এই পৃথিবীর আদিম ইতিহাসের প্রথম পুরুষ তার বর্বর জীবনের মধ্যে থেকেও সভ্যতার হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেওয়া রূপসী প্রকৃতির মধ্যে আবিষ্কার করতে পেরেছিল তার প্রথমা নারীকে। তারপর সেই নারীর নিরাবরণ আর নিরাভরণ যুবতী দেহের অনন্ত শিল্প-শোভার ঝিলিমিলিতে মায়াঞ্জন মেখেছিল চোখের কামনার্ত দৃষ্টিতে। সে অভাব বোধ করেছিল। নিজের কামনাকে জয় করতে গিয়ে যখন দেখল নারী তাকে বাধা দিল না, বরং লাজাঞ্জলী দিয়ে সেই পুরুষের কাছে দেহারতি সাজিয়ে তুলে ধরে তৃপ্তি দিয়েছিল অকপট নিস্বার্থভাবে। নারীর এই নিস্বার্থতা দেখে একদিন সত্যি ইতিহাসের সেই প্রথম নায়কের মধ্যে এক কঠিন বাস্তবের নির্ঝর স্বপ্ন-সঞ্চার কোরল। সেদিন থেকে সে বুঝল—তার জীবনে এই প্রথমা নায়িকা আষ্টেপৃষ্ঠে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে।

তার পর?—

ইতিহাসের এই প্রথমা নায়িকা পরিণয়ের সুখভূমিতে পুরুষকে ...বান করেছিল সৃষ্টিকাজের ভেতরে কুমার-সম্ভব করাতে। তারা তাই করেছিল—প্রথমযুগ, যখন তারা কিছুই বুঝতে পারেনি, পায়নি সংযত মনোরম জীবন নিয়ে অতিবাহিত করার নির্দেশ—তখনই বিশেষভাবে পুরুষ তার পরিচিত এলোমেলো সমাজের বাইরে ও ভেতরে অসংযত থাকায় বর্বর ছিল ব্যবহারে। তবুও প্রতিদিনকার সূর্যাস্তের পর মিষ্টি সন্ধ্যা এসে তাদের ঘিরে ফেলত—আর তার ঢিমেতেতালা ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিনীর মায়াপাশের ঝিম ঝিমুনিতে তাকে এলিয়ে দিত। পুরুষ টের পেত তখনি—এখন এই মুহূর্তটি তার নিজের —একান্তভাবে এ যেন তাকে হাতছানি দিয়ে রমণীর মনমঞ্জিলে যেতে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে। নারী যদিও তার নারীত্বের দাবীতে পুরুষকে তার দিনমানের ক্লান্ত তপ্ত মুহূর্তের পল-অণুপলগুলোকে আপন স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দিতে চাইত। সেদিনের প্রথম মুহূর্তে রমণী ছিল চরম আধুনিকা—যখন সে তার ডাগর চোখের অপাঙ্গে ফেলা দৃষ্টি দিয়ে শান্ত সুবোধ হোতে চাওয়া পুরুষের চোখকে পঞ্চশরে দগ্ধ করেছিল, আর তাই করে সে তার বর্বরতাকে আস্তে আস্তে ভুলে যেতে সাহায্য করেছিল প্রেমের মুঠোভরা রভস দিয়ে। ভাবতে বড় ভাল লাগে সেদিনও সে ছিল আধুনিকা—অন্তত তখনকার পরিবেশে। পরিবেষ্টনে। তবে ঠিক আজকের মতন ছোট ছোট গীতিকবিতার রিমঝিমানিতে সাজানো গোছানো আধুনিকার মত ছিল না। এরা যেন সত্যি আজ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, স্যামুয়েল কোলরিজ, সাদে, পুষ্পবিলাসী দেবেন সেন ও কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের ছবিতে গানে, গানে মুখর হোয়ে "লেক ডিসট্রিকটে"র ধারে ধারে ছায়া বিতানের মধ্যে, পদ্মার পারে, শিলাইদহে প্রেমাভিসারে জাগরূক এক একটি—লিরিক্যাল ব্যালাড্—পুরুষের মীনপিয়াস আর রূপতিয়াসকে বিহ্বলা করে দেবার অভিলাষে।

ওরা—মানে সেদিনের সুদূর-কন্যারা সেদিনকার মতই ছিল আধুনিকা। আজকের রমলা, শুচিস্মিতা, লীলা, বন্দিতা, কুঙ্কুম, কাকলি বা অরিজিতা কি সুপ্রিয়ার মতই ওদেরও ছিল এক একটা নাম, আর ধাম। সে সব ধামের প্রিয় পুরুষটিও নিশ্চয় আজকের আধুনিকের মত আদর জানিয়ে নামটুকুর অপভ্রংশ ঘটাতো। ছোট কোরে ডাকত। আর সে ডাক শুনে রমণীর চাহনিতে ছিটিয়ে দিত রঙ ছুট্ করা দুষ্টুমি। কাঁকন কিঙ্কিণিতে তাদের সলাজ ব্রীড়া জড়তা মুক্ত হোত। ঘোমটার সঘন অন্তরালের সব কৌতূহল বাইরে ছড়িয়ে পড়ত।

ই কোরে ছড়িয়ে পড়ার মধ্যেই ফুটে উঠত বসন্তের দমকা বাতাস ঘেরা রূপ।
এখন বসন্ত নিয়মমত এসে সাজাত নারীর দেহকে,—দেহের রূপরেখায়
সাজানো যৌবনকে। তার স্বতঃস্ফূর্ত মদিরা বাহার ঝলকে। পলকে পলকে
ছড়িয়ে দিত পুরুষের বুকের তপ্ততা ভরানো প্রমত্ত প্রহরগুলোকে। আনচান
করা কুহেলী ইচ্ছার গুঞ্জরণকে স্পন্দন প্রকাশে তুলে ধরত তার জন্য রূপের
অলঙ্কৃতা প্রিয়তরার কাছে। একের ইচ্ছায়, আরেকের চাহিদায়—বসন্ত-
মাসের গোধূলিতে প্রেম রিমঝিমিয়ে নেচে যেত চার চোখের তমসা রঙে।
দু চোখে থাকত জয়ীর সরব বার্তা। আর দু চোখের স্নিগ্ধনিশা ভাবাত
জয়ীকে কেমন কোরে জয় কোরতে হবে তার নিজের তৃষ্ণাকে সুতৃপ্তিকার
দেহ-মনের আধারে। প্রেম এ ভাবে জাগায় পুরুষকে, তার মধুর স্বভাবের
নারীকে। ভালোবেসে ভালোবাসা পায়—একে ও অপরে। সেখানে থাকে
রীতি আর ঋতু—দুয়েরই পরিবেশ সৃষ্টি করানো পরিপূর্ণতা। থাকে প্রমিতির
রতি, আরতি আর আরাধনার প্রেমাবর্তি ঠিক প্রেমের যৌথ-জীবনে,—যেখানে
ওরা দু জনে একজন আর একজনের পরিপূরক,—সম্পূরক।—পৃথিবীর চলার
পথে, এই আধুনিক মুহূর্তে,—প্রেমে ঘেরা যুবক ও যুবতীর কাছে এটাই চরম
সত্য—তারা আর আলাদা নয়, নয় দ্বিধা ও শঙ্কায় বিক্ষিপ্ত ও বিভক্ত।
মনোযোগের কঠিন প্রেমাবর্তে দুজনে সহযোগী পরস্পরের। শক্তি তাদের
ঋতুরঙ্গীন প্রণয়-মাধুর্য্য। আর প্রেরণা আসে পরিণয়ের রীতিসুন্দর যুগল রূপ
থেকে।—এটা আদর্শ। যুগ যুগ অভিনন্দিত বন্দিত প্রেমাদর্শ। এমন কথা
বললে ভুল হবে না যে, অতীতে, ইতিহাসের আগেও, প্রাগৈতিহাসিক যুগে
পুরুষ রমণী জীবন বাসরের দোসর ছিল মনের অকপট দিক থেকে। সংসারের
কঠিন ও জটিল দিক দেখত পুরুষ। সেখানে তার কাজ ঘর বাঁধান, ক্ষেত করা,
ফসল ফলানো, সমাজপতির কানুন মেনে চলা আর রীতি অনুসারে একটি
নারীকে সহযোগী সঙ্গিনী রূপে লাভ করা—আর তারপর বিধি-ঘেরা জীবনে
সমাজ-বিবর্ধনের মস্ত রীতি অনুসারে সময়ে সময়ে বাসক সাজে সাজা সুজনার
ঋতুমতী অবস্থাকে সৃষ্টিলোকে প্রজাবতী কোরে তোলার সাধনা। ঋতুর
রঙবাহার প্রকৃতিতে প্রেম-সাধনা। বসন্ত তাদের দূত। তার মাদক তৃপ্তি
ও বিহ্বল নেশার চমক ফুলদলে সাজাতো—ঐ সেদিনও—কেন না—"বসন্ত
পাঠায় দূত রহিয়া যে কাল গিয়েছে তার নিশ্বাস বহিয়া"।—এমন বড় সত্য
সেদিনও তাদের আজকের আধুনিক মুহূর্তের সতেজ আমেজ আর আবেগে

ভরিয়ে রাখতো খুবই। যুগ পালটায়, তাই বলে প্রকৃতি কিন্তু তার বিত্ত
বৈভব নিয়ে অটুটই থাকে। সে তার মধুময় রূপ নিয়ে বিন্দুমাত্র এদিক কি
সেদিক হোতে পারে না। আর তা হওয়ারও উপায় নেই। তার অপার
অসীমতাব দুনিয়ায় বসন্ত, শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ- সকলেই এক ছন্দ বাঁধনে
মিতাক্ষর। ঋতুতে ঋতুতে যে বহুরূপী রাগ বিচিত্রার অবদান আসে
বনান্তরাল ও জনপদ ঘিরে,—তারই অশেষ দান নির্ঝর হোয়ে ওঠে, যখন
যুবক ও যুবতীর কৌতূহলের রোমাঞ্চে ঘেরা সবুজ আঙ্গিনায় ভালোবাসা পলাশ
রঙে ফোটে। যুবকের বিহ্বল চোখের চাহনির কাছে যখন মধুরা কন্যার
ছন্দখানা কম্প্রমান বক্ষেব ঔদ্ধত্যে প্রেমারতি সাজিয়ে বন্দিতা হয়—তখন
আলোকসম্পাত হয় অমন একটা মঞ্জুল মুহূর্তে। প্রেমের জগত পথ দেখানো
নিশানা নিযে আলোকের দেউল হোয়ে ওঠে তাদেরই কাছে। আলো, আরো
আলো—এমনি ঝরঝরে এক উষালগ্নে তারা দুজনে কাছে আসে, চার চোখে
মিতালি পাঠায়, জীবনকে ভরাতে চায় কাকলি মূর্ছনায়, অধরে অধরে সাজায়
গুনগুনানো সুরে কাঁপা সুধার সরাব-মদির পেয়ালা, আর মধুমাসেতে
অধিবাস শেষে ঋতুতে ধারাস্নান সেরে ওঠা শ্রীমতীকে ঋতায়ণ কোরে পুষ্পবতীর
মিল-ছন্দে আহ্বান জানায় রতি আর আরতিতে—চিরদিনের যে এই হোল
একটাই টানা ইতিহাস। তাই সত্যি হোযে দাঁড়ায—

> "আলো যবে ভালোবেসে
> মালা দেয় আঁধারের গলে
> সৃষ্টি তারে বলে।"

তাই চিরকালের ইতিহাসের পটভূমিতে অতীত আর বর্তমান, নতুন আর
পুরানো, সেকেলে আর আধুনিক—এমন কোন নামাঙ্কন নেই। আজ যা
আধুনিক, ঠিক দুদিন বাদে তা হোল সেকেলে। এমনি এক দ্বিধাজড়ানো
সমাজে ও সাহিত্যে চিরন্তন হোয়ে থাকে সৃষ্টির কাজ আর সৃষ্টিলগ্নে জাগা
ভালোবাসার তীব্র অনুভূতি,—যা প্রেমরাগানুরঞ্জিত দু জনের মধুরে মধুর
সত্তায় সব সময় জাগরূক থাকে। জীবন, বিশেষ কোরে প্রেম-জীবন অশেষ
বিচিত্র ধরনের রোমাঞ্চ ও তার না জানা, না বোঝা আঁধারে ঘেরা থাকে।
এই কুহেলী রূপকে ধীরে ধীরে মনোযোগ দিয়ে জ্যোৎস্নাচ্ছন্ন কোরে তোলার
জন্য প্রয়োজন খাঁটি সমঝদারের—যে প্রেমের নিকষ সুবর্ণকান্তি আভায়

নিজেকে ও আরেকজনকে শতদলে প্রকাশ করাতে পারবে—আর সে ভাবে মধুরীম করার শেষ প্রতিদান সৃষ্টিকলার কারুকাজকে কি জীবন, কি জীবনাশ্রিত সাহিত্যকে মহৎ কোরে তোলে। পুরুষকে করে সুজন-সুভদ্র-সুহৃদয়বান। নারীকে করে মহিয়সী। নারীকে বোধ হয় আরো কিছু করে—ভালোবাসা তাকে মুক্তোঝরার কবির জন্য করে কবি-মানসী, অজন্তা-ইলোরা-খাজুরাহোর রূপদক্ষ প্রস্তরশিল্পীর চোখের রূপদর্শনের সামনে দাঁড করায় নিরাবরণ আর নিরাভরণ দেবকন্যার পারিজাত সুরভিত কল্পনায় ভরিয়ে, আর কথার পিঠে কথা, কাহিনীর ওপরে কাহিনী সাজিয়ে চলা কথাশিল্পীর একমাত্র অনুপ্রেরণা, সহাস আকুতির নির্ঝর স্বপ্নসঞ্চার।—স্বপনচারিণী আর গোপনচারিণী—দুই রূপেই নারী দুদিক থেকে পুরুষের প্রণয় ও পরিণয়ের অন্তরতমা আর স্রষ্টা সাহিত্যিকের মানসবিহারিণী—এর যখন যেমন তখন তেমন ভাবেই তৃপ্ত, মুগ্ধ, আবেশবিহ্বল করাতে পারে। এ যে তার প্রেমরূপ দীপবর্তিকার সলাজ আরাধনা নিরালা জগতের নিঝুম মুহূর্তে প্রিয়জনের জন্য, প্রতিভাধর মনীষী স্রষ্টার জন্য।—আপন মানস-কন্যা সোনালী চুলে ভরানো, নীল নীল চোখে সাজানো, পলাশ রঙীন আভাময় অধরযুগলে ছিমছাম শ্রীমতী ফেনি ব্রনেকে অনুরঞ্জিতা কোরেই মহাকবি কীটস্ মুখর হোয়েছিলেন—Love is my religion. I can die for that.—তাই পূর্বরাগ অভিসারে জড়িত এই প্রেমের সবুজ ঘরের আহ্বানে মৃত্যুকেও শ্রেয় বলে গ্রহণ করা হয় দ্বিধায় না পড়ে। মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান! এতে দার্শনিকতা আছে কবির আপন মনের বিভূতির মায়াসিঞ্চনে। শ্রীরাধার জীবনেতিহাস যৌবন অভিনন্দিত রাগে-অনুরাগে সব রকম নশ্বরতাকে অনায়াসে বরণ কোরতে রাজী ছিল,—আর তাঁরই মঞ্জুল কথায় সাজানো যুবতীর প্রিয়তমের জন্য প্রেমারতি অপরূপ সাহিত্য হোয়ে উঠতে পেরেছিল এ দেশেরই জয়দেব, চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতিতে।—এই বৈষ্ণব পদসাহিত্য প্রেমের সুখমঞ্জিল হোয়ে তার অনন্যতাকে অটুট রেখেছে আধুনিক শতকের চরম আধুনিকতার মানসবিহারে,—পুরুষ-রমণীর ভালোলাগার যুগল পরিক্রমায় অনুরাগের মান-অভিমান পরম্পরায়। মনে রাখবার মত এক দামী কথা এর মধ্যে ভেসে ওঠে—সাহিত্যের শিল্পকলা যেখানে নর নারীর জীবনযৌবনের রভসবাসরের বিচিত্র মিলনমেলার অনেক, অনেক হাজার এক রাতের কাহিনী বুনোনে প্রেমবাদকে দেহবাদের শুচিতায় অভিসার করানো ব্যঞ্জনাতে কল্পনার শত রঙবাহারে

সৃষ্টি করায়,—তার কোন বাধাধরা একাল-সেকালের পরিমাপ নেই। ও রূপ চিরন্তন। চিরসবুজের আঙ্গিনা শোভা কোরে তোলা ও যে বাতুলে বাতাসে ফোটা লাল পলাশ। ও বলে প্রিয়র কানে কানে 'নূতন করিয়া লহ আরবার চির পুরাতন মোরে'। আর সে আহ্বানে প্রিয়াকে বন্দনা কোরে জানায় তার সৃজন স্বভাব 'নবীন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবন ডোরে'। —চিরনতুন এমনি নিটোল ভাবনার জগতের দূতী বলে ওর সাহিত্যের রূপ কখনো হয় না পুরনো। ওর পাতায় পাতায় আঁকা যেন আম্রমুকুলের মৃদুল গন্ধে ভরা জীবনের খুঁজে ফিরে চলা নতুন বাসরের স্থির নিশ্চয়তা। এ যে ভালবাসার আরাধনা তারই মধুরা আরাধিকাকে সুনিশ্চিতা রাখে কোন এক বলিষ্ঠ আধারের আন্তর কোণে। যেখানে ছন্দে বেজে ওঠে মিথুন লগ্নের নূপুর-নিক্কণ। এ কথা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই, যদি মনে করা হয় সাহিত্যের ভালোলাগার জিনিস মাত্রে বহুলাংশে ভালবাসার অনুরঞ্জনে অঙ্কুরিত,—প্রণয়ের রূপাভায় তা সাহিত্যের দীপাধারে অলঙ্কৃত আরতি কল্পনার আবেশে আর আমেজে। যে প্রেম এসে তার প্রিয়ার সন্ধ্যারাগের ঝিলিমিলিতে আঁকা অধরের বাঁকা হাসির মনসিজা রূপের গড়ানে ভেসে ওঠা বিউটি স্পট একটি তিলের জন্য গোটা সমরখন্দ দান কোরতে রাজী, তেমন যাঁর মানস ও শারীর অভীপ্সা তাকে অন্যের ও সকলের সহৃদয় হৃদয়ের উপলব্ধির জন্য সাহিত্যই একমাত্র সম্ভব করায় নিজের শিল্পকলার রসসম্ভোগের ভেতরে।

ওমর খৈয়ামের যত কিছু বাস্তব অনুভূতি তাকে শুধু পলে পলে প্রেমরীতির সূক্ষ্ম দার্শনিকতায় টেনে নিয়েছিল, তার সবই পৃথিবীর জনমানসের প্রত্যেকেরই আপন আপন নিভৃতের নিরালা সুখের কাছে অব্যক্ত হোয়েই থেকে যেত, যদি না তাকে খৈয়াম মালঞ্চের মালাকরের মত কাঁকন কেয়ূরের কিঙ্কনীতে এক অশেষ কাব্য কোরে তুলতেন! খৈয়ামের ভালোবাসার সৌগন্ধে ভাসে যৌবনেরই সুরভিমদিরতা যুগ থেকে যুগান্তরের প্রণয়ছন্দে গাথা আলোর ভুবনে। মহাকবি শেলীর 'লাভস্ ফিলজফি' প্রথমা হ্যারিয়েট ওয়েস্টব্রুক ও দ্বিতীয়া মেরী গডউইনকে যে মানবতাবাদ বিকাশের স্বাধীনতার বাণীতে ফোটাতে চেয়েছিল, সেখানে তার মহার্ঘতার মধ্যেও প্রজ্বল হয়েছিল খৈয়ামেরই অভিব্যক্তি নারীর রমণীয় কল্পনায় বাসর-ঘরের কথায় আর কাব্যসুষমায়—এ সমস্ত অধর সাজানো চুম্বনাতিশয্যের মূল্য কি? নাই

যদি আমাকে তুমি দেও ঐ চুম্বনের রভসতা! পুরাণের বন্দী প্রমিথিয়ুসের বন্দীত্বকে বিন্দুমাত্র স্বীকৃতি দিতে পারেন নি দেবদূতরূপী কবিবরের যৌবন-দৃপ্ত গরিমা। তাঁর ভাববাদের মুক্তি শিল্পায়ণে ঐ বীর যৌবনের অধিকারীকে বন্দনা কোরেছেন 'প্রমিথিয়ুস আনবাউণ্ডে'—তুমি মুক্ত। বীরের বন্দীদশা মানবতাবাদের অবমাননা। এই ধ্যান শেলীর জীবনে আরাধনায় এসেছিল তাঁরই জীবন ও জীবন-বাসরের বরবর্ণিনী সুচরিতাদের রাগবিচিত্রা থেকে। আপন মানসের সহযোগী হৃদয়বিলাসের দ্বন্দ্বে যে প্রচণ্ড বিদ্রোহী সত্ত্বায় মহাকবি শেলী জাগরূক ছিলেন তারই শিল্পরূপ অসামান্যতা নিয়ে পুরাণকথাকে আজকের এক নিখুঁত মানবদলিল কোরে গেছে প্রমিথিয়ুসের মুক্ত পরিচয়ে! বাস্তবে কোথাও হার না মানা কবি তাঁর শিল্পকে নিজের দর্পণ কোরেছেন। অভিধা আর প্রজ্ঞা স্রষ্টার জীবনলোক থেকেই শতধারায় উৎসারিত হয় সাহিত্যে, যদি তাঁর মধ্যে থাকে প্রখর কল্পনার তীব্র দ্যুতি। তেমন স্রষ্টার মধ্যে ফ্যানটাসি বা কাল্পনিকতার স্থান নেই কোনরকম। কল্পনা বা ইমাজিনেশন হোল আসল প্রতিভার মানসী। বাস্তবে আছে ঘরের স্বতন্ত্রকা বরকন্যার প্রেয়সী ও শ্রেয়সীর এক হওয়া সমঞ্জসতা। আগেই বলা হয়েছে সাহিত্যের খানদানি পরিবার হোল রতি আর আরতিতে বন্দিত প্রণয় মাধুর্য্যের হারিয়ে না যাওয়া সৌন্দর্য্য, যা হোল 'a joy forever'—কবি প্রথমে ভেবে লিখেছিলেন 'a constant joy'। পরে অনুভবের প্রগাঢ়তা প্রমার রূপযানে চড়ে জানাতে পেরেছিল মর্ত্ত্যোঝরার মুক্ত আনন্দে—

Its loveliness increases ; it will never
Pass into nothingness ; but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep
Full of sweet dreams, and health, and quiet breathing.

—এমন বিভাবে চণ্ডীদাসের নায়িকার ভাবোল্লাস ও মিলন রূপঝরার কাকলিতে "চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে পুলক যৌবনভার, বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে হিয়ার হার"—তারই মনিকুট্টিম অভিব্যঞ্জনা ফোটে ভাষার সুষমায়, প্রেমের প্রখরতায়। আর স্রষ্টা তখনি বলতে পারেন—

"চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হ'য়ে।...
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর—সুন্দর হ'ল সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা, এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য, তাই এ কাব্য।"

এ তো গেল কল্পনারই রূপকল্পরা কথা। এর কি শেষ কোথাও আছে? না, নেই। সাহিত্যায়নের কারুকলার মধুবর্ষী ঋতা-রূপ ধরে কল্পনা তারই মনসিজ বাস্তবের গলায় প্রীতি-হার পরিয়ে পরিণীতা হোতে চায় বলেই—সাহিত্য তখন রূপে-রসে-আবেশের অভিনিবেশে, আর চিত্র-বিচিত্রময়তার অশেষে-বিশেষের দৃষ্টিনিমেষে ভরিয়ে কোরে তোলে 'কংক্রীট' রূপায়ণ। আলিম্পনের সাজঘর। এই অভিব্যক্তিটিই মানুষের ধারণার জগতে কোরে রাখা বাস্তব ও কল্পনা-সম্পর্কিত আসমান জমিন ফারাকটুকুকে ভেঙ্গে-গুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন কোরে আপন স্বাতন্ত্রতাকে কথাশিল্পের সব দেশেরই দুনিয়াদারির মধ্যে বারে বারে যুগ থেকে যুগোত্তীর্ণ রূপে সৃষ্টি করাতে পেরেছে। একেই আমরা বলব 'চিরায়ত'। বলব 'ক্ল্যাসিক'। আরো বলব—এই তো হোল রোমান্টিক সৃষ্টি! আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে বিশ্বাস করি—রোমান্টিক শব্দটি মোটেই কোন হাল্‌কা মেঘের খেলা নয়। গুরু রেশ ভাব-গাম্ভীর্য্যের ও ঐশ্বর্য্যের আলোকিত বিভাসে যুক্ত থেকে মাধুর্য্য ফোটায়। মানুষের জীবনে, কাজে, প্রেম-পরিণয়ে, চিন্তায় ঔদার্য্য ভরিয়ে তোলে। রোমান্টিক কথাটা স্বাতন্ত্রতারই পরিচায়ক। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে আমরা যখন বলি, তিনি ছিলেন একজন "romantic pioneer"—তখন তাঁর বিরাট কাব্য-প্রতিভার অসাধারণত্বকে বুঝতে কিন্তু তড়িঘড়ি করি না। ঋষিব প্রবক্তায় ধ্যান-দৃপ্ত সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও তাই ছিলেন। অন্য পরে কা কথা—কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের রূপ থেকে অপরূপ ঘুরে আসা রূপক পর্য্যন্ত অরূপরতনেব ধ্বনিসাঙ্গ অন্বেষণটি তো রোমান্টিক সমীক্ষাকেই কঠোরে-কোমলে সৃষ্টির রূপ দিয়েছে—তাকে কি অস্বীকার করা যায়? আর অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, তিনি কি রোমান্টিক-বিরোধী ছিলেন? যদিও জানি তাঁর স্বকীয়তার জগতকে একদিন রবীন্দ্রনাথের এক কবিতার নায়িকা তার করুণ জীবনের কাহিনীটিকে লিখবার জন্য মিনতি জানিয়েছিল—সেই 'রবি'র ভাস্বরে বন্দিত শরদিন্দু-প্রভায় ঝলকিত নভেলিষ্টের বাস্তবমুখী অভিজ্ঞা সমাজের কৃষ্ণপক্ষের কাহিনী নিয়ে মাতোয়ারা থেকেও—শেষ পর্য্যন্ত কি শুক্লপক্ষের ঝলমল করা রূপালী সামীয়ানায় ঢাকা আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে শৈল্পিক কারুকাজের জন্য শুভসন্ধ্যা জানান নি শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী, "শেষ প্রশ্নের" কমল পর্য্যন্ত? নিশ্চয়ই পেরেছেন। "একটি সাধারণ মেয়ে"র ঐ নিবেদনটি রূপে আর অপরূপে সমাজ-মানসের সুষ্ঠ বিবর্ধনের জন্য শরৎচন্দ্রের প্রতিটি সাহিত্যিক সৃষ্টির প্রতীতি নিয়ে সর্ব-সমক্ষে এক নামী সার্বজনীনতার

অশেষ মূল্যায়ন সমেত হোয়ে আছে দৃঢ়-বদ্ধ স্বাক্ষরে—সার্থকনাম। শরৎচন্দ্রের শিল্প-মনীষা এ কথাটা হৃদয়ঙ্গম কোরেছিল যে—নিছক বাস্তব-প্রীতির ঘনঘটা যে কোন আলোক-চিত্রশিল্পীর সর্বস্ব স্বত্ব হোলেও,—এতে জীবনদরদী কথাশিল্পীর রসিকসুজন অস্তিত্বটি কোন রকমেই সব সময়ের জন্য বিভোর থাকতে পারে না। কেন না—"মুক্ত যে ভাবনা উড়ে উর্দ্ধপানে, সেই এসে বসে মোর ভাবনা 'পরে"র একনিষ্ঠ অন্বয় শিল্পীর সৃষ্টিধর ক্ষমতার সঙ্গে কথাযানী প্রবক্তৃতায় যখন রূপযানী কল্পনার আবেশ ভরিয়ে করায় সিসৃক্ষু—ঠিক তখনি কথাকারের মুক্ত ভাবনার উত্তরীয় রাঙিয়ে যায় রামধনুর সাত রঙে। আর এমনটা হয় বলেই—স্রষ্টা শিল্পীর অনলসে করা নৈষ্ঠিক সাধনা এক কাল অতিক্রম কোরে আপনার সৃষ্টিকে করায়—যুগোত্তীর্ণ। করায় চিরায়ত ধ্যানকুট্টিমতায় সাজানো—ক্ল্যাসিক। বিদেশে এই নিছক বাস্তবে মুগ্ধ না থেকে এক আন্তর্জাতিক আবেদনে ধ্যানসাঙ্গ ধৃতির কৃতি-স্বরূপ ধরে অসাধারণ কল্পনা-শক্তির বিভায় যেমন যুগোত্তীর্ণ হোয়েছেন—শেক্সপীয়র, গ্যেটে, টলষ্টয়, কীটস্, শেলী, রেঁালা, আনাতোল ফ্রাঁস, বায়রণ, টমাস্ ম্যান্, স্কট, ডিকেন্স, হ্যান্স এ্যাণ্ডারসন বা পিরানদেল্লো বা ডস্টয়েভস্কি। এদেশে যেমন হোয়েছেন কালিদাস, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র।—কিন্তু তার পরের কথা কি? সত্যি এই তারপরের সমীক্ষা করা বড কঠিন, বড জটিল—যেহেতু একটা শত বছরের যুগ না অতিবাহিত হওয়া পর্য্যন্ত—আজকের অনেক যুগন্ধর আধুনিক স্রষ্টার শিল্পায়ন সম্পর্কে একটা রায় অর্থাৎ কোন 'ভার্দিক্টে' ভারাক্রান্ত করা যায় না—ঠিক ঠিক। সত্যি একটা যুগ যাবে, আরেকটা যুগ আসবে—আর এরই নিরীখে শিল্পী তার সৃষ্টি নিয়ে হবেন কালজয়ী। এটাই মূল্য নিরূপণের সঠিক জীয়ন-কাঠি বলেই দেখতে পাই—"থীবো"র রোজার মার্টা দ্যু গার, "ম্যারেজ"এর এইচ্. জি. ওয়েলস্, "ডলস্ হাউজে"র ডাঃ ইবসেন, "প্রাইড্ ও প্রেজুডিসে"র জেন অষ্টেন, "রোমলা"র জর্জ ইলিয়ট, "আণ্ডার দি গ্রীন উড্ ট্রী" "এ পেয়ার অফ্ ব্লু আইজ" "ফার্ ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড"-এর টমাস হার্ডি বা অন্যধারার ফ্লবেয়ার, বালজাক্, অস্কার ওয়াইল্ড্, বোদলেয়ার, হুইটম্যান বা আঁদ্রে জিদ প্রভৃতির, বা আমাদের দেশের রমেশ দত্ত, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, স্বর্ণকুমারী দেবী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী বা নিরুপমা দেবী বা কামিনী রায় বা অনুরূপা দেবীর আপন আপন সৃষ্টির রসে-রূপে-গন্ধে মাতাল সেদিনকার যুগ শেষ হওয়া সত্বেও কি

—তাঁরা আজও আধুনিক পাঠকের বা সমালোচকের বড় বেশী যুক্তি-বিযুক্তিতে ভরানো জটিল মানসিকতাকে রঙ্ লাগিয়ে উতলা কোরে যান না? ঠিক-ই যায় তা। তবে অবশ্য এদিক থেকে আজ অন্ততঃ ব্যতিক্রম হোয়ে দেখা দিয়েছেন বার্নার্ড শ'। তাঁর সমালোচকরা আজ অনেকেই বলতে শুরু কোরেছেন—শ'র সাহিত্য আজকের চল্‌তি হাওয়ার পন্থী হোতে পারছে না! জানি না—শ' নিজেই নিজের সাহিত্যিক ভবিষ্যতকে নিয়ে সময় বিশেষে যে রসিকতা কোরেছিলেন নিজে লিখেই—তা-ই ধরেই কি সমালোচকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হোয়েছেন? মনে হয় সবটা নয়, কিছুটা। অন্ততঃ শ' যে যে জায়গায় তাঁর রচনাকে বাস্তবের ঘনঘটায় ধরে রেখে কথার তুবড়ি ও জ্বালাময় কষাঘাত কোরেছিলেন সমাজ, নারী মায় প্রেম সম্পর্কে—ঠিক সে সব কথা আজ প্রকারন্তরে হোয়ে পড়ছে—অব্‌সোলিট্‌। অচল। তবু বলব যে প্রবীণত্বের অনুজ্ঞায় রাঙিয়ে বার্নার্ড শ' এ-যুগ থেকে অভিসারে যাত্রা কোরে কল্পনার ঋতু-সাজে মুখর এক নতুন যুগের ভবিতব্যতা নিরূপণের শিল্প-স্বাক্ষরে রচনা কোরে গেছেন "Back to Methusila"র জীবন-বীক্ষাকে, আর অনাগত সেই সমাজ সমীক্ষাকে—তা কি সত্যি কখনো কালের কপোল তলে এক বিন্দু অশ্রুজল ফেলে হারিয়ে যাওয়ার মতো জিনিস? এই হারিয়ে যাওয়ার প্রশ্নটা কখনোই উঠতে পারে না। কেন না—যে সৃষ্টির মধ্যে অন্বয় আছে, সমীক্ষা আছে, বক্তব্যের মাদক ছোঁয়াচ আছে, আর সর্বোপরি যখন আছে এক ব্যাপক দর্শনের উদ্বোধন—তখন শুধু শ' কেন—এমন ঋদ্ধিময় আর বোধময় স্রষ্টার সৃষ্টি—যে কোন নশ্বরতাকে অনায়াসে হারিয়ে দিয়ে সাহিত্যের মৌনতা ভাঙিয়ে জানাতে পারে মন্ত্র-কথাটাকে—"Bread that is broken—is—bread that is shared."

আপন সৃষ্ট সাহিত্যকলার অয়নান্ত রূপ ধরে কোন স্রষ্টা কতদিন থাকবেন, আর কেনই বা 'পস্টেরিটি'কে জয় করতে পারবেন না—এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে পৃথিবীর দুই দেশের দু'জন যুগপ্রবর্তক শিল্পী-মনীষীর সমকালীন তাঁদেরই পরস্পরের দু'জন সাহিত্যিক বন্ধুর কথা ও কাহিনীকে। বেন জনসন ও দামোদর মুখোপাধ্যায় হোলেন এই দু'জন। আর মনীষী দু'জন হোলেন উইলিয়ম্ শেক্সপীয়র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।—আর সত্যি একেই বলে প্রকৃতির পরিহাস! কেন না, সেদিন সত্যি যুগের এ-পিঠে এবং ও-পিঠে, এ-দেশে আর ও-দেশে যথাক্রমে দু'জনে আর দু'জনার 'contem-

porary'ত্ব নিয়েই সত্যি যুগোত্তীর্ণ হোতে পারলেন না—কি বেন জনসন, কি দামোদর মুখোপাধ্যায়—তাঁদের কেউ-ই। অন্যদিকে আর দু'জনা আজও যুগ থেকে যুগান্তরের পথপরিক্রমায় হোয়ে আছেন নতুন বিবাহের রূপসাজে অলঙ্কৃত অভিসারক—যেমন বক্তব্যে, তেমনি জীবনের দার্শনিক ব্যক্ততায়, আর সমাজ ও প্রেম-ভালোবাসার সোনার কাঠিটির অন্বেষণে! সত্যি অ্যাভন নদীর তীরের এই বাস্তবকে রূপকথা, এবং রূপকথাকে বাস্তব করার জহুরী রূপে প্রখর কল্পনার সম্রাট-কবি,—আর ভারতের স্বাধীনচেতনা ও দেশপ্রেমের মন্ত্রগুরু রূপে সাহিত্যসম্রাটের ঋষিত্ব-ঘেরা অবিনশ্বরতাকে সেদিনও নয়, কোনদিনও নয়, মায় অনাগত কালও নশ্বরতা দিয়ে চ্যালেঞ্জ কোরতে সক্ষম হয়নি। আর হবেও না তা। আর সত্যি ইংলণ্ডের "পোয়েট লরিয়েট" হোয়েও বেন জনসন তাঁর "Every Man in his Humour' বা 'The Alchemist'—এবং এদেশী ও বিদেশী জ্ঞানে পণ্ডিত ও রোমান্সের পাকা লিখিয়ে হওয়া সত্ত্বেও দামোদরের "শুক্লবসনা সুন্দরী"—এই দু'জনারই প্রতিভাকে মাঝে মধ্যিখানে পাঠকের কাছে পরিচায়িত কবাতে সক্ষম আছে। আর সব রচনা সে-সে যুগে সক্ষম হোয়েও—রুচি ও রীতির আর নীতির আর সর্বোপরি 'স্টাইলে'র আমূল পরিবর্তনী ধারায় বিহ্বলতা ছড়াতে আজ সত্যি অক্ষম। সেদিক থেকে শেক্সপীয়র কি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের সৃষ্টিতে রেখে গেছেন—রুচি আর সুরীতির ঋতুঝরা ক্ল্যাসিকত্বকে। চিরাচরিত মন-দোদুলা আবেদনটিকে। অনুরাগনির্ঝর রস ফোটানো নিবেদনটিকে।

এই রূপ-রস-রঙ্-মাদকতা-বিলোলতা সাজানো পৃথিবীর একটা কোণে বসে ধীর সমীক্ষায় যে বক্তব্যের প্রবর্তনা কোরেছি—সেই সোনা-ঝরা সন্ধ্যার নিরালায় আকুলতা ভরা প্রণয়-বাসরেতে বাগকসজ্জায়, আর নিলাজে হওয়া সলাজমধুরতায় প্রিয়ার পৃথিবী যে ভাবে প্রিয়র দেহ-ঘিরে সুরের লহরে আদর-সোহাগ-চুম্বন দিয়ে ও নিয়ে এক একটা 'মুনলাইট সোনাটা' ফোটায়—তারই রূপবীক্ষা অনিন্দ্যতায় অবিনশ্বর বিভাসে ঝলকিত ঋদ্ধিময়তা ও অশেষ সুদৃপ্তময়তাকে নিয়ে রাঙিয়ে রেখেছে—এ-দেশের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও ও-দেশের মহাকবি বনাম মহানাট্যকার শেক্সপীয়রকে।—আমার এ কথা বলবার কারণ যুক্তিযুক্ত ভাবে হলো একটাই—অর্থাৎ পৃথিবীর দুটো আলাদা জগতের দিনদুনিয়ায় প্রেমকথার এক হাজার এক 'আরব্য' রজনীর পাতায় ঘেরা বনানীর ধার ঘেষে প্রিয় ও প্রিয়ার মৌনতা ভেঙ্গে যে রূপকথা গুঞ্জরিত

হোয়েছে—তার প্রথম থেকে শেষ হোয়েও শেষের মহার্ঘ্যকুট্টিম জীবনবেদ নিয়ে রচনার প্রতিটি ছত্রে যে অসাধারণ বক্তব্য ও বিলাসের প্রসাধনে রূপখানী দার্শনিকতা ফুটে উঠেছিল—তারই অবিনশ্বর শিল্পবিবেক সব যুগন্ধর মহাশিল্পীরই পরিপ্রেক্ষিতে দু'ধারায এক ও অদ্বিতীয় হোয়ে আছে শেক্সপীয়রে আর বঙ্কিমচন্দ্রে। একটা জোরালো কথায জানাতে পারি যে—এই দু'জন মহামনীষীর শিল্পভবনেতে সমাজে যা ছিল, যা আছে, আর যা হবে বা হতে পারে—এই তিনেরই দারুণ অভিনিবেশ উঁচু হতে নীচু মান পর্য্যন্ত, আর স্বর্গ হতে মর্ত্য হয়ে পাতাল ঘুরে নরক পর্য্যন্ত অতি দূরদৃষ্টির ফলে যে বিরাট সমীক্ষার চারধার ঘিরে হাজারে হাজার রকমেরই 'টাইপে' বিশিষ্ট চরিত্রগুলো হেথা-হোথা-অন্য কোনখানেতে আনাগোনা কোরে থাকে—তারই বৈচিত্র্য-মুখরতা সমাজ নিয়ে, মানুষের ইতিহাস ও ধর্ম নিয়ে, আর তাদেরই যৌবনের প্রণয়-পরিণয় নিযে অনন্যে আর বরণ্যের অসাধারণত্বে রূপকল্পতা নিয়েছে এই শেক্সপীয়রে, আর বঙ্কিমচন্দ্রে। অন্ততঃ ভালবাসার যৌবনান্বিত কথার কাকলিতে মনকে যদি ক্ল্যাসিক সুরে ভরাতে হয়, তবে তা পাওয়া যাবে সহজের স্বাভাবিকতায়—এই এইখানে—তাঁদের দু'জনারই "seer" পরিচিতির ভবিষ্যৎদ্রষ্ট-মানসেতে। ওঁদের দু-জনার দৃষ্টিনিমেষের প্রখরতায় যুবকের আর যুবতীর যৌবন পলাশে আর সবুজে সেজে আরতি কোরে গেছে প্রণয়ের হেমাঙ্কিত কথা ও কাহিনীকে। সে সব কথা কি পলকের জন্যও ভুলতে পারি ?

তাই ভুলতে পারি না যে—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রমণীর মঞ্জুল মানসিকতায় মঞ্জীরামুখর যুবতী স্বভাবের রাগমুরাগ ও অভিমান দর্শনে "আনন্দমঠে" প্রবাদিত কোরে গেছেন—"রমণীর বুক বড নরম জিনিস"—এই এবই রমণীয় অভিধায়! সত্যি তো ভালবাসার অভিব্যক্তি মাত্রেই হলো—হৃদয়ের জাগরণী স্বত্বা। হৃদয় দিয়েই বাসতে হয় ভালোবাসা—প্রিয়র জন্য, তারই মধু-মিতার জন্য। আমি বলব—ভালোবাসা জিনিসটা প্রিয়র চাইতে সময় বিশেষে তার "মিষ্টি খুশী"র হৃদয়-বাসরেতেই ডগমগিয়ে ওঠে। যুবতী বর-কন্যা জানে—হৃদয়ই হচ্ছে প্রণয়ের সব ভাব ও বিভাবের আধার—আর তারই আধেয় না হযে পারে না প্রিয়-সুজন মানুষটি। রমণীর ঐ হৃদয়ে আছে প্রণয়ের দীপারতি করার জন্য বজ্রশ্রীর রূপসাজ। সলাজে কাঁপা পেশলতারই নিলাজমঞ্চ বসন্তসাজ ফোটে দুই ঋতা-সুন্দর ঋতুর ঐশ্বর্য্যে ভরিয়ে। এই সেদিনের স্রষ্টি অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসে দেখেছি—শ্রীমতী রত্নাগোরী হৃদয়ের ঐ ঘন পীনোন্ধ

যৌবনসাজ দেখিয়ে বন্দনা কোরেছিল শেষ মুহূর্তে প্রিয়তম—রত্নকে! ইংরেজী প্রবাদে বলে—ভালবাসার যুবতী তার যুবককে গভীরে টেনে বাসতে চায় ভালবাসা—"with the point of her breast." আমার মনে হয় যুব-কন্যার এ ধরনের প্রণয়বিলাসে আছে—প্রজ্ঞার ঔজ্জ্বল্য ও উচ্ছলতা।— আছে কথাশিল্পী বা কবির 'wit' ও 'wisdom'—সে কথা শেক্সপীয়রে শিল্প-ধৃতির সঘনতায় কারুকাজ হোয়ে ফুটেছে। প্রণয়ে বিহ্বলা রোজালিণ্ড তার প্রিয়তমকে নিবেদনে সাবধানী হোতে বলে কথার রমণীয় 'উইট'-এ উচ্ছলিত হয়ে বলেছিল—"No, No, Orlando; men are April when they woo, December when they wed: maids are May when they are maids, but the sky changes when they are wives. I will be more jealous of thee than a Barbary cock-pigeon over his hen, more clamorous than a parrot against rain,···I will weep for nothing, like Diana in the fountain; and I will do that when you are disposed to be merry; I will laugh like a hyen, and that when thou art inclined to sleep.···(Orlando) But will my Rosalind do so?···(Rosalind) By my life, she will do as I do.· (Orlando) O, but she is wise.·· (Rosalind) Or else she could not have the wit to do this: the wiser, the waywarder · make the doors upon a woman's wit, and it will out at the casement, shut that, and 'twill out at the key-hole; stop that, 'twill fly with the smoke out at the chimney.··· (Orlando). A man that had a wife with such a wit, he might say,—"Wit, whither wilt?" ·· (Rosalind) Marry, you shall never take her without her answer, unless you take her without her tongue. O, that woman that cannot make her fault her husband's occasion, let her never nurse her child herself, for she will breed it like a fool!"—এই যে রোজালিণ্ডের কথার উত্তরে আবার কথা সাজানো এবং তারই পিঠে জুড়ে বসছে অরল্যাণ্ডোর সহজ প্রগল্ভতা ভরা কথাও, তা যুবক-যুবতীর প্রণয়লোকের উচ্ছলতাকেই কোরে তুলেছে প্রজ্ঞার চঞ্চল ঊর্মিতে রাঙা—রূপের জগত। মায়ারাগের ঝর্ণা-ধারা। ওরা ভালবাসা বাসবে—এটা প্রকৃতি-বিধিত কানুন বলেই যখন পরস্পরের সবুজ দেহমনে সানন্দে উপছিয়ে ওঠা পলাশ মাখা লজ্জাকে ওদের মধ্যে কে প্রথম সক্রিয় হোয়ে করাবে—অধরের মিলন-সঙ্গমে আহ্লাদিত ভাবে "রাঙা হাসির বাসর' শয়ন" পাতাবার জন্য ঝরিয়ে দেওয়া নিলাজেতে মদালসা

হওয়াটা ? এমন ভাবের উদ্বোধন যৌবনেরই প্রণয়রীতির নিখুঁতায় মঞ্জুল থাকে বলেই "As you like It" ধরে দু'জনার যে কেউ কোরতে পারে প্রস্তাব—আর অপরে তার পছন্দসই একে করাতে পারে গৃহীত। প্রিয়াই পছন্দ নিয়মানুসারে তার বরপুরুষকে নিজের ইচ্ছাটাকেই না করিয়ে ছাড়ায় না—পছন্দমত। এই দুষ্টুরাঙা দুটি স্বভাবেরই সহাসে কলোচ্ছলিত দুটি মনের মিতালি সুখ কেমন অসামান্য শিল্পরূপ নিয়ে হয়েছে অপরূপতারই অয়ন ধরে বিভাসিত—তা শেক্সপীয়রের রোজালিণ্ড-অরল্যাণ্ডোকে ঘিরে মূর্ছনা নিয়েছে—বাদুলে নেশার মধ্যে রিমঝিমিয়ে ওঠা শুধু প্রণয়কুট্টিমতাটি : তৃপ্তির অনুভবনীয়তায় সুর-ঝঙ্কার তুলে প্রিয়া রোজালিণ্ড তার প্রিয়তমকে আহ্বানে বন্দনা কোরে বলেছিল "Come, woo me, woo me ; for now I am in a holiday humour, and like enough to consent. What would you say to me now, an I were your very very Rosalind ?" এর উত্তরে প্রিয় কিন্তু দুষ্টু-কথা না বলে থাকতে পারে নি—"I would kiss before I spoke." ব্যস, আর যাবে কোথায়। প্রিয়াকে চুমা খেতে চায় তারই প্রিয়—সত্যি এ কি—নিলাজ দুঃসাহস! চিরাচরিত রীতি মেনে প্রিয়া তখন কাটা কাটা স্বরে অনুরাগবতী সন্ধ্যার আমেজ ঝরিয়ে যা বলতে চেয়েছিল—তা ছিল মধুরা যুবতীদেরই এতে সম্মতি-জানাবার সেই বিশেষ পন্থাটি—অর্থাৎ হ্যাঁ-কে কিছুতেই হ্যাঁ বলে জানান দেওয়া চলবে না! বলতে হবে—না, না, না! এই ওদের না বলার মধ্যেই কিন্তু জানানো থাকে—হ্যাঁ বলার স্বীকৃতিটি। রসিকশ্রেষ্ঠ কথাকার সার্ভেন্টিসের 'ডন কুইক্সোটে' তো বলাই আছে—

"Between a woman's 'Yes' and 'No'
There is no room for a pin to go."

এটা কিন্তু শিল্পবেত্তার নিছক রসিকতা নয়। এটা অধিকন্তু কিছু বলেই হয়ে উঠেছে এক প্রবাদ বাক্য। এ কথা শুনলে পর—আজকের আধুনিকারাও হবে—লাজবতী। এটা যে তাদেরই একটি বিশেষে মধুর স্বভাবের দুষ্টপনাকে রাঙিয়ে গেছে। অবশ্য এর পরেও কিন্তু যুবতীরা প্রণয়াকুলতার অভীপ্সাগুলোকে উচ্ছল 'উইটে'র ঔজ্জ্বল্যে আরো প্রাঞ্জল করায়।—এই তারই নিরীখে প্রিয়র ঐ নিলাজ চাওয়ার ইচ্ছাকে কথাজালে বাধা দিতে চেয়ে রোজালিণ্ড বলেছিল—"Nay, you were better speak first ; and when you were gravelled for lack of matter, you might take occasion to kiss.

Very good orators, when they are out, they will spit ; and for lovers, lacking (God warn us !) matter, the cleanliest shift is to kiss." এ তো যা তা বক্তব্য নয়! এ তো আর যেন-তেন-প্রকারেণ করা—প্রেম নয়! যুক্তির আদানে হ্যাঁ-কে না-ই প্রতিপন্ন করাতে পারলেও—প্রতিভাষণে কিন্তু অরল্যাণ্ডোও কম গেল না, যখন সে প্রিয়ার বক্তব্যে সন্দেহ নিয়ে প্রশ্ন করলো—"How if the kiss be denied ?" প্রিয়ার দুষ্টুমিতে আবরিত দেহমনে উত্তর সাজানোই ছিল। বলল, কোন ভাবনা নেই—কেননা প্রিয়ার তৃষিত ঠোঁটে চুম্বন-দান-করাকে বারে বারে বাধা দিলেও এটা প্রিয়র জানা উচিৎ যে—"Then she puts you to entreaty, and there begins new matter."—সত্যিই তো বোজালিণ্ডের এই কথাটার মূল্যায়ন অনিন্দ্য আর অনিবার। প্রণয়ের আবেশলোকের দু'জনার মধ্যে যদি এই একটু দ্বন্দ্ব, একটু ভুল বোঝা নিয়ে সাধা-সাধি করা মান-ভঞ্জন-মানসে, আর তা নিয়ে অভিমান করা, আর আলস্য ভরিয়ে অকারণে চোখের জল ফেলা—এমনটা না হোলে পর ভালোবাসার জীবন হোতে পারে না বিচিত্রামুখর। হোতে পারে না মধুঋতা সুখের মধ্যে মিতালির—রিমঝিম ছন্দ। শেক্সপীয়র এই অভিব্যক্তিটিকে ব্যক্ত করিয়ে গেছেন—অসাধারণ শিল্পায়নের রীতি-সাজে। এ-দেশে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে তাঁর "ইন্দিরা"র শিল্পকাজে এই ধ্যানময়তাকে প্রণয়কলার আশ্লিষ্ট দম্পতির জীবনেতে করাতে পেরেছেন প্রতিভাসিত। তাঁর তুলনা সত্যই অন্য কোন দেশের সাহিত্যে পাওয়া অসম্ভব। "ইন্দিরা"র অত ছোট পরিগণ্ডীর মধ্যে দাম্পত্য-জীবনের এমন মধুলিটরূপী প্রণয়ের রূপস্বাক্ষরে এক কথায় এর কাহিনীকে চিরায়ত করাতে পেরেছেন। কি ভাবে বিচ্ছেদের পরে প্রিয়তমকে আদরে আর সোহাগে মাতিয়ে তুলবে প্রিয়া-স্ত্রী নিজেই আপন অধরের লাল হাসি ঝরা চুমায়—এমন ব্যাপারে ইন্দিরাকে তার সখি যে আপন দক্ষতারই পরিচিতি দেখিয়ে, আর তা বুঝিয়ে আলিঙ্গনে বাঁধা থেকে প্রিয়র তাপিত অধরে—প্রিয়া নিজে থেকেই সচেষ্ট হোয়ে কেমন অতর্কিতে এঁকে দেবে চুম্বনেরই সিক্ততার মিষ্টি-লেখামালা—এই এ সবেরই জন্য দুই সখিতে মিলে মহলা নেওয়ার কথা ধরে বর্ণনা-বিচিত্রার রসাস্বাদনটি হোয়ে উঠেছে এক কথায়—শুধু কুট্টিমসাজে লাজহর আর মধুরিম শিল্পায়ন—পরিণয়ের প্রণয় বনাম যৌবনায়ন সমেত। —অতি আধুনিককালে মণীন্দ্রলাল বসু "রমলা"তে—আর সর্বোপরি বিভূতি

মুখোপাধ্যায় তাঁর বিভিন্ন ঋতু-বিচিত্রার অস্তিত্বে সাজা শিল্প-সৃষ্টির দুনিয়াদারিকে এরই একটা নামধেয় অনিন্দ্যতা দিয়েছেন। এমন ভাবের বিভাবকেই বিভূষিত করেছেন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় শিশুর দেয়ালা হাসিতে, আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাকেই সাজিয়েছেন আউল-বাউল বৈষ্ণব-শাক্ত থেকে সাঁতালীর বেদে-বেদেনীর দেশ ঘুরে—ঝুমুর সম্প্রদায়ের নাচ আর গান পর্য্যন্ত। এমনটাকেই অন্নদাশঙ্কর রায় অলঙ্করণ করেছেন নতুনা রাধাদের প্রকৃতি নিয়ে রূপের নির্ঝরে হ্লাদিত থাকা মান-অভিমান-অভিসার-প্রণয়াকুলতার জন্য "সুখ" অন্বেষণী সত্বায়। হাজার এক বৈচিত্র্যে একেই কোরেছেন "বনফুল" দূর-সুদূরের রূপকল্প। প্রবোধকুমার সান্যাল দেখিয়েছেন প্রেম-সায়রের 'বোহেমিয়ানিজমে'তে সিঁদুর-রাঙা থেকেও দুইয়েরই এক হওয়ার বন্ধন-মিতালি। সারী গান আর নদী-দেশের চড়া ভাটিয়ালী সুরে গণ-বিলাসের আপন আকুলতাকে এই নিরীখটি ধরেই শিল্পায়িত করেছেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এ অভিব্যক্তিটিই বাস্তবের ওড়নায় কল্পনার রঙ্ মাখিয়ে মধুরে মধুর প্রণয়ের জীয়ন-কাঠি হোয়ে উঠেছে সুবোধ ঘোষের মনীষায়। —এঁদের সব সৃষ্টির শৈল্পিক কারুকাজের আপন আপন বিচিত্রা-সাজানো রূপঝরার সাজঘরের হরেকরকম কথা ও কাহিনীর অনন্যে স্বচ্ছন্দ বক্তব্য ও বর্ণনার মধ্যে দেখেছি—নামধেয় স্বাক্ষরেতেই ব্যক্ত হোতে পেরেছে এ-দেশেরই চিরায়ত অনেক কিছু—আমার মতে—যার মূল্যায়ন পৃথিবীর প্রতিটি দেশের সাহিত্যাঙ্গনের মধ্যে নির্ধারিত হবার মতো জোরদার স্পর্ধা রাখতে সক্ষম। এই "পথের পাঁচালি" থেকে "অপরাজিত" হোয়ে "ইচ্ছামতী" নিয়ে "আরণ্যক", বা "কবি" থেকে "রাইকমল" হোয়ে "ধাত্রীদেবতা", বা "স্বর্গাদপি গরীয়সী" থেকে "কাঞ্চন মূল্য" হোয়ে "রাণুর প্রথম ভাগ", বা "মৃগয়া"র পর "জঙ্গম" ধরে "ত্রিবর্ণ" পর্য্যন্ত, বা "সত্যাসত্য" থেকে আরম্ভ কোরে "কন্যা" হোয়ে "রত্ন ও শ্রীমতী"রও পরবর্তী অন্বেষণী অন্বয় "সুখ" পর্য্যন্ত, বা যৌবনায়নেরই জীবনবেদ "জীবনায়ন" থেকে "রমলা", বা "তিতাস একটি নদীর নাম", বা "পুতুল নাচের ইতিকথা", বা "প্রিয় বান্ধবী" থেকে "মহাপ্রস্থানের পথে" হোয়ে "হাসুবানু" নিয়ে "আঁকাবাঁকা" পর্য্যন্ত, বা সরোজকুমারের "নতুন ফসল"—এই সমস্ত রচনাগুলোই অসাধারণ জীবন ও সমাজ নিরীক্ষারই অতি বাস্তব ও অতি প্রখর কল্পনার মিলন-বাসরে পরিণীত হোয়ে যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিয়েছে নিখুঁতে নিটোল আর বক্তব্যে অটল শিল্পায়নে—তা চিরায়ত আবেদন নিয়েই

পৃথিবীর যে কোন দেশের সাহিত্যে বৈচিত্র্যের আস্বাদন দিতে ও বিদেশীর দৃষ্টির কাছে সঠিক মূল্যায়নে স্বাক্ষরিত হবার মতো অধিকার রেখেছে। আমার এটাই দৃঢ় বিশ্বাস—এই সব গ্রন্থ ও সে সবেরই আধুনিকতায় যুগন্ধররূপী এই স্রষ্টাদের সম্পর্কে। কিন্তু মন ভরে ওঠে হতাশায় যখন দেখি—বিদেশের সাহিত্যবাসরে এই বইগুলোকে ভাষান্তরিত কোরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য—কেউ-ই নন সচেষ্ট। এ-দেশে বহু বিদেশী ভাষায় লিখতে সক্ষম অতি শিক্ষিতজনের উপস্থিতি থাকা সত্বেও—ওঁদের মধ্যে নেই নিজেদের মাতৃভাষার সাহিত্যকে ভাষান্তরিত কোরে বিদেশ-বিভুঁয়ে প্রচার করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাটা। এই ওঁবা সজাগ না হোলে পর কোনদিনই এ-দেশের সাহিত্য মিলতে পারবে না—অপর দেশের সঙ্গে। যেমন তাঁবা চুপ—তেমনি নির্বিকার প্রকাশকেরা। জাতীয় সরকারকে এ ব্যাপারে অভিযুক্ত করা ভুল হবে—কেন না, আমি বিশ্বাস রাখি—এই গণ-তান্ত্রিক পৃথিবীর বিরাট সংস্কৃতিভরা ইতিহাসের থেকে আরম্ভ কোরে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত কোন দেশের সাহিত্যই আন্তরিকতা থাকলে পর রচিত হয় নি, আর হয়ও না—আপন দেশের সরকারের মুখাপেক্ষী থেকে। সরকার চালাবে দেশের জন-মানসকে—আব সেই জনমানসকে জ্ঞানী করাবে, ভাল-মন্দ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করাবে, আব সর্বোপরি পেতে দেবে আনন্দময় সত্বাকে—মূলত এই সাহিত্যই। কাজেই আমি মনে করি—সাহিত্যের মূল্যায়নকে জগত-সমক্ষে তুলে ধববে—সে দেশেরই শুধুমাত্র অনাগত আর অনিবার জন-সাধারণ, বিশেষভাবে বিদগ্ধ সুধী-সমাজটি।—সবকারের সত্যি করার কিছু নেই। যদি করেন—তবে তার ফল-স্বরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে দেখাবো—আধুনিক সোভিয়েট দেশটিকে—যেখানে সরকারী অনুগ্রহের অতি দাপটে বাঁধা পড়ে আর সরকারী নির্দেশনামাব ছকে ছকে ছক্ মেনে চলায়—ও দেশের সাহিত্য আজ হোয়ে উঠেছে—তরঙ্গহীন বদ্ধ জলাশয়ের মতো। একেবারে পুরোপুরি—স্ট্যাগনান্ট্। শুধু কি তাই—সব চাইতে স্বাধীনতা-প্রিয় ও সেই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতায় বিশ্বাসী খাস্ ইংরাজের দেশে এই সেদিন দেখা গেছিল নোবেল্ লরিয়েট্ টি. এস. এলিয়ট তাঁর ধর্মান্তর-গ্রহণের প্রেক্ষিতে লিখেছিলেন যে আলোচনার বই, অর্থাৎ ঐ সম্পর্কিতই একটা 'ট্রীটিজ'—যার প্রচারনার জন্য ঐ গ্রন্থের মুখবন্ধের লেখাটা লেখা হোয়েছিল—'ফরওয়ার্ডেড বাই স্যার এণ্টনী ইডেন, কে. বি., দি অনারেবল প্রাইম মিনিষ্টার অফ্ দি ইউনাইটেড কিংডম্'। সত্যিই তো এ বড় বিস্ময়েব কথা—কেন

না এক মস্ত নামী কবি রূপে যে এলিয়ট সর্বত্র পরিচিত—এই তাঁরই বইয়ে
গোড়ার পরিচিতিটা লেখা প্রয়োজন হোয়েছিল—একজন রাজনীতিকে
দ্বারা! সাহিত্যিকের জন্য সাহিত্যিক লিখবেন বিশ্লেষণ কোরে,—তা
কোরে তা লেখা হোল কিনা সমাজেরই 'এলিট'-রূপী অন্য জগতের না
কাউকে দিয়ে—যিনি সাহিত্য সম্পর্কে বোধ হয় কোন দিন একটা বিন্দু-প্রম
কোন কিছু লেখেন নি—এমনি একজনকে দিয়ে তা লেখানোর জন্যই আম
আপত্তি জাগছে, ঠিক সেখানটিতে। অবশ্য এ ব্যাপারে বেশী কিছু ভেবে ল
নেই এ জন্য যে—আধুনিক সাহিত্যের অঙ্গনে বহুদিন ধরে পর্য্যায়ক্রমে বহুব
ঘুরে ফিরে আমি যখন এটা ভাল কোরেই বুঝতে পারলাম যে—সাহিত্যিকদে
মধ্যে এমন অনেকে আছেন—যাঁদের একজন রূপে আরেকজন অন্যের সাহি
প্রসঙ্গে অতি অর্বাচীনের মতো ধারণা পোষণ করেন--যা শোনার ফলে আম
এই ওঁদের সম্পর্কে ব্যথিত কোরে রেখেছে। এটা আমার দুর্ভাগ্য ছাড়া আ
কিছু নয়। এই ব্যাপারে একটা কথা কোন দিনও ভুলতে পারব না। সে
হোল আমার এক প্রশ্নের জবাবে পাওয়া উত্তর। উত্তরটা দিয়েছিলেন
আকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত কোন একজন লেখক। আমি জানতে চেয়েছিল
—আজকের দিনে বাঙলার অধিকাংশ ঔপন্যাসিকেরা কেন প্রবন্ধ লেখেন
মোটেই। উত্তরে তিনি বলেছিলেন—ঔপন্যাসিকের পক্ষে না কি প্রবন্ধ লে
অনুচিত! আর তা গর্হিতও বটে। তাঁর মতে প্রবন্ধ লিখতে গেলে না
ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিক্ষমতার সংহার হয়। অর্থাৎ—তার কথার মানে এই দাঁড়
যে—প্রবন্ধ হোল 'creative' সাহিত্যিকের শত্রু। হা হতোস্মি। আ
কেন—স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শেলী, রোঁলা যায় এ-কালের মম্ বা কা
কি হাক্সলি পর্য্যন্ত বড় বেশী শিউরে উঠতেন এমন কথাটা ভেবে নিশ্চয়ই—প্র
আর উপন্যাস নিয়ে সাহিত্যের মধ্যে রাজনীতিক চাল্ চালার মতোই এ
আবার কোন ধরনের ব্যবস্থা হোল? হ্যাঁ, সাহিত্যিক হোয়ে কিনা সাহিত্যে
সামগ্রিকতার ওপরে রায় দিয়ে বসি—এ হেন—'লিটারারি সেপারেশনে
জন্য! —এটা আজকের সামাজিক, রাজনীতিক, অর্থনীতিক যায় পারিবারি
জীবনের অনেক আশ্চর্য্য কিছুর মতোই আরো আশ্চর্য্যময় নয় কী—পুরস্কার
লেখক যখন অমন অদ্ভুত আর কিম্ভুত ধারার মন্তব্য করেন?

এমন কিছুকে কিন্তু হেসে অনায়াসে' অর্বাচীন কথা বলে উড়িয়ে দেও
যায়,—যেহেতু সমাজ, কি জীবন, কি সে সুবেরই অস্তিত্ব যায় সমস্ত কি

নবিক সম্পর্কের আবেদন-নিবেদন সময় বিশেষে, ব্যক্তি বিশেষে বা পারি-র্শ্বিক অবস্থা বিশেষে যাই অদ্ভুত হউক না কেন—এই পৃথিবীটা চিরায়ত রূপে হাল—বিচিত্রার রূপ-ভবন। তারই অপরূপতার আলোকসম্পাত। সত্য নুভূতি—শিবময় সাংকেতিকতা—আর সুন্দরেরই আরাধনা এই পৃথিবীর নবিকতার উন্মেষ থেকেই মানুষের জীবনেতে আর তাদেরই চিত্র-বিচিত্রময় মাজেতে স্বাক্ষরিত আছে—তা না হোলে মহাশিল্পীর মানস-কন্যা মিরাণ্ডা টম্পেষ্টে' দার্শনিকতায় রাঙিয়ে সগর্বে আর সদম্ভে জানাতে পারতো না—

"O wonder!
How many goodly creatures are there here!
How beautious mankind is! O brave new world,
That has such people in't!"

বং অন্যত্র "As you like It"-এ মহাকালের এই মহাকবি এমনটাই বলে সাধারণত্বে রাঙিয়ে দর্শনেরই কথা শুনিয়েছিলেন—

"All the world's a stage,
And all the men and women merely players,
They have their exists and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages"

—আর সত্যিই তো বিশ্বরঙ্গমঞ্চের প্রতিটি মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপ প্রথম থেকে শষ ধরে তারই জীবনের শেষ অঙ্ক পর্য্যন্ত মহাকবি বর্ণিত সেই বিখ্যাত সাতটি ারার বয়েস নিয়ে হয় তারই যবনিকা পতন—এই চিন্তা শ' কয়েক বছর আগে বর্তিত হোয়েও চিরায়ত সাহিত্যিক মূল্যায়নের মহার্ঘ্যতা নিয়েই অবিচল থকে এই বিশ শতকেরই তীক্ষ্ণ মনস্তাত্ত্বিক কথাকার আলডুস্ হাক্সলিকে পর্য্যন্ত কারেছিল মন্ত্রমুগ্ধ। তা না হোলে পর মনীষী-শিল্পী হাক্সলি তাঁর ভাব-গম্ভীর চনাটির মধ্যে এরই ব্যঞ্জনাতুলে নামকরণ কোরতেন না নিশ্চয়ই—"Brave New World" বলে!—এই প্রসঙ্গেই বলতে চাই যিনি যুগ-যুগান্তরের মহা-শিল্পীর ভূমিকাভিনয় কোরে যান সত্য-শিব-সুন্দরের ত্রয়ী সাধনায় ধ্যানী আর ত্যাগী রূপে—এই তাঁদেরই শিল্পায়িত কর্মযোগ ধীরে ধীরে হোয়ে ওঠে ঋষির দার্শনিকতায় রাঙা-রাজযোগ। তাই সত্য বলেই ঋষির ধ্যানকুটিরে দর্শন হোয়ে উঠেছে ম্যাক্‌বেথের জীবনায়নী শেষ অনুসন্ধিৎসায়—প্রিয়তমার মৃত্যুবার্তার মধ্যে কালজয়ী রণনের ছোঁয়ায়—যে কথা ভারতেরই মহাকবি মাইকেল

শ্রীমধুসূদন পৃথিবীর থেকে স্বর্ণখচিত অবিনশ্বর খ্যাতির রূপযানে চড়ে ও-পারে স্বরধ্বনিলোকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাত্রার অন্তিম মুহূর্তে সগর্বে ও সরবে মন্ত্রোচ্চারণেরই মতো মুখর কোরেছিলেন—

"To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time ,
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle !
Life's but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his our upon the stage,
And then is heard no more . it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing."

মহাশিল্পীর কালজয়ী প্রতিভা প্রমূর্ত সাধকের মতোই ঋষি-বাক্য তোয়ের কোরে যান শিল্পায়নের নানান পরম্পরায়। এ দেশেরও মহাকবি রূপে চণ্ডীদাসও এমনই ঋষিময়তার ঋতারূপ সাজানো শিল্পকথাটাই জানান—যখন তিনি বলেন—"শুনহ মানুষ ভাই—/সবার উপরে মানুষ সত্য,/তাহার উপরে নাই।"

—আমি বলব—এমন কিছু ভাবনা আর কল্পনার ঋদ্ধিসাজ তাঁদের রচনার মধ্যে জাগরূক থাকে বলেই—সে সব শিল্প-সৃষ্টি ক্ল্যাসিক না হোয়ে যায় না। এ-ও বলব—মানবিকতার সামগ্রিক রূপটি চিরায়ত, প্রেম চিরায়ত, পুরুষ-রমণীর পারস্পরিক ভাব-বিহ্বলতাগুলোও চিরায়ত—কাজেই এ সবেরই রূপ ধরে, বিভাব নিয়ে শিল্পীরা বৈচিত্র্য সৃষ্টির মানসে যা সৃষ্টি করেন—তা নিয়ম মাফিক তো চিরায়ত আবেদনে ভরাট হওয়াটাই উচিৎ।

কিন্তু কথা আছে—আজকের যুগটা কিন্তু ক্ল্যাসিক হওয়ার তাগিদে মোটেই ব্যস্ত নয়। না থাকার কারণ—জীবনের সমস্ত রকম অর্থই আজ গেছে পাল্‌টিয়ে। সমাজ, ভালোবাসা, মানবিক প্রবৃত্তি ও উচিৎ-অনুচিত-বোধ—সব কিছুই কি পূব, কি পশ্চিম সর্বত্রই হোয়ে পড়েছে—এলোমেলো আর দিশাহীন। কেমন কোরে বাঁচবো—এ-ও হোল আজকের একটা মস্ত প্রশ্ন। এ সব দিক নিয়ে কি বলব, কি ভাববো, কি নিবেদনে জানাব—তা নিয়ে আধুনিক কথাশিল্পীরা বড় বেশী ভাবিত থেকেও মাঝে মাঝে বক্তব্যের চিরাগত কথাটাকে হারিয়ে ফেলেন।—ভুলে যান আদর্শের কথাটাকে। এ কথা বলার মানে এই নয় যে—আদর্শের কথা ছাড়া যেন সাহিত্য হয় না! একশ' বারই হোতে

ধ্য—সামাজিক ও ব্যবহারিক অনাদর্শের লিপিবিলাসেও—নিখুঁত শিল্পায়ন। স্তু ভুলে গেলে চলবে না—অনাদর্শময়তার কথা লিখতে বসে শিল্পীর পক্ষে হিত হোয়ে উঠবে—যদি তিনি সে লেখায় কোন বক্তব্য না জানান। এই ই জানান দেওয়া বিশেষ বক্তব্যটাই হোয়ে দাঁড়ায়—কথাশিল্পীর শৈল্পিক াদর্শ। এর পরেও বলার কিছু আছে কথাসাহিত্যের বিষয়াদি সম্পর্কে। ধান বিষয় রূপেই সকলে ভালো কোরেই জানেন—সেটি হোল প্রেম ও ণয়। কিন্তু আজকের সমাজে আমরা এই সূক্ষ্মতমে অনুভবেরই আন্তবিক স্তিত্বটিকে দেখতে পাই—স্থূলত্বে আর জটিল দ্বন্দ্বে হোয়ে উঠেছে—অসংযমী। নাদর্শের খেলা। হারজিতের মিল-অমিল। প্রেম নিয়ে চলে পাশা খেলা। রুষে আর নারীতে। আজকের শিল্প-অধ্যুষিত সমাজের যৌবনায়ন আদর্শ বলে ল কোরে আসক্ত থাকতে চায়—নিছক যৌনতার চিন্তায়নে।—দেশে-বিদেশে থাশিল্পীরা তাকেই প্রকাশ করার মধ্যে এ ব্যাপারের রহস্য সন্ধানে তাদেরই নোবিশ্লেষণের কথায় আপনাদের শিল্পায়নকে শিল্পময় কোরেই সাজিয়েছেন। নোবেল্ লরিয়েট্ ফ্রাঁসোয়া মরিয়াকের মনোবিশ্লেষণী সৃষ্টিক্ষমতার এক শ্রেষ্ঠ রিচিতিকে বহন কোরেছে তাঁর ছোট উপন্যাস "A Kiss for the Leper". াধুনিক দাম্পত্য জীবনের প্রণয়-মাদকতা ভুলে কেমন ভাবে এক জটিল ম্পর্ককে গড়ে তোলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে—শুধু যৌনানুভূতির মায়ায়—তা-ই শেষ শিল্প-বীক্ষায় মরিয়াকের এই লেখায় শেষ পর্য্যন্ত শান্ত-শুচিতার প্রণয়-জ্জ্বল কোরে তুলেছে। সত্যি দাম্পত্য-জীবনের অসংযমী দেহ-লিপ্সার অনাদর্শময় কথার কাহিনী বুনোন কোরতে বসে মরিয়াকের শৈল্পিক-দায়িত্ব সে কথাকে সমাজ-সচেতন স্রষ্টার কর্তব্য অনুসারে যুক্তির আদানে কোরে তুলেছেন—'সাব্লিমেশন্ অফ্ সেক্স'। সর্বোপরি কোরেছেন—জীবনদর্শনে মুখর শিল্পায়ন। জ্যাঁ পেলুয়ের ও তার যুবতী স্ত্রী নোয়েমির দাম্পত্য-জীবনের জটিল হওয়ার, আর স্বামীর 'errotic' আসক্তির কাছে এক লাজভীরু মঞ্জুলার মন উপছিয়ে পড়া ভয়ের কথায় বলা হয়েছে—"The autumn rain whispered on the roof, a shutter banged, a farm waggon rumbled into the distance. Noémie, kneeling beside the dreaded bed, repeated in a low voice the words of her evening prayer : "O God, here on my knees, I thank thee that thou hast given me a heart capable of knowing and of loving thee ··" In the darkness Jean Péloueyre could feel

the adored body shrink away from him. He put as much space between them as he possibly could. Now and again Noémie, stretching a hand to touch the face which now, because she could not see it, seemed less odious, would find it warm and moist with tears. At such times, with remorse and pity, she would strain the unhappy creature to her, as, in the Roman amphitheatre, a Christian virgin might, with closed eyes and teeth fast clenched, have leapt forward to throw herself before the waiting beast." আর এর পরেই দেখেছি কী ভয়ঙ্কর তাদের এই দাম্পত্য-সম্পর্কের দেহ সম্ভোগ-কথা! সত্যি মনো-সম্ভোগ তাদের ঘিরে দাঁড়াতে পারে নি। কারণ—একজন স্বামীত্বের অধিকারে ছিল,—প্রবলে অসংযমী। অন্যজনা সলাজে হোতে চায় না ভয় পেয়ে নিলাজ-লহর-দল হবার জন্য। তবু নোয়েমিকে হোতে হয় তাই। তাই দেখি এর পরে সত্যি আলোচকের আর কোন কিছু বলার নেই—যেহেতু আধুনিক দাম্পত্য-মানসের এই জটিলতা ভরা রূপকে অতি প্রাঞ্জলেই বোঝাতে পেরেছেন মরিয়াক। এই প্রেম-ভালোবাসা কোন দিনও অশুচি হোতে পারে না মানুষের জীবনে, তাদেরই সমাজে, আর তাদেরই প্রিয় কথাশিল্পীদের সাহিত্যচেতনার আঙ্গিনায়। মনে পড়ে নোবেল্ লরিয়েট্ অ্যালবেয়ার ক্যামুর কথা। তাঁর মতো অসাধারণ প্রজ্ঞাময় ও প্রমাময় যুগন্ধর শিল্পীও সমাজবদ্ধ মানুষের যৌবনরাঙা প্রণয়ের রোমান্টিক সমীক্ষায় রূপবিভোর না থেকে পারেন নি। প্রণয় ও পরিণয়ের মধুমঞ্জুষা নিয়ে এক অনিন্দ্য সৃষ্টি রূপে বিভাসিত হোয়েছিল—মনীষী ক্যামুব যৌবনের রচনা—"Noces" (নোস)। এর মানে হলো—বিবাহ। ক্যামুর রোমান্টিক মনীষা এই উপন্যাসে যুবক-যুবতীর ভালোবাসাকে দ্বন্দ্ব থেকে, জটিলতা থেকে, ভুল বোঝা থেকে, ধ্বংস থেকে উত্তীর্ণ কোরেছিল—সহাসে সলাজ ভঙ্গিয়ে নিলাজে রূপনির্ঝরকে বয়ে আনা সুখদানকারী 'বিবাহে'র আবেশময় বাঁধনে। ক্যামু পরিণয়ের আনন্দময় স্বত্বায় মুগ্ধ ছিলেন। আর যে পরিণয়ের ভালোবাসা-বাসিতে মাতোয়ারা অবস্থায় যুবক স্বামী তারই আদর করার, চুমা দিয়ে লাজ কেড়ে নেওয়ার জন্য যুবতী প্রিয়ার প্রগাঢ় থাকা যৌবন-বঙ্কিমায় সালঙ্কৃতা দেহ থেকে যে অফুরান সুখ-নির্ঝরের রভস ছোয়ায় নিজেরই প্রিয়রূপকে করাতে

পারতো—তারই জন্য সুখ দেওয়া ও নেওয়ায় লাজহর—এই অভিব্যক্তিকেই মনীষী ক্যামু বন্দনা কোরে গেছেন। আর এ ছাড়াও দেখেছি—পরবর্তীকালের ভাবুকশ্রেষ্ঠ ক্যামু এই "Noces"-এ না বলে পারেন নি—"Except the sun, kisses and wild perfumes all seems futile to us." তবু, এই কাহিনী প্রণয় ও পরিণয়ের জয়গানকেই সৌন্দর্য্যবাদীর দৃষ্টিতেই আরাধনায় মুখর রেখেছে। এটা এক পরম সত্যানুভূতি। কথাশিল্পী আঁদ্রে মারোয়া পর্য্যন্ত লিখেছেন পরিণয়-সপক্ষে—"A successful marriage is an edifice that must be rebuilt every day." কেন না—"No marriage can be happy one, unless tastes are mutually respected."—শুধু দাম্পত্য-জীবনেতে এই বিধিটা মানলেই চলবে না।—আমার মতে সাহিত্যিকে আর তার আগত ও অনাগত পাঠককে যে কোন সৃষ্টির রসাস্বাদন প্রসঙ্গে এই পৃথিবীর 'ভিন্ন রুচিহি লোকাঃ'র দারুণ শ্রদ্ধাবান হওয়ার জন্য ঐ একই নিরীখের সখ্য-বাঁধনে হোতে হবে—পারস্পরিক রুচি ও রীতি সম্পর্কে দু ধারার হোয়েও—রসানুগ্রহণের জন্য এক রূপ।

আর আমার শেষ কথায়—বলতে চাই—যিনি মহাশিল্পী হন, যিনি মহাকালকে আপনার সৃষ্টির মধ্যে বাঁধতে পারেন চিরায়ত রূপ-রস-গন্ধরূপে, যিনি ভবিষ্যতকে দর্শান আপনার "seer" পরিচিতিতে—এই তাঁদেরই একজন রূপে—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গাণিতিক-বিজ্ঞানীদেব একজন বনাম শ্রেষ্ঠতম কবিদেরও একজন—সেই বিশ্বজনবন্দিত মনীষী ওমর খৈয়ামের নিটোল দর্শনের কথাটাই বলতে কিছু চাওয়ার সমাপ্তি হিসাবে জানিয়ে রাখলাম—ছন্দকবি কান্তিচন্দ্র ঘোষের অমর করা অনুবাদের মাধ্যমে—

"বচন-বাগীশ পণ্ডিতেরা বিজ্ঞভাবে নাড়ুন শির,
স্মরণ রেখো বন্ধু আমার— জীবন কভু নহে স্থির।
এই কথাটাই সত্য ভবে, বাকী যা সব মিথ্যা, ভুল,
সৃজন-বোঁটায় আর ফোটে না ঝ'রলে পড়ে আয়ুর ফুল!"

—অশোক কুমার রায়

"ধূর্জ্জটির মুখের পানে পার্ব্বতীর হাসি"

অশোককুমার রায়

শিল্পচেতনা আর প্রেমচেতনা, সাহিত্য আর ভালোবাসা, স্রষ্টা আর সৃষ্টির বিভাসে সবুজ পান্না ও লাল চুনি হওয়ার ঋত-রূপ যখন মঞ্জুলিক ও ঐকতানিক স্বর-লহরে থাকে আরাধিত—তখন মনে হয় এই সাহিত্যায়ণের শিল্প-কাজ ব্যাপ্তিতে যেন ব্যক্ত হোতে চায়, ধূর্জটির ত্রিনয়নী অনুসন্ধিৎসায়! আর তারই অব্যক্তময়তা যেন প্রণয়-ঋতুর রীতি-সাজে অভিষিক্তা পার্বতীর রাগে-অনুরাগের হর্ষোৎফুল্লতার ছোঁয়াচে স্রষ্টাব ধূর্জটি রূপের মধ্যে আপনারই শুচিস্মিততাকে কথা ও কাহিনীর আলিম্পনে ফোটায়, সাজায়! —এ কথাটা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে,—সব সাহিত্যিক ধ্যানেব প্রথম থেকে সমাপ্তি পর্য্যন্ত থাকে এক শিব-চিন্তার রণনেতে জাগরিত—রটনা। তাই-ই ঘটনার মধ্যে পুরুষ ও রমণীর যৌবনান্বিত দেহ নিয়ে, মন নিয়ে, আহ্লাদ নিয়ে প্রণয়ের যে সব মঞ্জিল তৈরী করে—ভালো ও মন্দ—এই উভয় ধারারই যৌবনেতিহাসের কথা, ইতিকথা ও তার পরের কথা ধরে প্রভাসিত জীবনদর্শনটি নানান বৈচিত্র্যের সাজঘর হোয়েও নিখুঁত শিল্প-কৃতির সুরুচিময় রূপ-ধৃতিতে জানাতে চায়—একটি মধুবাতা ঋতায়ণী কথাকে!—তা হোল, অসুন্দরের মধ্যেও চাই সুন্দবের অভিসার। তা চায় না মন্দত্বকে কোণঠাসায় 'suppress' কোরে নিন্দিত করাতে। ও চায় মন্দত্বকে ভালোত্বের 'sublime'-এ বন্দনা করা। খোশবুর রাজা গোলাপের ডাঁটায় কাঁটা আছে বলে তার শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করি নি। কেন না চেতনার যৌক্তিকতায় তার সুবাসিত রেণুর সৌন্দর্য্যকে আস্বাদ করাটার মধ্যেই আছে সত্যের রূপচর্চা, শিবের অপরূপতা-দর্শন, —আর সুন্দবের অব্যক্তময় অনামধেয়তার মধ্যে নামী হোয়ে ওঠা!—আর এই চেতনাই যখন অনুজ্ঞানী প্রমিতিতে রাঙিয়ে সাহিত্যকে "strangeness added to beauty"তে সাজায় বলে এক অসাধারণ রীতির স্বাতন্ত্র্য-পিয়াসে যে রূপনির্ব্বৃতি ফোটায়—তারই নাম হোল রোমান্টিকতা। ওয়াল্টার পেটার নির্দেশিত

প্রজ্ঞায় ও ডাঃ হারফোর্ড রূপিত “extraordinary development” হোয়ে যখন হাজার এক কথার লিপিবিলাস প্রণয়ের ঋতু ও রীতিবিবর্ধনেতে যৌবনেরই স্বপ্ন, সুখ ও খুশীর মহাদেশেতে রঙে রসে উদ্ভাসিত হয়—ঠিক তখনই এর সাহিত্য সঙ্গমে যৌবনের ভালোবাসা অরূপরতনের সম্ভোগে মেতে একটা অখণ্ড রূপের মধ্যে “concrete” সৃষ্টির নিটোল শিল্পায়ণ সম্পন্ন করায়—এই তারই মন-মন্দিরে সিক্ত আঙ্গিনার উন্মুক্ততার নীল-নির্জন ধরে প্রকাশ পায় “ধূর্জটির মুখের পানে পার্ব্বতীর হাসি”টি। সত্যি ধূর্জটির বিষাণের সুরে সৃষ্টি আর লয়ে সম পাওয়া সাহিত্যিক চেতনাটি ভালোবাসার যৌবনে-সবুজ পরিণয়ে কুসুমিত থেকে পার্বতী-ধ্যানাঙ্কিত হাসির সঘন ছোঁয়াচের মীড-গমক-মূর্ছনায় উতাল-মাতাল হয় বলেই যেন সাহিত্যিক স্রষ্টা তাঁর রূপঝরার জীবন ও যৌবন নিরীক্ষায় নিয়ম, মাফিকই কারণে-অকারণে হোয়ে থাকেন আত্মবিভোর, অরূপরতনের জগতে অনুসন্ধিৎসু, আর পাটোয়ারী জগত সম্পর্কে ‘disinterested’, এবং তাঁরা প্রত্যেকেই “to some extent bohemian” না হোয়ে পারেন না। হাজার বন্ধনের মধ্যেও তাঁরা শিল্প-মানসের ইঙ্গিতে খোঁজেন মুক্তির রসাস্বাদনকে। পানও তা। বন্ধনে মুক্তির নিবৃত্তি—এটা শুধু মাত্র ওঁদেরই শিল্প-চারণার জগতে মেলে। কারণ, যেহেতু সাহিত্যিক কি শিল্পী মাত্রেই গৌরবে “pleasure giving world”এর ঘরানা। আনন্দ-সৃষ্টি তো একটা বিজ্ঞান বিশেষ। ও তো থিয়োরীতে সাজানো “Science of Aesthetics”-এরই প্র্যাকটিকাল প্রতিবেদন—সাহিত্যে, শিল্পের নিবেদন ইতিতে। তাই সত্য বলেই আধুনিক বাঙলার হ্যাচারালিষ্টিক স্কুলের দুটি স্বতন্ত্র-ধর্মী ধারা রূপে প্রকৃতিবাদী বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘আরণ্যক’ প্রীতিবিলাসের ‘চুপি চুপি কথা’র দেশের বনানী-শোভায় আশ্লিষ্ট থেকে মৌনে সমাহিত আপনার সাধক-মানসটিকেই ফোটাতে পেরেছেন! আর সেই কানুন ধরেই অন্য ধারার প্রকৃতিবাদী অন্নদাশঙ্কর রায় বলতে পেরেছেন প্রেমের চিরন্তনত্বকে রাঙিয়ে—

আমার কবিতা কোকিলের কুহুতান,
বার বার বলি, বলার সুখে কেবলি—
সার তার শুধু, কোকিলারে আহ্বান ॥

কেন না অন্যত্র তিনি এও বলেছেন—

আমরা দু'জনা দুই কাননের পাখী,
একটি রজনী একটি শাখার শাখী।

সত্যি—এই ধারণা বড় বেশী ব্যাপক বলেই রোমান্টিকবাদী মণীন্দ্রলাল বসু লিখতে পেরেছিলেন "রমলা"র রজত ও রমলা রায়ের দাম্পত্য-জীবনের সুখনির্ঝর রূপে সে কী "স্বপ্নভরা দিন ও গল্পভরা রাতে"র ভালোবাসার অশেষ রূপতত্ত্বকে। এ কথা প্রিয়া সমীপে প্রিয়কে না জানিয়ে পারে না তাই—"তুমি যে এসেছো মোর ভবনে, তাই রব উঠেছে ভুবনে"র তাতা থৈথৈ মানসেতে জাগা "মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে"র ভাবনায়। আরো গভীরে এই শিল্পীর রোমান্টিক নিরীক্ষা "জীবনায়নে"র উমা রায় সমীপে অরুণের জীবনে যে অশেষ যৌবনের ছোঁয়াচ ভরিয়ে প্রিয়াকে সুদূরিকা কোরে বিদিশার আঁধারে পথ হারিয়ে, পুনরায় শ্রাবস্তীর সন্ধ্যায় তা দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের পল্লী-প্রান্তরে খুঁজে পাওয়ায় অরুণ যে দৃপ্ত-চেতনার প্রেমবিহ্বলতা থেকে সমাহিত হোতে পেরেছিল—তা কানে কানে যেন বলে চলে—

"দেখো সখা ভুল করে ভালোবেসো না;
আমি ভালোবাসি বলে তুমি বেসো না।"

—এই ভালোবাসাই যে 'সুপ্রা-কমেডি' হোতে পারে বিচ্ছেদের জগতে প্রিয়র জন্য প্রিয়ার কাছে—তারই নিরীখ ধরে রোমান্টিকবাদী বিভূতি মুখোপাধ্যায় নিজের একটা স্বাতন্ত্রে ঘেরা দুনিয়া সাজাতে পেরেছেন "নীলাঙ্গুরীয়ে"র মীরা রায়ের কাহিনী থেকে আরম্ভ কোরে বর্ষার বাদলে হাওয়ায় বেপমান হোয়ে ওঠা বহু বরকন্যার প্রেম-ভালবাসার অভিমানী কথায়। এই রোমান্টিকবাদী বিভূতি মুখোপাধ্যায় তাঁর রচনায় অকারণ চোখের জলের ধারায় মধুর হোতে সুমধুরিক জীবন-যৌবনের মধ্যে যে নতুন জীয়ন-কাঠির সন্ধানটি রেখেছেন—তার বিভাব আমার মতে পৃথিবীর অন্য দেশের অন্য কোন ভাষার শব্দ-চাতুরী দিয়েও মাত্র একটি কথায় বোঝানো অসম্ভব—অন্ততঃ বাঙলা ভাষায় "অভিমান" শব্দের মহার্ঘ্যতা আর কোনও ভাষায় নেই। "বর্ষায়" "বসন্তে" "হাসির অশ্রু" "অ্যালট্রা" "মেঘদূত" "গোলাপী রেশম" "হার-জিত" থেকে আরম্ভ কোরে অভিমান তার ঔজ্জ্বল্যে প্রিয়ার দেহ-মনে যে আবীর-গুলাল ঝরিয়ে ও ভরিয়ে গেছে—তা দেখে মনে হোয়েছে—পার্বতীর মুখের হাসি যেন বারে বারে আত্মভোলা ধূর্জটি বর্পী প্রিয়টিকে আপনার রাঙা অধরের বাঁকাচোরা কোণে ভেঙ্গে পড়া 'অভিমানে'র ছবিতে কেঁপে-হেসে-কেঁদে, অকারণ "idle tears"-এর বন্যায় মধুরে মধুর করাতে পেরেছে। সে কথা বেশ কিছুটা অর্থাৎ "to some extent" কি বিভূতি মুখোপাধ্যায়েরই মন ও মানসিকতার রঙ্‌ছুট করা শৈল্পিক

"Bohemianism" নয়? নয় কি এটা প্রতিটি পাটোয়ারি সালতামামিকে ডিঙ্গিয়ে আসা এই রূপধ্যানী শিল্পীর মধুরিম দৃষ্টি-নিমেষ?

তাই বলব, জাগতিক ঘটনা-সমূহের সঙ্গে এই ধ্যান-কুট্টিম অভিব্যঞ্জনা শুধু-মাত্র শৈল্পিক কারুকাজের একই ধরনের সম্মিলনে রাজী নয়। খুশী নয়। প্রখর কল্পনার রূপযানী সাংকেতিকতা ধরে শিল্পীদের রূপবাদী এই রোমাণ্টিক মনটি রূপ থেকে অপরূপ হোয়ে রূপক পর্য্যন্ত যৌবনের প্রেম ভালোবাসা পরিণয়ের আবেশ ও রভস ভরা জীবন-দর্শনটিকে ভাবসম্মিলনে একীভূত করে। দ্বৈত থেকে শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের পরম-পুরুষের সত্তায় মিলে মিশে হোয়ে ওঠেন অদ্বৈত রূপারূপ।—ঠিক তেমনটি! ওরই মধ্যে থাকে বাস্তবের প্রতিটি পলে অণুপলে সাজানো অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞা আর সমীক্ষা। কথাশিল্পী এই ভাবেতে তাঁর জীবনের অনুজ্ঞানে শিব-চিন্তায় বিভোর থাকেন। আর তাই তাঁর আন্তর উপলব্ধির জগৎ শিল্পকে মহিমময় কোরে তোলে। কথাশিল্পী নিজেই যখন সামাজিক মানুষ এবং সেই সামাজিকতারই প্রতিভূ—তখন তিনি কারণের পুলকে জাগতিক বাস্তবতার মধ্যেই দেখতে পান অপরূপের দর্শন। আর তখনি তিনি "উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী" রূপে রসমাধুর্য্যময়তার মূর্ত শিল্পীর আকুলতায় শিল্পায়ণকে মহান করার অভিলাষে শুভলগ্নের গরিমা-ধারায় রাঙিয়ে বলতে পারেন—

"হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চল-তলে ঢাকি।
আঁধারের সাথী, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখী।"

—তাই শিল্পী তাঁর কথাযানী রূপকথার বর্ণালী রেখায় আর লেখায় ভালোবাসা ও পরিণয়ের চিরন্তনত্বকে অনুরাগবতী সন্ধ্যার ধূপ-বিভাসে আরতি করান। সেই সঙ্গে ব্যাপ্তিতে প্রকট করা যে শৈল্পিক আধারে সাজান তা দেখে যেন মনে হয়—ও যেন ভাবের আর বিভাবেরই সুতীব্রতায় অনুভবনীয় মাধুর্য্যে সৌন্দর্য্যে ঔদার্য্যে প্রকাশমান ধূর্জটিরই মৌন-ভাঙ্গা তৃপ্তির সঘন হাসি। ধূর্জটি যেন তাঁদের শিল্পের দৃষ্টি-মুখীন আধার! সেই আধারে বিষয়ের বিচিত্রিতায় যে প্রাণ-খুশীয়াল করা প্রণয়লোক আবেশের নির্ঝর ঝরায়, তার মধ্যে দেখি পার্বতীর মুখের অভিমান করা কুঙ্কুমময় হাসিটি। আর তখনি, সেই মুহূর্তেই পার্বতীর শুচিস্মিতা স্বভাবে ঘেরা আহ্লাদ নিশ্চয়ই শিল্প হোয়ে, কাব্য হোয়ে, ছন্দ হোয়ে, বীঠোভেনী

রিদম্ ঝরিয়ে, আর রিমঝিমিয়ে ধূর্জটি-সত্বাতে অলঙ্কৃত সাহিত্যের আঙিনায় দাঁড়িয়ে প্রিয়ার আকুতি ভোরে প্রিয়কে নিবেদনে প্রণতির আবেদনটুকু জানাতে পারে—

"তোমার ঐ মাথার চূড়ায় যে রঙ আছে উজ্জ্বলি
সে রঙ দিয়ে রাঙাও আমার বুকের কাঁচুলি।"

—এই কবি-কথাটি অনিন্দ্য! এর আকুতি অসাধারণ। এ হোল শ্রীরাধার অপরূপ ভাব-গাম্ভীর্য্যের ভালোবাসায় অনুরণিতা প্রতিটি মঞ্জুলা যুবতীর সবুজে আবরিত প্রিয়ার বহুত মিনতি, ও সেই সঙ্গে তাদেরই প্রিয়র মন্মুখ ভরানো প্রিয়াল-কথা!—সত্যি সাহিত্যের আঙ্গিনায় এমন ভাবে জীবনকথাকে শুধু সবুজের সুষমায় কথাযান বনাম রূপযান করাতে পেরেছে ঠাকুরঝি-বসন্ত-কবিয়াল নিতাই পরিবেষ্টিত "কবি"র ক্ল্যাসিক সৃষ্টি। গৈরিক ভূষিত জীবন ও যৌবনের লালিমা বিভাসিত যে শান্তি ও শ্রান্তির শ্রীনিকেতন জীবন-রস-রসিক শিল্পী-দার্শনিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বকীয়ত্বকে অনন্যতা দিয়েছে—তারই রূপবিবর্ধনের রূপকথা হোয়ে "কবি"র ছান্দসী প্রণয়বার্তা কবিয়ালের কাকলি-ঝরা দিন-দুনিয়ার মস্ত এক জমজমাটি সরাইখানার ইতিকথা শোনাতে শোনাতে ধ্যানময় কোরে তুলেছে—যৌবনেরই উচ্ছল আধারে আধেয় সাজানো গানে গানে, আর ভালোবাসায়। বড় কথা, "কবি"র ক্ল্যাসিকত্ব শুধু বাঙলা দেশের কবিগান ও ঝুমুর নাচের শৈল্পিক প্রতিবেদনেই প্রকাশ পায় নি।—তা রূপ প্রকাশের আরো গভীরে জীবন ও যৌবনের প্রতি আলোকপাত কোরেছে অতি সহজে সহজ রূপপদ্ধতিতে আবিষ্ট দার্শনিকতায়। তাই "কবি"র অনন্যতা শুধু এদেশ নয় —আমার মতে বিদেশেরও গৌরবের এক সাহিত্যিক বিষয়। আর সত্যি,— এই ঠাকুরঝির ও বসন্তের পরেও রূপবাদী তারাশঙ্করের দৃষ্টির অভিজ্ঞা "রাইকমলে"র রঞ্জন সমীপে কমলের কথা হোয়ে, এই সেদিনের অসাধারণ পরিকল্পনার সৃষ্টিতে রাঙা রীনা ব্রাউনের প্রেম-ভালোবাসা ধৈর্য্যের একটানা ও একনিষ্ঠ কথা ও কাহিনীর মধ্যে এই সুচরিতা বরবর্ণিনীদের যে রূপকথার সুখান্বেষণে জীয়ন-কাঠির সন্ধানী পরিচয়টি পেয়েছি—এই কমল কি রীনা ব্রাউনও কল্পনার ওড়নায় বাতুলে বাতাসের দোলা জাগিয়ে, আর নিটোলে যৌবনান্বিত বুকের রেশম আবরণে ঢেউ খেলিয়ে তাদের প্রিয়দের অতি সহজেই বলতে পেরেছিল—ওদের প্রণয়ে বিহ্বল বুকের যৌবনে উদ্বেলিত ভরাট মাধুর্য্যের কাঁচলে ঢাকা ঔদার্য্যকে যেন তারই প্রিয় নিজের ভালোবাসার রঙ,

লাগিয়ে গরিমারঞ্জিতা করায়! আর নিতাই বা রঞ্জন বা কৃষ্ণেন্দু শেষ পর্য্যন্ত কোরেওছিল তাই। প্রিয়াকেই শুধু রঙে রঙীন কোরে চুপ থাকে নি তারা। প্রণয়ের ঋতু ও রঙ্ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে ওরাও প্রিয়ার ঝলসিত লাজ-পলাশে মাঝে-মধ্যিখানে নিশ্চয়ই কুঙ্কুমিত হোয়ে বলতে পেরেছিল—

"মোর উত্তরীয়ে রঙ্ লাগায়েছি প্রিয়ে।"

এ তো গেল শান্ত আর শ্রান্ত ভুবনের শ্রীতে ভরা আর ধীতে সাজানো শান্তিনিকেতনী নিশ্চয় প্রতীতির সুনিশ্চিত কথা। কিন্তু এর পরেও আছে আরো কথা। আধুনিক জীবনটাও যে হাজার বাস্তবের সঙ্ঘর্ষে আলোড়িত হোয়েও দূর সুদূরের আহ্বানে সাড়া দেয়—তারই জোরালো আর ধারালো সমীক্ষা শিল্পদৃষ্টিতে পুষ্পিত হোয়েছে মস্ত রীতির আর নীতির কারুকলায় আত্মস্থ প্রবোধকুমার সান্যালে। আর সত্যি বনানী শোভার মধ্যে নিভৃতের নিরালাকে বন্দনা কোরে এই রূপদক্ষর অশেষ রোমান্টিক সৃষ্টি রূপে সুস্মিততায় বিলোলিতা ও সেই সঙ্গে সলাজের মধ্যে থেকেই এক ধরনের নিলাজ হওয়ার সুখে "আঁকাবাঁকা"র মীনাক্ষী তার প্রিয়তম কঙ্কবের চোখের সামনে যে-ভাবে নিজের বরতনুতে লাজ-ঢাকা সজ্জার সমস্ত আবরণকে উন্মোচনের মধু-ইচ্ছায় ঝরিয়ে দিয়ে ফুলদলে অলঙ্কৃতা হোয়েছিল,—বা "মহাপ্রস্থানের পথে" অতি গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে ফেলে নায়িকা রাণী যেভাবে নায়ককে কোরেছিল মিলনে মধুময় থেকে শেষে বিচ্ছেদে নিখিলময়;—বা বন্ধুত্বের নামধেয় দার্শনিকতায় রেঙে শ্রীমতী যে-ভাবে আত্মভোলা জহরকে দূরের পথে থেকেও ঘর বাঁধার মিথুন বাসরের সুন্দর ভুবনে শেষ পর্য্যন্ত কোরেছিল এক নতুন রীতিকার পরিণয় বাঁধনেতে আশ্লিষ্ট হওয়ার জন্য মধুর সম্ভাষণ,—বা সর্বোপরি একটা মহা-উপন্যাসের মতোই "হাসুবানু"র ভেতরের চিরায়ত মানবিক আবেদনটি যে ভাবে একধারে নায়ক হিরণের "অভিব্যক্তি"ত্বকে হাসুবানু ও অন্য আরেকদিকে সুচরিতা মীরা রায় যে যুগপৎভাবে ভালোবেসে যাওয়ার রূপকথায় সেজে কোরে তুলেছিল প্রিয়তমকে "ব্যক্তিত্বে"র হিরণ;—ও শেষ পর্য্যন্ত ইদানিং সৃষ্টিতে ফুটে ওঠা "বিবাগী ভ্রমরে"র পার্থ সমীপে হেনার কথামালা বারে বারে মনে করিয়েছে ওরা মঞ্জুলা শ্রীমতীর "ভাজিন" রূপ থেকে নতুন দৃষ্টিতে, আর নতুন অভিজ্ঞায় "উওম্যানে"র সাধনায় প্রিয়দের আপন আপন অধরের ছবিতে "পার্বতীর হাসি" ঝরিয়ে বন্দনা করাতে পেরেছিল "ধূর্জটির মুখের পানে"র প্রতি। আর তাই বলতে পারি—নারীতে ও পুরুষে, যুবকে আর

যুবতীতে, প্রিয়া ও প্রিয়তে, মধুরা দম্পতিকে ঘিরে কল্পনায় আর বাস্তবে মিলে-মিশে যে কথাসাহিত্যিক রূপ-মহল আজকের প্রতিটি যুগন্ধর শিল্পী তৈয়ার করাতে পেরেছেন—ঠিক এইখানে, এই ভাবনার রূপকাঠি ধরে আর ভালোবাসার 'সুখ' নামক 'তৃপ্তি-নির্ঝর' মহাদেশটির জন্য জীয়ন কাঠির সন্ধানে থেকে আমি বলব—কখনো দ্বন্দ্ব বাঁধতে পারে না কল্পনা ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব-মধুরে, —ঠিক যেখানটিতে এ-দল ও ও-দলের তার্কিকে তার্কিকে দ্বন্দ্ব বাঁধে—"খোঁপা আর এলোচুলে বাঁধিল বচসা নিয়ে"।

এই দ্বন্দ্ব-মধুর বিবাদটি সমাজ ও জীবনের, আর যৌবন ও ভালোবাসার হাজার রীতির রূপচয়নে অসাধারণত্ব নিয়ে বিভাসিত হোয়েছে 'বনফুলে'র বহু সাহিত্যিক সৃষ্টির গভীর ও আন্তরিক শিল্পদর্শনটিকে ঘিরে। এপিক্-ধারার "জঙ্গমে"র প্রধান চরিত্ররূপে সর্বত্র যুবক শঙ্কর রায় এক অনিন্দ্য বৈচিত্র্যের ভাববিলাসে অনুরণিত থেকেছে—যা থেকে মনে হোয়েছে এই শঙ্কর রায় আত্মভোলা ধূর্জটিরই এক অতি-আধুনিক রূপ-ধৃতিতে সজ্জিত ও মনসিজ। আর 'বনফুলে'র এই শিল্প-সৃষ্টির অনন্যসাধারণ রূপ-দীক্ষায় জাগা শিব-চিন্তার সামাজিক দায়িত্বে, অনন্যরূপী কথাযান "কষ্টিপাথরে"র অসিত ও হাসির শুধু সবুজে পলাশময় থাকা দাম্পত্য-জীবনে ভয়ানক শঙ্কট দেখা দেওয়ায়ও—অচিরে তাকে মিতালি-মধুরে করাতে পেরেছিল থির বিজুরি ভরা প্রণয়ের রভস-কথা! সত্যি পার্বতীর হাসি পুরুষ-প্রিয়র জীবন-যৌবন নিনাদিত কোরে অসত্যকে সংহার করে, আর অন্যায়কে ভেঙ্গে জ্বালায় ন্যায়ের সন্ধ্যাদীপ।—সত্যি প্রিয়ার প্রিয়তমর জন্য এই যে ধ্যান, এই যে তিতিক্ষা রাঙা প্রণয়াকুলতা—তা সত্যি একটা ক্ল্যাসিক সুরে বহু মুন্‌লাইট্ সোনাটা ফুটিয়ে, আর সেই সঙ্গে 'আঃ, সেরেনেড্' বলে নানান কথা ও কাহিনী পরম্পরায় রূপ পেয়েছে রূপে বিদগ্ধ সুবোধ ঘোষের শিল্পায়ণে। প্রণয় ও পরিণয় যে স্বর্গীয় বিভাসের প্রতিদান এবং তা যে একটা বিরাট আদর্শেরই হেমাঙ্কনে সাজা যৌবনের জীয়ন-কাঠি—তা রূপদক্ষ সুবোধ ঘোষে একটা স্বকীয়তার আন্তরিক ভুবন কোরে তুলেছে। তাঁর মহৎ সৃষ্টি রূপে "ত্রিযামা"র স্বরূপা সম্বন্ধে বলতে পারি—ওর কুশল সমীপে যে যৌবনারতির প্রণয় আরাধনা আশ্লেষ ঝরিয়েছিল, তা শুচিস্মিতা স্বরূপাকে কোরে তুলেছে ক্লান্তিতে শ্রান্তি ও শান্তি ঝরানোর রিদম্ সাজানো এক—মুনলাইট্ সোনাটা।—আর সত্যি এই পার্বতীর রুচিরা স্বভাবও যে প্রণয়ের দুনিয়ায় মাঝে মাঝে ধূর্জটিরই মতো হোয়ে ওঠে আত্ম-হারা, প্রায়

বৈচিত্র্যের স্বাদে 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে' উতলা—ঠিক রূপসীর সে জীয়ন রসের তরঙ্গলালিমায় দোদুলা হোয়ে গণবিলাসী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পর্য্যন্ত ঐ স্মিতারা রোমান্টিক জীবন-বিলাসের স্রষ্টা না করিয়ে ছাড়েনি। তাই দেখেছি "পুতুল নাচের ইতিকথা"র কুমুদের প্রিয়া স্ত্রী মতি সর্বাংশে এবং "শহরবাসের ইতিকথা"র চিন্ময়ের সুজনা-প্রিয়া সন্ধ্যা স্ত্রীর অধিকারে এক যাযাবরী রূপবিলাসের অন্বয়ে আপন আপন প্রিয়র ভেতর ও বাইরের জীবন ও যৌবনের মধ্যে ঝলকে ঝলস্ ফুটিয়ে নিজেদেরই দাম্পত্য সুখ ও খুশীকে করাতে পেরেছিল প্রগল্ভের চিত্র-বিচিত্রে বিলোলিত, মাঝে মাছে তার আবার লাজুকতায় হ্লাদিত আর শেষমেশ আহ্লাদিত—ঠিক শ্রীরাধার মতো—নিজের নিজের শ্যামরায়ের জন্য। কেন না, ঐ সময়েতেই তো পার্বতীর স্বত্বায় জাগ্রত ধূর্জটির আত্মময়তা যুগপৎ ভাবে জানাতে পারে—

> "অধরের কানে যেন অধরের ভাষা।
> দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
> গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
> তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সঙ্গমে।
> দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
> ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।"

নিরালা ঘেরা রূপ-নিঝুম প্রকৃতির পাতায় পাতায় সাজানো পল্লী-প্রান্তর থেকে জনহীন বনানী পর্য্যন্ত যে গোপন দুনিয়াটি আপনারই নিঃশব্দতার অনমুভবনীয় মাধুর্য্যে তৃপ্ত থেকেই হোয়ে থাকে পরিপাটি রূপে সুসজ্জিত ও সুব্যঞ্জিত—তারই ভাববিলাস মৌনে সমাহিত কথাশিল্প হোয়ে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপ-ধৃতিতে সালঙ্কৃত থেকেছে। অন্তর্মুখীন দৃষ্টি-নিমেষের গহনতা এই শিল্পীর সরলতার প্রমূর্ত ধী-ময়তাকে বাইরের সহজতায় আরো সহজ রঙে রাঙানো বিষয়েতে মিলিয়ে কোরে তুলেছে নিসর্গ-মুখর প্রণয়লোক—Nature's land of Romance. প্রকৃতির সেই মহাকবির কথা মনে পড়ে, যখন তিনি "My heart leaps up" বলে জানান—

> "The Child is father of the Man ;
> And I could wish my days to be
> Bound each to each by natural piety."

আর মনে পড়ে তাই—বিদেশে যেমন ছোট'দের জগতের দেয়ালা হাসির

শিশুময়তার বৈচিত্র্য নিয়ে বিস্ময়ে মাতাল ও আয়নার দেশটির এলিস্ আছে, গ্রাম-প্রান্তরের লুসি গ্রে আছে, আর আছে 'নীল পাখী'র সংকেতে খুঁজে ফেরা টিল্‌টিল্ ও মিটিল, বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের অনিন্দ্য সৃষ্টি 'রাণু', আর তার পরেও যেমন আছে ল্যামের 'স্বপ্ন শিশু'রা, মায় হেমিংওয়ের সেই সমুদ্র আর মাছ শিকারে মাতামাতি করা ছোট ধীবর ছেলেটি—তেমনি আপন বৈশিষ্ট্যে বহু শিশুর কল-হাসে আর কলতানে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় পল্লী বাঙলারই নিরালা ভরা নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের অতি নিশ্চিন্তে থাকা স্নিগ্ধতায় ভরা অভিজ্ঞা থেকে, যে অপরাজিত থাকা পথের গানকে কথার বুনোনে তুলে ধরেছেন—সেখানকার সব কিছু বিভাবই ভরাতে পেরেছে ছোটদের জগত হোয়ে। শিশুর সরল আর্তির দিনলিপি হোয়ে। শৈশবের কল-কলানি আর স্বভাব-মিষ্টি দুষ্টুমিপনার দুনিয়া পথেরই গানে গানে মুখর হোয়েছিল মূলত অপুকে নিয়ে, অনেকাংশে লীলাকে নিয়ে, আব সব কিছুকেই বাঁধন থেকে ছিন্ন কোরে অন্য জগতে পৌঁছানোয—স্মৃতি-চারণার বিষয় হোয়ে দাঁড়ানো দুর্গাকে নিয়ে। তারপরেও দেখেছি ছোট'র দুনিয়াদারিতে শিশু ভোলানাথের পুনরাগমন হোয়েছে, ঠিক তখনি—যখন 'চাইল্ড' থেকে হোয়ে ওঠা যুবক অপূর্ব রায় "···father of the Man" হওয়ার জন্য স্বভাব-রাঙা আকুতিতে বধূ অর্পণা রায়ের সুস্নিগ্ধ যৌবনের "ভার্জিন" রূপকে প্রিয়ার খুশীতে ঝলমলানো "উওম্যান" কোরে যে নতুন প্রাণের পুষ্পায়ণী বন্দনা সমাপ্ত করাতে পেরেছিল, তা এই দ্বৈত দেহ-মনের আরাধনায় ফুটে ওঠা আত্মজ কাজলের শিশু-রূপ ধরে। এ ছাড়াও "দৃষ্টি-প্রদীপে"র জিতু ও তার ছোট বোন সীতাব শৈশব ঘিরেও শিশু ভোলানাথ আবার এসেছিলেন সমাজে ও জন-মানসে শিশু-দর্শনের রূপ ধরে অপার সরলতার সুস্নিগ্ধতাকেই যেন প্রতিষ্ঠা করাতে! শুধু কি তাই? ইতিহাসের দেশে, সেই সেদিনকার কলোচ্ছলা ইছামতীর তরঙ্গ-ধোয়া দু'পারের জনপদে নীলকরসাহেব ও প্রজাসাধারণেব যে সুখ-দুঃখ ঘেরা কাহিনীটি তৈয়ার হোয়েছিল এই শিল্পীর অনিন্দ্য কারুকাজ রূপে কথাযান "ইছামতী"র ইতিকথায়—এই তারও মধ্যে দেখেছি নায়িকা তিলুর ছেলে খোকার সরব মুখরিত অস্তিত্বটি। এখানেও শিশুরূপ রেখে গেছে অরূপরতনের ছোঁয়াচ্। এই ছোঁয়াচ বড়দের ভুবনেও পৌঁছেছিল। তাই দেখেছি বয়েসে ও জ্ঞানে প্রাজ্ঞ ও গুণী ভবানীর স্বামীরূপ যৌবন ধরে থাকার ঊনপঞ্চাশী বয়েসে পৌঁছেও যৌবনের তেজদৃপ্ত পৌরুষকে হারান নি,—আর এই স্বাস্থ্যে ও মনে অটুট রাখার কারণ তারই

স্বভাবের সরল শিশুময়তার হর্ষোৎফুল্ল রূপান্বয়টি। তাই দেখেছি এক পরাক্রমশালী রায় রায়ানের তেজস্বিনী ভগিনী রূপে শৌর্য্যে ও মাধুর্য্যে মুখর তিরিশটা সুদীর্ঘ বসন্তের দোলনে দোদুলা, সুতীব্র যৌবনের যাদুময়তায় আনচানিয়ে তিলোত্তমা রায় ওরফে তিলু এই জ্ঞান-তপস্বীকে বিবাহ কোরে সুখের প্রগাঢ় রঙেই পেরেছিল নিজেদের দাম্পত্যজীবনকে রাঙাতে। শিশু-স্বভাব ঘেরা ভবানী বাড়ুজ্যের মতোই তিলুও ছিল তেমনি। তাই শৈশবের কলহাস ফুটিয়ে ওরা একদিন ইছামতীরই জলে নেমে ডুব সাঁতারের কৌশলাদি দেখাতে দেখাতে হোতে পেরেছিল দুর্দম। হোয়েছিল প্রগল্‌ভ। এই শিশুময়তাই তিলু-ভবানীর দাম্পত্যজীবনে পারস্পরিক বয়েসের আধিক্য এবং পার্থক্যের ফারাক্‌টুকুকে অতি নিকটের একান্ত রস-সম্ভোগের একান্ততায় আনাতে পেরেছিল। তাই তার ঋতু সম্ভোগের মন-মদিরতায় নিজেদের 'গাঁয়ের মাটিতে ...বাঁশবাগানের ভিটেতে...একটা বংশ তৈরি করে রেখে' যাবার আশ্লেষে অতি সহজেই স্বামী-স্ত্রীর রহস্য-ঘেরা 'প্রাইভেসি'তে গর্বিত হোতে পেরেছিল তারা। আর তাই "...আপনি ভাবছেন সামান্য মেয়েমানুষ আমি? ·কে জানেন আমি?"-র প্রশ্ন তুলে "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষী তনুমাশ্রিতং" বলে তিলু যখন সহাসভরা নিবেদনে স্বামীকে জানাতে পেরেছিল তারই শিক্ষার আলোকে জ্ঞান-গরিমায় শিখে ওঠা পরিচয়টি—তখন দেখেছি প্রিয়া স্ত্রীর জ্ঞান-চর্চার আনন্দময় বার্তায় খুশী হোয়ে "...ভবানী তিলুর রঙ্গভঙ্গি মাখানো সুন্দর ডাগর চোখ দুটিতে চুম্বন ক'রে ওর চুলের রাশ জোর করে মুঠো বেঁধে ধরে বললেন—তুমি হলে দেবী..."। আর এই দম্পতিরই সন্তান হোল—খোকা। কাজেই এ কথা স্বীকার্য্য যে—সামাজিক সমৃদ্ধির ও বংশগত মর্য্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হোয়ে উঠবে একদিন না একদিন—এই বিভূতি-মানস পরিকল্পিত—খোকা। তাই দেখেছি খোকার উপস্থিতি "ইছামতী"র সৃষ্টিগত অনিন্দ্যতাকে ফোটাতে বেশ ব্যাপকতাই নিয়েছে। বড় কথা যেটা, সেটার আলোয় দেখতে পাই শিশুর এই সরলতার উর্ম্মিমালায় অন্যান্যরা পর্য্যন্ত খুশীয়াল না হোয়ে থাকতে পারে নি। তাই তো—ভবানী এই খোকার শিশুরূপদর্শনেই দেখতে পেতেন ভাবীকালের ভবিতব্যময় আধুনিকতার সার্বিক ধারার নানান জোয়ারে উজান ভেঙ্গে আসার ইঙ্গিতটি। আর তিলু তার মাতৃত্বের গরিমায় ও স্বামীর জ্ঞানের ছায়ায় থেকে শিখে ওঠা ঔপনিষেদিক তত্ত্ব ও তথ্যের আলোতে রেখে খোকার ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়ে তোলার আন্তর ঝরা পরিকল্পনায় থাকতো বিভোরা। এ সবই ছিল শিশুর

রূপদর্শন-জাত অনুজ্ঞা আর অভিজ্ঞা। এমন কি সেই অষ্টাদশী নিস্তারিণী—যে বিবাহে সুখী না হওয়ায় আপনারই সমবয়েসী মনের সুজন ছেলেটিকে পাওয়ার আকুতিতে প্রায়ই সমাজ-চক্ষুর কাছ থেকে, গ্রামের পরিচিত চৌহদ্দি থেকে পালিয়ে এসে এক বন-ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ফেলতো নিজেকে। আর সেখানে সুখী মনে, খুশী ঝরিয়ে নিস্তারিণী তারই আকাঙ্খিত গোবিন্দ নামধেয় সেই সুশ্রী ছেলেটির টাটকা যৌবনের স্বাদ নিতে যেভাবে নিজেকে ওরই বুকের আশ্রয়ে লুটিয়ে দিতো—তা দেখে মনে হোয়েছে নিরালা বনানীর শোভায় যেন ভয়ে আর লজ্জায়, আর ভয়-জড়ানো একরকম বীরত্ব নিয়ে ওরা দুটি হোয়ে উঠেছে শিশুরই মতো অনাবিল দুষ্টুপনায় মাতাল, উতলা।—সত্যি শিশুময়তার এই রূপদর্শনের ভেতরেই যে বিশ্বরূপটিকে খুঁজে পাওয়া যায়, সে কথাই অশেষে-বিশেষে ধ্যানস্নাত করাতে পেরেছেন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশুর জগতে আর শিশু-সম্পর্কিত চিন্তায় বিন্দুমাত্র আবিলতার স্থান নেই। তাই জীবন ও যৌবনের স্বত্বাকে গভীরে টানবার আগে প্রাথমিক ধ্যান হোয়ে তাঁর সাহিত্যের বহু চরিত্রই শিশুর স্বরূপে বারে বারে রূপিত হোয়েছে। সেই সঙ্গে ঝরিয়েছে মন-সুখ্ করা আহ্লাদ ও আব্দার।—এই এক ও অনিন্দ্য সৃষ্টিধারার উৎস যে—সেই অপু "অপরাজিত"তে যৌবনের বাসর সাজিয়ে বন্দনা কোরেছিল অপর্ণার প্রিয়া রূপকে। দু'জনেই যৌবনের পলাশময় প্রতিভূ হোলেও,—ওদের দাম্পত্য-প্রীতির দুনিয়া ঘিরে কখনো লাজময় আর কখনো নিলাজ হওয়া যে সব ভালোবাসার ছবি "courting pleasure"-কে মুখর কোরেছিল—তার সম্বন্ধে ঐ একটা কথাই বলা যায়—ওরা প্রতিটি ব্যবহারে ছিল চির-সবুজে সজীব শিশু ছাড়া, অন্য কিছু নয়। এই হাসানো, এই কাঁদানো, এই চুলকে এলো কোরে টেনে ধরা টান দিয়ে দিয়ে, চিমটি কাটা, নিজের হাতে আঁচল টেনে প্রিয়র তার চোখের দৃষ্টিতে ফেলে শরমরাঙা কোরে প্রিয়ার দেহের ছান্দসী পেশলতাকে লজ্জা মাখাতে আর সেই স্থানীয় উদোল যৌবনকে বঙ্কিমায় দোদুল করানো—প্রভৃতি শিশুর দেয়ালা হাসির সরব মূর্ছনাকে স্বাক্ষরে সুনিশ্চিত কোরে তোলাতে পেরেছে "অপরাজিত"র নীল নির্জনতার নিরালা সন্ধ্যায় অনুরাগ ভরা অপূর্ব রায় ও অপর্ণা রায় সমীপের সুস্নিগ্ধ অভীপ্সায়। ন্যাচারস্ ল্যাণ্ড অফ্ রোমান্স—তো এই এ হেন জীবন-যৌবনেরই রূপ ধরে আশ্লেষিত হয়—শিল্পে আর সাহিত্যে। পথের গান গাওয়ার এই কাহিনী বিশ্বরূপের খেলাঘরে শিশু-মনোদর্শনে মেতে "পথের- পাঁচালি" থেকে

"অপরাজিত" পর্য্যন্ত যৌবনময় শিশুবিলাসে গুনগুনাতে পেরেছে—A song of the road leads to youth. সত্যি তাই। একটা কথা— কথাশিল্পী মাত্রেই যৌবনের কথায় যৌবন মুখর মুহূর্তগুলোকেই সাহিত্যায়ণের আলপনায় সাজান—এটাই কানুন! কিন্তু দেখেছি, এই "পথের পাঁচালি"র মধ্যেই বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট্ট অপুর সঙ্গে রাজকন্যা-সদৃশ্যা ছোট্ট লীলার কাহিনী নিয়ে বেশ কিছু দিনের জন্য যে দুটি শিশু মনের আলাপচারিতায় মুখর রেখেছিলেন—সে ব্যাপারে কি আমরা অন্তত একবারও ভেবেছি—অপু আর লীলা অজান্তে, আর অবুঝ চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেই ঐ বয়েসে কী কোরে অতি ঘনিষ্ঠতায় এসেছিল? আর নিজেদের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছিল যে একটা understanding-কে, সেটা কি ভেবেছি? আমি বলব—অপু-লীলার এই কাহিনী একমাত্র কাহিনী—যা বাঙলা সাহিত্যের কোন এক যুগসন্ধিক্ষণে সৃষ্টি হোয়ে রেখে গেছে অতি ছোট্ট দুটি নায়ক-নায়িকার ইতিকথার শেষ না হওয়ার এক রেশ—যা শেষ পর্য্যন্ত অপূর্ব রায়ের যৌবন ও সর্বোপরি তারই সাহিত্যিক রূপটিকে "অপরাজিত"তে এসে ছোটবেলাকার অবুঝ মনের ভালোলাগার জোরেই পুনরায় ভালো না বেসে থাকতে পারে নি—যুবতী লীলার মধুছন্দা স্বভাব। যদি পরবর্তী এই মিল তাদের জীবনে আর নাও দেখা দিতো,—তবু বলব, পথের গান গেয়ে যৌবন দেখিয়ে "road to life" পর্য্যন্ত বন্দনা করার আগেই ছোট্ট অপু ও ছোট্ট লীলার মধ্যেও ঘটেছিল ভালোলাগারই অজান্তে বাসা, অশেষ ভালোবাসা। একথা স্বীকার না কোরে পারা যায় না। অপর্ণার ভালোবাসা ছিল স্নিগ্ধ যুঁইফুলের মতো সুরভি-বিহ্বল। কিন্তু লীলার প্রণয়াকুলতা ছিল থির বিজুরিক মূর্ছনায় হঠাৎ আলোর ঝলক দিয়ে বিহ্বল করা গোলাপের খোশবু। ছোট্ট বয়েসের ভালোবাসার ঋতুসত্তার কোন কারণ বা যুক্তির নাগপাশে বাঁধা না থেকে অতি স্বাভাবিক ভালো লাগার প্রেয়ত্ব ধরেই অপূর্ব রায়ের জন্য শ্রীমতী লীলা তার মনের আর দেহের সুখের উল্লাসে ভালোবাসার শ্রেয়ত্বে টানতে পেরেছিল। এটা অনিয়মেরই স্বাক্ষরিত নিয়ম। দেহে আর মনে একটা শিশুময় সুতৃপ্ততার আবেদন মুখর থাকে বলেই, আমি বলব, ভালোবাসা হঠাৎ এসে দেখা দেয় তার সরল সজীবের সবুজ আহ্বানে।—আমি দেখেছি অতি স্থির জীবনদার্শনিকতায় বিশ্বাসী বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেম ও পরিণয় সম্পর্কের অভিধা মাঝে মাঝে মহামনীষী রোমাঁ রোলাঁর শিল্প-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় আশ্লেষিত হোয়েও—তাঁর মস্ত বড় বৈশিষ্ট্যের রস-

স্বরূপটিকে এই গ্রাম-বাঙলার হরেক রকম পল্লীবিচিত্রার সঙ্গেই আধার ও আধেয় সমেত অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি কোরে রেখেছে। বিশেষ ভাবে পরবর্তী ধারায় অপু সমক্ষে লীলার জীবনের প্রেম ভালোবাসার আকুতি যে অসাধারণ আসক্তির হেমাঙ্কনে বিভূষিত হোয়েছে—তাই দেখে মিতালি মধুরে রূপস্নাত রূপকথার কথাই মনে পড়ে। আর তাই রোলাঁর ক্রিস্তফের কথাও মনে পড়ে। যৌবনে এক শরৎ-ধোয়া রবিবারের সোনালি রঙ্ ঝরা পথে চলতে চলতে ক্রিস্তফের সঙ্গে দেখা হোয়েছিল অপরিচিতা বরকন্যা অ্যাডার। এই অ্যাডা তখন যুবতী রঙে ভরাট এক ভয় জড়ানো লাজুকতা নিয়ে মুস্কিলে পড়েছে। গাছ থেকে ফল আহরণ করবার জন্য কোন রকমে কসরৎ কোরে উঠেছিল পাঁচিলের ওপরে। কিন্তু নামবার সময় গোল বাধল। অসুবিধায় পড়ল। আর তাই নেমে আসতে এই অপরিচিত ক্রিস্তফেরই সাহায্য চাইল। কিন্তু যৌবনের জীয়নকাঠির ছোঁয়াচ যুবক ও যুবতীর অপরিচয়কে মুহূর্তেই কতদিনের যেন পরিচিত না কোরে ছাড়ে না! ওদেরও ছাড়লো না তাই!

এটা সত্য বলেই দেখলাম অ্যাডা একটা পাঁচিলের ওপরে দাঁড়িয়ে সামনে ঝুঁকে থেকে একটা ফলন্ত কুল-গাছ থেকে পাকা কুলগুলো পারতে পারতে নীচে দাঁড়িয়ে থাকা অপরিচয়ে বিস্মিত ক্রিস্তফকে প্রশ্ন কোরল: "Would you like some?" তখন দেখলাম আদর্শবাদী যুবক সঙ্গীতজ্ঞের পরিচয় পাওয়া গেল: "Respect for property had not developed in Christophe since the days of his expeditions with Otto: he accepted without hesitation. She amused herself with pelting him with plums. When he had eaten she said: "Now!..." He took a wicked pleasure in keeping her waiting. She grew impatient on her wall. At last he said: "Come, then!" Held his hand up to her.... But just as she was about to jump down she thought a moment. ...'Wait! We must make provision first!"... She gathered finest plums within reach and filled the front of her blouse with them.... "Carefully! Don't crush them!" He felt almost inclined to do so. · She lowered herself from the wall and jumped into his arms. Although he was

sturdy he bent under her weight and all but dragged her down. They were of the same height. Their faces came together. He kissed her lips, moist and sweet with the juice of the plums: and she returned his kiss without more ceremony.…"Where are you going ?" he asked.… "I don't know." …"Are you out alone ?" "No, I am with friends. But I have lost them.… Hi! Hi!" She called suddenly as loudly as she could.…No answer.…She did not bother about it any more. They began to walk, at random…"

—সত্যি ক্রিস্তফ্ যেমন সে মুহূর্তে মনের মাধুরী নিয়ে হঠাৎই অচেনার অসোয়াস্তিকে কাটিয়ে শ্রীমতী অ্যাডাকে স্বস্তির নির্ঝরে প্রণয়ে হ্লাদিত কোরেছিল—অপু ঠিক এই আচমকা ভাব নিয়েই লীলা হোয়ে অপর্ণাকে, মানে লীলার মধ্যে আত্মা-বধূ আর অপর্ণার মধ্যে লীলা-বধূকে গ্রহণ কোরেছিল আচমকাই। "ইছামতী"র ভবানী যেমন তিলুকে, "দৃষ্টিপ্রদীপে"র জিতুও তেমনি আত্মার বধূরূপে পেয়েছিল শ্রীরাধায় দেহ-মনে সমর্পিতা বরকন্যা মালতীকে। আর লীলাচাঞ্চল্যের দেহলি-দোসরের বধূ রূপে বরণ কোরেছিল হিরণ্ময়ীকে। কেন এমন হয়—এর উত্তর পাওয়া দুষ্কর। তবু হয়, আর তাই তা হঠাৎই আলোর ঝলক মেখে আসে বলে জগতের পুরুষ-রূপ আর নারী-রূপ প্রণয়াভায় নন্দিত না হোয়ে পারে না,—কেন না খৈয়ামেই তো ভাষ্য আছে—

"রাত পোহাল—শুনছ সখি, দীপ্ত ঊষার মাঙ্গলিক ?
লাজুক তারা তাই শুনে কি পালিয়ে গেছে দিগ্বিদিক্!
পুব-গগনের দেব-শিকারীর স্বর্ণ-উজ্জ্বল কিরণ-তীর
পড়্‌ল এসে রাজপ্রাসাদের মিনার যেথা উচ্চশির!"

(কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ)

আর তাই বুঝতে দেরী হয় না যে, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতিবাদ তাই "কিন্নরদলের" শ্রীপতির বৌ-এর শুচিস্মিতা রূপ ধরে গানের লহরদলে ছন্দ সাজায় এদেশেরই ভাবে, যখন সে তার যৌবনের পঁচিশটা বসন্তের বধূ-সাজে ও প্রিয় শ্রীপতির প্রেমের ছোঁয়াচে সুতৃপ্ততায় সুদৃপ্ততা নিয়ে শুক্লপক্ষের অঞ্চলতলে কোন 'মুন-লাইট সোনাটা' বাজাতো—আর ও-ভাবে পল্লীর প্রতিটি ঘরের মানুষকে হাসিয়ে, নাচিয়ে, সুখী কোরে শেষ পর্য্যন্ত যখন হঠাৎই প্রেমে ডগমগিয়ে

ওঠার মতো, হঠাৎই এই সুস্মিতা বধূর কোকিল-কণ্ঠ নীরব হোল এই পৃথিবীর ও-পারের বাসিন্দা হওয়ায় সকলকে কাঁদিয়ে— তখন বুঝি এই প্রকৃতিবাদী শিল্পীর দর্শন গল্পেরই নামধেয় সাংকেতিকতা ধরে ঐ সুকন্যার "কিন্নরী"ত্বকে তীব্র কল্পনারই রঙ্ বাহারে অতি বাস্তবিক ট্র্যাজেডি কোরে তুলেছে। আর এই ভাবই আবার সঙ্গীতের সাধনায় যেন গানাৎ পরতর সমীক্ষায় "মেঘমল্লারে" বর্ণিত হোয়েছে। তার পটভূমিকা ছিল বৌদ্ধ যুগের একটি বিহারের অধ্যয়ন মানস পর্য্যন্ত—যার ছাত্র ছিল সুবেশ আর সুকণ্ঠ প্রদ্যুম্ন। গানের সাথে সাথে সে ভালোওবেসেছিল সুনন্দাকে। মনে হয় গানের যে বিজ্ঞান ভূমার পথে তার সাধককে টেনে নিয়ে চলে, তার সঙ্গেও যেন ওতপ্রোতভাবেই সংশ্লিষ্ট থাকে নর-নারীর প্রণয়াকুলতাটি। কেন না, এই নম্র মধুর বৃত্তির পরিবেষ্টন সত্যি পরস্পরের কাছে প্রেরণার মহৎ উৎস হয়। কথায় আছে—গান, ফুল আর শিশু—এই তিনের মহত্বকে যে ভালবাসতে পারে— সে কখনো অপর কোন প্রাণের হন্তা কখনোই হোতে পারে না। কথাটা ঠিকই। কিন্তু প্রদ্যুম্নের বেলায় ফল ফললো উল্টোটি। সঙ্গীত সাধনারই একটা "myth" বিশ্বাস কোরে প্রদ্যুম্ন তার প্রাণ বিসর্জন না দিয়ে পারে নি। প্রদ্যুম্ন কিন্তু তার প্রিয়া সুনন্দাকে নিভৃতের বাঁধনে নিয়ে সত্যি মেঘমল্লারের গভীরে ডুবে গানের সুরে সুরে মাতাল হোয়ে কখনো বলতে পারে নি—

"পেয়ালাটুকু ভরিয়ে নে গো, এতই কিসের চিন্তা তোর ?
সময়টা কি সব কাটছে বৃথা—ভাবনা কি তাই দিনটা ভোর !"

তা না পারার কারণ, প্রদ্যুম্নর ভেতরের শিশুময় অনুসন্ধিৎসাটি। "Search for heart's woman" নয়, প্রদ্যুম্ন অনুসন্ধানে মুখর ছিল "search for musical world"এর জন্য। তাই "মেঘমল্লারে"র সুর এই শিশুমনতায় ভরা আর্তির মধ্যে প্রিয়াকে দূরের সুদূরিকা কোরে, আর প্রিয়ার অপ্রাপ্তিতে ক্রন্দসী কোরে প্রদ্যুম্ন হারিয়ে গেছিল সঙ্গীত মহাদেশের "Muse"-এর রাজদরবারেতে একাত্ম হোয়ে। —কিন্তু এই ধ্যানও অতি সাধারণ এক কথার কথকতায় সাজানো গল্প হোয়ে উঠেছে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বুটীর বাড়ী ফেরা"য়। এখানে বুটী যার নাম, সে মানুষের সমাজের কোন শিশু নয়,—আর স্ত্রী-লিঙ্গ বাচক শব্দ হোলেও সে কোন নারী নয়। সে একটি সহৃদয় প্রাণ। আর সমাজের কাছে তার প্রয়োজন অশেষ বিশেষে অপরিহার্য্য। ও একটি গরু। নাম বুটী। ও অন্য কিছু না হোলেও, এ কথা ধ্রুব সত্য যে, সমাজের শিশুদের দেহে ওর

নির্য্যাস শক্তি সঞ্চার করে, আর যারা যুবতীকালে সুন্দরী হোতে চায় বহিরঙ্গের রূপসাধনায়, তারা সময়ে সময়ে দেখা যায় ওর দুধের ধারায় স্নান করে, কিম্বা দুধ ঘন হোয়ে ওঠা থেকে সর তুলে নিয়ে শরীরে মাখে—রূপ যাতে হোতে পারে গোরোচনা, সোনার বরণ। তাই এহেন যার প্রাণের দাম, সেই একজনা রূপেই শিল্পী এখানে তার চেতনার সজাগ রূপ থেকে বুটী পরিচয়ে বাছুর থেকে দুগ্ধবতী গো-মাতা হওয়া পর্য্যন্ত যে কাহিনীটি এঁকেছেন, তা পড়ে মনে হয়েছে সাহিত্যিক ব্যঞ্জনার নিখুঁত নিটোলতায়—animal psychology-কে কাহিনীর দ্বন্দ্ব-মধুরতায় অপরূপই করাতে পেরেছেন। শিল্পীর মনের শিশু-স্বভাব আদরিত দার্শনিকতা তাঁকে তাই নামধেয় শ্রেষ্ঠতা দিতে পেরেছে।—তবু বিশেষভাবে মনে পড়ে তাঁর "অরন্ধনের নিমন্ত্রণে"র কথা। এখানে দেখেছি বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলার পল্লী-বিচিত্রায় গোছানো যে ঘরোয়া কাহিনীটি পল্লী-যুবতী কুমী আর শহরতলীর সংস্কৃতিভাবাপন্ন যুবক হীরুদার সঙ্গে যে সম্পর্কটি গড়ে তুলেছেন—তার মধ্যে আছে অতি শান্তশ্রীতে ভরা ভালোবাসার মৃদুলতায় কাঁপা রাগানুরাগের এক দিব্য-শ্রী। গ্রাম-বাঙ্‌লার এক দূরবর্তী অজ পাড়া-গাঁর সন্ধ্যার ঝিঁঝি ডাক, বন-চাঁপার আর সোঁদালি ফুলের গন্ধে, মায় জিউলিতলার ঘন অন্ধকার কাঁপিয়ে বাঁশঝাড়ের দোলনে বেলা-অবেলার প্রান্তে বিবাহিতা কুমীর যুবতী সুখ যে-ভাবে স্বপ্নীল আবেগে শহুরে হীরুদার বিবাহিত মনেতে প্রণয় রঙ আঁকতে পেরেছিল—তা প্রকৃতিবাদী বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়েরই যে ভালোবাসা-নিরীক্ষার রূপদর্শন—সে কথার অনিন্দ্য মুখীন ঘনঘোরতা সত্যি এই শিল্পীর অসামান্য প্রতিভারই বিচিত্রিতাকে বিস্ময়ে অবাক কোরে তোলে। আর মনে হয় শেষ পর্য্যন্ত হীরুদার বিবাহিত মন শরমে রঙীন হোয়ে অন্ততঃ একবার তারই শৈশবের পরিচিতারূপী আজকের এই কুমীর যুবতী-দেহ-মনের প্রণয়-জড়ানো শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন পেয়ে এটা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। আর ও যদি খেয়াম হোত, তা হোলে কুমীকে নিশ্চয়ই শোনাতো—

> "এই যে কোমল দূর্ব্বা যাহার বুকের ঘেরা আঁচলটুকু
> সদ্য শীতল শয়ন মোদের—সব ভিজিয়েছে নদীর মুখ—
> আস্তে সখি পাশ ফিরে নাও, কী জানি এর ব্যথার ফের্—
> কোন্ রূপসীর পাৎলা ঠোঁটের জিয়ন রসে জন্ম এর !"
>
> (কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ)

অনুরাগবতী সন্ধ্যার বর্ণালিতে ঝলক্ দেওয়া স্বর্ণালি রেখামালায় সেজে প্রতিটি মঞ্জুলা প্রিয়ার জীবন-বিচিত্রার সাজঘরে মাঝে মধ্যিখানে সময় বিশেষে, তাদেরই প্রিয় যুবকটির ওপরে করা এক সুরীতিতে ঘেরা অভিব্যক্তির প্রকাশ পায়। এই প্রকাশ বেশ কিছু সময়ের জন্য প্রেমিকা, বাগদত্তা ও বিশেষ ভাবে বিবাহিতা যৌবনান্বিতার খুশীবাঙা দেহ-মনে—ঠিক খুশীরই বৈচিত্র্যকে তৈরী করাতে রঙ্ বদলিয়ে চলে।—আর চলেও আসছে তা' সেই সুদূরের বিদিশার, আর শ্রাবন্তীর সন্ধ্যালি ঝিলি-মিলির সুরেলা-লহর-দলে আনচানিয়ে উজ্জয়িনীর, সেই হারানো প্রথমা প্রিয়ার মতই—রাগে ও অনুরাগের বাসকসাজে, কলহান্তরে, অভিসারে, আক্ষেপানুরাগে, মধুরা রতির আরতি করা মিলনে, আর সর্বোপরি প্রোষিতভর্তৃকার ঋতুরঙীন স্বভাব থেকে—মেঘের দূতী হওয়া পর্য্যন্ত।—এই যে, অবস্থা, এরই নাম—অভিমান। মনে হয়,—সুস্মিতা বধূর যৌবনের পলাশ ভরা শুচিতার প্রাক-পরিণয় ও পরিণয়-পরবর্তী যৌথ-জীবনের আশ্লেষের মধ্যে প্রণয়-কলার এ-ধারে ও-ধারে অভিমানে কুঙ্কুমিত হওয়ার জগতে হোল—প্রিয়ারা একচেটিয়া অধিকারিণী। আর আহ্লাদিনী ও আদরিণী! ছোট্ট শিশুর মনের সমীক্ষা যেমন বড়দের কাছ থেকে চুমা খাওয়াটা তারই একচেটিয়া এক্তিয়ার বলে বুঝে রাখে অবুঝতা নিয়ে—তেমনি মধুরা যুবতীর বোঝদার মনের প্রেমময় ভুবন 'অভিমানে' আবীর হওয়াটাকে নিজেদেরই 'monopoly' রূপে আক্রে রেখেছে। আর তাই এই অভিমানের রস-মাধুর্য্য অতি বাস্তবকেই কোরে তোলে কল্পনায় সাজানো ও গোছানো রোমান্টিক অবস্থার রূপশ্রী। আর এর সঙ্গে ভাবের রূপমন্দিরে একটা গাম্ভীর্য্যের ঝর্ণা ফুটিয়ে তোলায়! অকারণ আনন্দ-নির্ঝর হওয়া চোখের জলের বৃষ্টিতে—তা সুনয়নীর কাজল চোখের কালো কালো কুট্টিমকে ঝাপসা দৃষ্টির নিমেষেতেই দেখতে দেয় প্রিয়র উপস্থিতিকে—যে প্রিয় তার প্রিয়াকে ভুল বুঝে বা দূরে চলে গিয়ে কাঁদিয়ে তুলেছিল, সেই-ই আজ ভুলের মাশুল দিতে বা নিকটের টানে দূরকে ছাড়িয়ে কাছের ঘনিষ্ঠতায় এসেছে! প্রিয়-প্রাপ্তির মধ্যের অনিন্দ্য তৃপ্তি প্রিয়াকে আরো কান্নার মুষলধারা বর্ষায় মাতিয়ে তোলে। কেন তোলে, তার কারণ নিহিত আছে একমাত্র সুখ নিবেদনী অকারণ চোখের জলের কথায়, 'Idle Tears'-এর নামধেয় রূপ থেকে অপরূপের সাজঘরের খুশীতে।—আর কেন না,—মিষ্টি স্বভাবের প্রিয়া-যুবতীর ততোধিক সুন্দর দেহের রুচিরা ভরা যৌবন-বঙ্কিমায় সাজিয়ে তোলা 'অভিমান' সম্পূর্ণ হোতে পারে না—যতক্ষণ না তার সঙ্গে অঝোর-ধারে ঝরা অকারণ চোখের জল কপোলের

ওপরে ভেসে ভেসে—হাসিতে কাঁপা অধরের লাল রঙকে ভিজিয়ে ভিজিয়ে সিঁদুরে-কুঙ্কুমে-কাজলে-পরাগে একাকার হোতে না পারছে! আর আপনার এই ক্রন্দসী প্রিয়ার অভিমানী যৌবনকে প্রিয়র তাপিত বুকের বড় বেশী নিশ্চিন্ত আশ্রয় তখন বুঝি বাঁধনের কঠিনে বন্দী রাখে। অভিমানিনীর এই রূপ-ঝরা মুখে ভাসা অশ্রু-সায়রের অপরূপতাকে প্রিয়রই অধরের নিলাজ-ছোঁয়াচ সুখ এঁকে দিয়ে দিয়ে, খুশীরই আবো চোখের জলের মন্দার ধারায় ভাসিয়ে রাখে!—এই যে সবিশেষ ঋতুনির্ঝর'র অনুজ্ঞান, যা প্রিয়ার অভিমানের পলাশ-সাজ রাঙিয়ে তোলে, ও যিনি সেই সঙ্গে "Idle Tears"-এর ছোটো ছোটো নানান বর্ণ-বৈচিত্র্যের লিপিবিলাসে অতি বাস্তবের অঙ্গনকেই অশেষে অনিন্দ্য রোমান্টিক-বীক্ষায় সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন—তিনি হোলেন রূপদক্ষ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর "নীলাঙ্গুরীয়" "উত্তরায়ণ" ও "দৈনন্দিন" এই তিনটি উপন্যাসের শ্রান্ত ও শুচিতা রাঙা সুনিকেতনী ভালোবাসার কুট্টিমতা এবং "হাসির অশ্রু" "মেঘদূত" "বর্ষায়" "হারজিত" "বসন্তে" "ভালোবাসা একটি আর্ট" "দুটি দিনের ইতিবৃত্ত" প্রভৃতি গল্পের কল্পনার রূপকাঠিটি সাহিত্যিক অভিব্যঞ্জনা ও সামাজিক অভিরুচির দিন-দুনিয়া বাড়িয়ে আপনার রূপদক্ষ শিল্প-মানসটিকে সুন্দরে, আর মধুর হোতে সুমধুরের দৃষ্টি-নিমেষে স্বাক্ষরিত কোরেছে। যৌবনের ভালোবাসার জীবন, বিশেষ ভাবে সবুজে পলাশময় দাম্পত্য-সম্পর্কটিকে বিভূতি মুখোপাধ্যায় সাহিত্যিক অভিধা ছাড়াও, বোঝাতে পেরেছেন আপন শৈল্পিক অভিজ্ঞার অনুজ্ঞায় যে—ওদের এই আবেশ-ভরা নির্ঝর-মুখর সবুজ-সুখের বাস্তবতাগুলোর প্রতিটিই যেন এক একটা নিরালা আর নিঝুম ঘরের মধ্যে সাজিয়ে রাখা—গ্রন্থ। উপন্যাস। তাই আঁদ্রে মারোয়ার লেখা থেকে দেখি—"This is a novel," the husband and wife should both say, "which I am going to live, not write. I know that I must take into account the peculiarities of the two characters who are already drawn, but I want to succeed, and I will succeed."

একটা বয়েৎ আছে—যাতে বলা হোয়েছে,—অযোধ্যার সন্ধ্যা, রাজোয়াড়ার সকাল আর মালবের রাত্রির নাকি অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে তুলনা হয় না! এটা যেমন দেখা যায় না অন্যত্র—তেমনি রূপবতী যুবতীর মুখের পলাশ-প্রভা ছাপিয়ে ওঠা "অভিমানে"র ছন্দে হঠাৎ কাঁপন-কাঁদন-দোলনের ঝলক তুলে

সারা দেহ-মন্দিরের লজ্জাকে শুধু লজ্জাবতী করার প্রতিবেদনটি অদ্বিতীয় ক্ল্যাসিক-সৃষ্টি হোয়ে ফুটেছে বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের শিল্প-মানসিকতায় অশেষ স্বাতন্ত্রতায় রাঙিয়ে। ভালোবাসার বাঁধনেও যে ফুটে ওঠে বিচ্ছেদের জন্য অকারণে আর আলস্যে ঝরা চোখের জল—তা সত্যি অযোধ্যার সন্ধ্যাকেও বোধ হয় হার মানিয়ে দেয়—প্রতিটি প্রিয়ার তারই প্রিয়র জন্য প্রণয়-বিহ্বলা থাকার "অভিমান" রাঙা নিরালা-নিঝুম সন্ধ্যাগুলো। এই রূপধ্যানের অপরূপতাই যৌবনের প্রাপ্তিতে দাম্পত্য-জীবনের এক মস্ত গহনদেশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মন-বিশ্লেষনের ধাপে ধাপে সরোজ ও সুচারুকে সুরীতির ঋতায়নে মন্ত্রের সত থেকে মৈথুনের স্বত্বে পূর্ণমিদম্ জীবনেরই যৌবন-ভাষ্যে সালঙ্কৃত শিল্পকাজ হোয়ে ফুটেছে বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের ছোট উপন্যাস—"দৈনন্দিন"এ। বিবাহিত যৌবন ধীরে ধীরে 'privacy'-র উন্মোচনে দু'জনায় মিলে-মিশে-মনোযোগের বোঝাবুঝিতে যে মধুরিম জীবনের জীয়ন-কাঠির সন্ধানে সুখ-ঝরার দেশে রূপকথা তৈয়ার করে ধৈর্য্যে, মাধুর্য্যে, সৌন্দর্য্যের ঔদার্য্যে—এরই নিরীখে দম্পতির অতি সূক্ষ্ম রীতির মধ্যে ঋতু ফুটিয়ে যুগপৎ ভাবে মিথুনে ঋতা হওয়ার মধ্যে আছে নানান মানস-বৈচিত্র্যের টানা-পোড়েন। "দৈনন্দিনে"র শিল্প-বিবেক সরোজ ও সুচারুর জীবন ধরে যা ব্যক্ত করিয়েছে পরিণয়ের প্রণয়ে—তা আগাগোড়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনঃস্তত্বকেই কোরে তুলেছে—কথামানী-শিল্প। আর প্রিয়ার অভিমানেই রেঙে সুচারু তার সরোজকে নিয়ে উভয়ের মানস-দ্বন্দ্বকে কোরেছে সত্যি—মিতালিতে দ্বন্দ্ব-মধুর। দাম্পত্য-জীবনের রীতি-ঘেরা জীবনের যৌবনায়ন যখন বিবর্তনী ছোঁয়াচে প্রিয়কে নিয়ে প্রিয়ার দেহ-মন্দিরে ঋতুর রিদম্ নাচিয়ে রতির আরতিকে করায় সুসম্পন্ন—তা যে সত্যি কখন আলোর ঝলক তুলে প্রিয়াকে যথার্থই করাতে পেরেছে প্রজাবতী—এই আনন্দ-ঝরা কথাটি অন্ততঃ কোন রকমেই প্রিয়র পক্ষে কখনোই জানা সম্ভব নয়—যতক্ষণ না প্রিয়া নিজেই তা জানাতে পারে তারই প্রিয়কে ;—যে প্রিয় মিথুন-বাসরের আহ্বানে প্রিয়ার বাসক-সাজের আড়াল ঢাকা লজ্জাকে কেড়ে নিয়ে পুনরায় পুষ্পায়নের অধিবাস শেষেতে ভরাতে পেরেছিল—"ভার্জিন"ত্বের সংহারে শ্রীমতীময় লজ্জায় আবরিত কোরে!—সত্যি এই রূপারূপটির মধ্যে আছে সূক্ষ্মতম এক মনঃস্তত্ব! আর একেই "অভিমানে"র আশ্লেষে সাজিয়ে বধূ সুচারুর সরোজ সমীপে আপনার এই সৃষ্টি-কাজের অকপট স্বীকারোক্তির ভেতরেই 'দৈনন্দিনে"র শিল্প-বিবেকটি স্রষ্টার অশেষ স্বাতন্ত্র্যতারই স্বাক্ষর বহন কোরেছে।

বাঙলা-ক্ল্যাসিক "নীলাঙ্গুরীয়" হোল বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। এতে অকারণ চোখের বর্ষায় নামা ঢল্ যে অপার পরিতৃপ্তির মধ্যে পলাশ রাঙা করেছিল মীরার অভিজাত-লালিত গরিমা রূপকে বাদুলে বাতাসের ঝাপটায়, তা পাঠকের ভাব-মঞ্জিলেতেও গভীর দাগ রেখে যায়। হাসি-কান্নার যুক্ত জীবনায়নের মীরা রায় তার প্রণয়রীতির চারধারে মরসুমী ঋতুরাজের তাগিদে রেখে যায় চোখেতে ঝরা বিদিশার নিশার কোন দিশা—আর কাজল কেশের অন্ধকার থেকে জানায় শ্রাবস্তীর সন্ধ্যায়—প্রিয়ার আকুতিভরা মধুর আহ্বান।

লজ্জার যে ব্যাপক প্রকাশ যুবতীর মাধুর্য্যকে মহিমান্বিত করে সুন্দরের মুক্ত অঙ্গনে—তারই প্রতিরূপ এই মধুর যৌবনান্বিতা মীরা রায়। শুধু লাজ-শরমিতা নয়, একটা ঐতিহ্য বোধ জুড়ে বসেছিল তার দেহ-মন আবরিত কোরে। তাই 'ভালবাসা একটা আর্ট' জেনেও ঋতুর রঙ্-বাহারে নিলাজ সুখের মন উচাটন অবস্থায়ও পারে নি প্রিয়তর শৈলেনের বুকেতে নিরাভরণার নিরাবরণা আলিঙ্গনে খুশীয়ালিনী হোতে। মীরা এমন একটি ব্যক্তিত্ব নিয়ে ফুটেছিল আর দশ জন সুবিনীতার চাইতে আলাদা ভাবে, যার সুসংস্কৃত রূপ মনে করায় —মীরার মঙ্গল অবস্থার অধর রাঙানো হাসি শৈলেনকে বোঝাতে পারে নি—ওরই মুখের লাল দাগে সাজানো আছে প্রিয়র অধরের জন্য কুসুম-মালিকা। অপাঙ্গে ভঙ্গিমা ছড়িয়ে ইশারায় বলতে পারে নি মীরা রায়—শৈলেন যেন তার মধ্যবিত্ত কৃষ্টির সরল সহজ সুরের জৌলুসে বাড়িয়ে দিয়ে যায় আনন্দ্য; মীরার চঞ্চল-রূপসী বুকের রাঙা আঁচলের উর্মিতে জাগা—স্নিগ্ধ এ্যারিস্টোক্রেসিকে। কিন্তু মীরা তা প্রণিতা হোয়েও বলতে পারে নি আরতির দীপায়নে। আর শৈলেনও তার গরিমার ছন্দখানাকে নির্বাক নিথর করাতে চায় নি বুকের বন্দিনী করার খুশী থেকে। মিলনের সপ্তপদ পরিক্রমায় অভিষিক্ত তারা হোল না। অবশ্য তা হোল না বরপুরুষের সক্রিয়তার অভাবে নয়। অভাব এসেছিল মীরার আন্তরিক লাজুক মানস থেকে। ও বুঝতে পেরেও অবুঝতাকেই ঝরিয়েছে। যদি বুঝতো—

"মন্ মী গোয়াম্ কে আব-ই-আঙ্গুর খ্‌শস্ত্।
ই নগ্‌দ্ বে-গীর, ব দস্‌ৎ আজ আঁ নসিয়াহ্ বে-দার্,
কে আওয়াজ-ব-নহল্ বরাদর আজ দূর খ্‌শস্ত॥"

সত্যি মীরার মনের লাজ আবরণ বুঝলো না,—এ আঙুরের যে রস, তারই রভস্ সব চাইতে তৃপ্তিকর। বর্ত্তমানে কাছে যা পাওয়া যাচ্ছে তাকেই ভোগ

টানো। অমন আশার ভাবী দান থেকে হুশিয়ার থেকো। কেন না সুদূর থেকে ভেসে আসা ঢোলের শব্দ শুধু মধুর লাগে শুনতে। আর বই অন্য কিছু নয়।

সত্যি মীরা রায় প্রেমের প্রতিদান সম্পর্কে খুব বেশী সজাগ থাকতে পারে নি। হাতের মুঠোয় শৈলেনের আতপ্ত করকমলের বাঁধন পেয়েও,—আপন স্নিগ্ধতায় তাকে মধুরিম করাতে পারল না।—অবশ্য শেষ দরবারে যুবতীর ঝিলিমিলি অঙ্গরাগের সুষমায় মীরা রায় তার মানসদ্বন্দ্বের সমাপ্তিতে ভুলে যেতে পেরেছিল আপন ঐশ্বর্য্যের বৃথা অহমিকাকে,—আর একবার দেখিয়ে গেল নারীর মধুরা প্রেমারতির বহুত মিনতির অভিজ্ঞান এই "নীলাঙ্গুরীয়ে"র মধ্যে। এ অভিজ্ঞান দেহী নাম পেল না; যেহেতু তার বরপুরুষের তৃষ্ণা জড়ানো অধরে এঁকে দিতে পারল না মীরা কোন দিন—আপন অধরের সিক্ত রেখার লাল আল্পনা। যা সে চিরতরে নিজেকে শেষ কোরে দিতে পারল,—তার নাম মন। আরো গভীরে যাব ব্যাখ্যা,—সহৃদয়া মানসবিহারিণী। "শেষের কবিতা"র লাবণ্য এদিক থেকে তার সহোদরা ও পূর্বতনী।—শ্রীরাধার অন্তরঙ্গ বিকাশস্বরূপ আরাধনার রূপাভায় ফুটেছিল মীরার শৈলেনের প্রতি করা সলাজ মধুরতার ব্যবহারে।

হাসি আর অশ্রু, নয় তো, হাসিরই অশ্রু হঠাৎ দোলনের কাঁপনে এলোমেলো করে দিয়ে যায় মানুষের মনের আকৃতি, মিনতি আর প্রণতির রূপকে। সে কথাকে কিন্তু আমরা কখনো ভাবি না,—যেহেতু একটা ধানের শিষের ওপরে সকালের সোনা ঝরা রোদ পড়ে চিকচিক করা একটা শিশির বিন্দুর সৌন্দর্য্য দেখে চোখের তৃষ্ণাকে মুগ্ধ করাতে চাই না,—সময় পাই না নামক অজুহাতটি দেখিয়ে।—কিন্তু জীবনরসের গূঢ়তম রহস্যলোকের রসিক আর জহুরী বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব বা অরিজিনালিটি এই এর মধ্যেই পরীক্ষার নিরীক্ষায় আছে আবিষ্ট, মন্ত্রমুগ্ধ। রাণু তাঁর মনীষা আপ্লুত-স্নেহাভিলোকেতে ছুঁইয়ে গেছে ছোট ছোট ভাবদ্যুতির যাদুময়তাকে। শিল্পীর হাতে ওর অবস্থান যেন—'magic wand'. শিশুর শিশুত্ব সত্যি ছোট্ট মেয়ে রূপে "রাণু"দের মধ্যে সকল বয়েসের বয়েসীদের চোখে নিজেদের কোরে রাখে—যাদুকরী।

রাণুকে তাই ভোলা শক্ত বাঙলা সাহিত্যের পাঠক রূপে দুটি কারণে—একদিকে স্রষ্টা-শিল্পীর ব্যক্তিত্বকে, তারই অনিন্দ্য রচনার ছান্দসী রূপরীতিকে,—আরেকদিকে যে চিরন্তন প্রভায় নারী কিশোরী থেকে যুবতী হোতে চায় অনেক দিনের প্রতীক্ষার সাধনায়, আর সংযমের পরিমিতি বোধেতে—মা ও

ঠাকুমার দেখাদেখি,—সেই সাধারণ হোয়েও অসাধারণ অনেক কিছুতেই বাণু বোঝাতে পেরেছিল—ও হোল ভবিষ্যতের 'Eternal Woman.'—আরেক মনীষী-লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় যেখানে পূর্ণ যৌবনের আলয়ে সবুজাভা ছড়ানো যুবতীর খুশীয়াল জীবনদর্শনেতে আপন মনীষার রূপকল্প আরাধনাকে রাঙাতে পেরেছেন চিরন্তনী বরবর্ণিকার ব্যঞ্জনায় উজ্জয়িনী, শ্রীমতী গোরী, সুরুচি মায় মালার 'সুখে'র অন্বেষণে—ঠিক সেখানের আরো আগে থেকে পথ-পরিক্রমণে বেরিয়েছিলেন রাণুকে নিয়ে শিশু-কন্যাদের দেশেতে আপন স্নেহার্তির দীপায়নে—এই রসেরই অনিন্দ্য পূজারী—বিভূতি মুখোপাধ্যায়। এই ছোটদের ধ্যানে যে ব্যাপক সত্য বড়দেব মনকে আনচান কোরে তোলে, তার মূলে এই রাণুর শিশু-মানসিকতার ভেতরেই দেখতে পেয়েছি এটা চিরন্তন যে, ছোট্ট বলেই ছেলেদের মানস বিকাশের আগেই ওরা মানে রাণুরা সহজাত রীতি থেকেই হয়ে ওঠে—আপনার স্ত্রীভূমিকা সম্পর্কে সচেতনা।

ভালোবাসার ভাবকুট্টিম-রূপ 'অভিমানে' অভিষিক্ত "নীলাঙ্গুরীয়ে"র ক্ল্যাসিক-শিল্পী বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের এই "বাণু" রমণীর রমণীয় মনবিতানের আকৃতির সুখনির্ঝরিণী রূপে ফুটেছে চিরকালের প্রতিভূতে। যদি বলি প্রাকৃতিক নিয়ম ছাড়াও,—একটি ছোট্ট মেয়ে দুষ্টুমিতে পাগলপারা বন্যার তাণ্ডবে মাতোয়ারা থেকেও একটি ছোট্ট ছেলের চাইতে মাত্রাধিক্যে খুবই হয়ে ওঠে বোঝদারনা, সংবেদনশীলা আর তীব্র অনুভূতিসম্পন্না—তা হোলে পর অত্যুক্তি কিছু করা হবে না।—তাই দেখেছি জীবনরসবিদগ্ধ বিভূতি মুখোপাধ্যায় তাঁব মনীষা-রাঙা স্বকীয়তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়টিকে সুলিপিকাবদ্ধ করাতে পেরেছেন এই রাণু নামে মেয়েটির দুষ্টুরাঙা দুনিয়াদারির ভেতরে ও আরো অনেক ছোটদের জগতের মস্ত সমস্যা 'প্রথম ভাগে'র শেখার ব্যাপারটুকু নিয়ে যে টানাপোড়েন তোয়ের হয়ে ওঠে,—তারই স্নেহার্তি-ঝরা আলাপচারিতায়। সত্যি রাণু তার মেজকা'র জীবনে প্রথম ভাগ শেখার মতই সমস্যার সূক্ষ্ম মন-বিশ্লেষনে টেনেছিল ছোট্ট মেয়ের অন্দরমহলে—যেখানের ঘুমিয়ে থাকা ভাবী যুবতীর প্রতিটি মধুরারেখাঙ্কনই প্রজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়েছিল। সত্যি, আমরা জানি আর বুঝেছিও,—আজকের এই সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে দাম্পত্য-জীবন-মানসিকতার অরূপরতন হাসি আর কান্নার সংযুক্ত লেখমালার রূপদ্রষ্টা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা ফুল্লকুসুম বিলোলতার শতদলে উন্মোচিত হয়ে উঠেছে, সবুজ মনের যুবকের প্রতি আশ্লেষে থিরা বিজুরিকা গোরোচনা যৌবনান্বিতার পলাশ-রাঙা সুখের গমক আর খুশীর

মিলন। তাঁর সাহিত্যায়ন সুরেলা মুখর না হোয়ে পারে না রাজপুত্রের জন্ম অন্বেষণে ত্রিযামা রজনী অবধি অবিচলিতা রাজকন্যার জাগরণী সত্তার রণনে। —আমি বলব, এই পৃথিবী এক প্রীতির ভুবন.—এই পরিচয়ের রূপস্রষ্টা রাণুর মধ্যেই তাদের যৌবনের রহস্য-সমাচ্ছন্ন স্বরূপকে আবিষ্কার কোরেছিলেন।—তাই আন্তর্জাতিক অনুরণনে মশগুল হৃদয়ের আর্তির রঙে প্রগাঢ় রকমে ঝলকানো এই "রাণুর প্রথম ভাগ" গল্পটির ছোট পরিধিতে পরিব্যাপ্তির অসীমতায় তা আন্তর্জাতিকই হোয়ে উঠেছে। অবশ্য মনে রাখতে হবে, আন্তর্জাতিক হোতে হোলে যে তার কাহিনীর মধ্যে আন্তর্জাতিক সমাজের হরেকরকম পাত্র-পাত্রীর অবস্থানকে ঘটাতে হবে—তার কোন বিধি-নিষিদ্ধ কারণ নেই।—মানুষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির হৃদয়সর্বস্বতাই হলো এক অনামধেয় আন্তর্জাতিকতারই অনুভবনীয় রসাবেশ। গল্প রূপে "রাণুর প্রথম ভাগে"র শ্রেষ্ঠত্ব সেখানেই।

রাণু তার এই নায়ক-হীন গল্পে একমাত্র নায়িকা,—সেই সঙ্গে—দুষ্টুমির রাণী; কিন্তু ওর মেজকা'? তিনি শুধু স্রষ্টা,—ছোটদের জীবনরহস্যের ওপরে স্নেহার্তির সোনার কাঠির ছোঁয়াচে তাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন নীল পাখীর দেশের রূপ-কন্যার মতোই। কথায় বলে, অপরকে বুঝতে হোলে মনে প্রাণে তারই সাথে নিজেকে করাতে হবে—একাত্ম। দম্পতিরা যেমন সুখের খুশীতে স্বাভাবিক কানুনেই হোতে চায়—To be one soul.—ঠিক এমন সম্পর্কটাই ছিল মেজকার সঙ্গে ভাইঝি রাণুর। তাই মেজকা প্রথমে না জানিয়ে পারেন নি যে,—"আমার ভাইঝি রাণুর প্রথম ভাগের গণ্ডি পার হওয়া আর হইয়া উঠিল না।...তাহার ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের পরবর্তী ভাবী নারীত্ব হঠাৎ কেমন করিয়া যেন ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে আসিয়া পড়িয়া তাহার ক্ষুদ্র শরীর মনটিতে যেন আর আঁটিয়া উঠিতেছে না। রাণুর কার্যকলাপ দেখিলে এই রকমই একটি ধারণা মনে উপস্থিত হয়। প্রথমত, শিশুসুলভ সমস্ত ব্যাপারেই তাহার ক্ষুদ্র নাসিকাটি তাচ্ছিল্যে কুঞ্চিত হইয়া উঠে।—খেলাঘর সে মোটেই বরদাস্ত করিতে পারে না, ফ্রক-জামাও না। মুখটা গম্ভীর করিয়া বলে,—আমার কি আর ও-সবের বয়েস আছে মেজকা?—বলিতে হয়, না মা, আর কি, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকল।"

শিশুর যে মনঃতত্ত্ব বেড়ে ওঠে সরল সহজতার জগতকে আলোড়িত কোরে—তা আধুনিক যুগে বড়দের দুনিয়াদারির ভবিষ্যৎ রূপগুলোকে অনেকাংশেই

ার্ধারিত করার চাবিকাঠিটি হয়েই ওঠে। বড়দের জগৎ তালা-বন্ধ লৌহ-বাক্সের
ভতরকার রহস্যের মতোই হলো—কাঠিন্যে কঠোর। আর তার মধ্যে
টিলতাপূর্ণ কোন রকম আবিলতা না থাকলেও। বোধ হয়, শিশুর রুমঝুম মনের
রেলা সহজতা তার এই অর্গল তুলে রাখাকে মুক্ত করায়,—এই পৃথিবীর প্রীতি
ার স্নেহের জৌলুসে রাঙিয়ে। নাচিয়ে। ওরা শিশু পরিচয়ে যে সব দুষ্টুমি করে
ড়দের অনুকরণপ্রিয়তায়—তাকে ভুল বুঝলে চলবে না,—যেহেতু দেশে-বিদেশে
শিশু-মনঃস্তাত্বিকরা বহু সমীক্ষার শেষে বলতে পেরেছেন—শিশুর দুষ্টুমির মধ্যেই
াছে তাদের অনাগত ভবিষ্যতের—গড়ার স্বপ্ন আর তার সংগ্রামী স্বরূপ।
ম্রিস্ মেটারলিঙ্কের "ব্লু বার্ডের"র টিলটিল আর মিটিল শিশুর সত্য মর্যাদার্শে
াকে অনেক কিছুর রহস্য উন্মোচনে যে রকম উচ্ছলে সংগ্রামী হোয়ে উঠেছিল,
-তা বড়দের মনকেও দারুণভাবে আলোড়িত না কোরে স্থির হয় না। শুধু
রা কেন, ছোট্ট এলিস্ কি কম বিস্ময়ের মায়ালোকে ভরায় নি বড়র মনেতে?
ার ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসি? তার পদ্মপাতার জলের মত ছোট্ট জীবনের
'তিচ্ছবির ভেতরে যে অনিন্দ্য শিশু-জীবন সম্পর্কে কবিকল্পিত সাংকেতিকতা
ভারে উঠেছিল, তার মূল্যও কি অমূল্য নয়? আর তা অতি স্বাভাবিক অনেক
চছু বলেই ও সবের মূল্যায়ন যুগ অতিক্রম কোরে আজ চলে এসেছে।—কিন্তু
বার চাইতে বেশী কাছের জানার আর বাস্তবের বোঝার মঞ্জুষারূপ নিয়ে ফুটেছে
াভূতি মুখোপাধ্যায়ের—রাণু! শুধু কি তাই, চিরন্তন নারীর ভাবদ্যোতির
াালিম্পনে সে তার শিশুত্ব নিয়েই মেজকা'র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেও সুন্দর
ানসিকতার রণনে ভরিয়েছে। রাণু যে বড় বেশী বাস্তববাদিনী, কেন না ও
া শিবের শক্তি উমার আদর্শের মায়ারঙে সেজে উঠেছিল "মডিফায়েড গৌরী-
ান" প্রথায় সত্যি একদিন এক "দীপ্তশ্রী কিশোর বরের পাশে পট্টবস্ত্র ও
ালঙ্কার পরা, মালা চন্দনে চর্চিত" অবস্থায় গোত্রান্তরিতা হবার জন্য। ওর
নের উমা-স্বরূপ—অভাবনীয় সরল রোমান্টিকতায় নাচিয়ে তুলেছিল পাকা
হিণীর মত মেজকার অবিবাহের ইচ্ছাকে ভাঙ্গাবার জন্য—যা দেখলে পর
াই রাণু সম্বন্ধে একটি কথাই বারে বারে মনে পড়ে,—এ হেন রাণুরাই একদিন
বদিশার নিশা ছেড়ে শ্রাবস্তীর সন্ধ্যায় পূর্ণ যৌবন নিয়ে এলোমেলো, আর
অগোছালো এবং শ্রান্তিতে তাপিত যুবকদের জন্য সিঁথির ওপরে লাল পরাগ
াঁকে শ্রীরাধারই মত আরাধনায়, অনুরাগের সাত রঙে শান্ত করাবে, গোছাবে
মার নম্রতায় সাজাবে।—তাই ছোট্ট রাণু বাড়ীর মা-ঠাকুমার দেখাদেখিই বিবাহে

অনিচ্ছুক মেজকা'কে বোঝাতে ছাড়ে নি—"রাণু বিমর্ষ হইয়া ভাবে। বলে, আমরা সব বলে বলে তো হয়রান হয়ে গেলাম মেজকা যে, বিয়ে কর, বিয়ে কর। তা শুনলে গরিবদের কথা? রাণু কি তোমায় চিরদিনটা দেখতে শুনতে পারবে মেজকা? এর পরে তার নিজের ছেলেপুলেও মানুষ করতে হবে তো? মেয়ে আর কতদিন নিজের বল?··· তোতাপাখির মত, কচি মুখে বড়োদের কাছে শেখা বুলি শুনিয়া হাসিব কি কাঁদিব, ঠিক করিতে পারি না।"

বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যে রাণু ঘুরে ফিরে এসেছে পরোক্ষের শিশুরূপ-চেতনার ধাপে ধাপে ক্রমবিবর্তিত অন্যান্য কয়েকটি প্রধানা নারী চরিত্রের যৌবন ধর্মেতে মঞ্জুল করা রীতির ঋতায়নে—আর ঋতুর প্রজায়নে। প্রথমেই মনে পড়ে ক্ল্যাসিক-সৃষ্টি "স্বর্গাদপি গরীয়সী"র গিরিবালার কথা। এটা আমার কল্পনা নির্ভর রূপচিন্তা থেকে জানাবার লোভটুকু ছাড়তে না পারার জন্য জানালাম। কল্পনা শতাংশে সত্য—এ কথা সর্বদেশে সর্বজনে স্বীকৃত। একটি নারীর জন্ম থেকে মৃত্যু—তার মধ্যে যে বিরাট প্যানোরামিক্ পটভূমি তোয়ের হয় শুধু সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে—তা সকাল থেকে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত জীবনের জয়গানকে কোরেছে মুখর গাথা। জননী-বধূ-প্রিয়ার ত্রয়ী রূপ ফুটেছে গিরিবালার মধ্যে। তাঁর নারীজীবনের উন্মেষে রাণুর সপ্রতিভা সহাস রূপটুকু তাকে সুন্দরতায়, আর শ্রীময়তায় সুনিকেতা কোরেছিল। রূপ-পিয়াসী এই রসস্রষ্টার চারিটি অনিন্দ্যা রোমান্টিকা যুবতী-চরিত্ররূপে "নীলাঙ্গুরীয়ে"র মীরা রায়—"উত্তরায়ণে"র সরমা —"নবসন্ন্যাসে"র চম্পা আর "নয়ান বৌ"এর নয়ান, এই প্রত্যেকেরই ওপরে রাণুর স্বভাবজ বিকাশে যে সুরেলা রীতির যৌবনায়ন কল্পনা করা যেতে পারে প্রিয় প্রসঙ্গ প্রেমের জন্য পুরুষ-প্রতিমের সমীপে করা আলাপচারিতায়—তা-ই ওদের পরোক্ষে কোরে তুলেছিল রূপানুরক্তা, বিলোলিতা, দুষ্টুমিতে হিল্লোলিতা। "নীলাঙ্গুরীয়ে"র অম্বুরী ও "মিলনান্তকে"র অরুণাও রূপে-অরূপে উমা-স্বরূপিণী রাণুর মৃদুল ছন্দে ছিল দোলায়িতা। মনে মঞ্জুলতার মায়াঞ্জন ছাপ দিয়ে যায়, যখন বুঝি ওরা প্রত্যেকেই নারী,—সেই সঙ্গে নারী-রত্ন। তার মানেই হলো, গ্যেটে যাদের নারীরূপে "ইটার্নাল্" বলে অভিনন্দিত কোরে গেছেন—এই এরাই হোল তারা। আর তাই, তারাই হোলো রাণুর হারিয়ে না যাওয়া রেশ। রাণু যে উমা-স্বরূপা ছিল, শিবকল্যাণের তাপসী পরিচিতিতে। ওরাও তো পরিচয়ে আপন আপন স্রষ্টার প্রখর ব্যক্তিত্বধর্মী অরিজিনালিটির রূপরসজীবন সচেতনতায় পুরুষ সমীপে আপন আপন নারী মনের অশেষ সুষমার রিমঝিমানিতে সাহিত্যের

আর বাস্তবের নায়িকা রূপে মণিমঞ্জুষায় আকুল কোরে রেখেছে। ওদের শৈশবের কাহিনী সেখানে না থাকলেও,—বলতে বাধা নেই, ওদের প্রত্যেকেরই ভিতরে এক একটি ছোট্ট নায়িকা নিশ্চয়ই সুপ্ত ছিল। আর অনামধেয় কালের কপোলতলে তারা প্রত্যেকেই ফেলে এসেছিল এক একটি ছোট্ট মেয়েকে—যাদের সে পরিচয় আমরা পাই নি প্রথম ঝলকেই কাহিনীর সঙ্গে মনের চোখাচোখিতে। যা দেখেছিলাম, তা শ্রাবস্তীর সন্ধ্যার অরুণিমা রাঙানো বর্ণবর্ণিকাদের ভরা যৌবনের সবুজ বাঁকে বাঁকে ঝলমলানো অজন্তার ছান্দসী শিল্পশোভায় সালঙ্কৃত অরূপরতনের কথাগুচ্ছ।—তবু, না ভেবে পারি নি, প্রত্যেকেরই মধ্যে স্বাভাবিক ছন্দের মিলেতে রেশ নিয়ে ফুটেছিল চিরন্তনীকা সেই ছোট্ট মেয়েটি—যার নামকরণ কোরতে হোলে কোরব—'রাণু'!—আর সেখানেই রাণুর সার্থকতা ফুটে ওঠে চিরসত্যের আধারে এক আন্তর্জাতিক অনুভূতির রসাবেশেতে। তাই আধুনিক জীবনরসের রসিক রূপবিদগ্ধ বিভূতি মুখোপাধ্যায় বারে বারে পরোক্ষে রাণুকে সাহিত্যায়নে না নামিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। কেন না এ ভাবের বিভাবটি একেবারে তাঁর স্বকীয়। তাই অননুকরণীয়। এ ভাবে নেই কোন আবিলতা। অসূয়া। স্বার্থপরতা।—যা আছে তা স্থির বিজুবিক গোরোচনা রূপ।—আছে তা রাণুর এই হারিয়ে না যাওয়া উমা-স্বরূপেতে।

•

যৌবনের নিখুঁত রূপায়ণকে অনিন্দ্যতায় সাজিয়েছেন মণীন্দ্রলাল বসু—যার সৃষ্টিকলার মানস যোগাযোগ ঘটেছিল দূর-সুদূরের অন্য কোথা, অন্য কোনখানের বিচিত্রা ভবনেতে খুঁজে পাওয়া প্রণয় আর পরিণয়ের সীমারেখাতে। রূপকথার দেশের আছে যে যৌবন-সৌরভ, তার কোনদিনই ম্লান হবার উপায় নেই। ওর রঙ সঘন সবুজ—যখন সে একা নর রূপে, কি নারী রূপে। কিন্তু যখন তারা নির্জন নিঃসঙ্গতাকে ছেড়ে দুই হয়—আরতির সুখলোভী লগ্নে যুবক তার পীনোদ্ধ আলিঙ্গনে আর চুম্বন-বৃষ্টিতে বেপথুমনা করে তারই যুবতীর মধুরা আর সুষমাভরা দেহের, আর মনের আরাধনাকে—তখনকার যে চিরন্তন রূপকথা প্রজ্জ্বল হয় কল্পনার রেখায় রেখায়, তারই আবীর রাঙা প্রিয়কথার অন্তরে, বাইরে সাজানোর মধ্যে ছন্দবদ্ধ হয়েছে "রমলা"তে। সর্বোপরি "জীবনায়নে"।

"রমলা"—এই নামের মধ্যেই রয়েছে অশেষ আর অনাবিল সৌন্দর্য্যের একটা মৃদুল দোলা। বেঠোভেনের কোন একটা সিম্ফনি যেন ওর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে

জড়ানো আছে।—প্রথমেই মনে পড়ে এর কাহিনী যেন সাধারণ প্রেমকথ
একঘেয়েমিতাকে অনেক পেছনে ফেলে এমন একটা সুন্দর জীবনের পথে
ইশারা কোরেছে—যেখানে বাস্তবের হোয়েও সুখ-দুঃখগুলো জীবনের বি
প্রেমকে বিন্দুমাত্র ম্লান করাতে পারে নি।—বাঙলা সাহিত্যের আধুনি
ধারায় দেখা যায় কাহিনীতে প্রেম থাকলেও যে তার জন্য দু জন মানুষকে কা
আসার একান্ততায় পরিণীতা হোতেই হবে—এমন কোন রীতি মানতে
বিরোধী। কথারূপ হিসাবে ওর অস্বীকৃতি শিল্প হয়ে উঠলেও, আমার ম
হয় সমাজের একটা 'রিলিজিয়াস্ রিচুয়ালকে'ই প্রাধান্যহীন করা হয় এভাবে
ইংরেজ যাকে 'স্পাউজ' বলে বন্দিত কোরেছে, বৈষ্ণব যাকে বলেছে 'বঁধু
সমাজের সেই প্রিয়মধুর দম্পতিরূপ, আর Conjugal love—আধুনিক ব্যা
মানসের কাছেও একটা চরম প্রকাশ হয়েই আছে। এদের যে প্রেম, তা
বলব—বিবাহিত। পলাশের মতই ঋতু-সম্ভার ওদের ক্রমবিকাশে দেখা দে
রঙে-রসে-রভসে।—যৌবনের সুদক্ষ কথাশিল্পী মণীন্দ্রলাল বসু তাঁর এই অনি
কথারূপ "রমলা"র জীবন-রসবিকাশের ধারায় মূলত রজত রায় ও রমলা রা
স্ফূর্ত প্রাণের লাল রঙ্ ছোপানো যৌবনেতিহাসের রূপ-রেখায় একটা ইটান
যৌবনরাজ্য গড়েই তা এঁকেছেন;—যা রজত-রমলারই যৌবনায়ন।
"রমলা"র কথাযানে চড়ে চিরকালের দুটি সবুজ প্রাণের দম্পতি পরিচয়
শোনাতে পারবে—"নূতন করিয়া লহ আর বার চির পুরাতন মোরে,/নূ
বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবন ডোরে।" এ যে শুধু ভালোবাস
ভালোলাগা কথা নয়,—এ যে ওদের পারিজাত কাননে সম্পন্ন "wedlock"-এ
কথা। পরিণয়ের সুরীতিমুখর ঋতু-সম্ভোগে ও যে মধুরা রতির রাগবিচিত্র
কথা। প্রেম—তৃষিতের মনে যে কোন মুহূর্তে জাগতে পারে,—পথে কি পথ
প্রান্তেও। কিন্তু তাই বলে সব সময়ে সে প্রস্তুত নয় বাধা মানতে—পরিণয়ে
শুভ-পরিক্রমায়। সমাজে এটাই শ্রেয়,—প্রিয় প্রেমের পূর্ণতারই জন্য। অ
দুটি প্রীতিবিভোর জীবনের বিযুক্তি থেকে ক্রমান্বয়ে যাত্রা করা—সংযুক্তি
মিথুনরূপের জন্য। —সত্যি ভালোবাসার পরবর্তী পর্য্যায়কে বিবাহের পরি
সুতোয় বুনোন করা হয়। প্রেম না হওয়ার আগেই সংগঠিত বিবাহের সংখ্যা
বেশী। আর তার পরে জাগে যে দাম্পত্য-প্রেম, তাকে আর সংশয়
সংকোচের আড়ালে আড়ালে সাবধানীর মত চলতে হয় না,—যেমনটা
অপ্রতিরোধ্য ভাবেই 'লাভ্ এ্যাট্ ফার্স্ট সাইটে'র বেলায়! ওখানে বন্ধন নে

আছে তা একটা ছাড়া ছাড়া ভাব। কিন্তু বন্দী-সত্তায় আসা যুগল-প্রেমের তিরাও যে একরকম রহস্য ঘেরা মুক্তির স্বাদকে মধুর কোরে তোলে, বুঝি কোন জুড়ি নেই। তা এক কথায় অনন্ত। তা সুন্দরতম।

প্রাক্-বিবাহ আর বিবাহ-পরবর্তী—এই দু' ধারারই যৌবন-স্নিগ্ধতা তার ঝরার কলতান সমেত ভালোবাসার প্রগাঢ় রভসতাকে নিয়ে দাঁড়িয়েছে লা"র মধ্যে। সহজেই এর আখ্যানকে প্রণয়ের আগে ও পরের—উভয় তেই আলাদা করা যায়। আশা, নিরাশা, দুঃখ, অনটন, অসূয়া, ভুল ঝাবুঝি, রোমান্টিক সুখ, তৃপ্তি—কত ভাবেই না তা প্রেমের মানুষের ওপরে স্তু, শ্রান্তির অনুভবে ভরিয়ে তোলে এক অনামধেয়া প্রকৃতিকে।—ওখানে উই বোধ হয় সহজে পরাজয় মানে না—প্রেমিক বলে। সর্বোপরি নিলাজতার ধুরিক দম্পতি বলে। মণীন্দ্রলালের "রমলা" তাকেই তুলে ধরেছে সাহিত্যের রে, গভীরতম কল্পনার সংগঠনায়।

দম্পতির মিষ্টি মনের চুম্‌কিলতার রাগে. অনুরাগের দরবার-মহল ঝিকি-কে রূপকথার দেশের অটুট যৌবনের ঝিলিমিলি ছড়িয়ে ছড়িয়ে শুধু লজ্জাহর শুচিতার জীবন-দর্শনে মানুষের পরিণয় সুরীতিকার কয়েক হাজার মধুরাতির ল হোয়েই প্রস্ফুটিত মণীন্দ্রলাল বসুর এই কথারূপ। যত কিছু এর মাধুর্য্য, সুখ সৌন্দর্য্য আর সলাজ জগতের ঔদার্য্য আর প্রিয়তম পরিণীতের জন্য মর প্রেরণায় দেওয়া প্রিয়ার সাহচার্য্য—সে সব কিছুরই গরিমায় অশোকের লালে লাল রূপাভায় আবরিতা হয়েছিল বধূ রমলা রায়। নারীর চরম প্রকাশ, তীর দোদুল পুলকের ছর্‌রা ভরিয়ে ইন্‌জিনীয়ার যতীনের ভেতরকার নীরস গতে কবির কবিতার মতো নরম ছোঁয়াচ্ দিয়ে জাগাতে পেরেছিল পুরুষের থাকা যৌবনাচারের আলাপচারণ,—বোঝাতে পেরেছিল যুবক-স্বভাবকে লাড়িত করানোর মধ্যে, যুবতীর আসঙ্গ-রভসের না পাওয়ার অভাব কত অতৃপ্ত কোরেই রেখেছিল যতীনকে। এটা একটা মস্ত কানুন বলেই ৎতির রাজত্বে পুরুষের ঘুমিয়ে থাকা মনের অলিন্দে—নারীর জীবন যৌবন াড়িত রূপরসসৌরভ অর্জন করাতে এগিয়ে আসে। ঘুম থেকে জাগায় ত প্রথম মহলাতেই মঙ্গলার দেহী মাদকবিভোর বিহ্বলতার যৌবন খচিত ার আলিম্পন। "রমলা"র এই প্রণয়বিলাস শ্রেষ্ঠতায় দম্পতির শাস্ত্রশুচিতায় শ্রীময় নিকেতনের একান্তভাবেই হোয়েছে প্রিয়াঙ্গ স্বরূপ। কথাসাহিত্য দরিয়ার স্বভাবজ সুষমায় নিজেকে নানান বৈচিত্র্যের কারুকাজে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

মনবিশ্লেষনের ধ্যান-ধারণায় অনেক সময়েই থাকে। সমাজের দম্প
পরিচয়কে অনিকেত কোরে এঁকেও তারই মধ্যে দাঁড় করাতে সক্ষম
শিল্পলোকীয় চরম সার্থকতাকে। এ ব্যাপারে বলবার অন্য কোন কথা
থাকতে পারে না বলেই।—কিন্তু যেখানে, সমাজে দম্পতির যুগল প্রে
বাস্তবতায় একনিষ্ঠতাকে রাঙাতে পারে মানুষের সুমন—তখন সে সব কাহি
রূপায়ণে জাগা দাম্পত্য-জীবনের গণ্ডিতে নিষ্ঠার অভাব দর্শনে সত্যি
রূপ-রস-তৃষ্ণা আঘাত পায়।—সত্যি, যখন পাঠক নিজেই থাকে আদর্শবা
কাহিনীর মধ্যেও সে তখন অনুসন্ধান করে অরূপরতন আদর্শের পথে এক
প্রেমমানসের স্বর্ণালি লেখমালার। সেদিক থেকে বলতে পারি, মণীন্দ্রলা
"রমলা" প্রেমের নৈষ্ঠিক সুরীতির ছন্দ-বাঁধনে জগতের দাম্পত্য-স্বরূপ
মঞ্জুষামুখর অরূপরতন কোরেই সৃষ্টি কোরেছে। রূপদক্ষ আর প্রেমবি
যৌবনবিলাসী কথাশিল্পীর এহেন রূপ-রস-সৌরভ বিলোলিত পলাশদ্যুতির
"রমলা"র মণিকুট্টিমে ভরানো বর্ণনাবিচিত্রা হোয়ে উঠেছে—

—"তরুণ ও তরুণীর প্রথম মিলনের দিনগুলি। সে কি বিস্ময়ঘন আনন্দ
সে কি অন্ধ-আবেগময় মহারহস্যভরা। সে কি অনাস্বাদিত অমৃতের স্বাদে
মনে চির উন্মাদনা।··রজত ও রমলার প্রথম মিলনের দিনগুলি। দুই জনে
জনের মধ্যে যেন হারাইয়া গিয়াছে।··দেহের প্রতি অঙ্গ মনের প্রতি গো
কক্ষ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত কৌতুক, কত উৎসুক্য, প্রতিক্ষণে নব নব অ
ভাণ্ডারের রহস্য উদ্‌ঘাটন। কথা কওয়ায়, চুপ করায়, হাসায়, চোখের
চাওয়ায়, না চাওয়ায়, ছোঁয়ায়, না ছোঁয়ায়, বসায়, চলায়, হাতের সঙ্গে হা
বাঁধনে, কেশের সঙ্গে কেশের স্পর্শে, অধরের সঙ্গে অধরের মিলনে জগ
কোন অন্তর্নিহিত আনন্দময় চৈতন্যের সহিত দুইজনের চেতনা একাকার হ
যাইত। যে সোনালী বালুচর সন্ধ্যায় মিলন শয্যা পাতে, যে সিন্ধু মিলন
গায়, যে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের স্বর্ণছটা মিলনক্ষণ রঙীন করে, যে জ্যো
মিলন-মুহূর্ত স্নিগ্ধ করে, সব যদি শূন্যে মিলাইয়া যায়, কিছুই আসে যায় না
দুই জন দুই জনের মধ্যে অনন্ত জগত খুঁজিয়া পাইয়াছে। রমলার অমল
সমস্ত বিশ্বের চেয়েও আনন্দসৃষ্টি। অকলঙ্ক নীলাকাশের দিনগুলি তাহ
চোখের উন্মীলিত দৃষ্টি। তারাভরা রাত্রি রমলারই লজ্জাজড়িত আঁখির
পল্লবের রহস্যময় ছায়া। তাহাদের দুইজনের মধ্যেই ত পুষ্প ফুটিতে
কোকিল ডাকিতেছে। সূর্য্য উঠিতেছে। সাগর গাহিতেছে। জ্যো

রিতেছে।…মধু। মধু। বাতাসে মধু বহিতেছে। আলোকে মধু ক্ষরিতেছে। কাশে মধু ঝরিতেছে। সাগরে মধু টলমল করিতেছে। প্রিয়ার দৃষ্টি মধু ও হার বাক্য মধু। এই দেহ মধু। এই আত্মা মধু।··কোন স্তব্ধ রাত্রে হঠাৎ হইতে জাগিয়া রজত দেখিত রমলার এলায়িত নিদ্রিত দেহ—গ্রহতারা-খচিত নিঃশব্দ তিমিরবেষ্টিত আকাশের তলে এই নিদ্রাটুকু কি সুন্দর। কোন প্রাতে রমলার ঘুম আগে ভাঙ্গিয়া গেলে সে রজতের সুপ্ত দেহের দিকে চাহিয়া কিত। কোনদিন দুজনেই একসঙ্গে জাগিয়া উঠিত, সে কি সুন্দর মধুর গরণ।—দুইজনের চুম্বনে যেন পদ্মের মত প্রভাত ফুটিয়া উঠিত। দুইজনের লিত চোখের দৃষ্টি দিয়া, মধুর হাসি দিয়া দিনের আলো সৃষ্টি হইত।…রৌদ্র-াস কর্মহীন অলস দুপুরে ঘরের সব জানলা বন্ধ করিয়া শুধু সমুদ্রের দিকে জাটা খুলিয়া রাখিয়া সেই দরজার সামনে দুইজনে পাশাপাশি চেয়ারে াত।…কখনও রজত চুপচাপ বসিয়া রমলার চুলগুলি লইয়া খেলা কবিত। র রমলা স্তব্ধ পুলকের বিদ্যুতে চকিত হইয়া উঠিত। জ্যোৎস্নারাত্রে উদ্বেলিত দ্রের দিকে চাহিয়া দুইজনে পাশাপাশি বসিত। রজতের কোলে রমলা া রাখিয়া শুইয়া পড়িত।…রজত ভাবিত,—কেন একে এত ভালবাসি? কি সত্য ভালোবাসা?…রমলা ভাবিত—এই কি প্রেম? একেই কি কে বলে ভালোবাসা? না, সে আরও কিছু অপূর্ব বিস্ময়কর মধুময়?… লা রজতের কোলে মাথা দিয়া সাগরতীরে শুইয়াছিল। কুড়ানো ঝিনুকগুলো ড়িতে নাড়িতে, মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখিতে দেখিতে অতি মিষ্ট স্বরে লা ডাকিল—এই।

চুলগুলি লইয়া খেলিতে খেলিতে রজত বলিল—কি?

দুইজনে আবার চুপচাপ।··কিছুক্ষণ পরে রমলা আবার ডাকিল, এই—? লা—আচ্ছা পৃথিবীটা যদি এই মুহূর্তে এসে থেমে যেত। আমাদের বয়েস বাড়ত। জীবনের প্রতিদিন আজকের মত কাটত।…রজত—তা তো যা রমু। এগিয়ে যেতেই হবে। কৈশোর হতে যৌবনে, যৌবন হতে—। রমলা—না, বুড়ো বয়সের কথা ভাবতে আমার এত খারাপ লাগে। আমি চুল পাকার আগে মরি, যখন হাসতে গাইতে পারব না, দেখতে ভাল ব না, দুষ্টুমি করলে লোকে নিন্দে করবে—। রজত—কিন্তু আমার কাছে চিরকাল—। রমলা—না, আমি বুড়ী হতে পারব না।

তাহার গালে চুম্বনের মৃদু আঘাত করিয়া রজত বলিল—ভয় নেই…।

রমলা—যাও। আচ্ছা···। রজতের চোখের দিকে রমলা চাহিয়া রহিল।

গভীর রাত্রে রমলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিছানা হইতে ধীরে ধীরে উঠিল। রজতের কোঁকড়ান চুল নিদ্রিত মুখের দিকে স্নিগ্ধ করুণ নয়নে চাহিল। দরজা খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্নার মায়ায় ধূসর বন্ধু। সাগরের একটানা সুর বড় করুণ। আবার ঘরে ফিরিয়া বিছানার পাশে দাঁড়াইল। রজতের মাথাটা বিছানা হইতে বালিশে তুলিয়া দিল। এই সমুদ্র-গীতমুখর নির্জন বালুচরে প্রেমলীলাময় দিনগুলি ছাড়িয়া যাইতে তাহার বেদনা বোধ হইতেছিল। চোখে জল ভরিয়া আসিল। বহু বৎসর পূর্বে এক বাল্যবন্ধুর মৃত্যুতে সে কাঁদিয়াছিল। তারপর এই তার যৌবনজীবনের প্রথম ক্রন্দন। সুখ-মিলনরাত্রি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।"—

আজ থেকে দীর্ঘ চার দশকের আগে রচিত এই কথা ও কাহিনীর প্রেম-মঞ্জিল একটা ক্ল্যাসিকাল্ রসের আমদরবার হোয়ে মূর্ছনা তুলেছিল খাটি 'মভার্নিজমে'র মায়াকারাগারে। যৌবন শাশ্বত প্রকাশে চিরদিনই থাকে আধুনিক। রুমঝুম-মনভবনের অলিন্দের জাফরানি কারুকাজে ওর "প্লেজার ট্রিপ" শ্রাবন্তীর সন্ধ্যার মৃদুল দোলনে, ঝুলনের মিলনে, অলকার সুবর্ণিনীদের সুখী করায় বরপুরুষের প্রতি নিবেদিত আরাধনায়। আরতির দীপাবলীতে। এর খুশীর ঝলকে প্রীতির রীতিস্পন্দন তখন মধুরতম হয়ে ওঠে দম্পতির বসন্ত-মাদক মধু-মাসের অধিবাসে। অভিসারে। প্রজায়নে। শুধু সুখ থেকে আসে পরোপকারের মহিমাধারা—সুখী স্বামী আর স্ত্রীর খুশীয়াল যৌবন নিঙাড়িত কোরে। কোন স্বার্থের আবিলতা তাদের এমন জীবনের বাসর ঝলমলানো সম্ভোগকে ম্লান করাতে পারে না। সুখী দম্পতির সুখের রেশ তার প্রিয়ার সিঁথির লাল পবিত্রতার আভায় ছড়িয়ে যায় আরো দশজনের ভেতরে সবুজ-প্রাণের আদর্শকে পলাশে রঙীন করাবার জন্য—এই তাই-ই মণীন্দ্রলালের "রমলা"য় স্বাক্ষরিত হোয়েছে শিল্পী রজত রায় ও বধূ-প্রিয়া শুচিস্মিতা রমলা রায়কে নিয়ে। প্রণয়-বিহ্বলতার এই মাদকতা মনকে স্নিগ্ধ করায়। শ্রীময় রূপে সাজায় ভাবনার এলোমেলো অনুভবগুলোকে—নিজের পরিবারে, ও তার বাইরের সামাজিক পরিবেশেতে পর্যন্ত। এমনটা ভালোবাসার সার্থকতার জন্যই ফোটে। ভগিনী নিবেদিতা তাই বলতে পেরেছেন—"Love all transcendent, / Tenderness unspeakable, / Purity most awful, / Freedom absolute."

—তাই নম্রতা, উদারতা, পবিত্রতা, স্বাধীনতা—দম্পতির জীবনেই প্রকাশ পায় মাদকবিভোর প্রণয়ধারার মধ্যে। এ অনুভবের জিনিস। এটা হৃদয় দিয়ে ভালোবাসার মধ্যে থেকে বোঝার জিনিস। শুধু বুদ্ধির যুক্তির প্রয়োগে বোঝা যায় না। চেতন আর অচেতনে কোন প্রভেদ না রাখার মধ্যেই তার অনুসন্ধান আসে।—রমলা রায় আর রজত রায় তাদের কাহিনীতে কত গভীরে তার ব্যক্ত অবিধা ফুটিয়েছে, ভাবতে গেলে পুলকে মনের ওপরে কনক সুতোর বাঁধন পড়ে।

কি পরিজন, কি প্রিয়জন, এমন কি প্রিয়ার সবুজে পেশল দেহ থেকে ঝরা মঞ্জুল আকুতির আহ্বান—কোন কিছুই এ অবস্থায় সহজে দোলায়িত করাতে পারে না—আত্মপ্রেমিককে। কেন না তেমন কারুর কাছে,—যানে এই তাদেরই স্বরূপে "জীবনায়নে"র অরুণের মধ্যে দেখেছি,—self comes first,—তাই ঠিক-ই বলে এমন আত্মপ্রেমিকের মধ্যে প্রাধান্য পায়—নিজেকে নিজেই খুশী কোরে রাখবার অভিলাষটুকু। এতে ভালো আর মন্দের বিচারে, দুটোই হয়। ভালোর দিকে হয়ে বলতে পারি,—এ থেকে অনেক জটিল বিষয়ের সুরাহা হয়ে যায় ভাবনার দূর-সুদূরের চিন্তায়নে, আর দর্শনের অভিনিবেশে। তাই সঠিক বলে, নায়ক-সুজন অরুণ ঘোষ বয়েসের যৌবন-ধ্যানাঙ্কিত ভাবনার কষ্টি-পাথরে যাচাই কোরতে পেরেছিল নিজেকে। নিজেরই উজ্জ্বল যৌবনকে। যুবকের খুশীর কারণরূপে সলাজে আর নিলাজে মধুরা যুবতীকে।—সর্বোপরি যৌবনান্বিত নর-নারীর সবুজে-পলাশে ভালোবাসতে চাওয়ার রীতি ও নীতিকে। এরই ঋতায়নকে।

সত্যি বলতে কি, "জীবনায়নে"র যৌবনধর্ম তার আবেশতা নিয়ে নির্ঝরে প্রবাহিত হোয়েও,—হোতে পারে নি প্রণয়াচারের দেহসর্বস্বতায়—এক পরমার্থ আশ্লেষ। দেহের গোপন অভিসারে দেহ যখন কেঁদে ওঠে শুচি-ঝরা যৌনতার যৌবনায়নে,—ঠিক তখনই বরকন্যা উমা রায় তার সুজন-প্রিয় অরুণকে প্রেমের এক অনুভবনীয় রসলোকে টেনে এনে—করাতে পেরেছিল আত্মোৎসর্গের মধ্যে —রুচিমধুরতায় শুচিস্নিগ্ধ। প্রিয়তম অরুণের কাছে তার নারী-স্বভাবের মধুক্ষরা রূপবার্তা বহন কোরে এনেছিল—হঠাৎ দূরে সরে যাওয়া সুদূরিকার সঘন বুকের রূপমন্দিরেতে আড়াল করা—প্রণয়ের দীপবর্তিকাকে। উমা রায় তার প্রাণের আকুল করা দোদুল ভাবনায় যেন জানাতে পেরেছিল—"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, / মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

এমন ভাবে ভাবিত হোলে পর অনায়াসে ভুলে যাওয়া যায় সবুজ জীবনেতে দাগ কেটে যাওয়া প্রীতির অভাব, বিষাদ-সিন্ধুকে।—আর সেখানেই সার্থকতার অনুভবনীয় পরম অনাবিলতার মধ্যে,—এক চরম আকস্মিকের মায়াডোরে জীবনের ভাষ্য পূর্ণরূপে স্বাক্ষরিত হয়। এর অন্বয়ে আছে হাজার হাজার বছরের সুখ আর খুশীর দেশের অন্বেষণ। সত্যান্বেষণ। রাজকন্যার ধ্যানে সময়ান্তরে রাজপুত্রের জন্য নিশ্চয়ই জাগবে—যৌবনাকাঙ্খা। রতির আরতিতে ভরা প্রণয়াকাঙ্খা। রাজকন্যা তখন ঠিকই সাড়া দেবে প্রিয়র আকুতির ঝড়ে,—প্রীতির সোনালী রেখার আলিম্পনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে,—আদরের আবেশিত আহ্লাদে রিমঝিমিয়ে। যৌবনস্বপ্ন অটুট থাকবে অরুণের—তারই জীবনায়নের পথ-পরিক্রমায়—যেখানে তার ঘুম ঘুম রূপমদির জগত ঘুমিয়ে থেকেও প্রকৃতির অকিঞ্চনতার মধ্যেই রাঙিয়ে উঠবে বারে বারে। প্রতিনিয়ত।

আর উমা রায় জেগে থাকবে চিরন্তনীর সুরবিভোরতায় সন্ধ্যা-শ্রাবন্তীর আবীর রঙে আবরিতা—মুক্তোঝরার কাকলি-স্বভাবেতে। ও নেবে ও দেবে, মিলনে মেলাবে ব্যথার অমারাত শেষে—ভোরের মালতী ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। উমা রায় জীবনায়নের অন্বয়ে পলাশ-প্রতিম অরুণিমায় জ্বলবে ও জ্বালাবে একই সঙ্গে প্রিয়র খাতির জগতে—অরুণের জন্যই। সেখানে একজন গতি হারালে পর,—আরেকজনা করাবে তাকে—গতিময়। রাগে আর অনুরাগে আবেগ থেকে প্রিয়া কেড়ে নিয়ে যাবে অরুণ ঘোষের মত সুমন যুবককে। গতিবেগেতে অভিনিবেশিতা উমা রায়ের মঞ্জুল রাগলতায় ভরা সে দেহলির দিগন্ত।—সত্যি একদিন, সেদিন জীবনায়নের অন্বয় খুঁজে ফেরার সমাপ্তিতে অরুণের নিলাজে সলাজ দেহবিতানেতে অনায়াসে ধ্যানাশ্রিতা হোতে পারবে উমা রায়ের প্রণিতা হওয়া অভিসারিকা রূপ। উমা রায় যৌবনবিলাসে ছিল সুবিনীতা। সুনন্দিতা। আর সুখ-উদ্বেলিতা এক সঘন রূপের আবেশময় বর্ণনা—যা নিজের একান্ত বলে অর্জন মানসে অনিবার্য্য কারণেই অরুণ ঘোষকে কোরেছিল—ধ্যানী। আর নায়কের এমন ধ্যান-কল্পনার উচ্ছলে উজ্জল দেহমনের ঘনিষ্ঠতায় কারণ ধরেই অচিরে দোল দিয়ে যাবে—বরনারী উমা রায়ের মঞ্জুবিকচ কুসুমপুঞ্জে যৌবনান্বিত রূপরেখার বাঁকে বাঁকে লাজহর হয়ে প্রকট হওয়া—অভিসার কথার—যার জন্য একদিন "…অরুণ বলিয়াছিল, চল, কোথাও ঘুরে আসা যাক্।… উমা বলিয়াছিল, আউটিং করবার মত দিন বটে, কোথায় যাবে?…অরুণ হাসিয়া বলিয়াছিল, নিরুদ্দেশ যাত্রা!…তাহাদের

বেশীদূর যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অরুণ যখন ষ্টিয়ারিং হুইল ধরিয়া বসিল, পার্শ্ববর্তিনী উমার হাস্যের ছন্দে, চক্ষের চাহনিতে, আতপ্ত স্পর্শে তাহার দেহ-মনে গতির মাদকতা লাগিয়া গেল। বালীগঞ্জ পার হইয়া গড়িয়াহাটা রোড ধরিয়া সে মোটরকার ছুটাইয়া দিল মাইলের পর মাইল।...উমা বলিয়াছিল, আজ বড় সুন্দর মোটর চালাচ্ছ, কিন্তু কোথায় চলেছ?...Last drive together! Who knows but the world may end to-night?...আচ্ছা, কবিতা আওড়াতে হবে না, পেট্রল আছে ত?... শরতের আলোভরা অজানা পথ দিয়া বহুক্ষণ মোটরগাড়ী চালাইয়া কয়েকটি গ্রাম পার হইয়া, তাহারা এই প্রাচীন ভগ্ন প্রাচীর ও পুষ্করিণীর সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছে।...গান শেষ করিয়া উমা বলিল, ক'টা বাজল বল ত?... অরুণ—সৌভাগ্যক্রমে সঙ্গে ঘড়ি নাই, আর গাড়ীর ঘড়িটাও বন্ধ।...উমা—বেশ দেরি যখন হয়েছে, নিশ্চিন্ত হয়ে বসা যাক্। চারিদিক কি নিঝুম, মনে হয় যেন এখানে সময়ের চলা থেমে গেছে। আচ্ছা অরুণ, তোমার কবিতা পড়ে শোনালে না?...অরুণ—শোনাব।.. উমা—আর কবে শোনাবে, যদি আজ সঙ্গে আনতে বেশ হত। এমনি জায়গায় বসে কবিতা পড়তে হয়।... অরুণ চুপ করিয়া জলের ছায়াগুলির দিকে চাহিয়া রহিল।...উমা হাসিয়া বলিল, একটা ঢিল দাও ত, আমি আর উঠতে পারছি না, বেশ আরামে বসেছি।...অরুণ--ঢিল কোথায়, দেখছি না, কি করবে?...উমা—জলে ছুঁড়ব, আচ্ছা, একটা কেক দাও।...উমা একটি কেক লইয়া পুষ্করিণীর স্তব্ধ জলের মধ্যভাগে ছুঁড়িল। স্থির জল কাঁপিয়া উঠিল। একটি ক্ষুদ্র জল-তরঙ্গ বৃত্তাকারে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া তীরে আসিয়া আঘাত করিল। গাছের ছায়াগুলি কাঁপিতে লাগিল।—দেখ, অরুণ, কি সুন্দর দেখায়। ছোটবেলায় আমরা ভাঙা-কলসীর টুকরো নিয়ে খেলতুম। জলের ওপর ব্যাঙের মত লাফিয়ে যেত।...অরুণ—জলটি ছিল শান্ত, স্থির, আয়নার মত। তুমি দিলে কাঁপিয়ে, গুলিয়ে। শান্তি বুঝি তোমার সয় না?...উমা—ঠিকই ত। আমরা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবার জন্যই ত জন্মেছি। শান্তি নয়, জীবন চাই।..."

রূপদক্ষ মণীন্দ্রলাল বসুর যৌবনবিলাসী মনের দুই পৃথক ধারার সাহিত্য-সৃষ্টিরূপে "রমলা" আর "জীবনায়ন" সবুজ আদর্শের স্বর্ণালি লেখমালায় হোয়ে আছে বাঙলা কথাসাহিত্যের—সুষমাস্নিগ্ধ ক্ল্যাসিক। অন্ততঃ শুচিস্মিতা উমা

বায় সমীপে অরুণের যৌবনের ধ্যান—প্রণয়রীতির আবেশ ঝরানোর দেশেতে, যে রহস্যময় আত্মপরিতৃপ্তির সুবেশিত যবনিকাটি টেনেছিল, তা দেখে মনের যৌবনে বাঁধা মুক্ত-দরজায় কবির দার্শনিকতাই প্রতিবেদনে বোঝাতে চায় "জীবনায়নে"র সমন্বয়ী অন্বেষণেতে।—উমা রায়ের জীবনের প্রণয়-আকুতির জগত তাই ভ্রষ্ট লগ্নের মাধুর্য্যেই রেঙে ওঠে। ও-ও যেন বলতে পারছে শ্রাবন্তীর সোনা ঝলসানো সন্ধ্যারাতির আরতি মুখর বন্দনায়—

"ফাল্গুনযামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,/দখিন বাতাস মরিছে বুকের 'পরে।
সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারী,/দুয়ার সমুখে ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী।
ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসরগেহ,/অগুরু গন্ধে আকুল সকল দেহ।
ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি/দূর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি।
রয়েছি বিজন রাজপথ পানে চাহি,/বাতায়নতলে বসেছি ধূলায় নামি—
ত্রিযামা রজনী একা বসে গান গাহি,/হতাশ পথিক, সে যে আমি,এই আমি।"

—প্রেম ও অনুরাগের ধ্যানাঙ্কিত বিদিশার চাহনিতে যে অরূপরতন দীপারতি বন্দিত হয় সুচরিতা প্রিয়ার জন্য সুজন প্রিয়র কাছে—তা ছোট ছোট ভাবদ্যোতনায় মণিমঞ্জুষা হোয়ে উঠেছে মণীন্দ্রলালের "অশোক" "অরুণ" "সুকান্ত" ও "দার্জিলিং" প্রভৃতির গল্পলোকে,—যেখানের সুমনা যুবতীরা কোন রসিক যুবকের আগমনে শোনাতে পারে,—"তুমি যে এসেছো মোর ভবনে, তাই রব উঠেছে ভুবনে"র-ই কথার ফুলঝুরিতে।—বিশেষভাবে "সুকান্ত" গল্পটি সম্বন্ধে আমি একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না অকারণ পুলকের উল্লাসে,—যখন দেখি এর ধ্যানী কথাকারের দূরদৃষ্টির অনিন্দ্য রোমান্টিকতা তাঁর কাহিনীর ঘনঘটার ভেতরে অজান্তে ভবিষ্যতের কোন এক বিদ্রোহী বাঙালী কবির নিয়তিতাড়িত জীবনবৈচিত্র্যের প্রতি আলোকসম্পাত করেছিল। এটা পাঠকমহলে সর্বজনবিদিত—যেখানে কোন বিখ্যাত কবির জন্মলগ্নের আগেই রচিত হয়েছিল—কবির আগমন-নির্গমনের প্রতি ইশারা করা রূপকল্প ধ্যান—এই "সুকান্ত" গল্পটি।—যা ঘটে, তা যে সময় বিশেষে সত্য নয়,—আর যা কল্পনায় ভাবা যায়, তাই ই যে প্রবল বিস্ময়ের মধ্যে সম্ভব করায় ভবিতব্যকে—তার স্বাক্ষর মণীন্দ্রলালের এই রচনাটি রাখতে পেরেছে।

অন্যদিকে যখন শৈলপুরী দার্জিলিঙে বর্ষা নামে, বাদুলে হাওয়ার দমকা রূপ চমক ঝরায়, বনফুলের গন্ধ সৌরভ ছড়ায়, ডালিয়া আর রডোডেনড্রন

গুচ্ছ হাসে রূপ দেখিয়ে—তখনকার পরিবেশে মনে জাগে—সবুজ সুগের কলোচ্ছলতা।

আর তাই যুবকের আসঙ্গ যুবতীর কাছে আবেশিত হয়। আর মনে হয়—

"মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।"

—সুবিনীতা শকুন্তলা রায়ের বিশ বছরী যৌবন তাই থাকতে পারেনি অচঞ্চলা। ক্ষণিকের জন্য হোলেও সুন্দরদর্শন প্রভাতের বাইশ বছরী বসন্তরূপকে ভালো না বেসে পারে নি। পরিবেশ, পরিচিতিতে আর প্রকৃতির প্রণিধানেতে রোমান্সের মদির করা সিম্‌ফনির রিদ্‌মে নেচে নেচে—প্রভাতকে বসন্তের পার ভাঙ্গা ঢেউয়ে দোদুল কোরে—ভালোবাসা বাসতে শিখিয়েছিল সবুজ প্রাঙ্গণের ঝিলিমিলিতে। পেশল দেহলতা ঘিরে ঊর্দ্ধাঙ্গকে আপীন করা, লাল জ্যাকেটে শোভিতা শকুন্তলা দায়—সমীপবর্তিকায়।

"দার্জিলিং" গল্পের রোমান্টিক ভাব-গভীরতার মুঠো মুঠো আনন্দ-কণা ভালোবাসার আম্‌-মহলেতে মিলনে আর মিলনের অপ্রাপ্তিতে মুক্তিপ্রিয়ার ময়ূরকণ্ঠী রঙে জৌলুস ঝরিয়ে গেছে। মণীন্দ্রলালের রূপঝরার নায়িকারা যেন বারে বারে তাঁর সৌন্দর্য্যনিষ্ঠা, প্রেমনিষ্ঠা, ও সর্বোপরি তাঁর ধ্যানাঙ্কিত শৈল্পিক ঋদ্ধির আলোকে প্রিয়-প্রতিম সুজনদের শিল্পায়নের ক্ল্যাসিক রীতির সুর-লহরের খুশীময়তার মধ্যে সুখী করিয়ে যেন বারে বারে বোঝাতে পেরেছে—

"রুদ্ধ-দুয়ার পানশালাটির সামনে সে কি হট্টগোল,
ভোরের ডাকে বলছে কারা—খোলরে, ওরে দুয়ার খোল্।
কতক্ষণ বা রইব হেথা, ছুটছে আয়ু ব্যস্ত পায়,
বিদায় নিলে ফিরব না আর—অন্তহীন যে সেই বিদায়।"

—তবু প্রিয়া তার প্রিয়কে ভালোবেসে যাবে যুগে যুগে—অনিবার রূপেতে। আর প্রিয় তার প্রিয়ার রাঙা অধরের 'পরে হাসির বাসর সাজাবার কথা ভুলে কপোলের একখানা ছোট্ট কাজল কালো বিন্দুর জন্য নন্দিত কান্তিতে প্রস্তুত থাকবে—সমরখণ্ড ও বোখারা পর্য্যন্ত দান কোরবার মত সুদৃপ্ততার মধ্যে। রূপদক্ষ মণীন্দ্রলালের "রমলা" আর "জীবনায়ন" সীমার মাঝে অসীমের সন্ধান রেখে গেছে শিল্প-সঞ্জাত সৃষ্টিতে আরাধনা করা—রমণীর রমণীয় বিতান সাজানো এ পৃথিবীর সোনা রঙ প্রীতির রূপমঞ্জিলেতে।

সব কিছুর পরেও প্রেমবিলাসী ও রূপশিল্পী মণীন্দ্রলাল বসুর মনীষা

ভালোবাসাবাসির শেষ নিরীক্ষার ধ্যানে ফুটিয়ে তোলে অশেষ তৃষ্ণারই সুমধুরিক পরিণয়ের আবেশতাকে। আর তার মধ্যেই মঞ্জুলিত মঞ্জুষায় ভাবকুট্টিম বহুত আকুতির শিল্পায়ণ সার্থক হোয়েছে। বারে বারে যেন "রমলা"ই কোরে চলে শেষ হোয়েও অশেষ দরবার—"ধরণীর কিশোরী বয়সে যখন জলস্থলের বিভাগ হয় নাই, তখন অগ্নি জল হাওয়া যে-অজানা বেদনার গোপন পুলকে মাতামাতি করিয়া বেড়াইত, সেইরূপ অসহনীয় ব্যথাময় সুখে দম্পতির মন কাঁপিতে থাকে।—সে কি স্বপ্নভরা দিন, সে কি গল্পভরা রাত। শিশুর হাসির চেয়েও সুন্দর, প্রসব-বেদনার চেয়েও ব্যথাময়, বন্ধুমিলনের চেয়েও সুখময়, ভাইবোনের ভালবাসার চেয়েও মধুর, মাতৃস্নেহের চেয়েও পবিত্র।"

আমাদের গর্ব, অতি আধুনিককালের চিন্তায়নে, আর দূরদৃষ্টির রূপকাঠি ধরে ধরে একটি অনামধেয় কৃতজ্ঞতার মৃদুল কাঁপনের ঝুলন-মেলায় সাজাতে পেরেছেন সামন্তশ্রেণীর অতি আধুনিক, আর অতি কাছের ঘরোয়া কথার সূক্ষ্ম ও অনুভবনীয় রূপকল্প অভিনিবেশের আশ্লেষে—জীবনরহস্যের সত্যান্বেষী কারুকার ও রূপ-রস-বিভাব-বিদগ্ধ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি বলব, সামন্ততন্ত্রের শেষ দরবার আধুনিকতার ঝলকানো রূপে-অরূপেতে আরম্ভ হোয়েছিল ১৯৩৯ সালেতে—তারাশঙ্করের মনীষা স্বাক্ষরিত "ধাত্রীদেবতা"য়। পরে পরে ঘুরে ফিরে চলেছিল "কালিন্দী" থেকে "গণদেবতা"য়। আর সেখান থেকে শেষ পরিক্রমাকে শেষ কোরেছিল ১৯৪৪-তে "পঞ্চগ্রামে"র পল্লীমানস বিচিত্রিতায়। এ তালিকার প্রথম ও শেষ রচনা দুটি ভাবের প্রখর দ্যুতিময়তায় সামন্তশ্রেণীর অনন্ভবনীয় চকমিলান কোরে তুলেছে। সত্যি এরই জন্য জীবনরহস্য-সন্ধানী তারাশঙ্করের স্রষ্টা-মনের শৈল্পিক ঋদ্ধি—আর তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া চিরকালীন অনাদর্শের সঙ্গে—আদর্শের দ্বান্দ্বিক জল্পনা শিল্পবিবেকে ফুটেছে।

এক বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণ বাঙলার গ্রামীন জীবন-বিচিত্রার ঘরোয়া পরিবেশেতে এই কয়েক দশক আগেও ফুটিয়ে তুলেছিল এক অগ্নিজ্বলা বিপ্লববাদ —যার লক্ষ্য ছিল মুক্তির অপরাজিত নীল পথ দিয়ে কাছে আসা—স্বাধীনতারই স্বাদ-গ্রহণে। প্রজায়-জমিদারে আর তদানিন্তনী বিদেশীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে উঠেছিল নিদারুণের অভিশাপে—এক নামধেয় সভ্যতার সঙ্কট দেখা দেওয়ায়। সুখের কথা.—সে মুহূর্তে বিশ শতকের পাদপীঠে দাঁড়িয়ে আপন প্রজাসাধারণের

স্বার্থ-অস্বার্থের কথাকে পেছনে ফেলে, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রজ্জ্বল বহ্নির শিখাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নীল রক্তেতে ডগমগ করা সংস্কৃতির জৌলুস থেকে—সংখ্যাতীত সামন্তশ্রেণীর যুবক। ওদের 'শিভাল্‌রি' নিয়ে আজও কোন ঐতিহাসিক নিখুঁত দলিল তোয়ের করতে পারেন নি। হয় ত ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই পারবেন। ওদের মনের আচারে যে দেশহিতৈষণার রঙে রেঙে রাজা আর্থারের পার্শ্বচরেদেরই মতো "ফিউডালিজম" মূর্ত হয়েছিল সেবায়, দীক্ষায়, বীরত্বের আর্তিতে—তা তাদের দুর্দম জীবনেতিহাসের মধ্যে নীল অপরাজিতার সৌরভ দিয়ে রাঙাতে পেরেছে এই বীরভোগ্যা বসুন্ধরার সময় বিশেষের অশ্রুজল ঝরা কথায়। জীবনরহস্যের ধ্যানী শিল্পীরূপে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলার এই "ফিউডাল্‌ হিরোইজমে"র ভেতরে রঙীন হোনে ওঠা দেশ ও দশ-প্রিয়তা, স্বাধীনতা-প্রিয়তা—সর্বোপরি 'love of mankind'এর 'humane history'কে শৈল্পিক কারুকাজে মানবতাবাদী এক সামন্ততান্ত্রিকের জীবন-দলিলে স্বাক্ষরিত কোরেছেন এই "ধাত্রীদেবতা"য়। অনেক কিছু, বা অন্য কিছু বলার আগে বলব,—এর কাহিনী পড়ে পড়ে আমার শুধু মনে হয়েছে—এটা ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা। সারসত্য সমন্বিত আদর্শের দুনিয়াদারিরই এটা হোল এক নামধেয় "fact"। —"ধাত্রীদেবতা"র দুই প্রধানা—মা আর পিসিমা—বারে বারে বোঝাতে চেয়েছে—নায়ক শিবনাথের জীবনেতে ওরা ছিলেন দিগ্‌নির্দেশক শক্তি। জীবনের যত পূজার্ঘ্য, তার সবটাই মায়ের জাতির সৌরভ-স্নিগ্ধতায় এরা দু'জনাই পেয়েছিলেন পুত্র ও পুত্রপ্রতিমের কাছ থেকে। আমরা যেন ভুলে না যাই,—সন্তানের জীবনে মা'ই সঞ্চারিত করেন—কঠোর আদর্শের অরূপ-বার্তাকে। শিল্পী তারাশঙ্কর শিবনাথের চরিত্রে আর মায়ের আর্তির মধ্যে এই আদর্শের ঘনঘোর ছবিটিকে প্রমূর্ত কোরেছেন—এক আভিজাত্যবোধের সুসমঞ্জস প্রজ্ঞায়। শিবনাথের জীবনে তার মা ছিলেন "inspiring instrument"—সময়ে সময়ে প্রখর বুদ্ধিমত্তার যুক্তিমার্গে পিসিমা তার স্বভাবজ কাঠিন্যের এক না বোঝা কোমলতায় আপন ভ্রাতৃজায়ার মাতৃরূপকে বেশী রকমেই—নারীত্বরূপে প্রতিভাসিত করাতে পেরেছিলেন। আর তাই শ্রদ্ধার মার্গে জাগা এক অপরূপ আর্তির ভুবনেতে মশগুল থাকায়—নিজের সম্বন্ধে যুবক শিবনাথ হয়েছিল নির্বিকারচিত্ত। এক কথায় "ইগো"শূন্য।—স্বার্থহীন। তাই "ধাত্রীদেবতা"র আধারে, নামের অর্থানুসন্ধানেতে গোলাপের মদালসা চাহনির সুরভি নিয়ে আনচান কোরে ওঠে নি—এর ভেতরের দাম্পত্য প্রেমের অনিন্দিত মনোলোক।

—শিবনাথ আর গৌরীর সম্পর্কে যে আদর্শের সরল-সহজ স্বরটি বেজে উঠেছিল, তা এর কথারূপের ব্যাখ্যার সামঞ্জস্যকে বিধান কোরেছে।—যুবক যখন 'motion', গতির প্রাবল্যে চলমান,—তখন তার প্রিয়া স্ত্রীর যুবতী-স্বভাব কিন্তু নিয়ম বলেই যেন আক্রে ধরে থাকে 'emotion'কে! আবেগে, অভিমানে, চোখের জলে, অধরের বাঁকা চোরা কোণে উপছানো কান্নার রেশ জড়ানো হাসিতে আর প্রগল্‌ভতায়—নারীর যুবতী মন প্রিয়া স্ত্রী হোয়ে, প্রিয় বন্ধুনী হোয়ে এমনটা কারণ-অকারণ ছাড়াই করে। গৌরী সম্বন্ধে শিবনাথ মাঝে মাঝে হয় চঞ্চল। অস্থির।—যেহেতু সে মেয়েদের এই বিশেষ ছন্দটুকু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হোতে চায় নি কোন দিন। বাধা ছিল স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর আবেগের দুনিয়ায় ভেসে যাওয়ার ব্যাপারে,—যেহেতু শিবনাথ তখন মশগুল ছিল দেশপ্রেমের সেবাব্রতে। মুক্তিপথের সংগ্রামেতে সে ছিল তখন সৈনিক। কাজেই ওদের দাম্পত্য প্রণয়কথা কাহিনীর মধ্যে বেশী কোথাও মাদকবিভোর করাতে পারে নি। তবু বুঝতে দেরী হয় না,—মনীষী-শিল্পী তারাশঙ্কর "ধাত্রীদেবতা"র অন্তস্থলে অভিধা রেখে গেছেন শিবনাথ-গৌরীর ব্যঞ্জনাতে উঁকি দেওয়া—দম্পতি পরিচয়ের এক সুন্দর রূপারূপ রূপে হর-পার্বতীর মনের মৃদুল মঞ্জুষার মধ্যে। ওদের প্রণয় সহাস-মূর্ত কাকলিতে প্রকাশমান নয়।—ও থেকেছে সুপ্ত হয়ে মনমহলের প্রশান্তির সুখের খুশীময়তায়।—দেশপ্রেমী, সংগ্রামী, সেবাব্রতী পরিচয়ের এমন নায়কের পক্ষে তার স্ত্রী-সুজনার মূল্যায়নের আকৃতি কখনো-সখনো ঘটে বিলম্বে। তারাশঙ্করের মনীষা এ হেন প্রীতির সরল কথায়, আদর্শের দ্বান্দ্বিক কাহিনীর ঘাত-প্রতিঘাত সমেত নতুন স্বাদের প্রমূর্ততায় ভরিয়েছে। এ যে কি অপরূপ দাম্পত্য জীবনের সরল আর সহজ খুশীর প্রশান্তি,—তা এই সেদিনও দেখতে পেয়েছি আরেক মনীষী-শিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা "পথ গেছে হারিয়ে"র স্ত্রী যশোধারা সমীপে স্বামী চন্দ্রকিরণের বড় বেশী আদর্শ ধ্যানাশ্রিত আলাপচারিতার কথায়। —এত কিছুর পরেও বলব,—"ধাত্রীদেবতা"র নায়ক শিবনাথ হোলেও আমার মনে প্রশ্ন জাগে—এর সত্যিকারের নায়ক কি সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশটি নয়? আর প্রতিনায়ক কি এই নীল রক্ত থেকে নীলাভা ছাড়িয়ে আসা শিবনাথের লাল রক্তের মধ্যে প্রজ্জ্বল হোয়ে ফোটা—দারুণ আদর্শবাদটি নয়?—জ্ঞানী আর ধ্যানী শিবনাথের চরিত্রে যে জমিদারী সংস্কৃতিটি মূর্ত বিকাশ পেয়েছিল—তার আলোচনায় মনে হয়—"ধাত্রীদেবতা" সব কিছু মিলিয়ে সামন্ততন্ত্রের এক সুন্দর গাথার ইতিহাস হোলেও—আমি বলব, এর চিরন্তন সুর প্রতিবারই বোঝাতে

চেয়েছে—এর কাহিনী একটা অসাধারণ 'fact'। জীবনবিচিত্রার পূজারী তারাশঙ্কর এভাবে এর 'fact'কে উপন্যাসের চাইতেও 'stranger' কোরে শিল্পায়িত কোরেছেন এই "ধাত্রীদেবতা"য়।

সত্যি, অজয়ের তীরে তীরে, রাঢ় দেশের রঙীন মাটির আভায়, জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি ও অন্য বৈষ্ণব-সহজিয়া সাধকদের পীঠস্থান ছড়িয়ে-ছাড়িয়ে যে অপরূপ প্রেম মন্দাকিনীর ধারায় ভেসে গিয়েছিল মধুরে মধুর অনুরাগ, পূর্বরাগ, অভিসার, বিরহ-মিলনের কাকলি-ঝরা অনয়া আরাধিতার গীতালী-কথা—তার লিরিক্যাল শব্দযোজনা ও স্বাধীনচেতনার উন্মেষে পাওয়া রোমান্টিক ভালোবাসার শিব-কল্যাণরূপ—আজও নায়িকা শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার জন্য মনের আধুনিক যুক্তি-বিযুক্তির সুদৃঢ় বাঁধনকে পর্যান্ত শিথিল কোরে তোলে,—আবীরে রাঙিয়ে। নিখিল রমণীর হৃদয়বাসরেতে প্রিয়-প্রতিমের জন্য যে আকুল করা মিনতি শ্যামরায়ের নাম শুধু কানে শোনা মাত্র নিজের যৌবনকে এলোমেলো ও বেপমান না কোরে পারে না,—আবার তমালকুঞ্জে মোহনমুরলী হাতে প্রিয়দর্শনে যখন তার যৌবন 'দরশ পরশ লাগি আওলাইছে' অবস্থায় বহুত আকুতির প্রণতিতে ভেঙে পড়ে—তখনকার যে কাহিনী 'মধুর বৃন্দা বিপিনে' ভেবে প্রেম-আরাধিকার জীবনযৌবনকে আরাধনার পুরুষ সমীপে এনে মানখণ্ড, মিলন-খণ্ডের ভাবোল্লাসে টেনে নেয়—তারই এক আধুনিক দর্শনবিকাশে সালঙ্কৃত হোয়ে আছে তারাশঙ্করের "রাইকমলে" নরনারী কমলের বন্দিত মিনতিতে ভরা জীবনের আবেশ রূপ পর্যান্ত,—প্রিয় প্রতিম রঞ্জন সমীপে। "রাইকমল" ছোট নভেলেট্। 'নভেল্‌টি',—অর্থাৎ তার ভেতরের জাঁকজমক শিল্পীর কথা ও ভাবের প্রগাঢ় আন্তরিকতার ছোঁয়ায় বৈষ্ণব-ধর্মানুসারী সহজিয়া সমাজের জীবনবন্দিত যৌবনাচার আর প্রণয়াচার, মায় দেশাচারের আলিম্পনে মনোবাসিত কোরে তুলেছে—সাহিত্যরসপিপাসুর জন্য।

সত্যি, এমন সমাজ-মানসিকতার দুনিয়ায় থেকে যে মঞ্জুলা সুকন্যার যাদুচোখের অপাঙ্গে হানা দৃষ্টি দিয়ে পুরুষকে বন্দী করায় আপনপ্রিয় হবার জন্য,—আর ঘরের এক সন্তানের মায়ের কুলবধূ পরিচয় যখন দূরের বাঁশীর সুরে সুরে ভেসে চলে যায়,—সব ভুলে এক বিস্মৃতির প্রেমলোকে—ঠিক সে দেশেরই 'ধেয়ানের ধনে' তৈরী হোয়েছিল—রাইকমল ওরফে কম্‌লি। এ কাহিনীর যত কিছু বিচিত্রতা আছে, তার সবটাই ধরে ফুটেছে কমলের মধ্যে। প্রীতির জোয়ার যে জাতি-কুল-শীল-লজ্জা কিছুরই তোয়াক্কা রাখে না—তারই

মূর্ত প্রকাশ দেখা দেয়—যৌবন সাজে রঙীন বৈষ্ণব-ধর্ম-সাধিকার প্রণয়াকুলতাকে জড়িয়ে। বৈষ্ণবীয় প্রেমদর্শন মনঃসমীক্ষার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক—যৌবনেরই সবুজে উচ্ছল চাহিদা আর ব্রতচারণাকে ঘিরে ঘিরে। নায়িকা কমল শ্রীরাধার যৌবন-দ্যুতির ভাবাবেশে প্রণয়-রীতির ঋতুময়তার রাজত্বে অতি কাছে টেনেছিল দুই পুরুষের জীবনের কামনা বাসনান্বিত পৃথক সত্বাকে। আপন জননীর শোণিত-ধারা থেকে কম্‌লির হৃদয়ে গেঁথে বসেছিল হ্লাদিনীর আকুল করা রূপঝরার মিনতিগুলো—যা গানে গানে, বিরহ-মিলনের মিল-অমিল ছন্দের ঝঙ্কারের কাকলিতে সমবয়েসী মিতা রঞ্জনকে কাছে পেয়েও সরিয়ে দিয়েছিল দূরের পথেতে,—মাথুরের চোখের জলের নামধেয় অলকাতে। বরনারীর ধ্যানে, বিরহের অমানিশা ছেড়ে রঞ্জন মালাবদল কোরেছিল পরীর সাথে—কম্‌লিরই যে ছিল বাল্যসহচরী। অপরদিকে এক ঝড়ের রাতের বাতুলে তাল-বেতালের আলোড়নে বর্ষাভিসারের নিভৃতে কমলের জীবনের যৌবন-উচ্ছলতাকে মালাবদলে বন্দী কোরেছিল—রসিকদাস মোহান্ত ওরফে বক-বাবাজী। সবল প্রয়োগে না হোলেও, এমনটা অতর্কিতে কোরে ফেলেছিল মোহান্ত কতকটা বুভুক্ষু অন্তরের কামনার বহ্নিতে জ্বলে ওঠায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্রৌঢত্বের আঙ্গিনা পরিক্রমণরত, পিতৃবয়েসী, ও সেই সঙ্গে মাতৃ-বন্ধু রূপে রসিকদাসের এ হেন আচরণ কমলকে দেহ-মনে জ্বালিয়ে তুলেছিল। একেবারে প্রধূমিতা না কোরলেও, বলব—বৈষ্ণবিনী জানে,—দেহের যৌবন মনেতে জ্বালা ধরায়। এ যে প্রেমসাধনার জ্বালা। তা না হোলে পরাশক্তি শ্রীরাধা কখনই কানু সমীপে কলঙ্কের সায়রে রূপস্নান সেরে হোতেন না—পরমপুরুষ কৃষ্ণের আশ্লেষে কলঙ্কিনী। তাই প্রেমে জ্বালা আছে। আর তা আছে যৌবনেরই না নেওয়া হিসাব-নিকাশের খাতায়। দেহ যখন ধরেছি, তখন ধর্মত দেহের আবদারকে রক্ষা কোরতেই হবে—নারীতে-পুরুষেতে, যৌবনের দেহে আর মনে লাজাঞ্জলি ছিটিয়ে, ছড়িয়ে দিয়ে।—রসিকদাসের প্রেম নিবেদন প্রথমটায় কম্‌লিকে কোরেছিল হতচকিতা। প্রাণ-বিহ্বলা। তারপর সহজিয়ার প্রাণ-ধারায় সুরীতির সমাচারে তা হয়েছিল স্নিগ্ধ। অবশ্য এটুকু বুঝেছি, কমল রসিকদাসকে 'মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়' এ দেহ সমর্পিলু তিলতুলসী দিয়া—এমন প্রণতি ঘন আশ্লেষে জানাতে পারে নি। কেন না, শৈশবের কর্তা-গিন্নী খেলার ভেতরে ভেতরে যে প্রীতির ঘনায়মান রূপ ফুটেছিল পরবর্তীকালে যৌবনের দীপ্ত-ভুবনেতে—তা কমলের প্রণয়কে কিন্তু অন্তর্লীন

থাকা ভালোবাসার একনিষ্ঠতা থেকে আবেশহীন করাতে পারে নি কোন দিনও—পরীর স্বামীত্বে হারিয়ে যাওয়া—সুদূরিক রঞ্জনের জন্য। আর সেখানেই প্রকাশিত হয়েছে বৈষ্ণব সাধিকার দেহ-মনের জ্বালাহর স্বরূপটুকু—কমলের পুনরায় রঞ্জন সমীপের ঘনিষ্ঠতায় আসতে পারার অপূর্ব ভাবোল্লাসের মধুময় সত্তায়। কামনার শুদ্ধাচার আস্তে আস্তে মোহান্তের মধ্যে জেগে উঠে মুক্তি-প্রিয়া কোরেছিল কমলকে শেষ পর্য্যন্ত।—তারপর হঠাৎ মনস্থখ করা প্রণয়-গোধূলির সোনা রঙে কমলের দেহ-বিতানেতে খুশী হয়ে কাছের আবিষ্টতায় ফিরে আসে বরপুরুষ রঞ্জন—কমলেরই অন্তরের প্রথম নিবেদিত প্রণয়রাগের স্বজন সখা রূপেতে। আর তার দাবীতে। মুক্তিপ্রিয়া কমলকে পুনরায় আপন পোড় খাওয়া জীবনের আবেশ-মুখর জগতেতে রঞ্জন বন্দী করায়—প্রিয়ার মুক্ত দেহের রভসকে নিঙাড়িত কোরে ঋতুর রূপতৃষ্ণাকে সুতৃপ্ত করাবার জন্য। রঞ্জন যে ধর্মপথের নামধেয় বৈষ্ণব। ও যে রাইদাস নামে নামাঙ্কিত। ও-ও যে আজ একজন মোহান্ত। অবশ্য যৌবনের আঙিনায় দাঁড়িয়ে। রঞ্জনের প্রয়োজন আজ কমলের সাহচর্য্যের—তা না হোলে যে বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্ম্য পূর্ণ হয় না! ঘরে তার আছে চিররুগ্না স্ত্রী—পরী। ওর কঙ্কালসার দেহের, আর শুষ্ক মনের কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়—সাধকের পথেতে প্রেরণার উৎস হোয়ে ওঠাটা। কিন্তু কমল পারবে তা। আজও ওর হ্লাদিনী শক্তি চিরসমাচ্ছন্ন রয়েছে সবুজে-পলাশে। তাই বধু পরী সমীপেই রঞ্জন অকুতোভয়ে নিয়ে এসে হাজির করে বঁধু কমলকে। তখনকার অবস্থা সঙ্কটময় হোতে যেয়েও হোতে পারে নি কমলেরই প্রত্যুৎপন্নমতিতার রূপাভায়। তাই দেখি·

"কমল হেঁট হইয়া রঞ্জনের পায়ের ধূলা লইল। রঞ্জন মুহূর্তে অবনত কমলকে বুকে টানিয়া তুলিয়া লইল। চুম্বনে চুম্বনে অধর ভরিয়া দিল। সবল পেষণে যেন পিষ্ট করিয়া দিতে চাহিল। কমলের চোখ দুটিও আবেশে মুদিয়া আসিতেছিল। এ আনন্দ তাহার অনাস্বাদিত পূর্ব। রসিকদাসও তাহাকে এমনই আদরে বুকে লইয়াছে। কিন্তু সে যেন তাহাতে পাথর হইয়া যাইত। ঠিক এই সময়ে ভিতরে পরীর সাড়া পাওয়া গেল। সে বোধ হয় আবার কাঁদিতেছে। মুহূর্তে আত্মস্থ হইয়া সে বলিল, ছাড।·· না।·· কমল বলিল, ছাড। যে মরতে বসেছে, তাকে আর ঠকিও না।···রঞ্জনের বাহুবেষ্টনী শিথিল হইয়া আসিয়াছিল, কমল আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, যাও, শোও গে যাও।—বলিয়া সে আর উত্তরের প্রতীক্ষা করিল না, এ পাশের

ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।"···সত্যি সময়ে সময়ে ন্যায়বোধে
শিবচেতনায় বৈষ্ণব-সাধিকা তার দেহমনের ওপরে টেনে দেয়—ত্যাগের অর্গল
সেখানে সে কমলির মতই থাকে আরাধিতা পরিচয়ে—মুক্তিপ্রিয়া। মুক্তি
স্বাদ রমণীর চেতনার সবুজ ঘরেতে অনুভবনীয় আবেশ ফুটিয়ে তোলে।
নারী বলে, সহজিয়া সাধিকা বলে, মধুরা যুবতী বলে, বোঝে সুন্দর কোরেই—

"ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং রাই গচ্ছং মথুরাওয়ে
ঢুঁডব পুরী প্রতি প্রতক্ষে
যাঁহা দরশন পাওয়ে॥
ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং কুরু গমনা।
অবিলম্বনে মথুরপুর আওল ব্রজরমণা॥"

—এমন ভাবনার স্নিগ্ধতা সত্যি আমেজ ভরিয়ে তুলেছিল কমলের মধ্যে
ও নারী, ও যুবতী,—কাজেই ওর যেমন মনের আকুতি আছে, তেমনি আছে
দেহের চাহিদাগত তৃপ্তি পাওয়ার সুখাবেশ। এইটা দিতে পারে তাকে একমাত্র
তারই দয়িত, মিতা, বঁধু রূপে—রঞ্জন। কৃষ্ণরূপে তার জীবন-যৌবনকে
ঈপ্সিত কোরে তোলার মধ্যেই আছে রাধার বেশ ও রেশ—কমলের নিবেদিত
পরিচয়ে। —নারীর যুবতী ধর্ম্ম ছাড়িয়ে কমল সাধিকা হলেও, আর বৈষ্ণবিনী
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবিভোরতায় আবিষ্টা থাকলেও—তার পক্ষে সজল চোখের করুণ
চাহনিতে আকুলতা না ঝরিয়ে থাকতে পারে না।

এই ভাব ধরেই বৈষ্ণব সাধিকা মনে করে, ও নিজেকে বোঝায়—আর কি
প্রিয়প্রতিমকে এবারে অনায়াসে অভিসারের আসঙ্গ সুখেতে টেনে নিয়ে, তুমি
কাঁদিয়ে—মাথুরে যাবো ভেসে। হবো—বিরহে আর আক্ষেপানুরাগে
—নিখিলময়। থাকবে না তার মধ্যে মিলনের—নিখিল-হারা রূপ। তাই পুনরায়
রঞ্জন সমীপে কমলের ব্রতচারণা মুক্তির পথ অনুসন্ধান করে। রঞ্জন আজ
একলা। ওর পরীও আজ অন্য লোকেতে স্থানান্তরিতা। কিন্তু কমল
সেও ত নিজে আজ একলা। একাকীত্বের অবসানে ওরা,—মানে কমল আর
রঞ্জন—কাছের ঘনিষ্ঠতায় এসেও বোঝাবুঝির জগতে আলাপ না কোরে পারে
নি যুক্তি নিয়ে,—বিযুক্তির কারণ দেখিয়ে—···"(রঞ্জন) তাহাকে আড়াল দিয়া
চলিবার চেষ্টা করিতেছে। হাসিয়া কমল ডাকিল, লক্ষ্মী!···রঞ্জন নতমুখে
আসিয়া দাঁড়াইল।···কমল হাসিয়া কহিল, এমন লুকিয়ে ফিরছ কেন বল ত
···নত চক্ষেই রঞ্জন বলিল, আমায় মাপ কর কমল।···প্রশান্ত কণ্ঠে কমল

ষ্টুর দিল, আর 'কমল' নয় 'চিনি' বল। বহুকাল পরে তুমি আমার লঙ্কা, আমি তোমার চিনি। কিন্তু রাগ কি তোমার ওপর করতে পারি লঙ্কা?... অগত্যা রঞ্জন বলিল, সত্যি কথা বল চিনি।...কমল হাসিমুখে বলিল, রাগ করি নাই, রাগ করি নাই, রাগ করি নাই,—তিন সত্যি করলাম, হল ত?... ঞ্জন এবার আদর করিয়া কমলকে বুকে টানিয়া লইতে গেল। কিন্তু কমল শ মর্যাদার সহিত আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, ছিঃ। তুমি লঙ্কা, আমি চিনি।..."

আনন্দের এক মনমদির করা দীপালোকে সত্যি "রাইকমলে"র এই কাহিনী তার বৈষ্ণবীয় আচারের যে সুন্দর রসাস্বাদনের পরিচিতি মূর্ত হয়ে উঠতে রেছে—তার মূলে বুঝতে দেরী হয় না তারাশঙ্করের শিল্পমানসগত ক্ল্যাসিক্যাল -প্রীতির আর্তির অভিধাকে। কাহিনীর সমাপ্তির মুহূর্তে ভালোর সঙ্গে ভালোর ধেহিল বিরোধ। বৈষ্ণব-পুরুষ—তার শ্রীরাধার অন্বেষণ কোরে যাবে নারী কে—পুনরায় অপরার মধ্যে। ও যে খোঁজে নারী-সত্তম্। রত্না। ধ্যানের প্রভায় কা যার রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতা রমণী পরিচয়—সেই তারই জন্য। কিন্তু রীর মনে' আবেগ ভরা রাগানুরাগ ও অভিমান এটা বুঝেও, মাধবের কথায় সে যায়—অপরা নারীর-আসঙ্গে প্রিয়প্রতিমকে দেখে দেখে। নিজেকে র সখিয়ে তাই কমল চেয়েছিল রঞ্জনের মধ্যে ফুটিয়ে তোলাতে—ভালোবাসার ক্ষকরণ কাঙ্ক্ষকে। তার মনের খুশী বুঝুক—কমল চিরদিনই এই ভালোবাসার া-কাকলিতে আবিষ্ট থেকে জানিয়েই যাবে—

"কি কহব রে আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥"

স্তুতে বাড়িয়ে কমল তা হোলে রঞ্জনের বুকেতে আশ্রিতা থেকে এ-ও বলতে রে—"আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই। / তব হাম পিয়া দরদেশে না ঠাই॥"

বাঙলার সংস্কৃতির জগতে—কবি-গান আর ঝুমুর দলের নাচ-গান-অভিনয়ের লাবদল—তার সমস্ত স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা সমেত—বাঙালীর গ্রামীন সভ্যতাকেই চ অতি সহজ সুরের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছিল। ছন্দের মিলে, যতির-ছেদের বস্থানে, রসের নানান ধারার টইটম্বুরতায়—নিতাই কবিয়াল "কবি"র হিনীকে হাসি-কান্নার মিলন-বিচ্ছেদের ভেতরে ভেতরে জীবনের দুর্বার তন্ময়তার হাতছানিতে ঘুরে-ফিরে ছুটে কোরে তুলেছে—কবির সত্যিকারের

কাব্যকথা—যদিও তা ব্যঞ্জিত হয়েছে সুললিত গদ্যকথায়, আর তারাশঙ্কর সুদূরাভিসারী রূপচিন্তায়। অতি সাধারণ জীবন থেকে উচ্চাশা নিয়ে জা নিতাইয়ের মধ্যে এর শিল্পী যে মহৎ জীবনের আলাপকে আরো মহান করা পেরেছেন শিল্পচেতনার যোগে,—তা "কবি"র নামধেয়রূপে হারিয়ে না যা চোখের জলের ভেতরে ব্যাপক সুরের লিরিক্যাল ব্যালাড্-গাথা হোয়ে উঠেছে আসরে বসে লালঠেম জ্বালিয়ে কবিয়াল নিতাইচরণেরা হাঁক দেয়—"অ্যা-ই কাটছে।" আর তখনি ঢোলক তার ঢোলেতে কাঠির আঘাতে শোনায় "ডুডুম্!"—এ ত গেল কবিয়ালের কবি-গানের টেক্‌নিক্যাল দিকের কথা। ক রকমের ভাবের আর ছন্দের আর রসের কারিকুরিতে কবিয়াল তার শ্রোতা মুগ্ধ করায়—সে রূপটুকুন অতি মাত্রায় বাস্তব হোয়ে উঠেছে এই "কবি"তে।

তাই বলব—প্রথম দর্শনে "কবি" বোঝায়,—এর কাহিনী হোল গদ্যে রচ করা এক ব্যাপক দৃশ্যাবলীতে সাজানো—লিমেরিক পদ্য। সেই সঙ্গে গদ্য অ পদ্যের মিশ্রণে উদ্ভাসিত কবিয়ালেরই ইতিহাস সাপেক্ষ জীবন-ভাষ্য।—কি দ্বিতীয় দর্শনে চোখের মণিকুট্টিমে আবীর রঙ্ নিয়ে ঝলসে ওঠে কবিয় নিতাইয়ের ভালোলাগা—ঠাকুরঝি আর বরতনুকা বসন্তের প্রতি নিবেদি প্রণয়ের অনুরাগনির্ঝর মধুবর্ষণ কথা। প্রেমের অরুণ দিঠির মায়ালো নিতাইয়ের জীবনের সমস্ত দুঃখ-অভাব ধুয়ে-মুছে উঠেছিল—দুই যুবতীর একজনার প্রারম্ভ প্রাচুর্যে ফুটে চলা দেহ-মনের লাজুকতায়—আর অপর যৌবনাঙ্কিত বঙ্কিমার রেখায় সাজানো বেহায়া হোয়ে ওঠা মাঝদরিয়ার মুঠো মুঠো আবেশতায়।

কবির জীবনেতে প্রথম প্রেমের কাজল দিঠির লহরে বেপমান কোরে নে গেছিল ষোড়শীর যৌবন প্রসাধন নিয়ে—এই ঠাকুরঝি। মেয়েটির ও ছাড়া অ কি নাম ছিল, আমরা জানতে পাবি নি। তবু মনেতে প্রথমেই দাগ কে যায় ওর সম্পর্কে বর্ণনা—"· ·রং কালো। কিন্তু দীঘল দেহভঙ্গিতে ভুঁইচাপ সবুজ সরল ডাঁটার মত একটি অপরূপ শ্রী। মেয়েটির মাথায় কাপড়ের বিড় উপরে তকতকে মাজা একটি বড় ঘটী। হাতে একটা ছোট গেলাস; পর দেশী তাঁতের মোটা সুতার খাটো কাপড়। মোটা সুতার ধপধপে খা কাপড়খানির আঁটোসাঁটো বেষ্টনীর মধ্যে তাহার ছিপছিপে দীঘল কা দেহখানি মানায় বড চমৎকার। মেয়েটি রাজার শ্যালিকা, পাশের গ্রাম বধু। সে···প্রত্যহ দুধের যোগান দিতে আসে। রাজার স্টেশনে গাড়ী আ

ড়ির কাঁটা ধরিয়া, আর এই মেয়েটি আসে পশ্চিমসমীপবর্তী দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের অগ্রগামিনী ছায়ার মত।...দেহখানিই শুধু লতার মত নয়, মনও যেন তাহার চঞ্চল দেহের অনুরূপ।...নিতাইও থামিয়া গিয়াছিল। ধরতার সময় পার হইয়া গেল, তবু নিতাই আর গান ধরিল না দেখিয়া রাজা বাজনা বন্ধ করিল। স মেয়েটিকে বলিল—কেয়া ঠাকুরঝি? হামারা মিতা। ওস্তাদ আদমী। হামারা নাম হায় রাজা তো—ফটকেকো নাম দিয়া যোবরাজা, তোমারা বিদিকো নাম দিয়া রাণী।—বলিয়াই অট্টহাসি।...সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরঝিরও বাবার আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল সেই হাসি। হাসিতে হাসিতে মাথার অবগুণ্ঠন সিয়া গিয়াছিল, চোখ দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িয়াছিল। তবু তাহার সে হাসি থামে নাই।...হাসি থামাইয়া রাজা বলিয়াছিল—ওস্তাদ! কালকুটি হামারা ঠাকুরঝি হ্যায়। ইস্‌কো কেয়া নাম দেগা ভাই?... নিতাই মুগ্ধদৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখিতেছিল, তাহার সর্বাঙ্গে কচিপাতার মত একটি কোমল ঘনশ্যাম শ্রী আছে, তাহা দেখিয়া তাহাকে লইয়া রহস্য করিতে নিতাইয়ের প্রবৃত্তি হয় নাই। সে বলিয়াছিল—ঠাকুরঝি, ওর আর দোসরা নাম হয় না। আমার ঠাকুরঝিও ঠাকুরঝি, রাজার ঠাকুরঝিও ঠাকুরঝি।"

আর এ ভাবেই রাজা মুচির আত্মার সঙ্গে মন-মোকাবিলায় মেতে উঠেছিল কবিয়ালের প্রাণের খুনীগুলো। অন্ত্যজ সমাজের প্রেমার্তিও যে উঁচু মহলের মতই রুচি ও নিষ্ঠার রণনে মুগ্ধকর হোয়ে ওঠে—তা সুন্দরতা নিয়েই প্রকটিত-প্রস্নায়ন হোয়ে আছে এই "কবি" উপন্যাসে। প্রেম যে তার "art of loving" দিয়ে জাতির উঁচু নীচু বর্ণাশ্রম—আর ধনী দরিদ্রের মধ্যে একই সুরের ঝঙ্কারে আবেশস্নাত করায়—তার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। ওরা প্রত্যেকেই যৌবনে অভিষিক্ত হোয়ে একের জন্য তারই অন্যতমার মিথুনবাসরেতে হোয়ে ওঠে—রাজমুকুটে শোভিত। নিতাই কবি। তাই সে তার জীবনের প্রথম ভালবাসার যুবতীকে কবিয়ালের ছড়ায় নাচিয়ে তুলেছিল—"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেন?"—বলে। সত্যি, ভাবতে বড় ভাল লাগে প্রিয়তরার দেহের রঙ কবির রূপেতে কবিতা হয়ে ফুটেছিল! তার মুখের কৃষ্ণ-বরণ হাসিতে লজ্জাভা ঝরেছিল। ও ঠাকুরঝি। নামের মধ্যেই রয়েছে একটা প্রেম জড়ানো প্রেমরাগ। সে গৃহস্থ-বধূ। তার ঘর আছে, মান আছে, আছে আপন স্বামীর ভালবাসা!—তবু অকারণেই ঠাকুরঝি তার মনের ভালবাসার তাগিদে কবিয়ালকে বুকের কাঁপা কাঁপা ভালবাসায় গুঞ্জরিত করেছিল।

গভীরতা ছিল নামধেয় পরিচয়ে।—কিন্তু লাজুকার মন-বিহঙ্গ ডানা মেলে উড়ে যেতে পারে নি কবিয়ালের পর্ণকুটীরে। বাধা ছিল। সে বাধা তার অন্তপুর্বা হওয়ার জন্য। বধূ সে—তাই বলে কবির সঙ্গে সে মিতালিতে দেহগত ঈপ্সা ছাড়িয়ে হয়েছিল—মনের মিতা। তাই দেখে বিপ্রপদ ঠাকুর অজান্তায় নিতাইকে যে হাসিঠাট্টার পরিহাসে টেনে নিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে ঠাকুরঝির কবিপ্রেম ক্রোধে রেগে উঠেছিল। কানুন বলেই মিতা সহ্য কমতে পারে নি মিতিনের সম্বন্ধে করা অহেতুকী নিন্দাকে। বয়েসে ষোড়শী যুবতী, রাগে অভিমানে দুষ্টুমি ঝরে পড়ে তার মাথার অবগুণ্ঠন খসে যাওয়ার মধ্যে। শুধু কি তাই, কারণে অকারণে হাসির গমকেও তার কাজল চোখেতে ঝরে—টপ্ টপ্ জল। বুঝি একটা কথাই—ও যৌবনে সবুজ মেয়ে। আর এমন মেয়ে বলেই কবিয়ালের গানের দ্বিতীয় কলিটাও তৈরী হোয়েছিল আচমকাই—

'কালো কেশে রাঙা কোসম (কুসুম) হেরেছ কি নয়নে ?'…"

এখানে বুঝতে দেরী হয় না যে—কবিয়ালের সুরেলা লহর গান হয়ে ফুটতে পেরেছিল আপন মিতারই রূপ, রঙ, সৌগন্ধে বিভোর হোয়ে। কবি নিতাই তার জীবনমঞ্চের অধিষ্ঠানে আটকাতে পারে নি ঠাকুরঝিকে। কাছে এসেও, দূরে দূরে সরে যাওবার মধ্যে যে যন্ত্রণা ফুটে ওঠে আর মুহূর্তমধ্যে আবেশিত হোয়ে যায় প্রিয়ার জন্য প্রিয়র মন-গহনেতে—তারই বিভাব মুখর হোয়ে ধরা পড়েছে নিতাই সমীপে ঠাকুরঝির আনাগোনায়।—তার দুষ্টুঝরা কথামালায়। মনে মনে দোসর হওয়া যে কত মঙ্গলতায় আনচান কোরে নেচে যায়—তার রস দিয়ে আকুল করেছে একা ঠাকুরঝি নিজে—তার কবির জন্য। সত্যি যারা সভ্যতার আলোতে এলো না—বুঝলো না রুচি-অরুচি কি, উঁচু-নীচুর তফাৎই বা কি,—তারা অজান্তে প্রকৃতিবিধিত বলেই দেখাতে পেরেছে প্রণয়রীতির মন্ত্রমুগ্ধতাকে—এই "কবি"র সমস্ত কাহিনী জুড়ে।

সবুজ জীবনে ভালোবাসার আস্বাদন এনে দিয়েও ঠাকুরঝি যদি একটু লজ্জার রেশটুকুকে হারিয়ে ফেলতে পারতো, আর সেই সঙ্গে ভাসিয়ে নিতে পারতো কবিকে—তা হলে অন্যতরার প্রেম দরিয়ায় কবিকে নিশ্চয়ই আবেশস্নাত হোতে হোত না!

গাঢ় যৌবনের প্রতিটি দেহ-বঙ্কিমায় রাঙা বসন্ত ছিল একটি মঙ্গলা কন্যা; যদিও সামাজিক নিরীক্ষায় ও হোলো ঝুমুর দলের প্রধানা নর্তকী। যে নাচে—যে গায়—যে কাজল চোখের বিলোলতা ছড়িয়ে, অধরের প্রগল্‌ভতায় রাঙিয়ে হোয়ে

ওঠে জীবনবিমোহিনী—তার জীবনটা অভিনয়ের কিছু হোলেও—সত্যি তার হার হয়েছিল নিতাইয়ের আসঙ্গ কামনার ঝড়ের মধ্যে। এতদিন তার যুবতী-ধর্ম ছিল ঘুমের রাজত্বে নির্বিকার। কিন্তু কবির সংস্পর্শে তার নারীমন ঝড়ে দোদুল কোরে উঠেছিল পুরুষের দেহমনের আন্তরিকতায়—জীবনের যৌবন-বাসরে মিথুন সাজাতে। ঠাকুরঝি সুদূরিকার মত দূরে দূরে থাকতেই চেয়েছিল প্রীতির এক অদ্ভুত সরলতায় আকুলা থেকে। সেখানে এই ষোড়শীর নবযৌবন বেহায়া হোতে পারেনি মনের ভাললাগা মানুষটির কাছে। একটি ছোট্ট স্বর্ণবিন্দুর মতোই ধীরে ধীরে সে রেল লাইনের বাঁকে দেখা দিতো। কাশফুলের মসৃণতা ফুটে উঠতো তার সবুজ যৌবনকে আঁকড়ে থাকা শাড়ীর প্রান্তে প্রান্তে। কাছে এসে বিকি-কিনির কথা শেষে এনামেলের মগে তপ্ত চা পান কোরে ঠাকুরঝি আতপ্ত করে যেত—কবির হৃদয়কে। তবে কবি নিজেও পরবর্তী কালে বসন্তকে যেমন শুধিয়েছিল "রঙ্গ তোমার দেখে ধন্ধ লাগে চোখে"—তেমনিভাবে ঠাকুরঝিকে ঘন আশ্লেষে বাঁধতে পারেনি। যেমন আসতো সে, তেমনি রেল লাইনের বাঁকে ছোট্ট স্বর্ণবিন্দুটি হয়েই হারিয়ে যেত। ও-যে ছিল মনের মিতা। দেহের নয়। আর তাই কবির জীবনের প্রথমা-রূপে এই ভাবের মধ্যে নিহিত আছে ঠাকুরঝির শ্রেষ্ঠত্ব।—কিন্তু বসন্ত হোল যৌবনের মণিমুক্তায় সালঙ্কৃতা—পূর্ণা যুবতী। কাজেই প্রেমের ধ্যানে ও যতটা শরমহীনা হোতে পেরেছিল রমণীয় তাগিদে—ঠাকুরঝি হোতে পারেনি তা। তবে কবির মনের আকুতিকে—নারী কি, নারীর ঐশ্বর্য্য কি, কি তার সৌন্দর্য্য—এ সম্পর্কে এই ষোড়শীই সচেতন করেছিল। এর জন্য বসন্তের মাদক হয়ে ওঠা বাতুলে বাতাসে ঝরে পড়া বসন্ত-পরিক্রমাকে মধুর কোরে তুলেছিল কবির জীবনের সঙ্গে ছন্দে-যতিতে মিলে গিয়ে। ভাবি—কত বিস্ময়ের ঘনঘোর রূপেতে ঝুমুর দলের কন্যা, এই বসন্ত তার জীবনের দুঃখ দৈন্য গ্লানি ও শেষ সময়ের কবি সমীপের আশ্লেষ থেকে পাওয়া সুখের মধ্যে আপন মহত্বকে স্বাক্ষরিত কোরেছে।

একটা কথা মনে জাগে,—ভালোয় আর মন্দে মেশানো এই ঝুমুর দলের ইতিহাস শ্লীল ও অশ্লীলের এক হোয়ে ওঠার মধ্যে আপন সংস্কৃতি নিয়ে আজও বিরাজমান। ওদের দলের যারা কন্যা—তারা আসরে নেবে নাচে-গায়-হাসে।—যৌবনের মাদকতা ছিটিয়ে দর্শকের চোখে কামনার বহ্নিও ফুটিয়ে তোলে সময়ান্তরে। তাই এভাবে ওদের রমণীদেহের বাসরে সাজাতে

হয় সময়ান্তরে—পুরুষের জন্য নিশুতি লগ্নের সকলঙ্ক বাসনাগুলোকে। এই বসন্তকেও মাঝে মাঝে হোতে হয়েছিল ওদের দেহের বন্ধু—আপন দেহলি দিগন্তে কলঙ্ক সাজিয়ে। তবু কবির সাক্ষাতে তার মনের মলিনতা সিক্ত হোয়ে উঠেছিল এক পবিত্রভাবের আন্‌চান্‌ করা উদ্বেলতায়। যদিও—"অদ্ভুত দৃষ্টি বসন্তের! চোখে মদের নেশার আমেজ ধরিলে তাহার দৃষ্টি যেন রক্তমাখা ছুরির মত রাঙা এবং ধারাল হইয়া উঠে। আবার সুস্থ বসন্তের চোখের দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইতেছে—এ চোখ যেন রূপার কাজললতা।"—বসন্তের জীবনের পরিচিতিতে এইটাই শেষ কথা নয়। লোকে জানে ও রূপসী। ও নাচে, গান করে, আর দেহ চাইলেই দেহ বিকিয়ে দেয়। কিন্তু ওর ভেতরের সুপ্ত কবি-স্বরূপটি ভাবে, রূপে, জ্ঞানে মূর্ছনা তোলে মহাজন্ পদাবলীর আলাপচারিতার মুহূর্তে। সত্যি, কবি নিতাইয়ের জীবনে প্রয়োজন ছিল এমনই এক গীত-রসিকা সুবচনীর। এই বসন্তেরই কাছ থেকে নিতাই তার জীবনে প্রথম পাঠ নিয়েছিল —মহাজন পদাবলীর।

সর্বোপরি নারীর যুবতী ধর্মের কথায়, তাদের রমণীয় ভালোবাসার বহুত আকৃতিতে আর কবিয়ালের জীবনবিচিত্রার সহযোগে "কবি"তে যে মহৎ প্রয়াস মধুবর্ষী শিল্পকথারূপে প্রকাশ পেয়েছে—তার চরম সার্থকতা জীবন-পুজারী তারাশঙ্করের মনীষাকে শ্রেষ্ঠতায় স্বাক্ষরিত কোরেছে। এর পরেও বলব—মানুষের প্রণয়াকুলতা যে কত ব্যাপক, আর পুরুষের রূপ-ধ্যানে আলোকিত যুবতীর জন্য কত আবেশময়,—সে কথা "কবি" অনিন্দ্যতায় ফুটিয়েছে। বুঝতে দেরী হয় না যে, সাহিত্যের লিপিকায় সামন্ততান্ত্রিক যুগের ও গণতান্ত্রিকতার উন্মেষের রূপকার—তারাশঙ্করও যে মস্ত রসিক-সুজন আপনার রচনাধরার সবুজ পান্না হোয়ে ওঠা ভালোবাসার কারু-কাজ নিরূপণে—তা প্রমাণ কোরেছে এই "কবি" উপন্যাসের প্রেমচেতনার তাগিদেতে সুন্দর হোয়ে ওঠা গোলাপের মনমদির করা খোশবু ভরিয়ে।

"কবি"র প্রিয়াসুজনা বসন্তকে পড়ার ভেতরে ভালো না বেসে থাকা যায় না। কেন না, ও যে রূপসাগরের পিছল পথ থেকে সরে এসে হয়েছিল—কবিয়ালের চোখের মণিকুট্টিম। "রূপোর কাজললতা"। এই কাহিনীতে আলম্বন বিভাবের উদ্দীপনাকে ভরিয়েছিল দুটি জিনিস। এক বসন্তের ঠাট্টা। দুই, কবির ঘৃণা জড়ানো অনুরাগ-সঞ্চার।—সত্যি রাজার কাছ থেকে কবির প্রশস্তি শুনে বসন্ত তার পেশাগত স্বাভাবিক প্রগল্‌ভতায়

শুধিয়েছিল—"এই তুমারা ওস্তাদ নাকি? আ-মা-গ, বলিয়াই সে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল; সে হাসির আবেগে তাহার দীর্ঘ কৃশ তনু থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। মেয়েটা শুধু মুখ ভরিয়া হাসে না, সর্বাঙ্গ ভরিয়া হাসে। আর সে হাসির কি ধার! মানুষের মনের মনকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ধূলায় লুটাইয়া দেয়।"...আগেই বলেছি, বসন্ত হোল ঝুমুর দলের মেয়ে। যেমন সে নাচে আর গায়—তেমনি তাকে কোরতে হয় রিরংসিত পুরুষের সঙ্গে—দেহ-বেসাতি। আর বোধ হয়—ও ভাবেই সে ধূলোয় লুটিয়ে দেয় মানুষের ক্লেদাক্ত মনগুলোকে। মানুষের পশুত্বকে। তবু বলব, বসন্ত কবির সঙ্গে প্রথম পরিচিতি নিয়ে ঠাট্টা কোরেছিল সত্যি—তাই বলে অন্য দশ জনের চাইতে স্বতন্ত্র কোবে তাকে বুঝতে ভুল করে নি কিন্তু। বসন্ত উপমা দিয়েছিল কবিকে 'কয়লা মাণিক' বলে। কিন্তু তারও পরে বলেছিল—'কালো মাণিক'। ওদিকে কিন্তু নিতাই প্রণয়ব্যাকুলতার বাঁধনে ধীরে ধীরে আশ্লিষ্ট হচ্ছিল—ওরই নারী মনের সঙ্গে। হঠাৎ বিস্ময়ের ঘোর কেটে গিয়ে বসন্তের জন্য কবির কণ্ঠে গুনগুনিয়ে ওঠে গান—"আহা! আহা—রাঙা বরণ শিমূল ফুলের বাহার সার।"—

কবি সত্যি তার নিজের মনের মাধুরীতে রচনা কোরবে কবি-গানের। কিন্তু বসন্ত তাকে ভালোবেসে যে অমূল্য কাব্য-ভাণ্ডারে প্রবেশের চাবিকাঠি হাতে তুলে দিয়েছিল—তাব ভেতরে ফুটে ওঠে—নারীর চিরন্তন প্রেরণার ছবিটি। ও কবিকে টেনে নেয় ঝুমুর দলের কবিয়ালরূপে। আব সেই থেকে চলতে থাকে হাসি, আর হাসির দেশের উচ্ছলতা—বসন্তের নাচে আর নিতাইয়ের গানে। এই পরিচয়ের আগে পর্য্যন্ত বসন্তের জীবন পায়নি কোনদিন প্রেমডোবের সঘন বাঁধন—যা সমবয়েসী এই কবি তাকে প্রথম ছোঁয়াচেই দোলায়িত কোরেছিল। একটা কথা মনে পড়ে—ভালোবাসার একজনা যদি হয় দুরারোগ্য কোন অসুখেব মধ্যে কবলায়িত—তবে নিশ্চিত বলেই যেন অপরজন এগিয়ে আসে প্রীতির সঞ্জিবনী সুধা হাতে কোরে তাকে সুস্থ করাবার নিষ্ঠতায়। নিতাই ও বসন্তের প্রণয়-কথা বাঙলা সাহিত্যে এমনি এক ভাবের সাজঘর হোয়ে আছে। তাই দেখি, জীবন-যৌবন সম্ভোগের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে দাঁড়িয়ে...নিতাই—"বসন্তের হাত চাপিয়া ধরিল।...বসন্ত দাঁড়াইল।...পথে পথে ব্যবসায়ের বিপনী পাতিয়া যাহাদের ব্যবসায় করিয়া ঘুরিতে হয়—লজ্জা তাহাদের থাকে না, পথের ধূলায় হারাইয়া যায়। কিন্তু বসন্তের মুখ তবু আজ রাঙা হইয়া উঠিল।

আরও আশ্চর্য্যের কথা, মুহূর্ত পরেই তাহার চোখে জল দেখা দিল। মুখ ফিরাইয়া লইয়া সে বলিল—আমাকে দেখো না।···কেনে?···আমার কাশরোগ আছে। মধ্যে মধ্যে কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে। সনজেয়-সনজেয় জ্বর হয়, দেখ না। টপ টপ করিয়া বসন্তের চোখ হইতে এবার জল ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া হাসিল।···হোক। নিতাইয়ের বুকখানা তখন ফুলিয়া উঠিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল বর্বর বীরবংশীয় সন্তান রূঢ়তম পৌরুষের ভয়াল মূর্তি লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল। সে রূপ দেখিয়া ঠাকুরঝি সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু বসন্ত ঝুমুর দলের মেয়ে, তাহার রক্তের মধ্যে বর্বরতম মানুষের ভীষণতম ভয়াল মূর্তি সহ্য করিবার সাহস আছে। নিতাইকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।·· নিতাইয়ের বাহু-বন্ধনের মধ্যে নিভয়ে নিজেকে সমর্পণ করিয়া সে মৃদুস্বরে গান ধরিল—'বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম, গরব টুটাবে কে!···তেজি জাতি কুল পরাণ কৈলাম তোমারে সঁপিয়া দে'।···নিতাইয়ের বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। গান শুনিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল—এ কি গান! বসন্ত নিজে সে হাত আবার গলায় তুলিয়া লইয়া গাহিল—'পরাণ বঁধুয়া তুমি, তোমার আগেতে মরণ হউক এই বর মাগি আমি'।··অপূর্ব! অপূর্ব লাগিল নিতাইয়ের; চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। ধরা গলায় সে প্রশ্ন করিল—কোথা শিখলে এ গান? এ কোন কবিয়ালের গান?···হাসিয়া বসন দুইটি হাত জোড় করিয়া গাহিল—'যে হোল সে হোল—সব ক্ষমা কর বলিয়া ধরিল পায়,···রসের পাথারে না জানে সাঁতার ডুবল শেখর রায়।'·· গান শেষ করিয়া সে বলিল—মহাজনের পদ গো! আজই বলেছিলে না—মহাজন পদের কথা।·· অধীর মত্ততার মধ্যেও কবিয়াল হাসিয়া উঠিল। বসন্তের দুই হাত ধরিয়া মিনতি করিয়া নিতাই বলিল—আমাকে শেখাবে?···বসন্ত আবেগ ভরে নিতাইয়ের মুখ চুমায় চুমায় ভরিয়া দিল।"···

ভালোবাসার মধুরে মধুর সত্তার জাগরণ নারীর যৌবনকালের ভুলগুলোকে অনায়াসে ছাড়িয়ে ওঠাতে পারে। ও শুধু নিজের প্রিয়াকে বলাবে মোকাবিলায় —তুমি সুন্দর হও। আর তখনি হবে সে সুন্দর। গোলাপ যেমনটি হয়েছিল কবি-ভাষণে রেঙে ওঠায়! প্রণয়ের আবেদন যে পৃথিবীর সেরা বস্তু রূপে এসে প্রিয়র মন্‌মহলে আওয়াজ তোলে—পূর্ণ হওয়ার জন্য—সে কথাকে তারাশঙ্কর অপরূপ কোরে দেখাতে পেরেছেন—তাঁর এই বসন্ত চরিত্রের মধ্যে। দেবসমীপে

এরে পর যেমন হওয়া যায় অকলঙ্ক—তেমনি ঝুমুর দলের দিনমানের নাচওয়ালী, আর রাতের দেহোপজীবিনীর অন্ধকারে ঘেরা পরিচয় থেকে--মুক্তির জন্য বসন্তেরই বরনারী হওয়ার মিনতিভার ঝাপিয়ে পড়েছিল নিতাই কবির জীবনের সরল আন্তরিক নিষ্ঠার মধ্যে। নিজেকে সে হারিয়ে দিতে পেরেছিল কবিয়ালের কবিপ্রতিভার সপ্রতিভা আর সপ্রগল্‌ভা প্রেরণার মন-পবন হোয়ে।—আর তা আদরে সোহাগে চুমায় ভুলেছিল ভরিয়ে। কবি যে আবহমানকালের একটা মস্ত রীতির তাগিদে তারই প্রিয়ার ধ্যানে, আর জ্ঞানে, আর অনুরাগের চুম্বন-মাদকতা ও মিথুনানন্দ থেকে তোয়ের করে নেবে—ও সেই সঙ্গে মেলাবে নিজেকে সুদূরের ভাবলোকের কথায়—ঠিক এই রূপেতেই বাস্তবের কবিমনীষা রূপশিল্পী তারাশঙ্করের কল্পনায় ঝলমলিয়ে উঠেছে বসন্ত সমীপের আশ্লেষে মাতোয়াবা নিতাইয়ের মধ্যে। "...নিতাই বলিল,—আমার গুরু হবে কিন্তু।...গুরু! বসন্ত চকিত দৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চাহিল। বসন্ত যেন পাল্টাইয়া গেছে। গুরুগিবির রহস্যে সে হাসিতেও পারিল না।...হ্যাঁ। আমাকে পদাবলী শেখাতে হবে।...পদাবলী? মহাজনের পদ?...হ্যাঁ। ...বসন্ত চলিতে চলিতেই গান আরম্ভ করিল। অতি মৃদুস্বরে। নিতাই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল।·সমস্ত পথ ধরিয়া গানখানি সম্পূর্ণ গাহিয়া বসন্ত বলিল—এই হাতেখড়ি দিলাম।·নিতাই দেখিল, বসন্তের মুখ চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছে।...বসন্ত হাসিতে হাসিতে চোখ মুখ মুছিয়া বলিল—মহাজনের পদ। চোখ ফেটে জল আসে।"—এ কথা ভোলা শক্ত যে—মহাজন পদের বিভোরতা প্রাণের সরব ঘোষণার মধ্যে করুণ কান্নার দেশকে শুধুমাত্র ফুটিয়ে তোলে না।—মানুষ যখন যুবতী হোয়ে তার যুবককে চায় ভালোবেসে—তখন অজানিত কারণে জাগে দ্বন্দ্ববিলাস। যা চাওয়া যেতে পারে, তা ভুল কিছু না হোলেও—এক অনামধেয় ভ্রান্তিবিলাসের শুরু হয় প্রীতির ভুবনকে ঘিরে। প্রেম যে কত মহৎ শক্তির আধার—তাকেই তুলে ধরা হোয়েছে কবিয়াল সমীপে—বসন্তের মধ্যে। অনেক তাত্ত্বিক বলেন—মানুষ যখন কোন না কোন যন্ত্রণামুখর ব্যাধির করাল-ছায়ায় কবলিত হয়—তখনি প্রকাশ পায় তার ভেতরে সুপ্ত থাকা—প্রতিভার সঘন রূপটি। একটা জ্বালা, আর তার ধূমায়িত ক্লেশযন্ত্রণা প্রেমিকাকে জগতের কাছে তারই প্রিয়র সাক্ষাতে নামধেয় কোরে তোলে। তেমনি ভাবে কবিয়ালের জীবনের সঙ্গে ভাবের আর রীতির আবেশ-ঝরা সম্পর্কের গাঁটছড়া বেঁধেছিল বসন্তেরই ক্ষয়রোগগ্রস্ত

দেহলি-স্বপ্ন। ভালোবেসেও ভুল বুঝে না পাওয়ার যে দুঃখ—তার চাইতেও ব্যাপক হোল ভালোবাসতে 'বাসতে ও-পারের ডাকে সাড়া দিয়ে মৃত্যুর অন্ধকারের—আলো-অধিক পরশের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার কথা'—ঠিক যেমনটি প্রেমিকের অন্তরের আবেশলোক রাঙিয়ে তুলেও, প্রিয়া বসন্ত মৃত্যুর প্রেয়ত্বকেই আলিঙ্গন কোরেছিল—নিতাইকে শ্রেয়রূপে গ্রহণ করার মধ্যেই। আর প্রেম-কথার এই দার্শনিক দিকটিই আমাব ধারণায় মনীষী-শিল্পীর ধেয়ানের ধনে সালঙ্কৃত "কবি" উপন্যাসকে কোবে তুলেছে অনিন্দ্য;তার মধ্যে মধুরে সুন্দরতম। শিল্পায়নের সুরীতিকায় মঞ্জুলতম। আনন্দে ঋতা-সর্বস্ব।

আর তাই বারে বারে কবি-প্রিয়া বসন্তকে বন্দনা করায় করিয়ালের কাব্য-কথা যেন আমাদের কাছে একটা প্রবাদের মতো শোনায়—

'তোমার চোখে জল দেখিলে সারা ভোবন আঁধার দেখি।

তুমি আমার 'জেবনাধিক' জেনেও তুমি জান নাকি ?'‥ "

'জেবনাধিক' বলেই বলব—কবি নিতাইয়ের জীবনে এক হোয়ে মিশেছিল তার আপনার চাইতেও অধিক প্রিয় প্রসঙ্গগুলো—যে ভাবে আর অপরূপ ধ্যানে সালঙ্কৃতা হোয়ে উঠেছে ঠাকুরঝির সলজ্জ আকুলতা, আব সর্বোপরি ঝুমুর কন্যা রূপসী বসন্তেব দেহ-মনের বেপমান সুখের বিলোল শরমতা। আর তার আগে ও পরে টইটম্বুরতায় ডগ্‌মগিয়ে আছে কবির কবিতায় ছড়া কাটার কারিকুরির কুশলতা। সুনিপুণতা। আমারও বলতে ইচ্ছা করে—সবে মিলেমিশে "কবি"র আবেদন পাঠক মায় সমালোচক পর্য্যন্ত বহু গুঞ্জরনে স্বাক্ষরিত হোয়ে আছে—তাদেরও 'জেবনাধিক' প্রিয় প্রসঙ্গ রূপে। আর সেখানেই রয়েছে মানব-পূজারী তারাশঙ্করের আপন চিন্তার অসাধারণ স্বকীয়ত্ব রূপে রণিত —প্রেমরীতির সঘনতা সমেত সাহিত্য-স্রষ্টার চরম সার্থকতা।

রূপসে সুরভিত গোবোচনা বাঙলা কবিতা-মঞ্জিলের আম-দরবারে প্রণয় ও পরিণয় কথার মণিকুট্টিম হোয়ে রিমঝিম ঝিলিকে ঝিলিকে সবুজ উচ্ছলতা জানাচ্ছে—"নূতনা রাধা"—একটি কাব্য, আর তারই রূপদক্ষ মালাকার প্রকৃতিবাদী অন্নদাশঙ্কর রায়। আমার মতে এর কবি ধরা পড়েছেন তাঁর পাঠকের মনেতে, যে মুহূর্তের নূপুর শিঞ্জিনীতে জানাতে পারলেন—

"আমরা দু'জন রসিক সুজন সকল রসই ভালোবাসি।

এতই বৃহৎ নয় গো জগৎ গড়বে আড়াল দোঁহার মাঝে

স্দূর অদূর সমান মধুর বিয়ের বাঁশি নিত্য বাজে।
চোখের দেখা ভাগ্যেলেখা নেই বলে কি রইব একা ?
আমরা দু'জন রসিক সুজন লিখব রসের লিপিকা যে।"

—আর এই প্রণয় ও পরিণয়ের অনুষ্ঠানে অনুরাগের সন্ধ্যালি বার্তায় প্রকৃতি-বাদী অন্নদাশঙ্কর 'রসের লিপিকা'য় আবেশ ঝরিয়ে বলতে চেয়েছেন—

"হই সুন্দর রই সুন্দর করি সুন্দর সৃষ্টি
তব তনুরুচি তনু মোর শুচি অনুরঞ্জিত দৃষ্টি।"

—আর তাই-ই সত্যি বলে এই 'রসের লিপিকা'ই যৌবন-দেশের তরুণ-তরুণীর জন্য 'মিলনের গানে'তে সুরেলা সিম্‌ফনি ফুটিয়েছে—

"তোমাদের তরে মিলনের গান গাই/ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত।
তোমাদের সুখে সুখ মিলাবারে চাই/ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত।
প্রিয়বাহুলীনা অয়ি তনু তনুলতা/কানে কানে মৃদু সোহাগকূজনরতা
···ওগো নববধূ কেমনে বোঝাব কত।/তোমাদের সুখে সুখ মিলাবারে চাই··
চির মন্দার ফোটে তোমাদের বুকে···
শরৎ শেফালী ঝরে হাসি ভরা মুখে
রজনীতে রাস নব নব কৌতুকে/দিবসে বিবশ নিলাজ নর্ম্ম শত।
মলয়গন্ধি সুরা তোমাদের মুখে/ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত।"

—হ্যাঁ, এরই ভেতরে প্রকাশ পেয়েছে অন্নদাশঙ্করের আপন স্বকীয়তার অনিন্দ্য-সুন্দর শিল্পী-মানসটি—যার তুলনা একমাত্র মেলে তাঁর সুদূরাভিসারী শিল্প-বিচিত্রার নানান মহলে।—প্রধানত অন্দরমহলে, যেখানে মানব-মনের অশেষ, অপার দুর্জ্ঞেয়তার কঠিন দেওয়াল চূর্ণ কোরে শান্ত ও স্নিগ্ধ অন্তর্মুখীনতার মধ্যে তা আসীন। তাই আমি বলব, একদিন কোকিলের গান দিয়ে যিনি মিষ্টি কোকিলাকে আহ্বান কোরতে চেয়েছিলেন—আজ তিনি প্রকৃতির মধুরতা ও পুরুষের এলোমেলো জীবন-দ্বন্দ্বকে প্রেমের কঠিন বাঁধনে বন্দী কোরে গড়ে তুলেছেন অপরূপ এক জীবন-দর্শন। সত্যি যৌবনের অপ্রতিরোধ্য প্রেম সোনার তরী নিয়ে প্রবাহিত হোয়েছে তার উপসংহারের দিকে। আর এই মধুর অভিসারের বাসকসজ্জা পেতে সাজিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে আর গল্পে। প্রেমের পূজারী এই রূপদক্ষ শিল্পীর মানস-বিবাহ ঘটেছে সাহিত্যের সঙ্গে—মূলত প্রেমের সাহিত্যে। প্রেমের ব্যাপারে প্রখর যুক্তিবাদী হওয়া সত্বেও তিনি হোলেন অসাধারণ আদর্শবাদী। আর প্রকৃতিবাদী।

তার চাইতেও বড় কথা—"সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়" যে সবুজ প্রেমে আর লাজ-পলাশে যৌবন রাঙা যুবককে আর যুবতীকে করায় হ্লাদিত—এরই রূপ-আলিম্পনে অন্নদাশঙ্কর হোলেন চরম প্রকৃতিবাদী। যুক্তিবাদ আর আদর্শবাদের সঙ্ঘর্ষ ভুলে গিয়ে কথাশিল্পী আর একবার গানের কাকলিতে মুখর হোয়েছেন। কেন না, তিনি যে পেয়েছেন এক অরূপরতনের সন্ধান!

এই যে প্রণয়, এই যে লাজ-নির্ঝর পরিণয়, এই যে ঋতুরঙ্গীন রীতিতে প্রিয় ও প্রিয়ার নিলাজে আর সলাজের সুখে সুখী হওয়া—তার সব কিছুই নিয়মে থেকেও হোল অনিয়মের আর আকস্মিকতায় বিচিত্রা-মুখর সাজঘর, ও তারই স্বর্ণলেখ কারুকাজ। তাই অন্নদাশঙ্করের প্রণয়াদর্শ রস-কথার প্রগাঢ়তায় 'আকস্মিকে' ফুটেছে প্রিয়র জন্য প্রিয়ার কথায়—

"না চাহিতে দিলে কেন দু'খানি চুম্বন কহিলে না ডেকে
নয়নের নিদ গেছে নিদের স্বপন মসীরেখা এঁকে।
লাজে করি নাই মানা বলি নাই ছি ছি না না
কিছু কি ভাবিলে পরে কিছু খন হাতে মুখ ঢেকে?
এখনো রয়েছে যেন শ্রীমুখের ছাপ নামাবলীসম
কপোলে দাগিয়া গেছে কি মধুর পাপ সুকলঙ্কময়।
আরো আরো আরো যদি দিতে আহা মহানিধি
আমার মুছিয়া যেত সব মনস্তাপ ওগো প্রিয়তম।
তনুখানি সঁপে খেদ মোর নাই তুমি যদি চাহ
মুখমদ বরিষণ দাও গো, নিবাই প্রাণ ভরা দাহ।
শিহরণে শিহরণে মরিব সুখমরণে
চুমি' চুমি' দাও তুমি তড়িৎ প্রবাহি' করি অবগাহ।"

সত্যি, এমনটি না হোয়ে পারত না। আমার মনে হয় ওমর খৈয়ামের কথাই ঠিক, যেখানে সাকীকে তিনি বলেছিলেন, জীবন হলো সরাব ভর্তি পেয়ালার মত। এক চুমুকে তার সব শেষ। ঠিক এও যেন তেমনি। ঠিক একটি রজনীর মতই ভালোবাসাবাসির জগতের দুই মধুর যুবক ও যুবতীর কঠিন জীবন-বন্ধন, কখনো জ্যোৎস্না-প্রাঙ্গণে আবার কখনো বা অমাপ্রাঙ্গণে একটি শাখার শাখী থেকেই সব রকম পারিপার্শ্বিক ঝঞ্ঝাকে অস্বীকার কোরতে পারে। আর সেই কোরতে পারারই বলিষ্ঠতম জীবন কাহিনী রচনা কোরেছেন তিনি।

আমার প্রথম পরিচয় তাঁর প্রথম লেখা উপন্যাস "অসমাপিকা"র সঙ্গে। কথায় বলে—প্রথম প্রেমে যতই ভুল থাকুক না কেন, তাকে ত কিছুতেই ভোলা যায় না। শেষ পর্য্যন্ত তাকেই আদরে, রভসে লাজহরা কোরে আলিঙ্গনে, চুম্বনে বাঁধতে হয়! এই "অসমাপিকা" তাই আমার কাছে আজও প্রিয়-মধুর। সুরুচিকে ভোলা শক্ত। তার যৌবনান্বিত দেহ থেকে রূপ মুঠো মুঠো লজ্জা হোয়ে ঝরছে। আর তাজা মন উপছিয়ে পড়ছে এক বিদ্রোহিনীর শক্তি ভরা শান্তশ্রীতে। সুরুচি বিবাহিতা। কিন্তু এ বিবাহ সে মানে না। আজকেরই মত তিন দশক আগেও স্ত্রীকে বিয়ে কোরে তার মর্য্যাদা দেওয়া হোয়ে থাকত তথাকথিত শিক্ষিত ও ধনী সমাজে—'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'—এই অন্ধ প্রথার জন্য। সুরুচির এর জন্য বিদ্রোহ করার কারণ বড় বলিষ্ঠ—তা হোল, সে যে পুরুষকে বিয়ে করা সত্বেও স্বামী বলে ভালবাসা ত দূরের কথা, বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাও কোরতে পারল না—তেমন পুরুষের কাছ থেকে সে নিজে কিছুতেই মা হোতে চাইল না। এ অবস্থায় সুরুচি ভালবাসা পেল প্রগাঢ় ভাবে, আপন বৌদিদির ছোট ভাই, শান্ত-মধুর আর লাজুক মনের, কলেজে পাঠরত—সুচারুর কাছ থেকে। সোনার কাঠির ছোঁয়াচ অস্বীকার না কোরে সুরুচি শ্রীরাধার মতো লাজাঞ্জলি দিয়ে ভালবাসলো সুচারুকে, এবং একদিন শ্রীরাধার মতোই জীবন খুঁজে ফেরা যৌবন-অভিসারে সুচারুর সঙ্গে বিরাট পৃথিবীর অনাবিল উদারতার মধ্যে ভাসলো। তারপর? হ্যাঁ, তারপরের কথায় "অসমাপিকা"র সুচরিতা কন্যা তার প্রিয়কে যুক্তি দিয়ে প্রশ্ন কোরেছিল—"তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। তোমার বয়স কত?···(সুচারু)—বিশ থেকে একুশ। তোমার?···(সুরুচি)—সতেরো থেকে আঠারো।··(সুচারু)—বেশী মনে হয়।···(সুরুচি) তার কারণ আমি মেয়েমানুষ। ইঁচড়ে না পেকে আমরা পারি না। সবাই মিলে জোর করে পাকায়।"—আর তাই বুঝতে দেরী হয় না যে, যুবতী মেয়ে মাত্রেই যে কোন ব্যাপারে যতটা বুঝেসুঝে এগুতে পারে—ছেলে হোয়ে তার পক্ষে ততটা সম্ভব হোয়ে ওঠে না। ওরা, মানে ওদের যুবতীমন যা চায়—তার পেছনে থাকে—যুক্তির গ্রন্থি। তাই তো মুক্তিপ্রিয়ার অভিলাষে সুচারুর বুকেতে বন্দী থেকে কান্না ঝরাতে পারল যে সুরুচি—সেও সবলার ধ্যানে প্রিয়কে না বুঝিয়ে ছাড়ল না যে "···সুরুচি সুচারুর কানে কানে বল্লে, একটা কঠিন শপথ করবে? ···(সুচারু) কী শপথ?···(সুরুচি)—যত দিন না আমাকে আইন অনুসারে

বিয়ে করছ ততদিন আমায় শয্যায় ডাকবে না। …(সুচারু)—এই ? তা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারো।…(সুরুচি)—তুমি মহান্, তুমি দেবতা।… সুরুচির চোখে দুই বিন্দু জল। কিন্তু মুখে হাসি !"—ঠিকই, এমন ভাবের সৌন্দর্য্যে সুজনকে খুশী করাতে পারে যে কন্যা, সে সর্বাংশে হল কবিকল্পিত "মহুয়া"র "সবলা" ! কোন সন্দেহ নেই এতে।—আর একটা কথা আছে সেটা না বললে এর আলোচনা থেকে যাবে অসম্পূর্ণ। তা হোল, এ কাহিনীর শেষ দরবারের ভেতরে রেঙে ওঠা ভালোবাসার মধুক্ষর অভিজ্ঞানের রসস্বরূপ কথাটুকুর। "অসমাপিকা"র কাহিনী শেষ হোতে যেয়েও, শেষ না হোয়ে রেখে গেছে মণিমঞ্জুষালোকের অশেষ হৃদয়সর্বস্ব আকুতি আর মিনতিকে এর সমাপ্তি-পর্ব অপূর্ব হোয়ে ফুটেছে প্রথম ভালোবাসারই মদিরাস্রোতে ভেসে গিয়ে বিচ্ছেদের মধ্যে—"আর দেখা হবে না, শেষ দেখা। আর কথা হবে না, শেষ কথা। দেরী করলে চেনা লোক এসে পড়তে পারে। সুচারু প্যাসেঞ্জার গাড়ী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, সুচারুকে তার ভিতরে গা ঢাকা দিতে হবে।…সুচারু বিদ্যুদ্‌বেগে সুরুচির দুটি সুন্দর চোখে দুটি চুমু খেলে। এই শেষবার।…সুরুচি মুহূর্তের মধ্যে নিজের আঙুল থেকে আংটি খুলে সুচারুর আঙুলে পরিয়ে দিলে। বল্লে, এক জন্মের অদর্শন তো কিছুই নয়, প্রিয়তম এই রইলো অভিজ্ঞান।…সুচারু বল্লে, "এ জন্মে যা তুমি অসমাপ্ত রাখলে আর জন্মে সমাপ্ত করবে তো ?"—সত্যি, চিরন্তন সুরীতির ঋতু-বিচিত্রার আলয়ে প্রিয় ও প্রিয়া ভালোবাসাবাসির ধ্যানে আর আরাধনায় একে অপরকে এমন মঞ্জুল কথাই আনন্দে নির্ঝর কোরে শোনায়। জানায়। বলাবলি করে।

"অসমাপিকা" নিয়ে এত কথা বলবার কারণ তার সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে লেখা লেখকেরই প্রস্তাবিত মহৎ প্রয়াসে সৃষ্ট দ্বিতীয় 'এপিক' উপন্যাস "রত্ন ও শ্রীমতী"র প্রসঙ্গ সহজতর কোরতে।—একটা কথা আগেই বলে রাখি— অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর মঞ্জুল-ভাষা আর রভস-কথার মায়ামাধুরীর বিভূতিতে অন্য যে কোন কথাশিল্পীর কাছে অনন্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর এর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন কোরেছে "রত্ন ও শ্রীমতী"। এই উপন্যাসে নায়িকা শ্রীমতী গৌরী সুরুচিরই মতো একই কারণে স্বামী যশোমাধবকে বাধা দিয়েছে স্ত্রীর রূপশ্রী দেহ-সম্ভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত কোরে। শ্রীমতী শেষ পর্য্যন্ত দৈহিক কামনার জগৎ থেকে সরে এসে রত্নকে চার চোখের মিলনের মধ্যে বরণ কোরল। সে সময়ে 'অনয়া রাধিকা আরাধিকা'র মতো শ্রীমতী গৌরী তাঁর

রূপবতী বুকের হঠাৎ তীব্র আলোর ঝলকানি দেওয়া 'বজ্রশ্রী'র শ্রী দিয়ে আরতি-দীপ জ্বালিয়ে, দেখিয়ে, বরণ কোরে নেয় যুবক রত্নর—চোখের না জানানো মধুর ভাষা, আর মুখের পরশ না পাওয়া স্মিত ব্যঞ্জনাকে।—তবু এত'র পরেও ক্ষোভ থেকে গেল। "রত্ন ও শ্রীমতী" আজও সমাপ্ত না হোলেও আমি বলব, বাঙলা সাহিত্যের এক অশেষ দামী রচনা এই উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক রত্নর কথা আমার মনের মাধুরীতে স্বপ্ন এঁকেছে—"স্বাধীন পুরুষের সঙ্গে স্বাধীনা নারীর স্বাধীনভাবে যে ভালবাসা তারই উপসংহার হলো বিবাহ।" আর এই কাহিনী পড়তে পড়তে এরই সত্যসন্ধ রূপদ্রষ্টার কবি-কথাটি মনে দোল দিয়ে ওঠে কাকলি ঝরিয়ে—

"বসন্ত নিতি তুলি বুলায় দিক্ সীঁথায়
সমীরণ নিতি বাঁশি বাজায় "রাধা কোথায়"।"

শুধু তাই নয়। এই উপন্যাসে অন্নদাশঙ্কর অসম্ভব অনেক কিছুকে সম্ভবের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ কোরেছেন। ভেবেছেন। আর সেই সঙ্গে ভাবিয়েছেনও। সেখানে আছে প্রেমিকের ভাবনা। প্রেম বড় না প্যাশন বড়। সমাজে যুগ্যিমন্ত মেয়েদের অকাল-বসন্তে হারিয়ে যাওয়ার ব্যথা। তাদের কান্না। অভাবের হাহাকার। অন্নদাশঙ্করের সাজানো কথায়—"রত্ন শুধু বলল—"আমার প্রেমের অনুভূতি জ্বালাময় নয়।" প্রভাত যেন এর জন্য তৈরি ছিল। দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, "আর আমাকে দগ্ধ করেছে আশাহীন এক প্যাশন।"···"প্যাশন!" চমকে উঠে সামলে নিল রত্ন। "তাই বলো।"·· "কেন? প্যাশন কি প্রেম নয়?" ··"তা কী করে হবে?"···"হাওয়া যে করে ঝড় হয়। জল যে করে মেঘ হয়। আলো যে করে আগুন হয়। প্রেম যখন গাঢ় হয় তখন তাকে বলি প্যাশন।"

প্রকৃতিবাদী অন্নদাশঙ্কর রায় হোলেন সৌন্দর্য্যের পূজারী। তিনি প্রেম ও পরিণয়ের মহতী কথাকে তার প্রায় সমস্ত গল্পেই আমেজ মুখরিত করে রচনা করেছেন। "মন পবনে"র প্রত্যেকটি গল্পই নিখুঁত ভাবে রচনা করা হয়েছে। লেখক "দু' কানকাটা" গল্পে শ্রীরাধার প্রেমতত্ত্বকে এক নতুন অর্থে আরোপ কোরেছেন। রাধা-তত্ত্বে রাধা যেমন প্রেমের ব্যাপারে সক্রিয়া, এ গল্পের নায়িকা কিন্তু তার প্রেমের মানুষটিকে করেছে—সক্রিয়। যে প্রেম হিংসা ভুলে যায়, রাগ করে না, আর ভুল বুঝে বিন্দুমাত্র লজ্জা পায় না পরস্ত্রীকে পরকীয়া রূপে ভালবাসতে—তারই বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে এর নায়কের জীবনে। ছোটবেলায় তাঁরা ভালবেসেছিল। যৌবনে এসে কার্য্য-কারণ সম্পর্কে দুই

এক হোতে না হোতে, আলাদা হয়ে গেল। তবুও তাতে দুঃখ নেই। শুক-সারী তারা মনে মনে হয়েই রইল। দেহে দেহে নয়। তাদের প্রেম নিকষ হেমের ছোঁয়াচ পেয়েছে। গল্পের শেষে দেখি, সারি আজ এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত ধনী পুরুষের নর্ম-সহচরী রূপে ভ্রমণ করছে রেলের প্রথম শ্রেণীতে। আর সুকু কোথায়? সে তখন তার নারীর সুখে সুখী হয়ে পরকীয়া প্রেমের বরনারীকে সেবা যত্ন দিতে এগিয়ে এসেছে তারই পরিচারক হয়ে। সারী প্রথম শ্রেণীতে, আর সুকুর স্থান গাড়ীর সার্ভেন্টস্ ভ্যানেতে। লেখকের প্রশ্নের উত্তরে সুকু লজ্জাহীন উক্তি করে গর্বের সঙ্গেই বলেছিল—"ও যে রাধা।"—প্রেম বোধ হয় পুরুষকে তার ভাললাগা, আর ভালবাসার নারীর জন্য এমনই সক্রিয় করে তোলে। কোরে তোলে এভাবে—সুখী। আর তাই "নূতনা রাধা"'র কবি বলতে পেরেছেন—

"পুন পুন বনে পড়িবে বাঁধা নূতনা রাধা।
পুন কোন বনে বাঁশরি সাধা আবার কাঁদা।
পথের কোথাও শেষ কি আছে
পথিকের কোন দেশ কি আছে!
ঘরের বাঁধনে নাই কি বাঁধা নাই কি কাঁদা?
সমাপিবে চির বাঁশরি সাধা সুচিরা রাধা।"

আমরা জানি—অন্নদাশঙ্কর হোলেন দারুণ আদর্শবাদী—প্রেমের কথায় আর পরিণয়ের কথায়।—তাই যতদিন প্রতীক্ষা করা হোক না কেন—এক যুবক আর এক যুবতীকে কাছাকাছি এসে শুভদৃষ্টির বিনিময়ে অন্তরঙ্গতম হওয়ার কাজটুকু যখনি সহজ ভাবে উপস্থিত হবে—তখনি তাকে বিনা দ্বিধায় সহজ ভাবে গ্রহণ কোরে স্বীকৃতি দেওয়াই হোল মানবিক পরিচয়। আর সে রকম পরিচয়কেই ফুটিয়ে রেখেছে তাঁর লেখা "বজ্র আঁটুনি" গল্পটি। নায়ক সুমন্ত আজ বয়সের দিক থেকে চল্লিশের দরজায়। যৌবন বোধ হয় এখনও পুরুষের জন্য অপেক্ষা কোরে আছে—যদি পুরুষ একবার তাকে আস্বাদন কোরতো তা হোলে নিশ্চয়ই যৌবন শেষ বারের মত যৌবনের রাজটীকায় সাজিয়ে দিতে তাকে। পথ চলতে চলতে সুমন্ত হঠাৎ একদিন মিললো শৈলপুরী দার্জিলিঙে তার যৌবন-কালের উচ্ছলা বরনারী—নূপুরের সঙ্গে। ভালবাসা নিয়ে বাসতে চাওয়া অনেকদিনের প্রতীক্ষা চার চোখের মিলনেতে একে-অপরকে নিজেদের অভিজ্ঞতা জড়ানো স্বভাব থেকে আরতি কোরে বসলো। অন্য কোন কথা নয়।

কোন ভাবনা-চিন্তা নয়। নট্ টু ডু—আর নয়। এবার হ্যাঁ, এবার শুধু—টু ডু। তাই তারা শেষ পর্য্যন্ত কোরলো। অনেকদিন আগেকার প্রণয় শেষ বেলায় তাদের—সুমন্ত আর নূপুরকে—দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মিটিয়ে পরিণয়ের শুভ-জীবনে আসতে বাধ্য করালো। কিন্তু আনন্দ আর খুশী তাদের চারধার থেকে ঘিরে রাখলেও—নূপুর আজ স্ত্রী হোয়েও একটা অতৃপ্তির জন্য কাঁদলো! আজকের স্বভাবের নূপুর তার প্রেমিক-সুজন সুমন্তকে খুশী করাতে চায়। মুগ্ধ করাতে চায় নারীর গরীয়সী রূপ দেখিয়ে—যেখানে নারী মাত্রেই প্রিয়ার পরবর্তী পর্য্যায়ে স্নিগ্ধা-মা। হাজার রকম মধুর সুষমায় ঘেরা যার পরিচয়। নূপুরের মনেতে শঙ্কা—সুমন্ত কি এতদিন পরে আজ পারবে তার প্রিয়ার মা হওয়াকে সার্থক কোরে তুলতে। এমন প্রশ্ন মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক। এ যে নারীর জন্যে নারীর যৌবনকে ধন্য করাতে পুরুষের নিজেরই পরিপূর্ণতা আনা, যৌবনেরই ব্রত। বন্দনা জানানো প্রিয়া স্ত্রীর জন্যে—বন্দিত স্বামীর সাধনা। কুমারসম্ভবের জন্য তপস্যা। আজ নূপুর উমা—সুমন্ত শিব। তাদের মিলন হোতে পারে—কিন্তু তবুও শঙ্কা জাগে সেখানে—যদি তাদের কুমারসম্ভব না হয়। তাদের দেরী হোয়েছে। কিন্তু তাই বলে আর প্রাকৃতিক অবস্থা তাদের জন্য আজও উর্বর আছে কিনা—এই হোলো সমস্যা। নূপুরের ক্রন্দসী দেহকে বুকে টেনে সুমন্ত তাকে আদর কোরতে কোরতে পুরুষের পৌরুষ কথাকে কানে কানে শুনিয়েছিল—তারা নিশ্চয়ই কুমারসম্ভব করাবে। স্বামী হোয়ে স্ত্রীর জন্য। পুরুষ হোয়ে নারীর জন্য।—আমরা অস্বীকার কোরতে পারব না।—পুরুষ ও নারীর জীবনেতে এ সত্য, বড় উজ্জ্বল সত্য। এ সমস্যার সমাধানও আছে। আর সে সমাধানের কথাকে মনীষা ভরিয়ে অন্নদাশঙ্কর তাঁর গল্পে আর উপন্যাসে জানিয়েছেন। হাজার জটিলতায় ভরা পুরুষ ও রমণীর দাম্পত্য-জীবনের সুসমাধান পাওয়া সুসমঞ্জস জীবনেরই অসাধারণ কথাকার হোয়ে দেখা দিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর। মনে হয়, এখানে তিনি অদ্বিতীয়।—অন্যের দৃষ্টিতে যা অসম্ভব, তাকে সম্ভব কেন করাবে না তাদের দম্পতি-রূপ! তাই মরিয়া হোয়ে উঠেছে ক্রন্দসী নারীর ভাবী মাতৃত্বের জন্য আকুতি—"নূপুর তাকে দুটি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আধো আধো স্বরে বললে, 'ওগো, তুমিও কি যোগী হবে?'...পুলকে ও বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে ক্ষণকাল নির্বাক থাকল সুমন্ত। আবিষ্কারের মতো উল্লাসে বলল, 'ওঃ, এইজন্যে এত কান্না! যোগী! আমি হব যোগী!' আবার কি মনে করে প্রিয়াকে আতঙ্কিত করে তুলল

এই বলে, 'হাঁ হাঁ যোগী হব আমি। যেমন তেমন যোগী নয়, মহাযোগী।'… তারপর নিজেই আতঙ্কিতার আতঙ্ক ভঞ্জন করে বললে, 'কার মতো, জানো? কুমারসম্ভবের মহাদেবের মত'।"

প্রেম—তা নিয়ে পুরুষের আকুতি, নারীর মিনতি—দুইয়ে মিলে তাদের যুগল কথাকে মধুর ব্যঞ্জনায় তুলে ধরেছেন অন্নদাশঙ্কর রায় অপূর্ব-অনিন্দ্যতায় ভরিয়ে—"যখন তারা দ্বন্দ্ব বাঁধায় তখন তারা পরস্পরেব অন্তর্লীন, নিশ্বাস প্রশ্বাসেব ভাগী। প্রগাঢ় প্রেমের নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যেই তাদের দ্বৈরথ সমর. দ্বৈরথ সমরের ছলে তারা পরস্পরের আসঙ্গলোলুপ। কোনো মতেই দূরে থাকতে পারে না, অথচ কোনো মতেই তারা একাকার হতে পারে না। না পারে তারা ক্লীব হতে, না পারে অর্ধনারীশ্বর হতে। প্রবল অভিমানে পরস্পরকে ফেলে লক্ষ যোজন দূরে পালাতে পারলে তাদের সমস্যা ঘুচত, উন্মত্ত আলিঙ্গনে এক হয়ে যেতে পারলে তাদের লীলা সাঙ্গ হতো; কিন্তু নির্মম প্রকৃতি এর কোনোটাই হতে দেবে না,—সে চায় দ্বন্দ্ব ও মিলন, কাছে আসা ও আলগা থাকা, টানাটানি ও ঠেলাঠেলি। স্ত্রীকে সে স্ত্রীই রাখবে, পুরুষকে পুরুষ এবং পরস্পবকে পরস্পরের করে তাদের অভিমানকে চোখের জলে ভাসিয়ে দেবে।…" —আবো আছে—"পরস্পরেব মুখে মুখ রেখে সূর্য ও সূর্যমুখী যেমন প্রহরে প্রহরে চলে, পরস্পরেব প্রতি বিপরীত হয়ে স্ত্রী ও পুরুষ তেমনি যুগে যুগে চলেছে।"—প্রেমের এমন মধুর ভাষ্য খুব কমই আছে। এক কথায় অতুলনীয়। অনিন্দ্যসুন্দর। রভসতার রূপকুট্টিম!

প্রেম ও পরিণয়ের এই ভাবকুট্টিমতা ও রূপকুট্টিমতায় সালঙ্কৃত অন্নদাশঙ্করের দুটি ছোট উপন্যাস হিসাবে একদিকে "আগুন নিয়ে খেলা"তে দেখানো হোয়োছে আমাদের দেশের কল্যাণ সোম—যে ইংলণ্ডে পড়তে এসে "কলিন" নামে রূপান্তরিত হোয়েছে—সে অল্পদিনেই তথাকথিত প্রেমের "লুকোচুরি" খেলাতে মেতে যায়। আগুন মেয়ে রূপবতী পেগী স্কটের প্রজ্জ্বলিত যৌবন রঙের ঝলসানো আভায় ধাঁধিয়ে যায় কল্যাণের চোখ।—কিন্তু সে পেগীর দেহকেই ভালোবাসল।—তার হৃদয়কে নয়। বাঙলা দেশের শান্ত প্রকৃতিতে মানুষ হওয়া কল্যাণ ইংলণ্ডের মাটিতে প্রেমের ব্যাপারে প্রতারণা করে।—কিন্তু এর জন্যে পেগীর প্রতি সহজেই অনুকম্পা জাগে পাঠকের। অন্নদাশঙ্করের রূপকাঠির যাদুতে পেগী আগুন মেয়ে হওয়া সত্বেও, তার মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত ফুটে উঠেছিল—চন্দ্রমল্লিকার মুঠো মুঠো স্নিগ্ধতা। বিদেশিনীর চরিত্র হিসাবে

একটি সুন্দর রূপায়ণ এই পেগী স্কটের মধুক্ষরা ছন্দ তোলা চরিত্রটি। পেগীর চরিত্র একটি বড় সত্যের ওপরে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।—তা এই যে, আমাদের দেশের মেয়েদের মতনই ওরাও লজ্জাশীলা।—জীবনে "মডেষ্টি" ও "চেষ্টিটি"—উভয়েরই দাম দিতে পারে পূরোমাত্রায়। আর শালীনতার বোধটুকুও খুব বেশী। উপন্যাসের মধ্যে এক জায়গায় কল্যাণকে অধিকার দিয়েছে পেগী তার প্রগল্‌ভ যৌবন-দেহকে "আর্ট অফ্ পেটিং"-এর মধ্যে নিয়ে যেতে। কিন্তু যে মুহূর্তে কল্যাণ তার বেপমান হাতের শালীনতাকে ভুলে এক বশীভূতা প্রেমাভিলাষিণীর গোপনতম লজ্জাকে অস্বীকার কোরতে চাইল—ঠিক তখনি পেগী কল্যাণের শঠতাকে বাধা দিতে পেরেছিল। আর তার ফলে লেখকের এ হেন "বিহেভিয়ারিজমে"র বর্ণনা শিল্পময় হয়ে উঠেছে।

অপর উপন্যাস "কন্যা"।—আজকের জটিল পৃথিবীর এলো-মেলো দিশাহীন জীবন ধারার জটিলতম ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে ভাসমান সদা-সংশয় ভরাট চিন্তারাজির সামনে এক মহান সত্যকে দাঁড় করিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর। যে সত্য অনুসারে "ব্রহ্মৈবকেবলমে'র অদ্বৈত-রূপ একদিন মিথ্যা হোয়ে গেল তার অতৃপ্তির পূর্ণতার জন্য। বিভক্ত হোয়ে দুই রূপ হোল। ব্রহ্মা তাঁর পাশে প্রকৃতিকে সৃজন কোরে স্থানাভিষিক্তা করালেন লীলা-সত্বার পরিপূর্ণা রূপের মধ্যে। রসাভাস ও চিদাভাস আলাদা থেকে থেকে দুইয়ে মিলে এক হোয়ে যায়।—তেমনি আজকের এই আধুনিক মুহূর্তে পৃথিবীতে নারীর স্নিগ্ধমাধুর্য্যভরা রূপকে অস্বীকার কোরে পুরুষের বেঁচে থাকার মধ্যে জীবনের কোন সার্থকতা আসে না। তার সব সার্থকতা নিহিত আছে নারী-পুরুষের এক হোয়ে যাওয়া যুগল রূপের মধ্যে। লেখকের ভাষায়—"সঙ্গত হওয়া। এই সঙ্গত থেকে আসে নারী-পুরুষের সম্ভোগ।"—আর এই সম্ভোগের সাব্লিমেশান প্রেমের রূপযান চড়ে ভূমা-র দিকে অগ্রসর হয়। তাই পুরুষের জীবনের পরিপূর্ণ রূপের কাছে নারী অশেষ ও অপরিহার্য্য। সে নারী কলাবতী, কান্তিমতি, রূপমতি বা পদ্মাবতী—যে রূপেই আসুক না কেন—তাই-ই তন্ময়, অনুত্তম, সুজন বা কান্তি—এদের প্রত্যেকের জীবনকে পূর্ণতার মধ্যে ভাসিয়ে নিতে পারবে। কেন না, নারী নারী-ই। এ যাদু-মন্ত্র পুরুষের জন্য একমাত্র তারই হাতের মধ্যে আছে। অন্নদাশঙ্করের "কন্যা" বার বার একটি কথাকেই পুরুষের কানে কানে প্রেমাভিসারের গীতালির সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে পাতিয়ে জানাচ্ছে—"The eternal womanly draws us upward."

অন্নদাশঙ্করের সর্বাধুনিক উপন্যাস "সুখ"। প্রবীণত্বে এসে মনীষীর দৃষ্টিতে মনীষা ভরিয়ে সৃষ্টি কোরেছেন এই বই। রূপকথার দেশের রাজকন্যা আর রাজপুত্রের মত আজকের দুই যুবক-যুবতী, দেবপ্রিয় আর মালা, সুখের অন্বেষণ কোরেছিল এবং অনেক পরিক্রমার পর ভালোবাসা ও বিবাহের মধ্যে সুছন্দে ঘেরা জীবনেতে সে সুখের সন্ধান তারা দেখাতেও পেরেছে—নিজেরা সে সুখে সুখী ও খুশী হোয়ে। "সুখ" উপন্যাসের উপসংহার অপূর্ব স্নিগ্ধতায় আর মধুরতায় ভরানো—"সেটি?" মালা আমার দিকে মধুর ভাবে তাকায়। "সেটি আনতে যেতে হবে মায়াপাহাড়ে নয়। রূপলোকে। সেও এক মায়ার রাজ্য। সেখানে যাবে তুমি।"..."আমি! কি সর্বনাশ!" আমি চমকে উঠি "সে কি সোজা রাস্তা! মালা! তুমি কি জান না যে রূপলোকের মার্গও মায়াপাহাড়ের পথের মতোই বিপদসঙ্কুল! ছায়া-মূর্তিরা আমাকে ভয় দেখাবে। সোনার হরিণরা আমার লোভ জাগাবে। আমার প্রহরী হবে কে?"..."আমি। আমি হব তোমার বিনিদ্র প্রহরী!" মালা আমাকে কথা দেয়।..."তার পর," আমি আকুল কণ্ঠে বলি, "সংসারের ধান্দায় আমি ভুলে যেতে পারি কে আমি, কী আমার লক্ষ্য। ওগো, তুমি কি আমাকে মনে করিয়ে দেবে? তোমার নিজেরি মনে থাকবে তো?".. "নিশ্চয়।" মালা প্রতিশ্রুত হয়, "সংসারের ধান্দা থেকেও যতটা পারি বাঁচাব।"..."তার পর," আমি চিন্তান্বিত হয়ে বলি, "মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে আমার প্রবৃত্তি নেই। কিন্তু অন্যায় যখন ঔদ্ধত্যভাবে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়, নিরীহকে আঘাত করে, তখন আমি স্থির থাকতে পারি নে। ফলে বিপদ ডেকে আনি। দেবী, সে সময় তুমি কি আমার পাশে দাঁড়াবে?"..."তৎক্ষণাৎ।" মালা আমাকে ধন্য করে দেয়। "সৌন্দর্য্য আর আনন্দ আনতে যাচ্ছ বলে তুমি কি রাজপুত্র নও? রাজপুত্র হয়ে থাকলে রাক্ষসের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাঁধবেই। তুমি না চাইলেও, আমিই তোমাকে দ্বন্দ্বে নামাব। আমি, আমি যে তোমার শক্তি।"... "অবশেষে", আমি মন খুলি, "আর একটি কথা। এবার সাধনায় আমি রূপদক্ষ হতে পারি। কিন্তু রসবিদগ্ধ হব কী করে? তার জন্য নিতে হয় নারীর কাছে দীক্ষা। তার জন্যে করতে হয় দু'জনায় মিলে যোগসাধন। সখি, তুমি কি আমাকে রসের দীক্ষা দেবে?"...মালা মৌন থাকে। সম্মতির লক্ষণ দেখে আমি ওকে কোলে টেনে নিয়ে সোহাগ জানিয়ে বলি, "প্রিয়ে, তবে তাই হবে। আমি যাব আনতে সোনার শুকপাখি।"

যে সুখের কথা অজস্র খুশীতে আত্মহারা ঝর্ণা হোয়ে উঠেছে "সুখ" উপন্যাসে—তিন দশকেরও আগে আন্তর্জাতিকতার মধ্যে থেকে সে সুখের সন্ধান পথ খুঁজেছিল সত্যলোকের "সত্যাসত্য" কাহিনীর ভেতরে। কখনো বাস্তবে আর কল্পনায়—কখনো প্রমিতি বোধের অভিব্যঞ্জনায়। সেদিনকার সত্যলোকের অসত্যতাকে মিথ্যা কোরে দিতে চেয়েছিল মানুষের জন্য—মানুষের প্রেম। মিথ্যা কোরতে চেয়েছিল উজ্জয়িনী তার জীবন-প্রতিম স্বামী বাদলের আত্মকেন্দ্রিক মানবতাকে।—কেন না বাদল বুদ্ধিজীবী ইগোটিষ্ট হওয়ায় নিজের আত্মসুখ পেলেও, আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট-চিত্ত বাদল তার পরিণীতাকে ভালোবাসার মদিরাস্রোতে টেনে নিতে সচেষ্ট নয়। যদিও তাই বলে বাদল নারী-বিদ্বেষী নয়। মনে হয় তার ভেতরে জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রমিতি সব কিছুই অপর্য্যাপ্তই আছে। যা নেই, তা হোল—শুধু আবেগ। আর আবেগ থেকে আসা—সেই অভিমান। যদি তা থাকত, তা হোলে উজ্জয়িনীর মঞ্জুল স্বভাবের মধুশ্রী ভরা মন খুশী হয়ে উঠত। হোত রতিতে সুখী। বাস্তব থেকে রূপলোকের তৃপ্তিকে আস্বাদন করবার জন্য সে সাধিকা হোতে চেয়েছিল—শ্রীরাধার মানসিক দৃপ্ততায় ও শারিরীক উচ্ছল বিহ্বলতায়—যদি সে প্রিয়ার দাবীতে পরমপুরুষ, পরম সঙ্গী, পরিণয়-সিদ্ধ সামাজিক বাঁধনের জীবন-দেবতারূপী বাদলের স্বামীত্বকে ফিরে পায় একান্ত ভাবে। প্রেমবতী বরবর্ণিকা উজ্জয়িনীর মন গঠিত ছিল এ-দেশেরই নিখুঁত মাধুর্য্যে। তার মন-দেউলে প্রিয়স্বজনের কথাও ছিল বড বেশী জাগরূক। ফলে, শেষে হোল সে বিদ্রোহিনী। বিদ্রোহ তার সুখের সন্ধানে। মানুষ পরিচয়ে, রমণীয় যুবতী পরিচয়ে সে তার যৌবনকে পরিপূর্ণ করাতে চায় তেমনি এক সুন্দর আকৃতি ভরানো বরপুরুষের ভালোবাসায়—যার রূপে শ্রীমতীর চোখ থেকে মুক্তোর বিন্দু হোয়ে জল ঝরে—যার গুণের কথায় মনের খুশী হয় আপ্লুত—যার প্রতি অঙ্গের 'দরশ-পরশ লাগি আওলাইছে গা'—তেমনি একজনের কাছে নিজেকে নিবেদিতা করাতে চায় উজ্জয়িনী। সেজন্য সে সুদূরের ইংলণ্ডে এসে পর্য্যন্ত পৌছয়।—শুধু একটিবার বহুত মিনতি জানিয়ে ফিরে পেতে চায়—বা নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় দম্পতির সুখলোভাতুর জীবনের সাত পাকে বাঁধা—বাদলের কবোষ্ণ বুকের আশ্রয়ে। সেখানে উজ্জয়িনী শুধু আবেগের রঙবাহার অভিমানে নিজেকে সাজিয়ে তুলবে। আর পরমুহূর্ত্তে তা ভাঙ্গাবে—বাদলের ভালোবাসা পেয়ে। কিন্তু যা-ছিল মধুর ভাবনা, বাস্তব তাকে কোরল রূঢ়

পরিহাস—একজন বিশ্ব-মুগ্ধ পুরুষের আত্মকেন্দ্রিক প্রীতি দিয়ে। প্রত্যাখ্যাতা হোলেও উজ্জয়িনী ভেঙ্গে পড়লো না। ব্রতচারিণী হোয়েছে সে।—আর ব্রত অনুসারে সে তার যৌবনকে বিন্দুমাত্র অতৃপ্ত রাখবে না। পূর্ণ করাবে তা সুখলোকে। সুখেরই রূপলোকে। মায়ালোকে।—শেষ পর্যন্ত এই বরবর্ণিনী সুখের সন্ধান পেল এমন এক পুরুষের কাছে—বাইরের পরিচয়ে যে একজন স্বার্থান্বেষী। কিন্তু তা ঠিক নয়। কুমারকৃষ্ণ দে সরকারকে প্রেমের মায়াকারাগারে অশেষভাবে রূপ-স্নান করাতে পেরেছিল উজ্জয়িনী। আর পেরেছিল আস্তে আস্তে তাকে হৃদয় দিয়ে প্রেমময় কোরে তুলতে। তাই হয়েছিল কুমারের ভালবাসাতে চাওয়া যৌবনের বিহ্বলতা। কুমার যৌবনের তাগিদে যুবতীর মধ্যে সুখকে অন্বেষণ কোরতে এগিয়ে এসেছিল।—আর যুবতীর রূপ ঝরানো রংবেরং আঁচলের বিস্ময়ে ঢেকে ফেলেছিল সে তার সব রকম 'ইগো'তে ভরানো চাহিদাকে। সে চাইল উজ্জয়িনীকে সুখী কোরতে। আর নিজেও সুখী হোতে—মানবতার তৃপ্তিলোকে। কুমারের কুমার-বিস্ময়কে ধন্য কোরেছিল উজ্জয়িনী সুখলোকের সন্ধান দিয়ে। সে সঙ্গে নিজেও পেয়ে।—পৃথিবীতে যৌবন সৃষ্টি হয় পূর্ণতার জন্যেই। তা পথ হারাবার জন্য নয়। নারীত্ব যৌবনের আহ্বানে পুরুষত্বকে বন্দনা কোরে তারই কাছে নিজেকে তিল-তুলসী দিয়ে সমর্পিতা করায়—সংযুক্ত-যুগল হওয়ারই—পূর্ণলোকে। পুরুষ নারীর অবদান থেকে সুখ পায় মুঠো ভোরে। মন-প্রাণ উপছিয়ে। পুরুষের খুশীর জন্যেই নারীর এই সুখ-সন্ধান হয় রূপলোকে। কল্পলোকে। মায়ালোকে। আর প্রণয় ও পরিণয়লোকের পূর্ণমিদম্ সত্তায়।—অন্নদাশঙ্কর সত্যলোকের এই ব্যাপক কথাকেই এখানে ফুটিয়ে রেখেছেন। আর এঁকেছেন তা মহান এক সত্যের আধারে।—আর সে আধারটি হোল—সুখ।—যা কখনো অর্থের, বৈভবের, শক্তির বিনিময়ে পাওয়া যায় না। বিকিকিনি করা যায় না।

আবার "সুখ" উপন্যাসের সুখের কথায় ফিরে আসছি।

সুখ সত্যি সুখ হোয়ে মূর্ছনা তুলেছে মনীষী-লেখক অন্নদাশঙ্করের "সুখ" উপন্যাসের প্রারম্ভেই—

"তরুণ তরুণী / দুর্লভ এই জীবন / জীবনে মিলন / মিলনে সুখ।
যা পেয়েছ তারে / অর্জন করো বিনয়ে / চির প্রণয়ে / সহাস সুখ।"

—তাই রূপদক্ষ আর প্রেম ও সৌন্দর্য্যের পূজারী অন্নদাশঙ্করকে তাঁরই

নায়ক রত্নর ভাষায়ই বলতে চাই—"মধুর, তুমি অনেক দিয়েছ, অশেষ দিয়েছ।"—আর এর পরেও প্রকৃতিবাদী অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পর্কে তাঁরই মঞ্জুষা-মুখর, আর রূপকুট্টিম কাব্য-কথার রণন মনের তারে বেঠোভেনী সুর-লহরের ঝড় দিয়ে মাতাল কোরে তোলে—যখন দেখি তাঁর প্রেম-দর্শন প্রিয়তমের নিরালা-নিঝুম তার শীতল ছায়ায় তারই প্রিয়াকে আর নিসর্গের পূর্ণিমাকে কোরে তুলেছে মিলনের গানে একাকার—

"আমার প্রিয়া আছে আমার ঘরে। / আমার মন আছে ভালো।
আকাশ হতে খালি কুসুম ঝরে / মাটীর ফুলদানী ফাটিয়া পড়ে
ধরায় ধরে না যে আলো।
আমার পূর্ণিমা আমার পাশে / হৃদয়ে কোন খেদ নাই
আমার জামাখানা বুনিছে তা সে / কদাচ মুখ তুলে মুচকি হাসে
আকাশে পূর্ণিমা তাই।"

বৈচিত্র্য কথাটা মানুষের জীবন-নিরীক্ষার প্রতি পলে-অণুপলে রেখে গেছে নিজের প্রভাবে রাঙা বিভাসময়তাকে—যা তার বিচিত্রিতার রসানুগ্রহণে আর রূপচয়নে একে কোরে চলে প্রতিনিয়ত অপরূপ থেকে রূপক পর্য্যন্ত—হাজার এক চিত্রালি চিত্রায়নের বিচিত্রা ও সুচিত্রায় ভরা—এই পৃথিবীর রঙ্গসভা। রূপসভা। শুধু বৈচিত্র্যের সাজঘর। এরই অনুভাবের প্রভাবে পুরুষ ও রমণীর মনের প্রণয় থেকে আরম্ভ কোরে যত কিছু এ-ধার কি ও-ধার সমেত কার্য্যকারণ সম্পর্ক রূপ ও ভাবের সঙ্গে হয় সংশ্লিষ্ট—কখনো বৈধতারই যুক্তির মসৃণতায়, আবার কখনো বা অযুক্তির অবৈধতার অনিয়মী অনাদর্শতায় —তারই হরেকরকমবা যৌবনান্বিত জীবনভাষ্যগুলো অতি সহজে আর অশেষ স্বাভাবিকত্বে অনন্য সাধারণ শিল্পসৃষ্টি হোয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যের পিয়াসে ও সুদূরের রূপবিলাসে—স্থির-ধীর প্রতিভার অনন্য স্বকীয়ত্বে অনলস স্রষ্টা 'বনফুলে', ওরফে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ে।

বাঙলা সাহিত্যে 'বনফুলে'র যে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষরটি নামাঙ্কিত হয়েছে—সেখানে এই জীবনরসিক স্রষ্টা তাঁর প্রতিটি কাহিনীর মধ্যে এই কথাটাই সহাস্যে নিবেদন করাতে পেরেছেন যে—"The world is nothing but a stage." সত্যি, চেহারায় কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনের মিল আরেকজনার সঙ্গে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল!—তেমনি এই কথাটা বৈচিত্র্য

ভরা, যে, প্রতিটি মানুষ তার রুচি নিয়ে, নানান ব্যবহারিক রীতি নিয়ে, এমন কি প্রণয় সম্পর্কিত ঋতুরঙ্ ঝলসিত "প্রাইভেসি" ভরা 'ritual' নিয়ে একে আরেকজনের থেকে নিজেকে ও অপরকে প্রতিপন্ন করায়—প্রত্যেকে তারা হোল—অতি পৃথক স্বত্তায় বৈচিত্র্যমুখীন। সুতরাং, রসিক-সুজন 'বনফুল' তাঁর শিল্পায়নে এক হাজার এক রাতের কাহিনী বুনোনে সমাজ থেকে, জীবন থেকে, প্রেম ভালবাসা থেকে—সে সমস্তেরই সব রকম রাজনীতি, সমাজ-নীতি, অর্থনীতির হাল্-চাল্ সমেত এই দুনিয়ারই সরাইখানার কথাতে—রূপকথা কোরে সাজিয়েছেন। তার মধ্যে আমি দেখেছি প্রথম দর্শনে 'বনফুল' হোলেন সমাজতান্ত্রিকতায় সচেতন কন্‌ষ্টিটিউশনালিস্ট,—যেহেতু তিনি সমাজের হরেক-রকম অদ্ভুত ও কিম্ভুত জীবন-মানসিকতায় রূপায়ণে জীবন-দরদী শিল্পীর আতি নিয়ে "তৃণখণ্ড" তা লিখে গেছেন, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবসা কত যে নির্মম ও অমানবিক হোয়ে উঠছে দিনকে-দিন তারই মুখোস খুলেছেন "নির্মোক" গ্রন্থে, আর সর্বপোরি মানবিক 'ট্রিটীজ' রূপে শিল্পায়িত "হাটে বাজারে" নামধেয় কথাযানেতে। তা এই শিল্পীর প্রখর মানস সমীক্ষাকে দৃপ্তিত করিয়েছে। তাই বলে যিনি জীবন-রস-রসিক শিল্পী, তিনি আষাঢ়ের প্রথম দিনে অলকার দিকে ছুটে যাওয়া নীল মেঘ দেখে সেই নীলেরই নিতল পারাবারে আপনার শিল্পকে প্রণয়ের রঙে না রাঙ্গিয়ে স্থির থাকতে পারেন না। সে কথাতেই নিরালা-নিঝুমে ও মঞ্জুল-নির্ঝরে ঋতা-রূপ নিয়েছে 'বনফুলের' ক্লাসিক সৃষ্টি "মৃগয়া"তে, তারই রূপ-কল্প "লক্ষ্মীর আগমনে", আর তার চাইতে আরো বেশী ব্যাপকতা নিয়েছে ততোধিক ক্লাসিকত্বে নিরূপিত "জঙ্গম" নামী মহা-উপন্যাসে। প্রথমোক্ত দুটি বই-এর মধ্যে দেখেছি রূপ-শিল্পী 'বনফুল' একটা সুন্দর প্রতীকের সাহায্য নিয়েছেন—শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নারই যেন বিভা বিকাশে। ভেবেছি, যৌবনান্বিত জীবনায়ন পলাশ রাঙ্গা ভালোবাসার অয়নে অন্বয় নিয়ে ফুটে ওঠে—তপ্ত জ্যোৎস্নায় ফিনিক্ ফোটানো আলোক-ছটার মধ্যে প্রিয় যে ভাবে তার প্রিয়াকে অন্বেষণ করে,—এই তারই সংকেত জড়ানো নাম হলো—"মৃগয়া"। "লক্ষ্মীর আগমন" নামী উপন্যাসে এই জ্যোৎস্না এসেছে আবার ঘুরে-ফেরে। এই আলোক-নির্ঝর সংকেতটি প্রণয়ের যুবক যুবতীদের বাধ্য করিয়েছে জীয়ন-কাঠির পরশে—দ্বন্দ্ব ভুলে, ভ্রান্তি শেষে পূর্ণমিদম্ স্বত্তায় দুই থেকে যুগল রূপের এক হওয়ার মধ্যে—তারা হোক্ মিতালির মধুরতায় যুক্ত। পরিণয়ের প্রণয়ে হোক—"Blessed !"

"জঙ্গম" সম্বন্ধে মধুরতম একটা কথা মনে পড়ে। 'বনফুল' এখানে দম্পতির প্রেমজীবনের মোকাবিলায় অমিয়ার বধূজীবনের ওপরে জটিল মনঃদ্বন্দ্বেরই মধুকথা নিয়ে বিবাহ-পরবর্তী ভালোবাসার ছবিটিকে সুনীরিক্ষায় অনুধ্যান করেছেন। শঙ্কর রায় বহু রমণীর রমণীয়ত্বকে চোখের দেখায়, আর ভাবের মেলায় মিলাবার স্পৃহা নিয়ে—প্রণয়ে রঙীন করাতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর মনের রঙেতে রাঙিয়ে ওদের কেউই পরিণয়ের সপ্তপদ-পরিক্রমায় আদরে-অভিমানে অভিসার নিয়ে মিলেজুলে উঠতে পারেনি। বরং বলা যেতে পারে, চায়নি ওরা এমন কিছুর বাঁধন। কাজেই শঙ্করের যৌবনকে শতদলে ফোটাবার জন্য ভবিতব্যের মতোই অচেনায়-অজানায় দেহী পেলবতার সবুজে শান্ত-মদির অমিয়ার লজ্জাভারে নিঝুম থাকা দেহমনের সুখ কিন্তু খুশীমনেতে তা বরণ কোরে নিয়েছিল অতি সহজে আর অনায়াসের আশ্লেষে। এই মৌনভরা প্রগল্‌ভ রূপেতে সচকিতা থাকা অমিয়াকে প্রেম কোরে শঙ্কব অন্তঃপুরিকার সঘন রহস্যময়তার লাজভীরু জীবনেতে আনে নি। Marriage by negotiation-এর হঠাৎ আলোর ঝলকে প্রীতির পসরায় সাজাবার জন্য—শঙ্কর রায় আপন প্রিয়ার বধূ-সত্বায় সত্যি তাকে রাঙাতে চেয়েছিল। কিন্তু পরহিতব্রতীর আত্মভোলা মানস থেকে স্ত্রীকে প্রিযার সরবতায় আকুল করানো ভালোবাসার মনমাদকতাকে ফুটিযে তোলাতে সচেষ্ট হোতে পারে নি, সময়ে কি অসময়ে—এই শঙ্কর বায়। তবু কিন্তু এই ব্যবস্থা-করা বিবাহের 'conjugal bliss'-কে মনের চাহিদায় আর দেহের আকুলতায় বোঝা-বুঝির মনোযোগের আবর্তে্য মধুর কোরে তোলার জন্য—একাকী অমিয়া হোয়েছিল—সক্রিয়া। বুঝেছিল, মৌনময় অভিমানের নিরালা ভরা আবেগ থেকে—ওর স্বামীর কাছে ওর রূপের দায় হোল হর-নন্দিনী শিবানীরই মত। তিতিক্ষায় ধৈর্য্য ধরে চলা, আর আদর যাঞ্চার ভেতরে স্বামীর আত্মময় অবিচল অস্তিত্বটি থেকে অমিয়া তার প্রিয়ার সুখকে রাঙাতে পেরেছিল একবার নয়,—দু-দু'বারই কুমারসম্ভবের প্রতিবেদনে। আত্মপ্রীতির কেন্দ্রাতিগ আকর্ষণ ছেড়ে যে রূপদর্শনে শঙ্কর মাঝে মধ্যিখানে অমিয়াকে ভালোবাসার জন্য মাতাল না হোয়ে পারে নি—ঠিক তার মূলের রহস্যে ছিল সবুজের রঙ্-গভীরতা। যাই হোক না কেন, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা জিনিসটাকে শান্তশ্রীতে ভরিয়ে অমিয়াই বারে বারে শঙ্করকে বোঝাতে পেরেছিল। তাই শঙ্কর রায় তার বধূর মধু-রূপ থেকে—"মুখের একটা পাশ, কবরীর খানিকটা অংশ, রঙিন

শাড়ির বিস্রস্ত প্রান্তটুকু, আর কিছু নয়—অমিয়ার এ রূপ সে তো কখনও দেখে নাই" বলেই হতচকিত প্রায় হোতো—কারণের যুক্তিতে অকারণের বিযুক্তি ভেঙ্গে। আর তাই বধূ-সুজনার যৌবনের আতপ্ততায় ভরাট সুখ-ঝরা দেহী অস্তিত্বের রভসতাকে লাজ-বিছানার নরমেতে আরাম-ঝরা আশ্রয়ে থাকাকালীনও রাতের গভীরতায় বিনিদ্র থেকে শঙ্কর তার আত্মিক-প্রীতিতেই সাহিত্য-চিন্তায় থাকতো—অবুঝ রূপেতে মশগুল। কিন্তু এ ভাবটা মোটেই দাম্পত্যবিলাসের সোপান নয়। তাই প্রকৃতির জল্পিত, প্রগল্‌ভ নয় এমনি এক লাজহীনতার সক্রিয়তায় অমন মধুনির্ঝর হওয়ার মতো মুহূর্তে প্রীতির কলোচ্ছলতায় মুখর করাতো অমিয়া নিজেই। আর সে শঙ্করকে ভাবাতোও আপন বধূর প্রেম-ভালোবাসা সম্পর্কে। যখন আদরের সোহাগ বর্ষণে স্বামীর দাবী ভুলে, আর কর্তব্য হারিয়ে শঙ্কর হোতো শুধু স্থাবর—ঠিক তখনি কারণ মাফিক জঙ্গমতার মধ্যে চালু রাখাতে "...সহসা অমিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল এবং ঘুমের ঘোরে শঙ্করকে জড়াইয়া ধরিল।...নানারূপ ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া সে অমিয়ার দিকে মন দিতে পারে না। মনে হয়, তাহার প্রতি সে অবিচার করিতেছে, বাহিরের ঐশ্বর্য্য দিয়াই তাই সে অমিয়াকে ভুলাইতে চায়। মাঝে মাঝে তাহার সন্দেহ হয়। সত্যই কি অমিয়া ভোলে? ভোলে কিনা তাহা শঙ্কর জানে না, কিন্তু ইহা সে জানে যে, অমিয়া কখনও বিচলিত হয় না, তাহার আচরণ সম্বন্ধে কখনও কোন প্রশ্ন করে না। শঙ্করের মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়ত তাহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে কখনও কোনও সন্দেহ তাহার মনে জাগে না, স্বামীর সম্বন্ধে কোনরূপ হীন ধারণা পোষণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। নীরবে শান্ত মুখে সে পত্নীর কর্তব্য করিয়া যায়। শঙ্কর নিজে কি তাহাকে ভালোবাসে? বাসে বই কি। যুবতী পত্নীকে কোন্ যুবক স্বামী ভাল না বাসে!"—কাজেই শঙ্কর রায়ের যৌবন অনিবার্য্য কারণে অমিয়ার যৌবনদেহকে বনাম লাজভীরু মনকে—সময়ে সময়ে ভালো না বেসে পারে নি। কারণ, আপনার আদর্শ আর উদ্দেশ্য নিয়ে পুরুষ যতই করিতকর্মতায় আবিষ্ট থাকুক না কেন, এমন এক একটি ক্লান্তিতে অবসাদগ্রস্ত মুহূর্ত তার জীবনে এসে পৌঁছয়, যখন সে শ্রান্তি খুঁজতে চায়—বধূর মধুর মজ্জিলেতে। অমিয়া এমন মুহূর্তের জন্য শঙ্কর-সমীপে প্রস্তুতা থাকতো তার স্বামীত্বের দাবীকে, চাহিদাকে, খুশীকে সুখী করাবার জন্য। একটি কথা, যেখানে বিবাহের আগে ভালোবাসার কোন দান-প্রতিদান ছিল না, কিন্তু পরে বিবাহের মনোযোগে দাম্পত্যসুখের

আদানে ভালোবাসা 'বাসাটা অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে—সে কথাকেই শঙ্কর ও অমিয়ার যৌবনময় আর্তির জগতে প্রকাশ কোরে দেখিয়েছেন "জঙ্গমে"র স্রষ্টা। বিবাহ-পরবর্তী জীবনে যখন দাম্পত্যরীতির ঋতু-বিচিত্রাকে বৈচিত্র্যে সাজিয়ে ভালোবাসার সময়টি পলে-পলে এগিয়ে আসে—আর যখন তার মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় পুরুষের যৌবনায়ন তার হাজারো চিন্তার জটিলতায় ডুবে গিয়ে যুবতী স্ত্রীর দেহমনের সুখ ও খুশীর কথাকে অকারণে আর অজান্তে প্রায় ভুলতে বসে—ঠিক তখনি পুরুষের স্বামীত্বের সমস্ত প্রেমময় চাওয়া-পাওয়াগুলি হয়ে ওঠে—স্থাবর। এমন অবস্থায় স্বভাব গোছালো যুবতী স্ত্রীর তৃপ্তিঝরা দেহের, আর মনের শান্ত আকুলতা তার প্রিয়-পুরুষটিকে ভালোবাসার জন্য সক্রিয়তায় কোরে তোলে—জঙ্গমময়!—সত্যিই, অশেষ ব্যাপকতার চিন্তাকুলতায় সাজানো আর গোছানো এই "জঙ্গম" উপন্যাসের চিরায়ত ধ্যানের মধ্যে 'বনফুল' এই দাম্পত্যরীতির এমন ধারার প্রেমদর্শনটিকে—জীবনদর্শনেরই শান্ত-সমাহিত রূপেব মধ্যে সুন্দরেতে মধুময় কোরে ফুটিযেছেন।—'বনফুলে'র এই শৈল্পিক মানসিকতাকে রাঙিয়ে উঠতে দেখেছি তাঁর অন্যান্য আরও কয়েকটি সৃষ্টির মধ্যে—যেখানে তিনি বিবাহ পরবর্তী জীবনের ও ভালোবাসার দাম্পত্য জীবনেরই কথায় আপন বক্তব্যকে কোরে তুলেছেন—দম্পতির "Home, Sweet Home".—এই "সুইট হোমে"র "সুইটেষ্ট" কথাই প্রিয় ও প্রিয়ার দাম্পত্য-যৌবনকে অপার রসমাধুর্য্যের উচ্ছলে-ঔজ্জ্বল্যে রাঙানো নিরালার রূপনিঝুম নীড় রূপে তোয়ের করাতে পেরেছেন 'বনফুল' তাঁর "কষ্টিপাথরে"।

যে যাই বলুক না কেন—এটা ঋতুবিচিত্রায় সাজানো এমন এক অবিনশ্বর সুখ ও খুশীর প্রভায় ও আভায় যুবক সঙ্গমে যুবতীর আদর-সোহাগ-আবদার সমেত ওদের দম্পতি পরিচয়কে কোরে রাখে দুইয়ে এক হওয়া—প্রেমেরই এক রূপকুটিম। তা অগুরু-চন্দন-ধূপ বিভাসিত ভালোবাসার শান্তিনির্ঝর শ্রীনিকেতন। দাম্পত্য-জীবনেতে বাইরের পৃথিবীটা প্রিয়র একচেটিয়া এক্তিয়ার হোলেও বাইরেরই হরেকরকম সালতামামির মধ্যে থেকে থেকে যখন সে সত্যি হয়ে পড়ে ক্লান্ত আর তাপিতও অবসাদগ্রস্ত—ঠিক তখনি ভেতর পৃথিবীর একচ্ছত্রা অধিকারিণী রূপে তারই সুস্মিতা প্রিয়া-স্ত্রীর পলাশ অধরের শুচিতা গমক ছড়িয়ে, আর রূপের প্রগাঢ় মঞ্জুষায় আপীন থাকা বুকের নিটোল সৌন্দর্য্যকে অভিমানের দোলায় দুলিয়ে সুজন দয়িতকে স্নিগ্ধ করাতে, তৃপ্ত করাতে চাইবে-ই।—কেন না সেটাই তো হল প্রকৃতির ঋতা রূপ। প্রিয় তখন কবি সত্যেন দত্তের কবিতার লাইন উদ্ধৃতি করে প্রিয়াকে খুশী করাবার জন্য না বলে পারবে না—"একটি তোমার চুমার লাগি পরাণ কাঁদে হায়।"—এই এত কথা বললাম 'বনফুলে'র "কষ্টিপাথরে"র দাম্পত্য-জীবন-যৌবনেরই অয়নকে বিশ্লেষণের জন্য।

LOVE and its CRAFTS

—*Swami Vivekananda*

Men do not know what is to love ; if they did, they would not talk so lightly about it. Every man he can love, and then in five minutes finds out there was no love in his nature. Every woman says she can love and finds out in three minutes that she cannot. The world is full of the talk of love, but it is hard to love. Where is love ? How do you know that there is love ? The first test of love is that it knows *no bargain.* So long as you see a man love another to get something, you may know that it is not love ; it is shopkeeper's love. Wherever there is any question of buying and selling, it is no more love. So, when any man is praying to God : "Give me this and give that," it is not love. How can it be ? I offer you a prayer, and you give me something in return ; that is what it is, mere shopkeeping......The first test of love is that it knows no bargaining ; it always gives. Love is always the giver, and never the taker.

The second test is that love knows no *fear.* How can there be any fright in love ?...Slaves sometimes stimulate love, but is it love ? Where do you ever see love in fear ? It is always sham. So long as man thinks of God as sitting above the clouds, with a reward in one hand and punishment in the other, there can be no love. With love never comes the idea of fear, or of anything that makes us afraid....Who cares whether God is a rewarder or punisher' That is not the thought of a lover. Think of a judge, when he comes home —what does his wife see in him ? Not a judge, or a rewarder, or a punisher, but her husband, her lover. What do the children see in him ? Their loving father, not the punisher or rewarder.

The third is a still higher test. Love is always *the highest ideal.* When one has passed through the first two stages— when he has thrown off all shopkeeping and cast off all fear— he begins to realise that love was always the highest ideal. How many times in this world we see that a beautiful woman

loves an ugly man ! How many times we see a handsome man loves an ugly woman ! What is the attraction there ? Those that stand outside see the the ugly man or the ugly woman, but not the lover. To the lover the beloved is the most beautiful being that ever existed. How is it ? The woman who loves the ugly man takes as it were, the ideal of beauty which is in her own mind, and projects it on this ugly man, and what she worships and loves is not the ugly man, but her own Ideal. That man is, as it were, only the suggestion, and upon that suggestion, she throws her own ideal and covers it, and it becomes her object of worship....

"None, oh beloved, loves the husband for the husband's sake, but for the Self that is in the husband ; none, oh beloved, ever loves the wife for the wife's sake, but for the Self that is in the wife. None ever loves anything else, except for the Self." Even this selfishness, which is so much condemned, is but a manifestation of the same love. Stand aside from this play, do not mix in it, but see this wonderful panorama, this grand drama, played scene after scene, and hear this wonderful harmony ; all are the manifestations of the same love. Even in selfishness, that Self will multiply, grow and grow. That one self, the one man, will become two selves when he gets married, several when he gets children, will become a whole village, a whole city, and yet grow and grow until he feels the whole world as his Self, the whole universe as his Self. That Self in the long run will gather all men, all women, all children, all animals, the whole universe. It will have grown into one mass of universal love, infinite love, and that love is God....

Thus sang the royal Hebrew sage, and thus sang they of India also : "O beloved, one kiss of Thy lips ! Kissed by Thee, one's thirst for Thee increaseth for ever. All sorrows cease, and one forgets the past, present and future, and only thinks of Thee alone." That is the madness af the lover, when all desires have vanished. "Who cares for salvation ? Who cares to be saved ? Who cares to be perfect even ? Who cares for freedom ?"—says the lover.

অরন্ধনের নিমন্ত্রণ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভালবাসার শিল্পকথা—১

এক একজন লোকের স্বভাব বড খাবাপ, বকুনি ভিন্ন তারা একদণ্ডও চুপ থাকতে পারে না, শ্রোতা পেলে বকে যাওয়াতেই তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ। হীরেন ছিল এই ধরনের মানুষ। তার বকুনির জ্বালায় সকলে অতিষ্ঠ। আফিসের যারা তার সহকর্মী, শেষ পর্য্যন্ত তাদের অনেকেব স্নায়ুর রোগ দেখা দিলে, অনেকে চাকরি ছাডবার মতলব ধরলে।

সব বিষয়ের প্রতিভার মতই বকুনির প্রতিভাও পৈতৃক শক্তির আবশ্যকতা রাখে। হীরেনের বাবার বকুনিই ছিল একটা রোগ। শেষ বয়সে তাঁকে ডাক্তারে বারণ করেছিল, তিনি বেশি কথা যেন না বলেন। তাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন—তবে বেঁচে লাভটা কি ডাক্তারবাবু? যদি দু'একটা কথাই কারো সঙ্গে বলতে না পারলুম! কথা বলতে বলতেই হৃৎপিণ্ড দুর্বল হবার ফলে তিনি মারা যান—মার্টার টু দি কজ!

এ হেন বাপের ছেলে হীরেন। বাইশ বছরের যুবক—আপিসে কাজ করে—আবার রামকৃষ্ণ মঠেও যাতায়াত করে। বিবাহ করবার ইচ্ছে নেই। শুনেছিলাম সন্ন্যাসী হযে যাবে। এতদিন হয়েও যেত কিন্তু রামকৃষ্ণ আশ্রমের লোকেবা এ বিষয়ে তাকে বিশেষ উৎসাহ দেন নি; হীরেন সন্ন্যাসী হয়ে দিনরাত মঠে থাকতে শুরু করলে এক মাসের মধ্যেই মঠ জনশূন্য হয়ে পড়বে।

হীরেনের এক বৃদ্ধা পিসিমা থাকেন দূর পাডাগাঁয়ে। স্টেশন থেকে দশ-বারো ক্রোশ নেমে যেতে হয় এমন এক গ্রামে। পিসিমার আর কেউ নেই, হীরেন সেখানে পিসিমাকে একবার দেখতে গেল। বুড়ি অনেকদিন থেকেই দুঃখ করে চিঠিপত্র লিখছিল।

সে গ্রামের সবাই এতদিন জানতো যে, তাদের কুমী অর্থাৎ কুমুদিনীর মতো বকুনিতে ওস্তাদ মেয়ে সে অঞ্চলে নেই। কুমীর বাবা গ্রাম্য পুরোহিত ছিলেন—কিন্তু যেখানে যখন পুজো করতে যেতেন, আগডুম বাগডুম বকুনির জ্বালায়

যজমান ভিটে ছেড়ে পালাবার যোগাড় করতো, বিয়ের লগ্ন উত্তীর্ণ হবার উপক্রম হ'ত।

কুমীর বাপের বকুনি-প্রতিভার একটা বড দিক্ ছিল এই যে, তাঁর বকুনির জন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজন হত না। যত তুচ্ছ বিষয়ই হোক না কেন, তিনি তাই অবলম্বন করে বিশাল বকুনির ইমারত্ গড়ে তুলতে পারতেন। মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ বলবার ও ছবি গডবার ক্ষমতা না থাকলে মানুষে এমন বকতে পারে না বা শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। তাঁর মৃত্যুর সময়ে গ্রামের সকলেই দুঃখ করে বলেছিলো—আজ থেকে গাঁ নিঝুম হয়ে গেল!

দু'একজন বলেছিল—এবার আমসত্ব সাবধানে রৌদ্রে দিও, মুখুয্যে মহাশয় মারা গিয়েচেন, কাক-চিলের উৎপাত বাড়বে। অর্থাৎ তাদের মতে গাঁয়ে একদিন কাক-চিল বসতে পারত না মুখুয্যে মশায়ের বকুনির চোটে।—নিন্দুক লোক কোন জায়গায় নেই?

কিন্তু হায়, নিন্দুকের আশা পূর্ণ হয় নি বা মুখুয্যে মশায়ের হিতাকাঙ্ক্ষীদের দুঃখ্ করবার কারণ ঘটে নি। মুখুয্যে মশায় তাঁর প্রতিনিধি রেখে গিয়েছিলেন তাঁর আট বৎসরের মেয়ে কুমীকে। পিতার দুর্লভ বাক-প্রতিভার অধিকারিণী হয়েছিল মেয়ে। এমন কি তার বয়েস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই সন্দেহ করলেন যে, মেয়ে তার বাপকে ছাড়িয়ে না যায়।

সেই কুমীর বয়েস এখন সতেরো আঠারো। সুশ্রী, উজ্জল শ্যামবর্ণ, কোঁকড়া কোঁকড়া একরাশ চুল মাথায়, বড বড চোখ, মিষ্টি গলার সুর, একহারা গড়ন, কথায় কথায় খিল-খিল হাসি, মুখে বকুনির খই ফুটছে দিন-রাত।

শুভক্ষণে দু'জনের দেখা হ'ল।

হীরেন সকালবেলা পিসিমার ঘরের দাওয়ায় বসে প্রাণায়াম অভ্যাস করার চেষ্টা করচে, এমন সময়ে পিসিমা আপন মনে বললেন—দুধ কি আজ দিয়ে যাবে না? বেলা যে তেপ্পর হ'ল—ছেলেটা যে না খেয়ে শুকিয়ে বসে আছে, একটু চা করে দেব তার দুধ নেই—আগে জানলে রাত্রের বাসী দুধ রেখে দিতাম যে—

—রাতের বাসী দুধ রোজ রাখো কি না—

বলতে বলতে একটি কিশোরী একঘটি দুধ-হাতে বাড়ীর পেয়ারা গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল।

পিসিমা বললেন—দুধের ঘটিটা রান্নাঘর থেকে বের ক'রে নিয়ে আয় দিকি, এনে দুধটা ঢেলে দে—

কিশোরী চঞ্চল লঘুপদে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকল এবং দুধ ঢেলে যথাস্থানে রেখে এসে আমতলায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে—শোনো ও পিসি, কাল কি হয়েছে জানো?—হি—হি—

পিসিমা বললেন—কি?

এই কথার উত্তরে আমতলায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি হাত-পা নেড়ে একটা গল্প জুড়ে দিলে—কাল দুপুরে নাপিত-বাড়িতে ছাগল ঢোকে। নাপিত-বৌ কাঁথা পেতেছিল, সে কাঁথা চিবিয়ে খেয়েছে, এইমাত্র ঘটনাংশ গল্পের। কিন্তু কি সে বলবার ভঙ্গি, কি সে কৌতুকপূর্ণ কলহাসির উচ্ছ্বাস, কি সে হাত-পা নাড়ার ভঙ্গি; পিসিমার চায়ের জল গরম হ'ল, চা ভিজানো হ'ল, হালুয়া তৈরি হ'ল, পেয়ালায় ঢালা হ'ল—তবুও সে গল্পের বিরাম নেই।

পিসিমা বললেন—ও কুমী মা, একটু ক্ষান্ত দাও, সকালবেলা আমার অনেক কাজকর্ম আছে—তোমার গল্প শুনতে গেলে সারা দুপুরটি যাবে—এই চা-টা আর খাবারটুকু তোর এক দাদা—ওই বড ঘরের দাওয়ায় বসে আছে—দিয়ে আয় দিকি?—

কুমী বিস্ময়ের সুরে বললে—কে পিসি।

—তুই চিনিস্ নে, আমার বড জেঠতুতো ভাইয়ের ছেলে—কাল রাত্তিরে এসেছে—তবে চা তৈরি করবার আর এত তাডা দিচ্ছি কি জন্য? তুই কি কারো কথা শুনতে পাস্, নিজের কথা নিয়েই বে-হাতি—

কুমী সলাজমুখে চা ও খাবার দাওয়ার ধারে রেখে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হীরেন তাকে অত সহজে যেতে দিতে প্রস্তুত নয়। সে কুমীর নাপিত-বাড়ীতে ছাগলের কাঁথা চিবোনোর গল্প শুনেচে এবং মুগ্ধ, বিস্মিত, পুলকিত হয়েছে এইটুকু মেয়ের ক্ষমতায়।

সে বললে—তোমার নাম কি?

—কুমুদিনী—

হীরেন বললে—এই গাঁয়েই বাড়ি তোমার বুঝি? ও-পাড়ায়? তা ছাগলের কথা কি বলছিলে? বেশ বলতে পার—

কুমী লজ্জায় ছুটে পালাল।

কিন্তু কুমুদিনীকে আবার কি কাজে আসতে হ'ল। হীরেনের সঙ্গে একটু

একটু করে পরিচয় হয়েও গেল। দু'জন দু'জনের গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ! দু'জনেই ভাবে এমন শ্রোতা কখনো দেখিনি। তিন দিন পরে দেখা গেল পিসিমার দাওয়ার সামনে উঠোনে দাঁড়িয়ে কুমী এবং দাওয়ায় খুঁটি হেলান দিয়ে বসে হীরেন ঘণ্টাখানেক ধরে পরস্পরের কথা শুনচে, হীরেন অনর্গল বকে যাচ্ছে, কুমী শুনচে—আর কুমী যখন অনর্গল বকচে, তখন হীরেন মন দিয়ে শুনচে।

সেবার পাঁচ ছ'দিন পিসিমার বাড়ি থেকে হীরেন চলে এল।

কুমী যাবার সময়ে দেখা করলে না ব'লে হীরেন খুব দুঃখিত হ'ল, কিন্তু হীরেন চলে যাবার পরে কুমী দু'তিন দিন মন-মরা হয়ে রইল, মুখে হাসি নেই, কথা নেই।

বুড়ী পিসিমার প্রতি হীরেনের টানটা যেন হঠাৎ বড় বেড়ে উঠল। যে হীরেন দু'বছর তিন বছরেও অনেক চিঠিপত্র লেখা সত্ত্বেও এদিকে বড় একটা পা মাড়াতো না, সে ঘন ঘন পিসিমাকে দেখতে আসতে শুরু করলে।

আজ বছর দুই আগের কথা, হীরেনকে পিসিমা বলেছিলেন—হীরু বাবা, যদি এলি তবে আমার একটা উপকার করে যা। আমার তো কেউ দেখবার লোক নেই, তোরা ছাড়া। নরসুপুরের ধরণী কামারের কাছে একগাদা টাকা পাব জমার খাজনার জন্য। একবার গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে টাকাটার একটা ব্যবস্থা করে আয় না বাবা?

হীরেন এসেচে দু'দিন পিসিমার বাড়ি বেড়িয়ে আম খেয়ে ফুর্তি করতে। সে জষ্ঠি মাসের দুপুর রোদে খাজনার তাগাদা করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে আসেনি। কাজেই নানা অজুহাত দেখিয়ে সে পরদিন সকালেই সরে পড়েছিল। এখন সেই হীরেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একদিন বললে—পিসিমা, তোমার সেই নরসুপুরের প্রজার বাকি খাজনার কিছু হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে, তবে এই সময় না হয় একবার নিজেই যাই। এখন আমার হাতে তেমন কাজকর্ম নেই, তাই ভাবছি তোমার কাজটা করেই দিয়ে যাই।—

ভাইপোর সুমতি হচ্চে দেখে পিসিমা খুব খুশি।

হীরেন সকালে উঠে নরসুপুরে যায়। দুপুরের আগেই ফিরে এসে সেই যে বাড়ি ঢোকে, আর সারাদিন বাড়ি থেকে বার হয় না। কুমীকেও প্রায়ই দেখা যায় পিসিমার উঠোনে, নয় তো আমতলায়, নয়তো দাওয়ার পইঠাতে বসে হীরুদার সঙ্গে গল্প করতে। কাক-চিল পাড়ায় আর বসে না।

জ্যোৎস্না উঠেচে।

কুমী বললে—চললুম হীরুদা।

—এখনই যাবি কেন, বোস্ আর একটু—

উঠানের একটা ধারে একটা নালা। হঠাৎ কুমী বললে—জ্যোৎস্না রাতে এলো চুলে লাফিয়ে নালা পার হ'লে ভূতে পায়—আমায় ভূতে পাবে দেখবে দাদা—হি-হি-হি-হি—; তারপর সে লাফালাফি ক'রে নালাটা বারকতক এপার-ওপার করচে, এমন সময় ওর মা ডাক দিলেন—ও পোড়ামুখী মেয়ে, এই ভরা সন্ধ্যাবেলা তুমি ও করচ কি? তোমায় নিয়ে আমি যে কি করি? ধিঙ্গী মেয়ে, এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান যদি তোমার থাকে।

হীরু ভালো মানুষের মতো মুখখানি ক'রে হারিকেন লণ্ঠনটা মুছে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

মায়ের পিছু পিছু কুমী চলে গেল। একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই গেল, মুখে তার অপ্রতিভের হাসি! হীরেন মনমরা ভাবে লণ্ঠনের সামনে কি একখানা বই পড়তে বসবার চেষ্টা করল।

মাসের পর মাস যায়, বছরও ঘুরে গেল। নতুন বছরের প্রথমে হীরেনের চাকুরিটা গেল, আপিসের অবস্থা ভাল নয় ব'লে। এই এক বছরের মধ্যে হীরেন বুঝেচে কুমীর মতো মেয়ে জগতে আর কোথাও নেই—বিধাতা একজন মাত্র কুমীকে সৃষ্টি করেচেন। কি বুদ্ধি, কি রূপ, কি কথাবার্তা বলবার ক্ষমতা, কি হাত নাড়ার ললিত ভঙ্গি, কি লঘুগতি চরণছন্দ।

প্রস্তাবটা কে উঠিয়েছিল জানি নে, বোধহয় হীরুর পিসিমাই। কিন্তু কুমুদিনীর জ্যাঠামশাই সে প্রস্তাবে রাজী হন নি—কারণ তাঁরা কুলীন, হীরেনরা বংশজ। কুলীন হয়ে বংশজের হাতে মেয়ে দেবেন তিনি, একথা ধারণা করাই তো অন্যায়।

হীরেন শুনে চটে গিয়ে পিসিমাকে বললে—কে তোমাকে বলেছিল পিসিমা ডেকে অপমান করে ঘরে আনতে? আমি তোমার পায়ে ধরে সেধেছিলুম কুমীর সঙ্গে আমার বিয়ে দাও? সবাই জানে আমি বিয়ে করব না, আমি রামকৃষ্ণ আশ্রমে ঢুকব। সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েচে, এবার এই ইয়েটা মিটে গেলেই—

কুমীর কানে কথাটা গেল যে হীরু এই সব বলেচে। সে বললে—হীরুদাকে বিয়ে করতে আমি পায়ে ধরে সাধতে গিয়েছিলুম যে! বয়ে গেল—সন্ন্যাসী হবে তো আমার কি?

হীরু তল্পী বেঁধে পরদিনই পিসিমার বাড়ী থেকে নিজের বাড়ী চলে গেল।

হীরুর বাড়ীর অবস্থা এমন কিছু ভালো নয়। এবার তার কাকা আর মা একসঙ্গে বলতে শুরু করলেন—সে যেন একটা চাকরির সন্ধান দেখে। বেকার অবস্থায় বাড়ী বসে কতদিন আর এভাবে চলবে ?

হীরুর কাকার এক বন্ধু জামালপুরে রেলওয়ে কারখানার বড়বাবু, কাকার পত্র নিয়ে হীরু সেখানে গেল এবং মাস দুই তাঁর বাসায় বসে-বসে খাওয়ার পরে কারখানার আপিসে ত্রিশ টাকা মাইনের একটা চাকুরি পেয়ে গেল।

লাল টালি-ছাওয়া ছোট্ট কোয়ার্টারটি হীরুর। বেশ ঘরদোর, বড় বড় জানালা। জানালা দিয়ে মারক পাহাড় দেখা যায়। কাজকর্মের অবসরে জানালা দিয়ে চাইলেই চোখে পড়ে টানেল দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেণ যাচ্চে আসচে। শান্টিং এঞ্জিনগুলো ঝক্ ঝক্ শব্দ করে পাহাড়ের নিচে সাইডিং লাইনের মুড়োয় গিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। কয়লার ধোঁয়ায় দিনরাত আকাশ-বাতাস সমাচ্ছন্ন।

একদিন রবিবারে ছুটির ফাঁকে সে আর তার কাকার বন্ধু সেই বড়বাবুর ছেলে মণি, মারক পাহাড়ের ধারে বেড়াতে গেল। মণি ছেলেটি বেশ. পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে বি.এস্-সি দিয়েচে এবার। তার বাবার ইচ্ছে কাশী হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো। কিন্তু মণির তা ইচ্ছে নয়, সে কলকাতায় সায়েন্স কলেজে অধ্যাপক রমণের কাছে ফিজিক্স পড়তে চায়। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তার মনান্তর চলচে। হীরু জানত এসব কথা।

বৈকাল বেলাটি। জামালপুর টাউনের আওয়াজ ও ধোঁয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ওরা দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের ওপর দিয়ে অনেকটা চলে গিয়েচে। নীল অতসী ও বনতুলসীর জঙ্গল হয়ে আছে পাহাড়ের মাথার সেই জায়গাটায়। ঘন ছায়া নেমে আসচে পূবদিকের শৈলসানুতে, একটি বন্যলতার হলদে ক্যামেলিয়া ফুলের মতো ফুল ফুটেচে, খুব নীচে কুলী-মেয়েরা পাহাড়তলীর লম্বা লম্বা ঘাস কেটে আঁটি বাঁধ্‌চে—পূবদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমতল ক্ষেত্র, ভুট্টার ক্ষেত, খোলার বস্তি, কেবল দক্ষিণে ; পুব-পশ্চিমে টানা পাহাড় শ্রেণী ও শালবন থৈ থৈ করচে, আর সকলের ওপরে উপুড় হয়ে পড়েচে—নিকট থেকে দূরে, সুদূরে প্রসারিত মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ।

একটা মহুয়া গাছের তলায় বসে মণি বাড়ি থেকে আনা স্যাণ্ড্‌উইচ্

ডিমসিদ্ধ, রুটি এবং জামালপুর বাজার থেকে কেনা জিলাপী একখানা খবরের কাগজের ওপরে সাজালে—থার্মোফ্ল্যাস্ক খুলে চা বার করে একটা কলাই-করা পেয়ালায় ঢেলে বললে—এসো হীরুদা—

দেখলে, হীরু অন্যমনস্ক ভাবে মহুয়াগাছের গুঁড়িটায় ঠেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে।

—খাবে এসো, কি হ'ল তোমার হীরুদা ?

হীরু নিরুৎসাহ ভাবে খেতে লাগল। সারা বৈকালটি যতক্ষণ পাহাড়ের ওপর ছিল, কেমন যেন অন্যমনস্ক, উদাস—কি যেন একটা ভাবচে। মণি ভাবলে পাহাড়ে বেড়ানোটাই মাটি হয়ে গেল হীরুদার জন্যে। পাহাড় থেকে নামবার পথে হীরু হঠাৎ বললে—মণি, একটি মেয়েকে বিয়ে করবে ভাই ?

মণি হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে—কি ব্যাপার বল তো হীরুদা ? তোমার আজ হয়েচে কি ?

—কিছু হয় নি, বলো না মণি ? একটি গরীবের মেয়েকে বিয়ে করে দায় উদ্ধার করো না ? তোমার মতো ছেলের—

—সে কে, তোমার কোনো আপনার লোক ? তোমার নিজের বোন নাকি ?

—বোন না হ'লেও বোনের মতই। বেশ মেয়েটি দেখতে, সুশ্রী, বুদ্ধিমতী।

—আমার কথায় তো কিছু হবে না, তুমি বাবাকে কি মাকে বলো। একে তা লেখাপড়া নিয়েই বাবাকে চটিয়ে রেখেচি, আবার বিয়ে নিয়ে চটালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। বাবার মেজাজ বোঝ তো ?

রাত্রে নিজের ছোট্ট বাসাটিতে হীরু কথাটা আবার ভাবলে। আজ পাহাড়ের ওপর উঠেই তার কেমন সব গোলমাল হয়েছিল। কুমীর কথা তাহলে তো সে মোটেই ভোলে নি ! নীল আকাশ, নির্জনতা, ফুটন্ত বন্য ক্যামেলিয়া ফুল, বনতুলসীর গন্ধ—সব সুদ্ধ মিলে একটা বেদনার মতো তার মনে এনে দিয়েচে কুমীর হাসিভরা ডাগর ডাগর চোখ দুটির স্মৃতি, তার হাত নাড়ার ললিত ভঙ্গি, তার অনর্গল বকুনি—সে তো সন্ন্যাসী হ'য়ে যাবে রামকৃষ্ণ আশ্রমে সবাই জানে, মিথ্যেই পিসিমা-কুমীকে জীবনে সুখী করে দিয়ে যেতে হবে। এ তার একটা কর্তব্য !

সাহসে ভর ক'রে মণির বাপের কাছে সে প্রস্তাবটা করলে। হীরুকে মণির বাপ-মা স্নেহ করতেন ; তাঁরা বললেন—মেয়ে যদি ভালো হয় তাঁদের কোন আপত্তি নেই। তাঁরা চাকরি উপলক্ষে পশ্চিমে থাকেন, এ অবস্থায় স্বঘরের

মেয়ের সন্ধান পাওয়াও কঠিন বটে। যখন সন্ধান পাওয়া গিয়েচে ভালো মেয়ের—আর মণির বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন মেয়েটিকে দেখে আসতে দোষ কি?

কুমীর জ্যাঠাকে আগেই চিঠি লেখা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা সমস্ত জিনিসটাকে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। অত বড় লোকের ছেলেকে জামাই করার মতো দুরাশা তাঁদের নেই। হীরুর যেমন কাণ্ড!

কিন্তু হীরু পূজোর ছুটিতে সত্যিই মণির এক জ্যাঠতুতো দাদাকে মেয়ে দেখাতে নিয়ে এল।

কুমী এসে হীরুর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

হীরু বললে—ভালো আছিস্ কুমী?

—এতদিন কোথায় ছিলে হীরুদা?

—চাকরি করচি যে পশ্চিমে, জামালপুরে। সাত-আট মাস পরে তো দেশে ফিরচি।

—ও কাকে সঙ্গে করে এনেচ?

হীরু কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে বললে—ও আমার এক বন্ধুর দাদা—

—তা এখানে এসেচে কেন?

—এসেচে গিয়ে ইয়ে—এমনি বেড়াতে এসেচেই ধরো—তবে—ইয়ে—

—তোমার আর ঢোক গিলতে হবে না। আমি সব জানি, কেন ওসব চেষ্টা করচ হীরুদা?

হীরু বললে—যাও, অমন করে না, ছিঃ, চুলটুল বেঁধে দিতে বল গিয়ে। ওঁরা খুব ভালো লোক, আর বড় লোক। জামালপুরে ওঁদের খাতির কি। আমি অনেক কষ্টে ওঁদের এখানে এনেচি। বড ভালো হবে এ বিয়ে যদি ভগবানের ইচ্ছেয় হয়—

অনেক কষ্টে কুমীকে রাজী করিয়ে তার চুল বাঁধা হ'ল, মেয়ে দেখানোও হ'ল। দেখানোর সময় মেয়ের অজস্র গুণ ব্যাখ্যা ক'রে গেল হীরু। কুমী কিন্তু পাঞ্জাব প্রদেশ কোন্ দিকে বলতে পারলে না, তাজমহল কে তৈরি করেছিল সে সম্বন্ধেও দেখা গেল সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হাতের লেখা বেঁকে গেল। গান গাইতে জানে না বললে—যদিও সে ভালোই গাইতে জানে এবং তার গলার সুরও বেশ ভালো।

সঙ্গের ভদ্রলোকটি মেয়ে দেখা শেষ করেই ফিরতি নৌকোতে রেল স্টেশনে

চলে গেলেন। রাত্রের ট্রেণেই তিনি খুলনায় তাঁর শ্বশুরবাড়ি যাবেন। যাবার সময়ে ব'লে গেলেন—মতামত চিঠিতে জানাবেন। হীরু তাঁকে নৌকোতে তুলে দিয়ে ফিরে এসে কুমীকে বললে—কি ক'রে বললে-গাইতে জানো না? ছিঃ একি ছেলেমানুষি, ওরা শহরের মানুষ, গান শুনলে খুব খুশী হয়ে যেত। এমনি তো ঘরের কোণে খুব গান বেরোয় গলায়? আর এর বেলা—

কুমী রাগ করে বললে—ঘরের কোণে গান গাইবে না তো কি আসরে বসে গাইতে যাবে? পারব না যার তার সামনে গান গাইতে।

হীরুও রেগে বললে—তবে থাকো চিরকাল আইবুড়ো ধিঙ্গী হ'য়ে। আমার কি? কুমীর বাড়ির ও পাড়ার সবাই এজন্য ভৎর্সনা করল। গান গাও না গাও, গান গাইতে জানি একথা বলার দোষ ছিল কি? ছিঃ, কাজটা ভালো হয় নি।

বলাবাহুল্য, ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোন পত্র এল না এবং হীরু পূজোর ছুটি অন্তে জামালপুরে গিয়ে শুনলে, তাঁদের পছন্দ হয় নি।

মাস পাঁচ-ছয় কেটে গেল। কি অদ্ভুত পাচ-ছ' মাস! কাজ করতে করতে জানালা দিয়ে যখনই উঁকি দিয়ে বাইরের দিকে চায়, তখনই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, কুমীকে কতবার জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেচে—হাত-পা নেড়ে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে হেসে গড়িয়ে পড়ে কুমী গল্প করচে—নিমফুলের গন্ধভরা কত অলস চৈত্র-দুপুরের স্মৃতিতে মধুর হয়ে উঠেচে বর্তমান কর্ম্মব্যস্ত দিনগুলি—.

ইতিমধ্যে এক ছোকরা ডাক্তারের সঙ্গে তার খুব আলাপ হ'য়ে গেল। নতুন এম্. বি. পাস করে জামালপুরে প্র্যাক্‌টিস্ করতে এসেছে, বেশ সুন্দর চেহারা, বাড়ির অবস্থাও খুব ভালো। তার জ্যাঠামশাই এখানে বড় চাকরি করেন। কথায় কথায় হীরু জানতে পারলে ছোকরা এখনও বিয়ে করে নি এবং কুমীদের পাল্‌টি ঘর। অনেক বুঝিয়ে সে তার জ্যাঠামশাইকে মেয়ে দেখতে যেতে রাজী করালে। মেয়ে দেখাও হ'ল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হ'ল না। তাঁদের কুটুম্ব পছন্দ হয়নি শোনা গেল। একে তো অজ পাড়াগাঁ, দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ভেবেছিলেন, পাড়াগাঁয়ের জমিদার কিম্বা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। অমন গরীব ঘরের মেয়ে তাঁদের চলবে না।

মাস তিনেক পরে হীরু আর এক বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে গিয়ে পিসিমার বাড়ি হাজির হ'ল। কুমীদের বাড়ির সবাই বললে—হীরু বড় ভালো ছেলে; কুমীর জন্য চেষ্টা করচে প্রাণপণে। কিন্তু অত বড় বড় সম্বন্ধ এনে ও খুব ভুল

করচে, ওসব কি জোটে আমাদের কপালে? মেয়ে পছন্দ হ'লেই বা অত টাকা
দিতে পারবো কোত্থেকে?

কুমীর সঙ্গে খিড়কী দোরের কাছে হীরুর দেখা। কুমী বললে—হীরুদা, তুমি
কেন এসব পাগলামি করচ বল ত? বিয়ে আমি করব না, তোমার দুটি পায়ে
পড়ি, তুমি ওসব বন্ধ কর।

হীরু বললে—ছিঃ লক্ষ্মীটি, অমন করে না, এবার যে জায়গায় ঠিক করচি
তাঁরা খুব ভালো লোক, নির্ঘাত লেগে যাবে—

কুমী লজ্জায় রাঙা হয়ে বললে—তুমি কি যে বল হীরুদা! আমার রাত্রে ঘুম
হচ্চে না, লাগবে কি না লাগবে তাই ভেবে। মিছিমিছি আমার জন্য তোমাকে
লোকে যা তা বলে, তা জানো? তুমি ক্ষান্ত দাও, তোমার পায়ে পড়ি হীরুদা।

হীরু এসব কথা কানে তুললে না। পাত্রপক্ষের লোক নিয়ে এসে হাজির
করলে, কিন্তু কুমী কিছুতেই এবার তাদের সামনে আসতে রাজী হ'ল না। সে
দস্তুর মতো বেঁকে বসলো।

হীরু বাড়ির মধ্যে গিয়ে বললে—পিসিমা, আপনারা দেরী করচেন কেন?

কুমীর মা বললেন—এসে বোঝাও না মেয়েকে বাবা! আমরা তো হার
মেনে গেলাম। ও চুলে চিরুণী ছোঁয়াতে দেবে না, উঠবেও না, বিছানার
পরেই রয়েচে।

কুমী ঘর থেকে বললে—পড়ে থাকব না তো কি? বারে বারে সং সাজতে
পারবো না আমি, কারো খাতিরেই না। হীরুদাকে বল না—সং সেজে বেরুক
ওদের সামনে।

হীরু ঘরের মধ্যে ঢুকে কড়া সুরে বললে—কুমী ওঠ, কথা শোন্—যা চুল
বাঁধগে যা—

—আমি যাব না—

—যাবি নে, চুলের মুঠি ধ'রে টেনে নিয়ে যাব—ওঠ—দিন দিন ইয়ে
হচ্ছেন—না? ওঠ্ বলচি—

কুমী দ্বিরুক্তি না ক'রে বিছানা ছেড়ে দালানে চুল বাঁধতে বসে গেল।
সাজানো গোজানোও বাদ গেল না, মেয়ে দেখানোও হ'ল, কিন্তু ফল সমান
দাঁড়ালো অর্থাৎ পাত্রপক্ষ বাড়ি গিয়ে চিঠি দেবো বলে গেলেন।

জামালপুরের কাজে এসে যোগ দিলে হীরু। কিন্তু সে যেন সর্বদাই অন্য
মনস্ক। কুমীর জন্য এত চেষ্টা ক'রেও কিছু দাঁড়াল না শেষ পর্য্যন্ত! কি কা

ায় ? এদিকে কুমীদের বাড়িতেও তার পসার নষ্ট হয়েচে, তার আনা সম্বন্ধের শীর সবাই আস্থা হারিয়েচে। হারাবারই কথা। এবার সেখানেও কথা তুলবার মন নেই তার। অত বড বড় সম্বন্ধনিয়ে যাওয়াই বোধ হয় ভুল হয়েচে। কুমীর ভালো ঘর জুটিয়ে দেবার ব্যাকুল আগ্রহে সে ভুলে গিয়েছিল যে, বড়তে ছোটতে কখনো খাপ খায় না।

লজ্জায় সে পিসিমার বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিলে।

বছর দুই তিন কেটে গেল।

হীরু চাকরিতে খুব উন্নতি ক'রে ফেলেচে তার সুন্দর চরিত্রের গুণে। চীফ্ ইঞ্জিনীয়ারের আপিসে বদলি হ'ল দেডশো টাকায় মার্চ মাস থেকে।

হীরু আর সেই হীরু নেই। এমনি হয়, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রতিদিন, প্রতি মাস, প্রতি বৎসর, তিলে তিলে মানুষের দেহের ও মনের পরিবর্তন হচ্চে। অবশেষে পরিবর্তন এমন গুরুতর হয়ে ওঠে যে, বহুকাল পরে আবার সাক্ষাৎ হ'লে আগের মানুষটিকে আর চেনাই যায় না। হীরু ধীরে ধীরে বদলেচে। অল্প অল্প করে কুমীকে ভুলেচে। রামকৃষ্ণ আশ্রমে যাবার বাসনাও তার নেই বর্তমানে! এর মূলে একটা কারণ আছে, সেটা এখানে বলি। জামালপুরে একজন বয়লার ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন। তাঁর বাড়ি হুগলী জেলায়, বিলেতের পাস ইঞ্জিনীয়ার, বেশ মোটা মাইনে পেতেন। কিন্তু অদৃষ্টের দোষে তার দুটি মেয়ের বিয়ে দিতে তাঁকে সর্বস্বান্ত হ'তে হয়েচে। এখনও একটি মেয়ে বাকি।

হীরুর সঙ্গে এই পরিবারের বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। সুরমা হীরুর সামনে বার হয়, তাকে দাদা বলে ডাকে, কখনও কখনও নিজের আঁকা ছবি দেখায়, গল্প করে, গান শোনায়।

একদিন হঠাৎ হীরুর মনে হ'ল—সুরমার মুখখানা কি সুন্দর! আর চোখ দুটি—পরেই ভাবল—ছিঃ, এসব কি ভাবচি? ও ভাবতে নেই।

আর একদিন অমনি হঠাৎ মনে হ'লো কুমীর চেয়ে সুরমা দেখতে ভালো —কি ফর্সা গায়ের রং সুরমার! তখনই নিজের এ চিন্তায় ভীত ও সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ল। না, কি ভাবনা এসব, মন থেকে এসব জোর ক'রে তাড়াতে হবে। কিন্তু জীবনকে প্রত্যাখ্যান করা অত সহজ হ'লে আজ গেরুয়াধারী স্বামীজীদের ভিড়ে পৃথিবীটা ভর্তি হ'য়ে যেত। হীরুর বয়েস কম, মন এখনও মরে নি। শুষ্ক, শীর্ণ, এক অতীত মনোভাবের কঙ্কালের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখতে তার নবীন ও সতেজ মন ঘোর আপত্তি জানালে। কুমীর সঙ্গে যা কিছু ছিল,

সে অমূল তরু শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গিয়েচে আলো-বাতাস ও পৃথিবীর স্পর্শ না পেয়ে।

সুরমাকে বিয়ে করায় কিছুদিন পরে সুরমার বাবা বয়লার ফাটার দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। রেল কোম্পানী হীরুর শাশুড়ীকে বেশ মোটা টাকা দিলে এজন্য। প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকাও যা পাওয়া গেল তাতে মেয়ের বিয়ের দেনা শোধ করেও হাতে ছ' সাত হাজার টাকা রইল। সুরমার মা ও একটি নাবালক ভাইয়ের দেখাশোনার ভার পড়েছিল হীরুর উপর, কাজেই টাকাটা সব এসে পড়লো হীরুর হাতে। হীরু সে টাকায় কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করল। চাকরি প্রথমে ছাড়ে নি, কিন্তু শেষে রেল-কারখানায় কয়লার কণ্ট্রাক্ট নিয়ে একবারে বেশ মোটা কিছু লাভ ক'রে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসাতে ভালো ভাবেই নামল। সুরমাকে বিয়ে করার চার বছরের মধ্যে হীরু একজন বড় কণ্ট্রাক্টার হয়ে পড়ল, শাশুড়ীর টাকা বাদ দিয়েও নিজের লাভের অংশ থেকে সে তখন ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা কারবারে ফেলেচে।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে হীরুর চালচলনও বদলে গিয়েচে। রেলের কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে মুঙ্গেরে গঙ্গার ধারে বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানেই সকলকে রেখেচে। রেলে জামালপুরে যাতায়াত করে রোজ, মোটর এখনও করেনি। তবে বলতে শুরু করেচে, মোটর না রাখলে আর চলে না। ব্যবসা রাখতে গেলে ওটা নিতান্তই দরকার, বাবুগিরির জন্য নয়। হঠাৎ এই সময় দেশ থেকে পিসিমার চিঠি এল, তিনি আর বেশীদিন বাঁচবেন না; বহুকাল হীরুকে দেখেন নি তিনি। তাঁর বড় ইচ্ছে মুঙ্গেরে হীরুর কাছে কিছুদিন থাকেন ও দুবেলা গঙ্গাস্নান করেন।

সুরমা বললে—আসতে যখন চাইচেন, নিয়ে এসো গে—আমিও তাঁকে কখনও দেখিনি। আমরা ছাড়া আর তাঁর আছেই বা কে? বুড়ো হয়েচেন—যে ক'দিন বাঁচেন এখানেই গঙ্গাতীরে থাকুন।

বাসায় আর এমন কেউ ছিল না, যাকে পাঠান যায় পিসিমাকে আনতে, কাজেই হীরুই দেশে রওনা হলো।

ভাদ্রমাস। দেশ এবার ভেসে গিয়েচে অতিবৃষ্টিতে। কোদলা নদীতে নৌকায় ক'রে আসবার সময় দেখলে জল উঠে দুপাশের আউশ ধানের ক্ষেত ডুবিয়ে দিয়েচে। গোয়ালবাসির বিলে জল এত বেড়েচে যে, নৌকোর বুড়ো মাঝি বললে, সে তার জ্ঞানে কখনও এমন দেখেনি, গোয়ালবাসি ও চিত্রাজপুর গ্রাম দু'খানা প্রায় ডুবে আছে।

অথচ এখন আকাশে মেঘ নেই, শরতের সুনীল আকাশের নিচে রৌদ্রভরা মাঠ, জল বাড়বার জন্য নৌকো চললো মাঠের মধ্য দিয়ে, বড বাব্‌লা বনের পাশ কাটিয়ে, ঘন সবুজ দীর্ঘ লতানে বেতঝোপ কড কড ক'রে নৌকার ছইয়ের গায়ে লাগচে, মাঠের মাঝে বন্যার জলের মধ্যে জেগে আছে ছোট ছোট ঘাস, তাতে ঘন ঝোপ।

পিসিমাদের গ্রামে নৌকো ভিরতে দুপুর ঘুরে গেল। এখানে নদীর পার খুব উঁচু বলে কূল ছাপিয়ে জল ওঠে নি। দু-পারেই বন। একদিকে হ্রস্ব ছায়া পরেচে জলে। অন্য পারে খররৌদ্র।—এই বনের গন্ধ—নদীজলের ছলছল শব্দ—বাঁশবনে সোনার সরকীর মতো নতুন বাঁশের কোঁর বাঁশঝারের মাথা ছাড়িয়ে উঠেচে—এই শরত দুপুরের ছায়া—এই সব অতি পরিচিত দৃশ্য একটি মাত্র মুখ মনে করিয়ে দেয়—অনেকদিন আগের মুখ—হয়তো একটু অস্পষ্ট হয়ে গিয়েচে, তবুও সেই মুখ ছাড়া আর কোন মুখ মনে আসে না। নদীর ঘাটে নেমে, পথে চলতে চলতে সে মুখ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল মনের মধ্যে—এক ধরনের হাত-নাড়ার ভঙ্গি আর কি বকুনি!—জগতে আর কেউ তেমন কথা বলতে পারে না। অনেক দূরের কোন্ অবাস্তব শূন্যে ঘুরচে সুরমা, তার আকর্ষণের বাইরে এ রাজ্য। এখানে গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী আর একজন, তার একচ্ছত্র অধিকার এখানে—সুরমা কে? এখানকার বন, নদী, মাঠ, পাখি সুরমাকে চেনে না।

হীরু নিজেই অবাক হয়ে গেল নিজের মনের ভাবে।

পিসিমা যথারীতি কান্নাকাটি করলেন অনেকদিন পরে ওকে দেখে। আরও ঢের বেশি বুড়ী হয়ে গিয়েচেন, তবে এখনও অথর্ব হন নি। বেশ চলতে ফিরতে পারেন। হীরুর জন্য ভাত চডাতে যাচ্ছিলেন, হীরু বললে—তোমায় কষ্ট করতে হবে না পিসিমা। আমি চিঁড়ে খাব। ওবেলা বরং রেঁধো।

অনেকবার বলি বলি করেও কথাটা সে কিছুতেই পিসিমাকে জিগ্যেস করতে পারলে না। একটু বিশ্রাম ক'রে বেলা পডলে সে হাটতলার মধু ডাক্তারের ডাক্তারখানায় গিয়ে বসল। মধু ডাক্তারের চুল-দাঁড়িতে পাক ধরেচে। একটি ছেলে সম্প্রতি মারা গিয়েচে—সেই গল্প করতে লাগল। গ্রামের মক্তবের সেই বুড়ো মৌলবী এখনও আছে। এখনও সেই রকম নিজের অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতার প্রসঙ্গে সাব্-ইনস্পেক্টর মহিম বাবুর গল্প করে। মহিমবাবু ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে এ অঞ্চলে স্কুল সাব-ইনস্পেক্টারী করতেন। এখন বোধ হয়

মরে ভূত হয়ে গিয়েচেন। কিন্তু কোন্‌বার মক্তব পরিদর্শন করতে এসে নিজেই শুভঙ্করীর সারাকালির একটা অঙ্ক দিয়ে নিজেই কষে বুঝিয়ে দিতে পারেন নি, সে গল্প আজও এদেশে প্রচলিত আছে। এই মৌলবী সাহেবের মুখেই হীরু এ গল্প বহুবার শুনেচে।

সন্ধ্যা হবার পূর্বেই হীরু হাটতলা থেকে উঠল। মধু ডাক্তার বললে—বসো হে হীরু, সন্ধ্যাটা জ্বালি—তারপর দু একহাত খেলা যাক। এখন না হয় বড়ই হয়েচ, পুরোনো দিনের কথা একেবারে ভুলে গেলে যে হে!

হীরু পথশ্রমের অজুহাত দেখিয়ে উঠে পড়ল। তার শরীর ভাল নয়। পুরোনো দিনের এই সব আবেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়ে সে ভালো করে নি।

কুমী এখানে আছে কিনা, এ কথাটা মধু ডাক্তারকেও সে জিগ্যেস করবে ভেবেছিল। ওদের একই পাড়ায় বাড়ি। কুমী মধু ডাক্তারকে কাকা বলে ডাকে। কুমীদের সম্বন্ধে মাত্র সে এইটুকু শুনেছিল যে, কুমীর জ্যাঠামশাই বছর পাঁচেক হোল মারা গিয়েচেন এবং জ্যাঠতুতো ভাইয়েরা ওদের পৃথক করে দিয়েচে।

অন্যমনস্ক ভাবে চলতে চলতে সে দেখলে কখন কুমীদের পাড়াতে, একেবারে কুমীদের বাড়ির সামনেই এসে পড়েচে। সেই জিউলি গাছটা, এই গাছটাতে একবার সাপ উঠে পাখীর ছানা খাচ্ছিল, কুমী তাকে ছুটে গিয়ে খবর দিতে, সে এসে সাপ তাড়িয়ে দেবার জন্য ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি করে। এ পাড়ার গাছে-পালায়, ঘাসের পাতায়, সন্ধ্যার ছায়ায়, শাঁখের ডাকে কুমী মাখানো। এই রকম সন্ধ্যায় কুমীদের বাড়ি বসে সে কত গল্প করেচে কুমীর সঙ্গে।

চুপ করে সে জিউলিতলায় খানিকটা দাঁড়িয়ে রইল।...

তার সামনের পথটা দিয়ে সাতাশ আঠাশ বছরের একটি মেয়ে দুটো গরুর দড়ি ধরে নিয়ে আসচে। কুমীদের বাড়ির কাছে বাঁশতলাটায় যখন এল, তখন হীরু চিনতে পারলে সে কুমী।

প্রথমটা সে যেন অবাক হয়ে গেল—আড়ষ্টের মতো দাঁড়িয়ে রইল—সত্যই কুমী? এমন অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে তার চোখের সামনে! কুমীই বটে। কিন্তু কত বড় হয়ে গিয়েছে সে।

হঠাৎ হীরু এগিয়ে গিয়ে বললে—কুমী কেমন আছ? চিনতে পারো?

কুমী চমকে উঠল, অন্ধকারে বোধ হয় ভাল করে চিনতে পারলে না। বলল—কে?

—আমি হীরু।

কুমী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। তারপর এসে পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করে হীরুর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কবে এলে হীরুদা? কোথায় ছিলে এতকাল? সেই জামালপুরে?

—আজই দুপুরে এসেচি।

আর কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না। সে কেবল একদৃষ্টে কুমীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কুমীর কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, পরনে আধ-ময়লা শাড়ি। যে কুমীকে সে দেখে গিয়েছিল ছ-সাত বছর আগে, এ সে কুমী নয়। সে কৌতূহলোচ্ছল কলহাস্যময়ী কিশোরীকে এর মধ্যে চেনা যায় না। এ যেন নিরানন্দের প্রতিমা। মুখশ্রী কিন্তু আগের মতোই সুন্দর। এতদিনেও মুখের চেহারা খুব বেশী বদলায় নি।

কুমী বললে—এসো আমাদের বাড়ি হীরুদা। কত কথা যে তোমার সঙ্গে আছে, এই ক'বছরে কত কথা জমানো রয়েচে, তোমায় বলব বলব করে কতদিন রইলাম, তুমি এ পথে আর এলেই না।।

হয়েছে! সেই কুমী! ওর মুখে হাসি সেই পুরোনো দিনের মতই আবার ফুটে উঠেছে। হীরু ভাবলে, আহা, ওর বকুনীর শ্রোতা এতদিন পায়নি তাই এ মুখ্যনিয়ওয়ান।

—তুমি আগে চল কুমী।

—তুমি আগে চল, হীরুদা।

চার-পাঁচ বছরের একটি ছেলে রোয়াকে বসে মুড়ি খাচ্ছিল। কুমীকে দেখে বললে—ওই মা এসেচে।

—বসো হীরুদা, পিঁড়ি পেতে দিই। মা বাড়ি নেই। ওপাড়ায় গিয়েচে রায়-বাড়ি, কাল ওদের লক্ষ্মীপুজোর রান্না রেঁধে দিতে। আমি ছেলেটাকে মুড়ি দিয়ে বসিয়ে রেখে গরু আনতে গিয়েছিলুম দীঘির পার থেকে। উঃ—কতকাল পরে দেখা হীরুদা। বসো, বসো। কি খাবে বলো তো? তুমি মুড়ি আর ছোলাভাজা খেতে ভালোবাসতে। বসো, সন্ধ্যাটা দেখিয়ে খোলা চড়িয়ে গরম গরম ভেজে দিই। ঘরে ছোলাও আছে, নারকোলও আছে! দাঁড়াও পিদিমটা জ্বালি।

সেই মাটির ঘর সেই রকমই আছে। সেই কুমী সন্ধ্যাপ্রদীপ দিচ্ছে পুরোনো দিনের মতো। যখন সে কত রাত পর্য্যন্ত ওদের বাড়ি বসে গল্প করতো। তবুও

কত পরিবর্তন হয়ে গিয়েচে! কত ব্যবধান এখন তার আর কুমীর মধ্যে।

কুমী সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখিয়ে চাল ভাজতে বসল। একটু পরে ওকে খেতে দিয়ে সামনে বসল। সেই পুরোনো দিনের মতই গল্প করতে। সেই হাত-পা নাড়া, সেই বকুনী—সবই সেই। কত কথা বলে গেল। হীরু ওর দিকে চেয়ে থাকে, চোখ আর অন্য দিকে ফেরাতে পারে না। কুমীও তাই।

হীরু বললে—ইয়ে, কোথায় তোমার বিয়ে হ'ল কুমী?

কুমী লজ্জায় চোখ নামিয়ে বললে—সামটা।

—তা বেশ।

তারপর কুমী বললে,—ক'দিন থাকবে এখন হীরুদা?

—থাকবার যো নেই, কাজ ফেলে এসেছি, পিসিমাকে নিয়ে কালই যাব। পিসিমা চিঠি লিখেছিলেন বলেই তো তাঁকে নিতে এলাম।

—না, না, হীরুদা, সে কি হয়? কাল ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপুজো, কাল কোথায় যাবে? এখন দু'দিন থাক। কতকাল পরে এলে। তুমিও তো বিয়ে করেচ, বৌদিকে নিয়ে এলে না কেন? দেখতাম। ছেলেমেয়ে কি?

—দুটি ছেলে একটি মেয়ে।

—বেশ, বেশ। আচ্ছা, আমার কথা মনে পডতো হীরুদা?

মনে খুব পডতো না, কিন্তু একথাও ঠিক যে, এখন মনে পড়চে যে, সুরমা ও জামালপুর অস্পষ্ট হয়ে গিয়েচে। বড লোকের মেয়ে সুরমা তার মনের মতো সঙ্গিনী নয়, তার সঙ্গে সব দিক্ থেকে মেলে—খাপ খায় এই কুমীর। অথচ সুরমার জন্য দামী মাদ্রাজী শাড়ি কিনে নিয়ে যেতে হবে কলকাতা থেকে যাবার সময়—সুরমা বলেচে, যাচ্চ যখন দেশে, ফিরবার সময় কলকাতা থেকে পুজোর কাপড-চোপড কিনে এনো। এখানে ভালো জিনিস পাওয়া যায় না, দরও বেশি।

আর কুমীর পরনে ছেঁডা আধময়লা কাপড!

না—দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীকে বড়লোকী উপহার দিয়ে সে তার অপমান করবে না।

কুমী বকেই চলেচে। অনেক দিন পরে আজই ও আনন্দ পেয়েচে—নিরানন্দ অসচ্ছল সংসারের একঘেয়ে কর্মের মধ্যে। বালিকা বয়সের শত আনন্দের স্মৃতি নিয়ে পুরোনো দিনগুলো হঠাৎ আজ সন্ধ্যায় কেমন ক'রে ফিরেচে।

ঘণ্টা দুই পরে কুমীর মা এলেন। বললেন—এই যে, জুটেচ দুটিতে? আমি শুনলুম দিদির মুখে যে হীরু এসেচে। কাল লক্ষ্মীপুজো, তাই রায়েদের বাড়ি রান্না করে দিয়ে এলাম। তা ভালো আছিস বাবা হীরু? কুমী কত তোর কথা বলে। তোর কথা লেগেই আছে ওর মুখে। আজও দুপুর বেলা বলছিল, মা হীরুদা নদীতে বন্যা দেখলে খুশি হোত; এবার তো বন্যা এসেছে, হীরুদা যদি দেখতো, খুব খুশি হোত—না মা? তা, আমি, তুই এসেছিস্ শুনেই দিদির ওখানে গিয়েছিলুম। বাড়ি নেই দেখে ভাবলাম সে ঠিক আমাদের এখানে গিয়েচে। তা ব'সো বাবা, চট্ করে পুকুর থেকে কাপড় কেচে গা ধুয়ে আসি। গামছাখানা দে তো কুমী। খোকার জন্য তরকারী এনেচি কাঁসিতে। ওকে ভাত দে। এই ওর বিয়ে দিয়েচি সামটায়—বুঝলে বাবা হীরু? জামাই দোকানে সামান্য মাইনের খাতা-পত্র লেখার কাজ করে। তাতে চলে না। তার উপর দজ্জাল ভাই-বৌ। খেতে পর্য্যন্ত দেয় না ভালো করে মেয়েটাকে! এই দেখো—এখানে এসেচে আজ পাঁচ মাস, নিয়ে যাবার নামটি নেই, বৌদিদির হুকুম হবে তবে বৌ নিয়ে যেতে পারবে। আর এদিকে তো আমার এই অবস্থা। মেয়েটার পরনে নেই কাপড়। জামাই আসে যায়, কাপড়ের কথা বলি, কানেও তোলে না। আমি যে কি করে চালাই? তা সবই অদৃষ্ট! নইলে—

কুমী ঝাঁজালো সুরে বললে—আঃ যাও না, গা ধুয়ে এসো না—কি বকবক শুরু করলে—

অদৃষ্ট, হ্যাঁ অদৃষ্টই বটে। সে আজ কোথায়, আর কুমী কোথায় পড়ে কষ্ট পাচ্চে। পরনে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, জীবনে আনন্দ নেই, সাধ-আহ্লাদ নেই, কিছুই দেখলে না, কিছুই ভোগ করলে না, সবই অদৃষ্ট ছাড়া আর কি?

খানিক রাত্রে হীরু উঠল। কুমী প্রদীপ ধরে এগিয়ে দিলে পথ পর্য্যন্ত। বললে—আমাদের হ্যারিকেন লণ্ঠন নেই, একটা পাকাটি জেলে দিই, নিয়ে যাও হীরুদা, বাঁশবনে বড্ড অন্ধকার।

সকালে কুমী পিসিমার বাড়ী এসে ডাক দিলে—কি হচ্ছে ও হীরুদা—

—এই যে কুমী, কামিয়ে নিলাম। এইবার নাইবো।

কুমী ঘরের মধ্যে ঢুকে বললে—কেন, কিসের তাড়া নাইবার এত সকালে? তোমার কিন্তু আজ যাওয়া হবে না হীরুদা—বলে দিচ্চি। আজ ভাদ্রমাসের

লক্ষ্মীপুজোর অরন্ধন, তোমায় নেমন্তন্ন করতে এলুম আমাদের বাড়ি। মা বললেন, যা গিয়ে বলে আয়।

হীরু আর প্রতিবাদ করতে পারলে না, কুসীর কাছে প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই সে জানে। কুসী খানিকটা পরে বললে—আমার অনেক কাজ হীরুদা, আমি যাই। তুমি নেয়ে সকাল সকাল এস।

হীরু বেলা দশটার মধ্যে ওদের বাড়ি গেল। আজ আর রান্নার হাঙ্গামা নেই। কুসী বললে—আজ কিন্তু পান্তা ভাত খেতে হয় জানো তো? আর কচুর শাক—আর একটা কি জিনিস বলো তো—উঁহু, তুমি বলতে পারবে না।

কুসীর মা বললেন—কাল রাত্রে তুই চলে গেলে মেয়ে অত রাত্রে তোর জন্যে নারিকেল-কুমড়ো রাঁধতে বসল। বললে, হীরুদা বড় ভালোবাসে মা, কাল সকালে খেতে বলব, রেঁধে রাখি।

কুসী স্নান সেরে এসে একখানা ধোয়া শাড়ি পরেচে, বোধহয় এইখানাই তার একমাত্র ভালো কাপড়। সেই চঞ্চলা মুখরা বালিকা আর সে সত্যিই নেই। আজ দিনের আলোয় কুসীকে দেখে ওর মনে হ'ল—কুসীর চেহারা আরও সুন্দর হয়েচে, তবে ওর মুখে চোখে একটা শান্ত মাতৃত্বের ভাব ফুটে উঠেচে যেটা হীরু কখনো ওর মুখে দেখেনি। কুসী অনেক ধীর হয়েচে, অনেক সংযত হয়েচে। মাথায় সেই রকমের এক ঢাল চুল, মুখশ্রী এখনও সেই রকম লাবণ্যময়। তবুও যেন কুসীকে চেনা যায় না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা কুসী অন্তর্হিত হয়েচে, এখন যে কুসীকে সে দেখচে তার অনেকখানিই যেন ও চেনে না।

কিন্তু খানিকটা বসবার পরে হীরুর এ ভ্রম ঘুচে গেল। বাইরের চেহারা যতই বদলে যাক না কেন, তার সামনে যে কুসী বার হয়ে এল, সে সেই কিশোরী কুসী। ওর যেটুকু পরিচিত তা ওর মধ্যে থেকে বা'র হয়ে এল—যেটুকু হীরুর অপরিচিত, তা নিজেকে গোপন রাখলে।

কি চমৎকার কুসীর মুখের হাসি। হীরুর মোহ নেই, আসক্তি নেই, আছে কেবল একটা সুগভীর স্নেহ, মায়া, অনুকম্পা—এ এক অদ্ভুত মনের ভাব, কুসীকে সে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে তাকে এতটুকু খুশি করবার জন্য।

কুসী কত কি বকচে বসে বসে—পুরোনো দিনের কথা তুলচে কেবল।

—মনে আছে হীরুদা, সেই একবার জেলেদের বাঁশতলায় আলেয়া জলেছিল ? —সেও তো এই ভাদ্রমাসে—সেই চারুপাঠ মনে আছে ?

হীরুর খুব মনে আছে। সবাই ভয়ে আড়ষ্ট, আলেয়া নাকি ভূত, যে দেখতে যায় তার অনিষ্ট হয়। হীরু সাহস করে এগিয়ে গিয়েছিল দেখতে, কুমীও পিছু পিছু গিয়েছিল।

হীরু বলেছিল—আসছিস্ কেন পোড়ারমুখী, ভূত ধরে খাবে যে—

কুমী ভেংচি কেটে বলেছিল—ইস্! ভূতে ধরে ওঁকে খাবে না—আমাকেই খাবে। আলেয়া বুঝি ভূত? ও তো একরকম বাষ্প, আমি পড়িনি বুঝি চারুপাঠে? শুনবে বলব—অনেকের বিশ্বাস আছে আলেয়া একপ্রকার ভূতযোনি, বাস্তবিক ইহা তা নয়—

হীরু ধমক দিয়ে বলেছিল—রাখ্ তোর চারুপাঠ—আরম্ভ করে দিলেন এখন চারুপাঠ, বলে ভয়ে মরচি—

পরক্ষণেই কুমী খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিল—কি বললে হীরুদা, ভয়ে মরছো? হি—হি—হি—হি—এত ভয় তোমার যদি এলে কেন? চারুপাঠ পড়লে ভয় থাকতো না। চারুপাঠ তো আর পড নি?

সেই সব পুরোনো গল্প। আলেয়া—আলেয়াই বটে।

কুমীর যে খানিকটা পরিবর্তন হয়েচে তা বোঝা গেল, যখন ও গ্রামের এক বিধবা গরীব মেয়ের কথা তুললে। আগে এসব কথা কুমী বলত না। এখন স পরের দুঃখ বুঝতে শিখেচে। মুখুয্যে-বাড়ির বড় পুরীপাল্লার মধ্যে হর মুখুয্যের এক বিধবা নাতনী—নিতান্ত বালিকা—কি রকম কষ্ট পাচ্চে, পুকুরঘাটে কুমীর কাছে বসে নির্জনে মৃত স্বামীর রূপগুণের কত গল্প করে—এ কথা কুমী দিয়ে বলে গেল। সত্যিই মাতৃত্ব ওর মধ্যে জেগেচে, ওকে বদলে দিয়েচে অনেকখানি।

হঠাৎ কুমী বললে—ওই দেখো হীরুদা, বকেই যাচ্চি। তোমায় যে খেতে দবো, সে কথা মনে নেই।

তার পরে সে উঠে তাড়াতাড়ি হীরুকে ঠাঁই করে দিয়ে ভাত বেড়ে নিয়ে এল। হাসিমুখে বললে—জামালপুরের বাবুর আজ কিন্তু পান্তা ভাত খেতে হবে। রুচ্‌বে তো মুখে? নেবু কেটে দেবো এখন অনেক ক'রে, নারকোল মুড়ি আছে, কচুর শাক আছে।

এসব সত্যিই হীরু অনেকদিন খায় নি। যা যা সে খেতে ভালোবাসে, কুমী

তার কিছুই বাদ দেয় নি। হীরু আশ্চর্য হয়ে গেল এতকাল পরেও কুমী মনে রেখেচে এ সব কথা।

খেতে বসে হীরু বললে—কুমী, ছেলেবেলা ভালো লাগে না এখন ভালো লাগে?

—এ কথার উত্তর নেই হীরুদা। ছেলেবেলায় তোমরা সব ছিলে, সে একদিন ছিল। এখনও তা বলে খারাপ লাগে না। জীবনে নানারকম দেখা ভালো—নয় কি?

—কুমী, একটা কথার উত্তর দে। তোর সংসারের টানাটানি খুব?

—কে বললে একথা? মা বলেছিল সেই তো কাল রাত্তিরে? ও বাজে কথা জানো তো মা যত বাজে বকে। বুড়ো হয়ে মার আরও জিব আলগা হয়ে গেছে

—কুমী, আমার কাছে সত্যি কথা বলবিনে?

—ঐ, তুমিও পাগলামি শুরু করলে। নাও, খেয়ে নাও। যত বাজে বকতে পারো, মা গো! দাঁড়াও, পায়েসটা আনি, কচুর শাক পড়ে রইল কেন অতখানি? না সে হবে না।

ছাখ্ কুমী, আমার কাছে বেশি চালাকি করিস্ নে। তোকে আর আমি জানি নে? কোদ্‌লার ঘাটে পায়ে খেজুর কাঁটা ফুটে গিয়েছিল, মুখে একটু রা করিস্ নি, জান্‌তে দিস্ নি কাউকে—

—আবার?

হীরু চুপ করে গেল। এতখানি ব'লে সে ভালো করে নি, ঝোঁকের মাথায় ব'লে ফেলেচে। কুমী যা ঢাকতে চায়, ও তা বার ক'রে কুমীর আত্মসম্মানে ঘা দিতে চায় কেন? ছিঃ—

কুমী বললে—আবার কবে আসবে হীরুদা?

—সত্যি কথা যদি শুনতে চাস্, আমার যেতে ইচ্ছে হচ্চে না কিন্তু।

—আবার বাজে বকতে শুরু করেচ হীরুদা? তোমার যা-কিছু সব সামনে; চোখের আড়াল হ'লে আর মনে থাকে না। আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যত বাজে বকুনি—

—তুমি তো জানো না একটুও বাজে বকতে? আমি ইচ্ছে করলে থাকতে পারিনে ভেবেছিস্?

—হ্যাঁ, থাকো না দেখি কাজকর্ম বন্ধ করে। বৌদি এসে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে না?

—আচ্ছা সে যাক ; একটা কথার উত্তর তোকে দিতেই হবে। আমি যদি
খানে থাকি তুই খুশি হোস্ ?

—উঃ, মা গো, মুখ বুজে খেয়ে নাও দিকি ? কি বাজে বকতেই পারো ?

হীরু দুঃখিত ভাবে বললে—আমার এ কথাটারও উত্তর দিবি নে কুমী ?
ই এত বদলে গিয়েছিস্, আমি এ ভাবতেই পারি নে। আচ্ছা, বেশ।

কুমী হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়তে পড়তে বললে—তোমার কিন্তু একটুও
লায় নি হীরুদা, সেই রকম 'আচ্ছা, বেশ' বলা, সেই রকম কথায় কথায় রাগ
রা। আচ্ছা, কি বলব বলো দিকি ? তুমি জানো না ও-কথার কি উত্তর
আমি দিতে পারি ? ভেবে ভাখো তা হ'লে আমি বদলাই নি, বদলে গিয়েছ
মি হীরুদা।

—আচ্ছা কুমী, এতটা না বকে সামান্য দু' কথায় শাদা উত্তর একটা দে না
কন ? বকুনিতে আমি তোর সঙ্গে পারব ?

—না, তা তুমি পারবে কেন ? বকতে তুমি একটুও জানো না। হ্যাঁ, হই।

—মন থেকে বলচিস্ ?

—আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করচে হীরুদা, এতটা বদলে গিয়েচ
মি! যাও—আমি তোমার কোনো কথার আর উত্তর দেবো না। তুমি না
জের বুদ্ধির বড় অহঙ্কার করতে ?

—কুমী, রাগ করিস নে। অনেক কাজের মধ্যে থেকে আমার সূক্ষ্ম বুদ্ধিটা
হয়ে গিয়েছে। যাক্, বাঁচলুম কুমী!

পায়েসটা খাও, তোমার পায়ে পড়ি। আর বকুনিটা কিছুক্ষণের জন্য ক্ষান্ত
খো। কিছু তোমার পেটে গেল না এই অনাছিষ্টি বকুনির জন্য।

কুমী পরদিন এসে বিছানা-বাক্স গুছিয়ে দিলে। ঘাট পর্য্যন্ত এসে ওদের
নৌকোতে উঠিয়ে দিলে। নৌকো ছেড়ে যখন অনেকটা গিয়েছে তখনও কুমী
ডাঙায় দাঁড়িয়ে আছে।

দু'পারের নদীচড় নির্জন! দুপুরের রৌদ্র আজ বড় প্রখর, আকাশ অদ্ভুত
নের নীল, মেঘলেশহীন। বন্যার জলে পারের ছোট কালকাসুন্দি গাছের
পর্য্যন্ত ডুবে গিয়েছে। কচুরিপানার বেগুনী ফুল চড়ার ধারে আটকে আছে।
ই সব বন জঙ্গলময় ডাঙার পাশ দিয়ে চলেছে ওদের নৌকো। ঝোপের
পার ছায়ায় ডাহুক চরছে। বন্যার জলে নিমগ্ন আখের ক্ষেতের আখগাছগুলো
াতের বেগে থরথর কাঁপছে।

ছইয়ের মধ্যে পিসিমা ঘুমিয়ে পড়েছেন। নিস্তব্ধ ভাদ্র অপরাহ্ণ। বাইরে নৌকোয় তক্তার ওপর বসে বসে হীরু কত কথা ভাবছিল। এ গ্রামে যদি সে থাকতে পারত! মধু ডাক্তারের মতো হাটতলায় ওষুধের ডিস্পেন্সারি খুলে? ডাক্তারীটা যদি শিখতো সে!

পুজোর বাজারটা ফিরবার সময় করতে হবে কলকাতা থেকে, অন্ততঃ দেড়-শো টাকার বাজার। আসবার সময় খুব উৎসাহ করে সুরমার কাছ থেকে ফর্দ করে নিয়ে এসেছে।

একটা মানুষের মধ্যে মানুষ থাকে অনেকগুলো! জামালপুরের হীরু অন্যলোক, এ হীরু আলাদা। এ বসে বসে ভাবছে, কুমীদের রান্নাঘরে অরন্ধনের নেমন্তন্ন খেতে বসেছিল, সেই ছবিটা। অনবরত ওই একটা ছবিই।—

কুমী বলেছে—আমার কথা মনে পড়তো হীরুদা?—

কুমী এখনও কি ঠিক তেমনি হাত-পা নেড়ে কথা বলে—ঠিক সেই ছেলেবেলাকার মতো!—আচ্ছা, আর কারো সঙ্গে কথা ব'লে অমন আনন্দ হয় না কেন? সুরমার সঙ্গেও তো রোজ কত কথা হয় - কই—

রেলের বাঁশির আওয়াজে হীরুর চমক ভাঙলো। ওই স্টেশনের ঘাট দেখা দিয়েছে। সিগ্ন্যাল নামানো। বোধ হয় ডাউন ট্রেণটা আসবার দেরি নেই—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অশোক

মণীন্দ্রলাল বসু

অশোকের কথা—

আমি আর রিভলভারটা পাশাপাশি স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। ভাবছি—রিভল্‌ভারটা বল্‌ছে—আব কেন বন্ধু, বল, এক নিমেষে তোমার সব ভাবনা শেষ করে দিই। হ্যাঁ বন্ধু, তোমার একটি অগ্নিচুম্বন দিয়ে আমাকে সব বোঝা হতে মুক্তি দেবে জানি, কিন্তু মুক্তি কি সত্যই দিতে পারবে—**in that sleep of death what dreams may come!**

পুলিশ কমিশনারের কাছে চিঠিটা তাকিয়ে যেন বল্‌ছে,—না, বেয়োনাক! ওতে লিখলুম, তোমরা যে অ্যানারকিস্‌টকে ধরবার জন্যে কত কাণ্ডই না করেছ, কাবুল পর্য্যন্ত ডিটেক্‌টিভ পাঠিয়েছ, তার মৃতদেহ কাল সকালে এখানে দেখলে নিশ্চয় খুশী হবে না, পুরস্কারের মোটা টাকাটা ভাগ্যে জুটল না। আমি স্ব-ইচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে আপনাকে বিনাশ করছি, নিজের দলের ষড়যন্ত্রে বা প্রতিহিংসায় কেউ আমায় মারেনি।

আর একখানা চিঠি বাড়ীতে লিখলে হয়, দাদাকে। তাঁকে ত আমার জমিদারির সব অংশ দিয়ে এসেছি,—শুধু যদি তিনি কয়েক হাজার টাকা পাশের ঘরের তরুণ কবিটিকে দেন। সেই সাত মহল জমিদার-বাড়ী,—এক ঝিল্লিরব-আকম্পিত তারাভরা নিশীথে সেই বাড়ীর ছোট ছেলেটি যখন সুখসম্পদ্ ছেড়ে এই বিপ্লবের দুঃসহ পথে প্রলয়ের শঙ্খ শুনে বেরিয়ে পড়েছিল, সেই রাতে বাড়ীখানি নদীর কলকলে, আম্রবনের মর্ম্মরে যেমন করে ডেকে চেয়েছিল, সেই ছবিখানি মনের সামনে ভেসে উঠছে। বায়স্কোপের দীর্ঘ ফিলিম্ হতে মাঝে মাঝে কাটা অসংলগ্ন টুকরো ঘটনার ছবির মত, শৈশব-জীবনের কত হারানো ক্ষণ, কত ভুলে-যাওয়া ঘটনা, কত টুক্‌রো কথা, ছড়ান হাসি—চোখের উপর নিমেষে জেগে মিলিয়ে যাচ্ছে,—আমের মুকুলের মত সেই যে ছেলেটি গ্রীষ্মের

দুপুরে খেয়াঘাটের বটচ্ছায়ায় বসে পারাপার দেখ্‌ত; বর্ষারাতে বিদ্যুৎ-চমকে কেঁপে মায়ের কোলে লুকিয়ে তেপান্তরের মাঠ পার হত, সেই পূজোর সময় একবার বলির ছাগল লুকিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল, সেই যে বল লেগে কপালটা কেটে গিয়েছিল, রক্ত দেখে হরিণটা কি সজল চোখে চেয়েছিল। হেমন্তের দুপুরে অঙ্কের পরীক্ষার দিনে স্কুলের ঘর থেকে জ্যোৎস্নার প্রথম-দেখা মুখখানি,—শিরীষ ফুলের মত সে সাম্‌নের পথ দিয়ে চলে গেল, আমার চোখে সোনার কাঠি বুলিয়ে। সারা দুপুর গাছপালাব ঝর্‌ঝরানিতে, আকাশ-আলোর কাঁপনে কিশোর মন বীণার মত বাজতে লাগল। সে পরীক্ষায় ফেল করেছিলুম। ব্যর্থ হওয়ায় পরম আনন্দ এমন করে কোনদিন অনুভব করিনি।

ঠিক ভাবতে পারছি না, টুক্‌রো ঘটনাগুলো এলোমেলো আস্‌ছে। মাথাটা হয়ত একটু বিকল হয়েছে। বেশ বুঝতে পারছি, আমার মধ্যের instinct of self-preservation সহজে হার মান্‌তে চাচ্ছে না। অতীত জীবনেব রঙীন মধুর স্মৃতি দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চাচ্ছে। আচ্ছা, বেশ।

ভাল লাগে না ভাবতে। সুন্দরী পৃথিবী তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র দিয়ে একদিন আ' 'য় ভুলিয়েছিল। হৃদয়ের পেয়ালা যখন প্রেমে সৌন্দর্য্যে কানায়-কানায় ভরে উঠেছে, তৃষিত তপ্ত ওষ্ঠ দিয়ে পান করতে গেলুম, নিমেষে পেয়ালা খান খান হ'য়ে ভেঙে গেল। স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। তারপর স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে দিকে দিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংসের লীলায় মাতলুম। হৃদয় পুড়ে গেল। জাগল না—কেউ জাগাল না। মৃত্যুর বাঁশি শুনে আমরা রুদ্রের যে ক্ষ্যাপাদল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলুম, সেই সঙ্গীদের কেউ মরেছে, কেউ জেলে, কারো বিচার হচ্ছে, কেউ বনজঙ্গলে লুকিয়ে।

বুঝলুম না, কেন জীবনের এ অগ্নিজ্বালা, সুখদুঃখের মায়াচক্র, সৃষ্টির ভাঙাগড়া খেলা। বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি।

নৃত্যময়ী মোহিনীর মত পূর্ণচন্দ্র সুধাভাণ্ড বুকে করে দিকে দিকে মদিরাধারা প্রবাহিত করে চলেছে! প্রথম যৌবনে বসন্তের জ্যোৎস্নাধারাতপ্ত কত রাত্রি গানের সুরে ফেনিয়ে উপচে উঠেছে। এই চাঁদের আলো আমার রক্তের সঙ্গে মিশে আমায় মাতাল করে তুলতো! আজ এ জ্যোৎস্না চোখে একটু মায়া লাগায় না। মনে হয় এ যেন বিশ্বমাতার অশ্রুজল গলে ঝরে পড়ছে। কাল সারারাত ওই বস্তি হতে যে পুত্রহীনা কুলি-নারীর গুম্‌রে গুম্‌রে কান্না শুনেছি, তাই এ আলোয় মিশে গেছে।

জ্যোৎস্না!—এই কথাটি আমার বুকের সমস্ত রক্ত দুলিয়ে দিলে। আমার শৈশবের রূপকথার রাজকন্যা আজ কোথায় জানি না। শুধু যদি তার মন-জাগানো মুখের মিষ্টি হাসিটি, মন-মাতানো চোখের স্বপ্নের চাউনি একবার দেখতে পেতুম তবে যাবার এ ক্লান্তক্ষণ পূর্ণিমা-রাত্রির মত মধুর হত। তার কতদিনের কত রূপে দেখা কত মূর্ত্তি চোখের সাম্‌নে এলোমেলো ভেসে মিশে মিলিয়ে যাচ্ছে। বকুল গাছের দোল্‌নায় দুল্‌তে দুল্‌তে ভ্রূকুটি করে সে চেয়েছিল! তার জন্মদিনে আমার জলখাবারের পয়সা জমিয়ে যে সেফ্‌টিপিন দিয়েছিলুম, কি মিষ্টি হেসে নিয়েছিল।

সতেরো আঠারো বছরের আমি এই উনত্রিশ বছরের আমিকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে—আনন্দ কি পাওনি? জীবনের যে দুটি বছর প্রেমস্বপ্নে যৌবনের উদ্দামতায় ভরপূর ছিল। জমিদারের ছেলে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি, আমার মত সৌখীন সুন্দর ছেলে ক্লাসে কেউ ছিল না। জ্যোৎস্না তখন কলকাতায় এসেছে,—সে চঞ্চলা বালিকা নয়, সলজ্জা কিশোরী। তার একটি মিষ্টি কথা মনের মধ্যে সারাক্ষণ ঝুমঝুমির মত বাজত। তার সঙ্গে একটুক্ষণ গল্প করায় আমি সাতরাজার ধন মাণিক কুড়িয়ে পেতুম, আমার মত ভাগ্যবান কে! তখন আমার জীবনে শেলীর যুগ। অ্যালষ্টারের কবির মত কোন বিশ্বউর্ব্বশীর সন্ধানে মন উদার। জ্যোৎস্না, সে ত সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রতীক মাত্র। তখন রূপ ও রূপকে ভেদাভেদ নেই। তারি চোখের চাওয়ায় ভুবনউর্ব্বশী জেগে উঠেছে।

অন্ধকার রাতে যখন ডিনামাইট দিয়ে ট্রেণ ওড়াতে গেছি, ভিড়ের মধ্যে যখন কাউকে মারতে বোমা হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যখন আসামের জঙ্গলে ঘুরেছি, আফগানিস্থানের গোলাপকুঞ্জে দ্রাক্ষারস পান করে যখন লুটিয়ে পড়েছি, আমার জীবনের এই চিরন্তনী চিরতরুণী আমার সামনে জেগে উঠে বারবার কি বল্‌তে চেয়েছে! আজও সে আমায় চঞ্চল করে তুল্‌লে।

কিন্তু শোন জ্যোৎস্না, আমি যদি কাপুরুষের মত আপনাকে বিনাশ করতে যেতুম, তা হলে কথা ছিল। লোকে ব্যর্থ প্রেমে, অর্থাভাবে, সমাজের লোকনিন্দায়, সংসারের দুঃখভারে আত্মহত্যা করতে যায়। কোন দুঃখকে, সংগ্রামকে আমি জীবনে ডরাই না। কিন্তু, কিছু ভাল লাগে না যে—এই জীবনভরা শূন্যতায়, এই পৃথিবীর অর্থহীন কর্মচক্রে, বেঁচে থাকার সার্থকতা খুঁজে পাই না।

এখন বুঝছি কেন স্বর্ণ বল্‌ত—দাদা, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে একটা দড়ি এনে গলায় দিয়ে ঝুলে পড়ি, একদিন সকালে উঠে দেখবে আমি মরে আছি। যতক্ষণ থিয়েটার করি বেশ থাকি, কোন রাতে রাজরাণী, কোন রাতে ভিখারিণী, কোন রাতে আয়েষা, কোন রাতে মর্জ্জিনা, কোন রাতে কপালকুণ্ডলা—থিয়েটারের ওই রঙীন সিনে কাল্পনিক জগতে, অবাস্তব জীবনে সব ভুলে থাকি। কিন্তু তার পর! উঃ, দিনের বেলাটা, একটু বাঁচতে ইচ্ছে করে না। তবু তোমরা যে ক'দিন আছ, তোমাদের সেবা করে একটু পুণ্যি করছি। পুলিশের চোখ এড়াবার জন্যে আমরা যে কজন ঘরছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ওই সমাজপরিত্যক্তার ঘরে আড্ডা নিয়েছিলুম, তাদের সেবা করে সে যে স্বর্গসুখ পেয়েছিল। সে শুধু থিয়েটার কোরে জীবিকা অর্জ্জন করত। কিন্তু পঙ্কের মধ্যে সে পদ্মটি কি এতদিন নির্ম্মল আছে? কত পুরুষের মত্ত লালসায় সে পদ্মের সব পাপ্‌ড়ি পঙ্কের তলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে তলিয়ে গেছে।

নারীর মোহিনীরূপ আমায় ভোলায় না। যে রূপে সে গানের সুর, ফুলের পাপ্‌ড়ি, আলেয়ার আলো, স্বর্ণমৃগ হ'য়ে সংসারের মরীচিকায় ঘোরায়, সে প্রিয়ার রূপ নয়,—নিপীড়িতা মাতা যখন দুঃখের, ত্যাগের দুর্গম পথে ডাক দেন, তাঁর বন্ধনশৃঙ্খল ভাঙ্‌বার জন্যে প্রলয়াগ্নি জ্বেলে মৃত্যুর মধ্যে ছুটে যেতে হয়, সেই বন্দিনী মায়ের পায়ে আমি জীবনের বরণমালা দিয়েছি—এই অত্যাচার-নিপীড়িতা দুঃখিনী দেশ-মা, এই যুদ্ধাগ্নিদগ্ধা আপন সন্তানরক্তকলুষিতা শক্তিমদপীড়িতা পৃথিবী-মা, মাগো, তোমার ওই ব্যথাভরা অশ্রুমাখা মুখ আমাকে ঘরছাড়া করেছে।

কালো মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়ছে। একটা ঝড় উঠছে, কৃষ্ণচূড়া গাছটা মত্ত দৈত্যের মত বাতাসে উদ্দাম হয়ে উঠেছে। জ্যোৎস্না নয়, এই ঝঞ্ঝা চাই। এই বিদ্যুতের ঝিকিমিকিতে বজ্রের গর্জ্জনে ঝঞ্ঝার কণ্ঠে কণ্ঠে রুদ্রের আহ্বান জেগে ওঠে, দেহের রক্ত ঝিল্‌মিল করে স্নায়ুগুলো নাচ্‌তে থাকে, এই গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায় মরজীবনের অভিসারে মৃত্যুর বাঁশি বাজে।

ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লুম। অন্ধকারের গর্ভ হতে ঝোড়ো হাওয়া পীড়িত পৃথিবীর বুকের কান্নার মত ছুটে আসছে। সত্যই একটা কান্নার শব্দ—মা, মা! কে গুমরে গুমরে কাঁদছে—পৃথিবীর বুকের ব্যথায় গুরু গুরু দীর্ঘশ্বাসের মত। চারিদিকে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল, সেই আলোর দেখতে পেলুম, রাস্তার মাঝখানে একটি ছোট খুকী লুটিয়ে পড়ে আছে। তার কালো কোঁকড়া

চুলগুলো বাতাসে উড়ে খোয়ায় লুটিয়ে পড়ছে। তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিলুম। শঙ্কিত ক্লান্ত মুখখানি শিশির সিক্ত শেফালির মত। মুদ্রিত কমলের মত চোখ বোজা। আমার বোতাম কয়েকটা খুলে গেছে। গোঁ গোঁ করে মৃদু আর্ত্তনাদ করছে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললুম,—কি হয়েছে খুকী? ঘাড়ে মাথা রেখে শান্ত হ'য়ে সে নেতিয়ে পড়ল। গর্জমান অন্ধকারটা টুকরো টুকরো করে বিদ্যুৎ আকাশের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে চিরে গেল। কন্যাহীনা মাতার অশ্রুজলের মত বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। বাতাস মত্ত হ'য়ে উঠল। ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যে মাতবার জন্যে পথে বেরোলুম। কোথা থেকে এ ফুলের পাপড়ি আমার বুকে পড়ে ঘরে ফেরালে!

তাড়াতাড়ি খুকীকে বুকে করে ঘরে ফিরলুম। বিছানাটা পাততে হল। বাক্স হতে ফরসা চাদর বের করতে হল। বালিশটা কি শক্ত, কচি মাথায় লাগবে। ধূলো-লাগা জামা পা-জামা ঝেড়ে দিলুম। ছাড়ান হল না। ছাড়াতে গেলে হয়ত ঘুম ভেঙে যাবে। কেঁদে উঠবে। আর ছাড়িয়ে পরাব কি। কোন মতে খুকীকে শুইয়ে জান্‌লা বন্ধ করে তার পাশে বিছানার ধারে বসলুম। ছোট সুন্দর নাকে নোলকটা কি সুন্দর। কচি হাতে রুপোর বালাগুলো কি সুন্দর দেখাচ্ছে। কি মিষ্টি ছোট পা দুটো। কি মিষ্টি মুখখানা। তার গালে, পা দুটোতে চুমো খেলুম। রিভল্‌ভারটা হেসে উঠল।

ঘুমন্ত মিষ্টি মুখের দিকে চেয়ে আছি। সে চঞ্চল হয়ে নড়ে উঠল। নিশ্চয় গরম হচ্ছে। খবরের কাগজ দিয়ে বাতাস করতে লাগলুম। অস্থির হয়ে সে কেঁদে উঠছে,—মা, মা। এ ত ভারি মুস্কিল, ছোট মেয়েদের ভোলাবার মন্ত্র ত আমার জানা নেই, ঘুমন্ত অশান্ত খুকীকে মা ভিন্ন কে শান্ত করতে পারে। ধীরে বুকে তুলে নিয়ে মৃদু মৃদু দোলাতে দোলাতে মুখে আঙুল পুরে দিলুম। আঙুল চুষতে চুষতে একটু শান্ত হল। শুইয়ে দিতেই আবার ছটফট করছে, কেঁদে উঠছে—মা, মা। চোখ খুলে আসছে। যদি জাগে ত ভয়ঙ্কর কাঁদবে—হয়ত দুধ খেতে চাইবে, আমার ঘরে দুধ কোথায়।

রিভল্‌ভারটা হেসে উঠল—কি বন্ধু, বড় মুস্কিল! ঘরের কোণে বেহালাটা খুশি হয়ে চাইল, বেশ হয়েছে। বেহালাটা তুলে নিয়ে এলুম। ধূলো জমেছে। তারগুলোয় ছাতা পড়ে রয়েছে। অভিমানিনী নায়িকার মত সে কোন কথা কইতেই চায় না। বল্লাম, বন্ধু, পূর্ব্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করে একটু সাহায্য কর। বেহালায় ঝঙ্কার উঠতেই খুকীর কান্না থামতে লাগল, গানের সুরে সুরে স্নে

ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

বাইরে ঝড় থেমে গেছে। জানলা খুলে দিলুম। কচিশিশুর আঁখির মত তারারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। খুকীর মুখের দিকে চেয়ে বেহালা বাজাচ্ছি। হঠাৎ একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ বেহালার গানের উপর কমলবনে মত্তহস্তীর মত এল। সশব্দে দরজা খুলে একটা বড় কালো কুকুর ঘরে ঢুকে একেবারে বিছানায় লাফিয়ে উঠল। তারপর ঘুমন্ত খুকীর দিকে চেয়ে তার কি আনন্দনৃত্য। বেহালা রেখে দাঁড়িয়ে উঠতেই এক বয়স্ক যুবক আর বিদ্যুল্লতার মত এক তরুণী এসে ঢুকলেন। তরুণীটির এলোচুল জড়ানয়, লুটান শাড়ীর টানে, চোখের ইশারায় বোঝা যাচ্ছে—বিছানা থেকে অতি ব্যস্ত শঙ্কিতভাবে উঠে এসেছে। তার চোখ দুটি আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল। বিছানা হতে খুকীকে তুলে বুকে জড়িয়ে, 'এই যে রেণু' 'এই যে রেণু' বলে আনন্দে চুমো খেতে আরম্ভ করে দিলে, আমার দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। যুবকটি একটু বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে বিনীত স্বরে বললে,—ক্ষমা করবেন।

আর একটু এগিয়ে আসাতে আলোটা তার মুখে পড়ল। আমি নিমেষে চিনলুম, আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলুম—আরে তুমি, সুরেশ। কলেজে সুরেশ ও আমার ভাব বন্ধুত্বের একটা উপমার বস্তু ছিল। একটু এগিয়ে এসে সে অবাক হয়ে একটু ব্যথার সঙ্গে বললে,—তুমি। কি চেহারা তোমার হয়েছে। কলেজে তোমার মত কেউ সুন্দর ছিল না, এ যে Asoke's ghost! এটি ভাই আমার মেয়ে, কোথায় পেলে? হেসে বল্লুম—রাত দুপুরে কি মেয়েটিকে রাস্তায় হাওয়া খেতে পাঠিয়েছিলে? মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে সুরেশ বললে, ওর ভাই ওই রকম ঘুমন্ত উঠে বেড়ান রোগ হয়েছে, আজ আবার দরজাটা খোলা ছিল,—উনি হচ্ছেন আমার শ্যালিকা।

শিরীষ ফুলের মত স্নিগ্ধ লাবণ্যমাখা তরুণীর দিকে চাইলুম। খুকীকে কোলে কোরে আমার অগোছান ঘর আর বই-খাতা-গাদা-করা টেবিলটি দেখছিল। সুরেশ ধীরে বল্ললে,—তুমি এত কাছে আছ, জানতুম না। আমি সামনের গলিতে দ্বিতীয় বাড়িতে থাকি। এটা বুঝি মেস, না হলে এত অপরিষ্কার,—কি সৌখীন তুমি ছিলে।

তরুণীর মুখটি একটু করুণ হয়ে উঠল, সে একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার টেবিলের বই-কাগজগুলো ঘাঁটছে। এই অগোছাল ঘরটা নিমেষে গুছিয়ে দিতে পারলে সে যেন কি আনন্দ পায়। ধীরে সে বললে—দিদি হয় ত বড় ব্যস্ত হচ্ছেন।

সুরেশ বললে,—হ্যাঁ ভাই, রেণুর মা, বুঝতেই পারছ, কি রকম ছটফট করছে। এখন যাই, কাল সকালে আসব। অতসী, বই ঘাঁটতে আরম্ভ করেছ ত! শ্যালিকার বই কিনে কিনে আমি গেলুম। এসো এখন, কাল আলাপ হবে'খন।

দরজা পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিয়ে এলুম। যাবার সময় অতসী কিছু বললে না, শুধু রঙীন চোখে চেয়ে ধীরে একটা নমস্কার করলে। কুকুরটাও আমার দিকে চেয়ে একবার ল্যাজ নাড়লে।

চুপ করে একা ঘরে বসে আছি। চাঁদ পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে; পূর্ব্বাকাশের তারাগুলো দপদপ করছে। রিভল্‌ভারটা কোথায় রাখলুম, মনে পড়ছে না। ইজিচেয়ারে বসে নীলাকাশের দিকে চেয়ে ভাঙা বেহালায় মানভঞ্জন করতে বসলুম।

পৃথিবী-মা গো, এই দুরন্ত ক্ষ্যাপা ছেলেটাকে তুমি বুঝি বড় ভালবাস, তাই দুটো সুকোমল সুন্দর বাহু দিয়ে বেঁধে রাখবার জন্যে এ ঝড়ের রাতে এমনি ছোট-মা হ'য়ে এলে।

(২)

এই ছোট খুকীটি তার দু'খানি কচি হাত দিয়ে আমায় বাঁধলে দেখছি। তাই সকাল বেলা সুরেশ যখন এসে আমায় বললে—চল। তখন শুধু তার ফুলের মত কচি মুখখানা দেখবার জন্যে ছুটে চললুম।

সুরেশ এখন হাইকোর্টের উকীল। সুন্দর বাড়ীখানি। আমাকে বাড়ীর ভিতর একেবারে তার ঘরে নিয়ে গেল। অতসী অভ্যর্থনা করে বসালে। কুকুরটাও একবার ল্যাজ নেড়ে সম্ভাষণ জানিয়ে গেল। সুরেশ বাইরে মক্কেলদের কাছে চলে গেলে অতসী মুচকে হেসে বললে,—কাল আপনার রিভল্‌ভারটা নিয়ে এসেছি।

আশ্চর্য হয়ে বললুম,—খুঁজে পাচ্ছিলুম না বটে। আর চিঠিটা?

চোখে বিদ্যুৎ ঠিকরে সে বললে—সেটাও। ভয় নেই, সেটা পুড়িয়ে ফেলেছি।

বিস্মিত-মুগ্ধ-নেত্রে তার দিকে চাইলুম। মৃদু হেসে সে বললে,—রিভল্‌ভারটা আর পাচ্ছেন না, আর অমন করতে যাবেন না কিন্তু—

এ যেন তার হুকুম।

সুরেশের মা রেণুর হাত ধরে ঘরে এলেন। ছোটবেলায় তাঁকে যেমন দেখেছিলুম, সেই দিব্যস্নিগ্ধ স্নেহকল্যাণমণ্ডিত মূর্ত্তি, কাঁচাসোনার মত দেহের আভা সাদা থান ফুটে বেরুচ্ছে, তাঁকে দেখলেই পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করে। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,—কি রে তুই এত কাছে আছিস, এতদিন দেখা হয়নি।

হেসে বললুম,—মা'র দেখা পেতে অনেক পুণ্যির দরকার যে মা।

স্নেহ-বিকশিত-নয়নে চেয়ে বললেন,—কি রোগা হয়ে গেছিস। মেসে আছিস্ বুঝি।

অতসী ফোড়ন দিলে,—হ্যাঁ মা, যেমন নোংরা তেমনি অন্ধকার।

মা বললেন, যা চেহারা হয়েছে। মেস ছেড়ে আয়, আমাদের এখানে থাকবি।

বললুম—সে ভাগ্যি কি আছে মা যে তোমার প্রসাদ পাব। এ লক্ষ্মীছাড়াদের ও-স্বভাবটা খুব আছে। যেখানেই বলো মা নিজের ঘর করে জমিয়ে বসতে পারি।

রেণু তার দিদিমার পাশে সলজ্জভাবে দাঁড়িয়ে আমাকে বার বার দেখছিল। তার দিকে অগ্রসর হয়ে বললুম, এ মা-টি যে কিছু বলে না।

মা হেসে বললেন,—ওরে রেণু, চিনতে পারছিস না, ও যে তোকে কাল চুরি করে নিয়ে গেছল।

রেণু একটু ভীত হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলে। মা হেসে উঠে বললেন,—না রে না, ও তোর কাকা, প্রণাম কর। আজ রেণুর জন্মদিন!

রেণু তাড়াতাড়ি প্রণামটা সেরে অতসীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আমি তাকে টেনে নিয়ে বললুম,—না মা কাকা নয়, আমার এখন মায়ের দরকার, আমার নাম অশোক, একটা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, বুঝলে মা?

মা চলে গেলেন। রেণু অতসীর কানের কাছে গিয়ে কি বলছে। আমি বললুম,—কি বলছে?

অতসী হেসে বললে,—বলছে চুলগুলো কি বিচ্ছিরি হয়ে রয়েছে। ওর কি কেউ নেই যে চুল আঁচড়ে দেবে?

রেণুর দিকে চেয়ে বললুম—আমার ত আর মা নেই।

বা, আমি ত হলুম,—বলেই সে রাঙা মুখখানা টেবিলের আড়ালে লুকোল। একটু পরে এক ভাঙা চিরুণী এনে আমার চুলের সংস্কার করতে বসল।

কাল রাতে জীবনটা একেবারে দেউলে হয়ে গিয়েছিল, আজ এই অতসীর হাতে গোছান ঘরে বসে ভাবছি, রাতারাতি পথের ভিখারী কেমন করে লাখপতি হয়ে ওঠে। আমাকে একেবারে দীন করে তারপর এ কি ঐশ্বর্য্য দেওয়া!

যে মাকে আবার পেলুম, এমন মা কার আছে! তাঁর কাছে গিয়ে বসলে মনের সব তাপ জুড়িয়ে যায়। নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা উনি, ছোট বেলা হতে পিতৃহীন সুরেশকে কি স্নেহময় শাসন ও নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষ করেছেন। সুরেশ যখন ব্রাহ্মসমাজে বিয়ে করতে চাইলে, বাড়ীর সবাই কি আপত্তি করলে, কিন্তু ইনি নিজে গিয়ে মেয়েকে আশীর্বাদ করে এলেন। এ মায়ের আশীর্বাদের প্রসাদে এক দি'নই যেন সেরে গেছি।

আর এই রেণু-মাটিকে পেলুম, ছেলেবেলার সেই চির আনন্দময় সরল শিশু-আমি আমার মধ্যে মরেনি দেখছি, আর এক শিশুর কলহাস্যে সে জেগে উঠল। প্রতি বংশের আশা-স্বপ্ন যতবার বিফল হচ্ছে, সৃষ্টি আবার নতুন উদ্যমে ছোট শিশু দিয়ে সে স্বপ্নের সাধনা সুরু করছে! —রেণু সৃষ্টির চিরনবীন বাণী আমার জীবনে নিয়ে এল।

আর অতসী! এই মিষ্টি মেয়েটি যেন কত দিনের বন্ধু। সারা দুপুর তার লাইব্রেরীটা খুব উৎসাহের সঙ্গে আমায় দেখিয়ে কি করুণ মধুর হেসে চাইলে। কত বই সে পড়েছে, সে কত ভাবে, স্বপ্ন দেখে, কিছুই সে করতে পারছে না— দেশের কাজ করতে এত তার ইচ্ছে করে। কতকগুলো রাজনীতি-সমাজনীতির বই দেখিয়ে সে বললে—দেখুন এসব ঠিক বুঝতে পারি না, কিন্তু যখন দেখি এরা যা বলছে তার সঙ্গে আমার মনের কথায় মিল হয়ে যায়, এত আনন্দ হয়। কিন্তু শুধু রাশ-রাশ বই পড়ে কি হবে বলুন, আমারও মাঝে মাঝে অবসাদ আসে।

বললুম—কেন, তোমরা ত ব্রাহ্ম, তোমাদের কত স্বাধীনতা।

সে বললে—কি আর স্বাধীনতা আছে, এই যা বি.এ. পর্য্যন্ত পড়েছি, আর জোর করে এখনও বিয়ে দেয় নি।

হেসে বললুম—আমার মত ঘরছাড়া বিদ্রোহী তোমাকে ঘরকন্না করবার উপদেশ দেবে না। তবে কি জান, শান্তি যদি চাও তবে ওই ঘরকন্নাতেই পাবে।

না, আমি জীবনটাকে সব দিকে পরিপূর্ণ করে অনুভব করতে চাই—কথা-গুলো বলেই সে একটু লজ্জিত হয়ে চুপ করল।

আমার জীবনের এক নিগূঢ় গভীর বেদনার পথে তার সঙ্গে জানা হল বলে সে একদিনেই আমার পরম বন্ধু হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যাবেলায় সে বলছিল—চুপচাপ বসে ভাববেন না বেশী। আপনার মনটা একটু অসুস্থ আছে, শরীরটা সারিয়ে নিন ভাল করে। আপনারা নিরাশ হলে কি হবে ?

বললুম—তুমি কি ভাব আমাদের দিয়ে দেশের কোন মঙ্গল হবে ?

সে বললে---আমি কি জানি বলুন, তবে আমি যদি ছেলে হয়ে জন্মাতুম, আমিও অ্যানারকিষ্ট হতুম। আপনার বেহালাটা বাজান, চুপচাপ বসে থাকলেই মন খারাপ হবে।

মেয়েরা চিরকাল আমার কাছে রহস্য, তাদের বুঝতে চাইনি, শুধু তাদের প্রেমের স্পর্শে জীবনটাকে বাজিয়ে চলেছি।

(৩)

ধীরে ধীরে মনটা দেখছি সুস্থ হয়ে উঠছে, অবসাদ কেটে যাচ্ছে, নব জীবন পাচ্ছি। আমাকে তাজা করে তোলবার জন্যে অতসীর চেষ্টার অন্ত নেই।

ছোট ঘরের গারদে পোরা এই বাঙালীর মেয়েটি। কিন্তু তার মন দেখি পৃথিবীর দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেছে। পৃথিবীর কত ঘরের হাসিকান্না, কত জাতির উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিদিনের সুখদুঃখ জড়িয়ে আছে। তার জন্যে সুরেশ সব দৈনিক সংবাদপত্রগুলো নেয়, তার পর কত ইংরেজী ফরাসী মাসিক পত্রিকা, আর বই কেনার ত শেষ নেই। সুরেশ সেদিন বললে,---দেখ শ্যালিকার কি expensive hobby ! ওর কাছে অতসীর বই-পড়াটা একটা সখ মাত্র। কিন্তু আমি দেখছি, ওটা ওর জীবনের ক্ষুধা, চিত্তের বিকাশ।

রোজ সকালে অতসী আমাকে ধরে তার খবরের কাগজের রাজত্বে নিয়ে যায়, মানবসভ্যতাচক্রের গুরুগুরু ধ্বনি, পৃথিবী-মার হৃৎপিণ্ডের ধক্‌ধক্ শব্দ যেন শুনতে পাই। প্রথমে দেশের সব খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া---কোথায় বোমা ফাটল, কার কারাদণ্ড হল, কোন কলের আগুনে কত কুলি মরল, ইত্যাদি। তার পর বিদেশের, আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে হনলুলু সব দেশের খবর চাই, জারের সঙ্গে আমীরের কি গুপ্তমন্ত্রণা হচ্ছে, বল্‌কানে অশান্তির রূপ কি দাঁড়াচ্ছে। কোন নিপীড়িত জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, কোন প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা, কোন রাজবিদ্রোহীর বিচার, প্রতিবিষয়ে তার মন সজাগ, উৎসুক।

দুপুরে কোন কোন দিন দূরদেশের ভ্রমণকাহিনী বা জাতির বিবরণ নিয়ে বসে, কোন দিন কোন দেশের ইতিহাস নিয়ে বসে ; বেদুইনরা কি ভাবে জীবন চালায়, ফরাসী-বিপ্লবের রাতে কি হয়েছিল, ল্যাপল্যাণ্ডের জীবনধারা কি রকম, সাহারার মরুভূমে কি সভ্যতা চাপা পড়েছে—সব পড়ে শুনিয়ে আলোচনা করে আমার এ মনকে পৃথিবীর মানব সভ্যতার ইতিহাস ধারার সঙ্গে যুক্ত করে দিতে চায়।

প্রথম কয়েকদিন খবরের কাগজ পড়তে মন লাগত না, কিন্তু এখন এ নেশার মত লেগে গেছে—হঠাৎ রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়, ভাবি সকালে আয়ার্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে কাগজে কি লেখা থাকবে, অমুক বিচারের রায় কি বেরুবে,—বৃহৎ মানবসমাজের জীবন স্পন্দন আপন নাড়ীতে অনুভব করি।

কিন্তু মনটা এতে ঠিক সারেনি, সেরেছে অতসীর গানের সুরে। সন্ধ্যে বেলায় সে রেণুকে নিয়ে গান গাইতে বসে, আমাকেও সেই ভাঙ্গা বেহালায় নতুন তাঁত লাগিয়ে বাজাতে বসতে হয়। গানের সুর একদিন আলো-বাতাসের মত আমার নিত্য প্রয়োজনীয় ছিল, শান্তিহারা জীবনটা আবার সুরে বাঁধছি।

আশ্চর্য্য অতসীর গলাটা! এ যেন কোন সঙ্গীতযন্ত্র হতে সুর ঝরে পড়ছে, গান যখন থেমে যায়, 'নৃত্যময়ী সুরপরীদের শিঞ্জিনী ধ্বনি রিনিঝিনি বাজে, মন ভরে, ঘর ভরে কাঁপে, ঘুরে বেড়ায়। তার সন্ধ্যায় গাওয়া গানের সুর এখনও কানে বাজছে,—

"গানের সুরের ভিতর যখন দেখি ভুবনখানি,
আমি তখন তাকে চিনি, আমি তখন তাকে জানি।"

পৃথিবীকে—জীবনকে গানের সুরের ভিতর দিয়ে দেখা, এই প্রথম দৃষ্টি সে আমায় দিলে।

আজ বেহালা বাজাতে বাজাতে হঠাৎ থেমে গেলুম, দেখে সে বললে,—কি হল আপনার?

বেহালার এক পুরানো সুর বাজাতে বাজাতে মনে হল, যেন আমি আমার সতেরো বছরের আমিতে ফিরে এসেছি, জ্যোৎস্না আমার সামনে বসে গান গাইছে। এমনি এক শুক্লা একাদশীর হারান সন্ধ্যা চোখের উপর চমকে উঠল।

মনের সব অন্ধকার বন্ধ ঘরগুলো খুলে যাচ্ছে, গানের সুরের আলোয় ভরে উঠছে। রাতে একা ছাদের কোণে দাঁড়িয়ে সে যে গান গাইছিল, সেই মালশ্রী রাগিণী তারায় তারায় কেঁপে বাজছে।

"আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো,
গান দিয়ে দ্বার খোলাবো।"

(৪)

অতসী আমার চারিদিকে যেন একটা মায়ার জাল রচনা করছিল। মাঝে মাঝে তার কথাগুলো শুনতে শুনতে মনে হয়, কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছি না, শুধু সুরের মত বাজছে, তার সুন্দর ঠোঁট নাড়ার ভঙ্গীটা এক শিল্পকার্য্যের মত উপভোগ করি, রহস্যময় মধুর চোখের দিকে চেয়ে থাকি। কাল যখন সে সন্ধ্যার অন্ধকারে জানালায় সুদূরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার মনে হল, সে যেন রূপ নয়—একটা রূপক, চিরন্তনী বিশ্বনারীর অব্যক্ত ব্যাকুলতার মূর্ত্তি, তারার আলোয় চিররাত্রি চেয়ে কার প্রতীক্ষা করছে।

কিন্তু অতসী মায়ামন্ত্র পড়ে যে সৌন্দর্য্য-আনন্দের রূপজাল দিয়ে আমায় ঘিরছিল তা টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে ধূলোয় লুটিয়ে পড়েছে।

আজ সন্ধ্যাবেলায় রেণুর সঙ্গে ছাদে ফুলের টবে জল দিচ্ছি, রেণু বললে—এই টবটায় বেশী জল দাও না, আমি আর পারছি না।

বললুম—কৈ টবে গাছ কৈ?

সে অবাক হয়ে বললে,—বা, তুমি যে টাকাটা দিয়েছিলে, সেটা ওতে ত পুঁতে রেখেছি, দেখবে পরশুদিন কেমন টাকার গাছ হবে।

মা গল্প করতে ধরে নিয়ে গেলেন। কথায় কথায় অতসীর কথা উঠল। মা বললেন—দেখ, ওর মা মরার সময় ওকে আমার হাতে দিয়ে গেছেন, বললেন—দিদি, সরসীকে তোমার হাতে দিয়েছি, অতসীকে তোমার কাছে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে মরচি, তুমি ওকে ঠিক পাত্রেই দেবে জানি। তা দেখ, এতদিন ও বিয়ের কথা বললে হাড়ে জ্বলে উঠত, এখন তোর উপর একটু টান হয়েছে দেখছি। তুই কি বলিস বল?

হেসে বললুম—একটু টান হয়েছে? আমার মত লক্ষ্মীছাড়া!

মা বললেন—চুপ কর হতভাগা। সুরেশ বলছে, তোরা দুজনে মিলে একটা কাগজ বের কর, ও তার টাকা দেবে।

ধীরে বললুম—মা, তুমি ত জান সব, কেন এ কথা তুললে?

বুঝলুম, মার মনে বেদনা লাগল। ধীরে তাঁর হাতখানি ধরে আদর

করতে লাগলুম। তারপর জানি না কেমন করে জ্যোৎস্নার কথা উঠল, আমি দেড় বছর বাংলায় নেই, তাদের কথা কিছুই জানি না। মা বললেন, জ্যোৎস্নার স্বামী গেল বছর মারা গেছে, জমিদারের ছেলে মদ খেয়ে লিভারের অসুখ করলে, বুকটাও খারাপ ছিল।

আর্তনাদ করে উঠলুম—সে কেমন আছে মা?

মা ধীরে বললেন—তোর কথা ভেবে তাকে একবার দেখতে গিয়েছিলুম, যখন এসে দাঁড়াল, বুকটা ফেটে গেল রে! একটু কাঁদলে না, শুধু মুখটা বুকে গুঁজে পড়ে রইল।

তার পর মা যে কত কি বলে যেতে লাগলেন কিছুই আমার কানে এল না।

অনেক রাত পর্য্যন্ত মার কাছে জ্যোৎস্নার সব কথা শুনতে লাগলুম। সেই আমার চিরতরুণী জ্যোৎস্না—বিয়ের রাতে লালচেলীপরা তার প্রতিমার মত মূর্ত্তিটি চোখে আঁকা রয়েছে। এখন সে বৃহৎ জমিদার-পরিবারের কর্ত্রী, এখনও সে তেম্‌নি স্নিগ্ধ মধুর দিব্যশ্রী। মার কথা শুনতে শুনতে সেই শুভ্রবসনপরিহিতা কল্যাণী লক্ষ্মীর ছবিটি ভাবছিলুম, ভেনাসের মত মুখখানি এখন ম্যাডোনার মত হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম—তার ছেলেটি কেমন হয়েছে মা?

মা বললেন—কি সুন্দর হয়েছে রে, কি শান্ত, নম্র, আমায় প্রণাম করে এমন সুন্দরমুখে দাঁড়াল!

বুকে কি একটা বেদনা হচ্ছে, উঃ, সেই মাতালটা!

ভাবচি জীবনটা কি? আমাকে দিয়ে বিশ্বশক্তি কি করাতে চায়। ধরো, এই সুরেশ, তার হাইকোর্ট, মক্কেল, মোটর, স্ত্রীকন্যা নিয়ে বেশ সুখে আছে, কিন্তু আমি ত এম্‌নি করে শান্ত হয়ে থাকতে পারি না।

আমার হাতে তোমার বাঁশিকে দিলে না প্রভু, তোমার বজ্রকে দিলে, আমার কপালে তোমার দুঃখের অগ্নিতিলক জ্বালিয়ে দিলে! ইচ্ছে করছে, একটা ধূমকেতুর মত পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটে যাই, অগ্নিপুচ্ছ দিয়ে সব অত্যাচারীদের দগ্ধ করে, রাজার মুকুট খসিয়ে, ধনীর প্রাসাদ জ্বালিয়ে, শক্তির দম্ভ ধূলায় লুটিয়ে, এই সমাজতন্ত্র রাজতন্ত্র চুরমার করি।

(৫)

অতসী ধরে ফেলেছে, আবার আমার মনটা বিকল হয়েছে। দুপুরে রেণুর

সঙ্গে খেলায় বেশ মন দিতে পারছিলুম না, সে রেগে আমার সঙ্গে আড়ি করে চলে গেল। এবার বুঝছি এখান থেকে বেরিয়ে যাবার সময় এসেছে।

অতসী আমাকে লাইব্রেরীতে ধরে নিয়ে গেল, বললে---আবার কি ভাবচ? কাল সারারাত ঘুমোওনি---ছাদে ঘুরেচ।

বুঝলুম আজ সহজে সে ছাড়বে না। ভালবাসার দুঃখ তাকে আর দিতে চাই না, খোলাখুলি সব বুঝিয়ে দিই।

হেসে বললুম,-- আমি হচ্ছি একটা অ্যানার্কিষ্ট, মৃত্যুর দোসর, আমার জন্য ভাব কেন?

কি করুণমুখে সে আমার দিকে চাইলে! কত রূপে নারীকে পেলুম,---কেউ বুকে আগুন জ্বালায়, কেউ চন্দনের প্রলেপ বুলোয়, কেউ আলেয়ার আলো হয়ে দিশাহারা করে ঘোরায়, কেউ স্নিগ্ধ গৃহে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে সারা রাত প্রতীক্ষা করে।

ধীরে বললুম,---দেখ, তোমার কথা দিয়ে গান দিয়ে আমার এ ভাঙ্গা মন তুমি সারিয়ে তুলেচ, তোমার ঋণ কোনদিন শুধতে পারব না বন্ধু, কিন্তু এব উপর কোন লোভ কোরো না।

তার বুকের রক্ত রিমঝিম্ করছে, চোখ জলজলে হয়ে উঠল, বললে---আমাকে শুধু তোমার বন্ধুর কাজই করতে দাও,-- তোমার মধ্যে যে শক্তি আছে, তাকে ব্যর্থ কোরো না।

ধীরে বললুম,---সেই শক্তিকেই সার্থক করবার জন্যে আমায় চলে যেতে হবে।

সে ভাঙা-গলায় বললে--আবার তুমি ওই পথে যাবে?

বললুম—ঠিক ওপথে নয়। দেখ তুমি ঘরে বসে কাগজ পড়, অত্যাচার-অবিচারের কথা; আমি তা পারি না, আমার গা জ্বলে, ইচ্ছে করে অত্যাচারীর টুঁটি টিপে ধরিগে। রিভলভার আমি ফেরৎ চাইছি না, এবার প্রাণে প্রাণে আগুন জ্বালাব, ওই নিপীড়িত পদদলিতদের জাগাতে হবে, তাদের প্রাণের বারুদে বিদ্রোহের অগ্নি জ্বালিয়ে অবিচারের মরণোৎসব হবে। তুমি কি ভাব এই যে শ্রমিকের রক্তে রাঙান, নারীর অশ্রুতে ভেজান ধনীর স্বর্ণ স্তূপীকৃত হচ্ছে; শক্তিমদমত্ত রাষ্ট্রশক্তির শাসন পেয়ালা অত্যাচারের বিষে ভরে উঠছে, এই রাজ্য নিয়ে রাজনীতিবিদ্‌দের জুয়াখেলা, মানবাত্মা নিয়ে পুরোহিতদের ধাপ্পাবাজী, এই প্রবল জাতির নিষ্ঠুর লোভ, শক্তির ক্রূর অত্যাচার চিরকাল টিকবে? এই যন্ত্র-

শক্তি-অধিষ্ঠিত বণিক্-সভ্যতা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, আমরা সেই ধ্বংসের যুগের অগ্রদূত, নটবর রুদ্র আমাদের হাতে তাঁর বজ্র দিয়ে পাঠিয়েছেন, ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে স্বাধীনতার মন্ত্রে পিনাকধ্বনি করে সবাইকে জাগাতে হবে।

অতসীর মুখ অগ্নিশিখার মত রাঙা হয়ে উঠল, চোখে স্বপ্নের গোলাপী আভা জড়ান, চুল ফুলে উঠল, বুক দুলতে লাগল।

দীপ্তকণ্ঠে বলে উঠলুম,---

"হায়! সে কি সুখ এই গৃহ ছাড়ি,
হাতে লয়ে জয়তুরী,
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে,
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে বসিয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।"

অতসী বলে উঠল,---আর আমরা!

বললুম,—বাংলারও সেদিন আসবে, তোমাদের পর্দা ছিঁড়ে যাবে, ভেঙে যাবে, অবগুণ্ঠন খসে যাবে। আজ বাংলার এ কোণে যে প্রাণের আ জ্বলে নিভে যাচ্ছে দেখছ, ওরা ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে জেলে পুরে সে প্রাণকে মারবে?---আজ শুধু পূর্ব্বসূচনা। ভারতের এ যুগের গুরুগোবিন্দ কোথায় কৃচ্ছ তপস্যা করছেন জানি না, কিন্তু তিনি দুঃখের সাধনা আরম্ভ করেছেন---তিনি আসছেন, তিনি আসছেন, তাঁর আগমনের জন্যে আমাদের আয়োজন করতে হবে।

(৬)

আজ নিশীথরাতে আবার ঝড় ঘনিয়ে এসেছে। ওই অন্ধকার শূন্য হতে ঝঞ্ঝার কণ্ঠে প্রলয়পথে যাত্রার আহ্বান আবার এল। ভাঙা দেহমন ত সারান হল, শান্তিনীড় ছেড়ে আবার দুঃখের পথে বেরুতে হবে। তরুণী বন্ধুর করুণ চোখের চাওয়া কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে কি ব্যথার টান পড়েছে, এই আকাশ জোড়া হাহাকারে---গাছপালার করুণ মর্ম্মরে---বুকের দীর্ঘশ্বাসে তারি বেদনা পাচ্ছি।

আজ রাতেই বেরিয়ে পড়ি, এদের কাছে বিদায় নিয়ে যেতে পারব না। মাগো! কতরূপে তুমি আমার সঙ্গে কত লীলা করবে! এক ঝড়ের রাতে তুমি ছোট মা হয়ে কচি হাতের বাঁধনে বেঁধে ঘরে ফিরিয়ে আনলে, আর এক রাতে এ কি প্রলয়ঙ্করীরূপে ডাক দিয়ে ঘরছাড়া করছ!

দীক্ষার রাতের কথা মনে পড়ছে! এমনি এক ঝড়ের রাতে বহু পুরাতন বট গাছের তলায় ভাঙা মন্দিরে কালীমূর্ত্তির সাম্‌নে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, এ জীবন মার কাছে উৎসর্গ করব। গৃহ ছাড়লুম, সস্নেহবন্ধন ছিন্ন করলুম, অর্থ, মান, সুখ, লোভ ত্যাগ করলুম। আছে শুধু শাণিত খড়্গ, অত্যাচারীর মুণ্ড, রক্তের স্রোত। এই ঝড়ের আকাশে কালীর বিশ্বরূপ দেখছি, নিবিড়-তিমির-ঘন কেশরাশি আকাশে ছেয়ে গেছে, রক্তাক্ত খড়্গের আভা নৃত্য করে বেড়াচ্ছে, প্রলয়-উৎসবের অট্টহাস্যের স্রোতে রাজ্য-সাম্রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

বিদ্যুতের চিকিমিকিতে অতসীর চোখের চাউনি জেগে উঠল।

বাতাসে লাইব্রেরী-ঘরের জানলাগুলো সশব্দে বার বার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। দরজা ঠেলে লাইব্রেরীতে ঢুকলুম, অন্ধকারে আলোর সুইচটা খুঁজতে কোনো কার গায়ে হাত পড়ল—শাড়ীর খসখসে—চুড়ির টুং-টাংএ অন্ধকার কেঁপে উঠল, কেশের মদির গন্ধ বিদ্যুতের মত স্পর্শ! জানলা দিয়ে বিদ্যুতের আলো চমকে গেল। দেখলুম অতসীর অনির্ব্বচনীয় মুখ।

তুমি?

হাঁ আমি।

সমস্ত অন্ধকার তার গলার স্বরে বেজে আমায় ঘিরে ধরলে।

দু'জনে ছাদে বেরিয়ে এলুম—আজ ঝড় এলে ওই বইয়ের গাদা ভেসে গেলে কিছুই যায় আসে না। কতক্ষণ দু'জনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

বললুম—ওই যে ঈশান কোণে কালো মেঘে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠছে তুমি দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি পাচ্ছি। পৃথিবী জুড়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠছে, নটরাজ তাঁর ধ্বংসের লীলা সুরু করলেন বলে। এক-এক দেশে তিনি তাঁর পা ছুঁইয়ে যাচ্ছেন, রাজসিংহাসন ধূলায় লুটিয়ে পড়ছে একবার রুশিয়ায় একবার চীনে একবার আয়ার্ল্যাণ্ডে, একবার তুরস্কে। রুদ্রের চরণ চিহ্ন দেশে দেশে পড়ছে, যেখানে জাতিতে জাতিতে হিংসা-দ্বেষ অত্যুগ্র হয়ে উঠেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী নিপীড়িতের নিরুদ্ধ রোষ জমে উঠেছে। ওই ইউরোপের অন্তস্থলে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের মত যুদ্ধাগ্নি জ্বলে উঠছে ক্ষুব্ধ জনসংঘের বিদ্রোহের

ভূমিকম্পে বর্তমান বণিক-সভ্যতা কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে। দেশে দেশে সে আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছে। আজ ঝড়ে রুদ্রের আগমনী বাজছে।

আকুল ধারায় বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হ'ল। দু'জনে বারান্দার কোণে সরে পাশাপাশি দাঁড়ালুম। আমার দীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে সে শুধু বললে—তুমি কি সত্যি যাবে?

শুধু তার মুখের দিকে চাইলুম।

—তোমাকে আমি বাধা দেব না, আমাকে যখন দরকার হবে ডাক দিও।

আমাদের ঘিরে ঝড় জল উদ্দাম হয়ে উঠল। মাতার অশ্রুজল, প্রিয়ার হতাশ্বাস, বিচ্ছেদের হাহাকারের মাঝে প্রলয়-পথিককে চলে যেতে হবে।

অতসীর কথা—

সেই ঝড়ের রাতে বন্ধু যে চলে গেল তারপর কত বছর কেটে গেল। প্রতি-বছর একবার করে তার খবর পেতুম। রেণুর প্রতি-জন্মদিনে পৃথিবীর যে কোণেই সে থাকুক তার বিদ্রোহী ছেলের একটা উপহার এসে পৌছত। কোন বৎসর নিউইয়র্ক থেকে, কোন বার প্যারিস থেকে, কোন বার বাগদাদ থেকে। বর্তমান বণিক-সভ্যতা ও রাষ্ট্র-তন্ত্রের ধ্বংসেচ্ছুক যে পৃথিবীজোড়া বিপ্লবীর দল আছে, সে তাতে গিয়ে যোগ দিয়েছে। বন্ধু যখন ধূমকেতুর মত পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েছে, আমি স্কুলে গিয়ে মেয়েদের পড়িয়েছি, ঘরে বসে কাগজ পড়েছি, নভেল পড়েছি, রান্না করেছি, ঘর ঝাঁট দিয়েছি আর প্রতিদিন সেই ঝড়ের-রাতে-দেখা জ্যোতির্ময় মূর্তিখানি ভেবেছি। সেই মন-ভোলান ঘর-ছাড়ান প্রাণ মাতান দীপ্ত মুখ।

তার পর ভারতের মহা দিন এল। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহের পাঞ্চজন্য বাজিয়ে অন্ধপ্রথা ও প্রভুত্ব-পীড়িত ভারতের ধূলিলুণ্ঠিত আত্মাকে মুক্তির দুর্গম পথে আহ্বান করলেন, এ নব ভাগীরথ স্বাধীনতার শঙ্খ বাজিয়ে চির-অপরাজিত মৃত্যুঞ্জয়ী অমর আত্মার অমৃতলোক হতে নবশক্তিগঙ্গার আবাহন করলেন—মৃতমূক জনসংঘ এ সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে জেগে উঠল।

রেণুর জন্মদিন। তাকে ধরে চরকার সুতো কাটাতে বসেছি। সহসা পেছনে পায়ের শব্দে চমকে চেয়ে অবাক হয়ে দাঁড়ালাম। অশোক আমার সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে একটা চরকা। কি সৌম্য স্নিগ্ধ মূর্তি, কাঁচাপাকা-দাড়িভরা মুখখানি যেন যীশুখৃষ্টের মত।

আমার হাত জড়িয়ে ধরে অশোক বললে—ফিরে এলাম আবার নূতন খেলায় মাততে।

বললাম—কি আশ্চর্য্য! তোমার কথাই ভাবছিলাম, আজ রেণুর জন্মদিন। এখনও তোমার উপহার এল না।

—এই যে, বলে সে চরকাটা রেণুকে দিলে। রেণু অতি সলজ্জভাবে তাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

আবার মায়ের ডাকে ফিরে এলুম—বলে সে রেণুকে আদর করলে।

—বলে গিয়েছিলুম, ভারতের দুর্দিন দূর করবার জন্যে বীর সাধক আসবেন, তিনি এসেছেন। কিন্তু মা কৈ?

চোখে অশ্রুর বান ডেকে এল। কোনমতে বললুম—গেল বছর তিনি স্বর্গে গেছেন।

বন্ধু সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। ভাঙ্গা গলায় বললে—আমায় কিছু বলে গেছেন?

আমার সমস্ত মুখ রাঙা হয়ে উঠল। তাঁর মৃত্যুদিনের কথাগুলো কানে বাজতে লাগল। তিনি বলেছিলেন, 'সেই লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটা যদি আবার ফিরে আসে মা, বলিস, আমি তাকে প্রতিদিন আশীর্ব্বাদ করেছি। তার হাতে তোকে দিয়ে যেতে পারলে আমি খুব আনন্দে মরতুম।' বন্ধুর করুণ মুখের দিকে চেয়ে ধীরে বললুম—তোমাকে তিনি প্রতিদিন আশীর্ব্বাদ করে গেছেন।

অস্ফুটস্বরে মাথা নত করে অশোক বললে—বুঝেছি।

দাদা এলে অশোক বললে—ওহে, মনে আছে বলেছিলে, যদি কাগজ বের করতে চাও ত টাকা দেব। এখন সে কথাটা রাখ দেখি।

দাদা রাজী হলেন।

তার পরের দিনগুলো লেখায় পড়ায় কাজে কি উৎসাহ-আবেগের সঙ্গে কেটে যেতে লাগল। সভা করে সমিতি গড়ে প্রবন্ধ লিখে গ্রামে গ্রামে ঘুরে দিনরাত গান্ধীর বাণী প্রচারে অশোক উদ্দাম হয়ে উঠল।

একদিন বিকেলে দাদা শুকনো মুখে এসে বললে—ওরে, অশোককে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। কোথায় বিদ্রোহসূচক বক্তৃতা দিয়েছিল।

স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রাণ দিতে হবে জানি, তবু চোখে জল এল। দাদা মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—এই বুঝি বাঙ্গালীর বীর মেয়ে!

শুধু বললাম—অশোকের কি ভাঙা শরীর জান ত।

দাদা ধীরে বললেন—দেখ, কাল থেকে আমি আর কোর্টে যাব না।

উৎসাহের সঙ্গে বললাম—সত্যি যাবে না?

দাদা হেসে বললেন—হ্যাঁরে, আর ভাল লাগে না।

দাদার পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

জেল খেটে বন্ধু যখন ফিরে এল তার শরীর একেবারে ভেঙে গেছে। কিন্তু খদ্দরপরা সেই রোগা লম্বা শরীরের কি তেজ। সোণার আভার মত দেহের রং-এ অন্তরাত্মার দীপ্যমান সত্য পুরুষটির রূপ দেখা যাচ্ছে। জেলবাসশীর্ণ তপঃক্লিষ্ট মুখে কি অপরূপ মহিমা জড়ান। অহর্নিশি দেখেও চোখ তৃপ্ত হয় না।

অশোকের সঙ্গে জেল থেকে একটি তরুণ সুন্দর যুবক এল। তার স্নিগ্ধ তেজোমণ্ডিত মুখখানির দিকে চেয়ে বললাম—এ কে?

অশোক তার পিঠে হাত চাপড়ে বললে—দেখ জেলে গিয়েছিলাম তবেই ত এটিকে পেলাম। এ হচ্ছে জ্যোৎস্নার ছেলে। আমরা এক জেলেই ছিলাম।

বললাম—আহা, গেল বছর ত ও মা হারিয়েছে।

কি করুণ হেসে বন্ধু বললে—হ্যাঁ, তাই ত মার কাজে এমন করে লেগেছে। ওরে রেণু, সুতো-কাটা বন্ধ করে পালাচ্ছিস কেন, আয়। এটি আমার ছোট মা। অতসী, জান, এর নামও অশোক।

সেই ভাঙ্গা শরীর নিয়ে বন্ধু আবার কাজে লাগল। দেহটা প্রতিদিন খুব শান দেওয়া ছুরির মত সূক্ষ্ম হতে লাগল। স্নান করা, খাওয়া, ঘুমান, কিছুরই হুঁশ থাকে না। কোন বারণ মানে না। আমি ঠেকাতে পারতুম না, রেণুকে পাঠাতুম। রেণু জোর করলে তবে লেখা বন্ধ হত। ঘুমোতে যেত।

একটু শরীর ঠিক হতেই অশোক আবার কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। রেণুও তাকে ধরে রাখতে পারলে না। বললে—সত্যিকার দেশ যেখানে, সেই নিরন্ন নিপীড়িত অন্ধ মূর্খ ভীত গ্রামবাসীদের জাগাতে হবে। গ্রামেই আমার কাজ।

হঠাৎ এক সন্ধ্যায় এক গ্রাম থেকে দাদার কাছে টেলিগ্রাম এল—অশোকের ভয়ানক অসুখ। সেই রাতেই সবাই কলকাতা ছেড়ে বেরোলাম। গিয়ে দেখি সহর থেকে অনেক দূরে এক শীর্ণ নদীর তীরে এক প্রাচীন ভগ্ন গ্রামে পচা পুকুরের ধারে এক কুঁড়ে-ঘরে অশোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়ে রয়েছে। নীলার মত স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে বললে—এসেছ অতসী, ভাবছিলাম আর বুঝি দেখা হবে না।

দাদাকে বললাম—এ কি কাণ্ড দাদা! এত অসুখ, ওই চাষার কুঁড়েতে পড়ে!

দাদা বললেন—এ গ্রাম ওদের জমিদারীর মধ্যে। অসুখ শুনে ওর দাদা মোটর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সহরে নিয়ে যেতে। অবশ্য নিজের বাড়ীতে রাখতেন না। কোন বন্দোবস্ত করে দিতেন। কিন্তু অশোক কিছুতেই গেল না।

রেণুর অনেক কান্নাকাটির পর অশোক পাশেই এক পাকা-বাড়ীতে যেতে রাজী হল।

তার পর সাতদিন মন-প্রাণ দিয়ে তাকে সেবা করে ধন্য হয়েছি। আমার জীবনের এই সাতটি দিন-রাত আমি কত জন্মের কত পুণ্যফলে পেয়েছিলাম। এ দিন-রাতের প্রতিক্ষণ আমার মনে গাঁথা রয়েছে। জীবনপ্রদীপ নিভবার আগে জলজলে হয়ে উঠল! সে রাতে বন্ধু অতি শান্ত হয়ে শুয়ে ছিল। জ্যোৎস্নার আলো বিছানায় এসে পড়েছে। বাগান থেকে আমের মুকুলের গন্ধভরা হাওয়া আসছে, কচিপাতা-ভরা গাছ থেকে একটা বউ-কথা-কও পাখী মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে। নিঝুম ঘুমন্ত গ্রাম। শুধু আমরা জেগে আছি। ধীরে সে বললে—তুমি শুতে যাও, লক্ষ্মীটি অতসী। আমি ত ভালই আছি।

—অশোক, তুমি একটু ঘুমোও না।

—ঘুম কি চোখে আসবে?

—আমারও ত আসবে না।

—রেণু ঘুমোতে গেছে?

—হ্যাঁ। ওতে আর অশোকে এতক্ষণ ঝগড়া করছিল কে রাত জাগবে। আমি দুজনকেই জোর করে ঘুমোতে পাঠিয়েছি।

—দেখ অতসী, ওদের যদি বেশ ভাব হয়, ওদের বিয়ে দিও।

—হ্যাঁ, সে আমি ভেবেছি। তোমাকে সেবা করার মধ্যে ওদের মিলন হয়ে গেছে।

—জানলাটা খুলে দাও ত। কি সুন্দর জ্যোৎস্না! এমনি এক জ্যোৎস্না রাতে আমি মরতে গিয়েছিলাম! সে মৃত্যু থেকে কে বাঁচিয়েছিল! জীবন কি পরমাশ্চর্য্য রহস্য। সেদিন বুঝিনি, আজও বুঝলাম না শুধু জানলাম কোন আনন্দময় বিশ্বশক্তি আমাকে সৃষ্টি করে তার কাজ করিয়ে আবার ছুটি দিচ্ছে। জীবনের সত্যি কাজটা এতদিন পরে খুঁজে পেলাম মনে হচ্ছিল। এক মাস গ্রামে গ্রামে পীড়িতদের সেবা করে যে কি আনন্দ পেয়েছি তার তুলনা নেই। দেখ,

মহাপুরুষদের সেই কথাই সত্যি—শক্তি দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে—লোভ দিয়ে নয়, ত্যাগ দিয়ে—জীবনকে ধ্বংস করে নয়—আপন জীবন উৎসর্গ করে আত্মার আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায়।

পাখার বাতাস করতে করতে বললুম—একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর না লক্ষ্মীটি।

ভোরের শুকতারার মত কোন জাগরণের আলো তার চোখে জ্বলে উঠল। আমার হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে সে বললে—না, আজ আমায় বলতে দাও —বিশ্বের সৃষ্টির কাজে ব্রহ্মার সঙ্গে আমিও যোগ দিয়েছি। রুদ্রের বজ্র হয়ে ভাঙার খেলাটাই সারাজীবন খেললুম। গড়ার খেলাটা আর খেলা হল না। আমি এ ছোট মাটির পৃথিবীতে বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে আনন্দের সৃষ্টি-সাথী হয়ে জন্মেছিলুম। পৃথিবীর কোন্ অনাগত যুগের স্বপ্ন আমায় মাতাল করেছিল জান, পৃথিবীতে এক ধর্ম—প্রেমধর্ম, এক জাতি—মানব জাতি, এক দেশ—এই পৃথিবী-মা। কোন্ মহামিলনের দিকে জগৎ চলেছে, ইংরেজ, জার্মান, কাফ্রী, জুলু, বাঙালী, চীন, যে লাঙ্গল ঠেলছে, যে লোহা পিটছে, যে জাহাজ চালাচ্ছে, সবাই সভ্যতার বিপুল রথচক্রের এক-একটি চাকা। শক্তির রথে চড়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী নর-নারায়ণ চলেছেন। কোন শান্তির আনন্দের মিলনের যুগের দিকে। কত কোটি তাঁর বাহু। বিপুল তাঁর শক্তি। দুঃখদ্বন্দ্বময় ইতিহাস-পথ দিয়ে নব নব ধর্ম, জাতি, রাজ্য ভেঙে গড়ে কতরূপে তিনি চলেছেন। কখনও নরমুণ্ডের পাহাড় তুলে রাজ্য পুড়িয়ে রক্তের স্রোত বইয়ে—আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিস, নাদির, নেপোলিয়ন; কখন জ্ঞানশিখা জ্বালিয়ে প্রেমের আত্মার স্রোত বইয়ে—বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী—সে যুগে ইংরেজ বাঙ্গালী কাফ্রীতে প্রভেদ থাকবে না। পুরুষ ও নারীর অধিকারে ভেদ থাকবে না। লোকে লোকে জাতিতে জাতিতে শক্তির জন্য অর্থের জন্য বীভৎস নিষ্ঠুর সংগ্রাম নেই। ধনীর ধনঝঙ্কার, শক্তিমন্তের রণহুঙ্কার থেমে গেছে।—মানব-ইতিহাসের সেই অনাগত যুগের প্রতীক্ষায় ভারত, আমার ভারত বিশ্ব-মানবের এই মিলনভূমি, এই বন্দিনী দুঃখিনী ভারত, তার বুকের ধর্মের আরতি-প্রদীপ ছিন্নমলীন অঞ্চলে ঢেকে পশ্চিমের ঝোড়ো হাওয়ার মুখে তপস্বিনীর মত দাঁড়িয়ে আছে—

শ্রান্ত হয়ে অশোক চুপ করল। তাকে হাওয়া করতে লাগলাম। সে ধীরে বললে—একটা গান গাও অতসী, 'বন্দে মাতরম'।

বললাম—না, তা শুনলে তুমি আরও উত্তেজিত হবে। আর, যে সুর তুমি

শুনেছিলে, সে স্বর আমার গলায় নেই। আমার গলায় যে ঘা হয়েছিল, এখন আর কিছুই গাইতে পারি না।

আবার বন্ধু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল—দেখছ, কি নির্মম প্রকৃতি। কাউকে সে রেহাই দেয় না। ডাক্তার বলছিল, আমি বাঁচতে পারতুম, কিন্তু যৌবনে যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেছি প্রকৃতি তার হিসেব রেখেছে। আজ কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিচ্ছে। একটু গাও, লক্ষ্মী অতসী। সুরের সুধার জন্যে প্রাণটা তৃষিত হচ্ছে।

ধীরে ধীরে মিষ্টি সুরের কয়েকটা গান গাইলাম। বন্ধু একটু শান্ত হল। ছোট শিশুর মত গানের সুরে সুরে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত গভীর হয়ে এল। ঝিল্লীর রবে পাণ্ডুবর্ণ আকাশ ঝিমঝিম করছে। রাতের বুকের দীর্ঘশ্বাসের মত মাঝে মাঝে অন্ধকার বাগানে মর্মর ধ্বনি হচ্ছে। বন্ধুর রোগশীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে চোখে জল এল! ভাবছিলাম, বৌদ্ধযুগে সেই রাজা অশোকের সময়ে পৃথিবীতে যে দুঃখ দারিদ্র্য পাপ ছিল, সেই স্বার্থ দম্ভ শক্তির হানাহানি কিছু কমেছে কি? এখনও সেই জীর্ণ তৃণ-কুটীর, সেই অজ্ঞতা, ভীরুতা, অত্যাচার আছে! এ অশোক চলে যাবে। ওই তরুণ অশোক চলে যাবে। মানব জাতি প্রেমশান্তির যুগের দিকে একটু এগোবে কি?

তারাগুলো মাথার খুব কাছে প্রদীপশিখার মত দপদপ করতে লাগল। মনে হল—যুগে যুগে দেশে দেশে যারা স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়ে এসেছে, তারাই অনিমেষ নয়নে এ বর্তমান পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে। আমাদের স্বপ্ন তোমরা কি সফল করলে? আমাদের মৃত্যু কি সার্থক হল?

এর পরের রাতে অশোক বড় চঞ্চল হয়ে উঠল। শুধু যদি একরাতের জন্য আমার আগের গলাটা পেতুম, গানের সুরে ভিজিয়ে তাকে স্নিগ্ধ করে দিতুম। সে রাতে তার বিদ্রোহী মানুষ নয়, কবি মানুষটি জেগে উঠেছে। চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে সে যেন মাতাল হয়ে উঠল—আহা! কি মধুর জ্যোৎস্না! সমস্ত সৃষ্টি ফুটে এ কার হাসি! এ ভুবনলক্ষ্মীর অঙ্গের লাবণ্য, দেখ, দেখ। পৃথিবী-মা এতদিন তার শত রঙ-এর আঁচল উড়িয়ে আমায় ঘুরিয়েছে—এই রক্তের লাল—আকাশের নীল—গাছপালার সবুজ—আলোর সীমাহীন শুভ্রতা—আজ পৃথিবী-মা তার কোন সৌন্দর্য-অবগুণ্ঠন খুলে আমায় ডেকে নিচ্ছে—যেখানে সব ঝরা পাতা, শুকনো ফুল, মরুহারা নদী, মরা পাখীরা জমে। দেখ, দেখ, কে ওখানে দাঁড়িয়ে! ও জ্যোৎস্না, মোনালিসার মত অপূর্ব হেসে আমায় ডাকছে—

শেষরাতে আবেগের প্রতিক্রিয়া হল, সে অবসন্ন হয়ে পড়ল। ধীরে একবার জিজ্ঞাসা করলে—গান্ধী কেমন আছেন?

গান্ধীর উদ্দেশ্যে সে বার বার প্রণাম করল।

ধীরে বললাম—তিনি ভালই আছেন।

গান্ধী যে দুদিন হল ইংরেজের কারাগারে বন্দী, একথা ওই মৃত্যুপথিককে বলতে পারলুম না।

হঠাৎ বন্ধুর চোখ বিদ্যুতের মত জ্বলে উঠল। সে বলে উঠল—না, ওরা ওঁকে বন্দী করবে, জেলে পুরবে। যীশুকে কি ফাঁসীকাঠে ঝুলতে হয় নি? এ যে অনেক দিনের জমা পাপ। তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

ভাবলুম, সত্যই ত—এ ত আমাদের পাপের ফল। এতক্ষণ ভাবছিলুম পশ্চিমদেশের বর্তমান সভ্যতার ব্যর্থতার কথা। এ সভ্যতা ইঞ্জিন তৈরী করেছে, এয়ারোপ্লেন তৈরী করেছে, সমুদ্র পার হয়েছে, রাজ্য জয় করেছে, কিন্তু মানবাত্মার স্বাধীনতা দিতে পারলে না—শুধু শক্তি দিলে, কল্যাণ দিলে না। নিজেদের হীনতা ভীরুতার কথা ত ভাবিনি।

অন্ধকার পৃথিবীর দিকে চেয়ে মনে হল, এ যেন একটা বড় জাহাজ চির-অন্ধকারের জোয়ার ঠেলে চলেছে। যাত্রীরা জাহাজের জায়গার ভাগাভাগি নিয়ে মারামারি করে চলেছে। জাহাজের উপর কি আছে, তলায় কি আছে, কোথায় চলেছে তা কেউ জানে না। কোন্ প্রবল জাতি কাপ্তান হয়ে জাহাজের হাল ধরে চালাবে এই নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে। আমার বন্ধু এ জাহাজের প্রান্ত হতে খসে মৃত্যুর অন্ধকার সাগরে কোথায় তলিয়ে যাবে তা ত দেখতে পাচ্ছি না।

ধীরে অশোকের পাণ্ডুর মুখে চোখে ঠোঁটে চোখের-জলে-ভেজা কয়েকটি চুমো দিলুম।

শেষের রাতে বন্ধু অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। বিকারে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেল। শুধু মাঝে মাঝে দু চারিটি কথা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত—liberty—equality—গান্ধী—অত্যাচারীর মুণ্ড—নরমুণ্ডের পাহাড়—নাদির—চাই রক্তের স্রোত—অতসী—বেহালা নয় রিভলভার—কে, জ্যোৎস্না?—যাচ্ছি—পৃথিবী-মা—জ্বালাও আগুন—জাগো, জাগো—liberty—

ভোরবেলায় সপ্তর্ষিমণ্ডল মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অশোক চলে গেলেন।

আজ রেণুর জন্মদিন। বন্ধুর দেওয়া চরকাটা সে আজ ফুল দিয়ে এতক্ষণ

সাজাচ্ছিল। আর পারলে না, ছাদের কোণে কাঁদতে গেল। অশোক পাশের ঘরে বসে কাগজের জন্য লিখছিল। স্বাধীনতার এ অগ্নিপ্রদীপখানি বন্ধু তার হাতে দিয়ে গেছেন। সেও আর লিখতে পারলে না। রেণুর পাশে গিয়ে ছাদে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, টাকা-পোতা টবটার পাশে।

আজ অবিরল ধারায় চোখের জল ঝরছে—ঝরুক, প্রতিদিনই চোখের জল ঝরবে।

আজ আকাশের এ উদার আলোর দিকে চেয়ে ভাবছি,—রাঙা চেলীর ঘোমটার নীচে সাহানার তানে আমাদের শুভ দৃষ্টি হয়নি বটে, কিন্তু মৃত্যুর অবগুণ্ঠনতলে তারার আলোয় জ্যোতির্ময় অমৃত আত্মার সঙ্গে আমার মিলন হয়ে গেছে। আমার নারীজন্ম সার্থক হয়েছে। আমি ধন্য হলুম।

ঝড়ের রাতে

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

ভালবাসার শিল্পকথা—৪

মেলট্রেণ থামে, থামেও না ; চলে হুস্ হুস্।

মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে চলে সে, ডোবার জলে মাছ ধরে কালো ডাগর মেয়েরা—তাদের দেখে দাঁড়ায় না। মাঠের মাঝে তেঁতুল-লক্ষ্মী, বাবলা-বৌয়ের দল সারি সারি দাঁড়িয়ে দেয় হাত ছানি। চেয়ে দেখে না তাদের পানে, মেলট্রেণ চলে হুস্ হুস্।

ইণ্টার ক্লাশের ছোট কামরা! পলক একা বসে তাকিয়ে থাকে, শূন্য দু খানা গদী-আঁটা বেঞ্চের দিকে। যারা ছিল তাদের কথা মনে জাগে—একরাশ তরুণী নেমে গেলেন সেই জংসনে—যেন তাদের অঙ্গতাপে আসন দুটি ভরা আছে। মাঝে মাঝে বসে গিয়ে তার উপরে, আর মেঝেতে দোক্তার রসে জাজ্বলে কালো পানের পিকের উপর মুখ নামিয়ে থুথু ফেলে দুঃখী পলক!

জন্ম-দুঃখী। কত ব্যথাই না পেছে! পড়ত কলেজে ; পাশের বাড়ীর মেয়ের জন্যে বুকের আগুনে প্রেমের হোম করত। পা পিছলে পড়ে গিয়ে চিলে কোঠা থেকে আঘাত পেল। কলেজের ওয়ার্ডে রাখলে নিয়ে ছেলেরা, ওষুধ খাবার ফাঁকে বিবি নার্সের মুখে চুমু দিত। এমনি করে একটি মাস। একদিন ডাক্তার দেখে তাকে দিলে ছুটি। মেসে জায়গা নেই, পরের বাড়ী ঢোকার অপরাধে বুড়ো প্রিন্সিপ্যাল কলেজের খাতা থেকে গম্ভীর মুখে দিলেন নাম কেটে যেন তিনি নীতি-রাজ্যের বাদশা পোপ।

পলক দেশে ফিরে এল। আজ সে নতুন পলক, পান করেছে নতুন সুধা, সেই সুধায় মাতাল হয়ে এল সে। এই নতুন মানুষটিকে কেউ চিনলে না, চিনলে শুধু ও পাড়ার শুভঙ্করী। পলক তাকে আদর করে ডাকে শুভা—বিশ বছরের ঝুমকো লতা—ফুল ফোটেনি। ঘরে বুড়ো মামা কানা, কেঁদে বলে বিয়ে দিয়েছিলুম বারো বছরেই, বছর পরে তারা তাড়িয়ে দিলে। কেন? মামা জবাব

দেয় না, কাঁদে। শুভা গালে হাত দেয়, ভাবে সাত বছর আগেকার কথা। তার অবুঝ কালের মন্তর পড়া স্বামীর ভায়ে দিগম্বরের মুখ মনে পড়ে—চোখ দুটি তার ছলছলিয়ে ওঠে। প্রথম প্রথম মামী.ক এড়িয়ে চলে সে, দু মাস যেতে পারে না। দিনের ভাগ্নে রাতের মামা হয়, যেন রূপকথার রাজপুত্তুর দিনে দত্যি রাতে দেবতা। সেই তার প্রাণলক্ষ্মীর গলার দোলা প্রথম মালা, বিজয় মালা। শুভার মুখ হাসিতে ওঠে ভরে। কড়া চাপিয়ে উনুনে খিলখিলিয়ে হাসে, তার স্বামীর কথা মনে করে—সে আব বিয়ে করে নি। তেল তেতে ওঠে কলকলিয়ে, নিমকি ভাজে!

পলক আসে রান্না ঘরে। বা হাতে চিবুক ধরে ডান হাতে খাওয়ায়, নিজেও খায়। মামাকে বলে ছেঁচকি রাঁধি। কানা মামা চোখে দেখে না, খেয়ে বলে বেশ হয়েছে। এমনি করে একটি বছর। ঝুমকো লতায় ফুল ফোটে ফোটে এমন সময় জন্মাল এক প্রেমকাঁটা—একটি শিশু। পড়শী শুধোয়, কি ও? পলক বলে, বেড়াল কাঁদে। সবাই হাসে! হাসির জ্বালায় জ্বলে উঠে দুঃখী পলক বেরিয়ে পড়ে। বন বাদাড়ের আঁধার পথে কাঁটা ফোটে, তবু চলে দূর ষ্টেশনের আলোর পানে—জংসনে। সেখানে নামে এক ঝাড় শ্যামলী লতা। পলকেব বুক ফেটে যায়—আর দুটো ষ্টেশন পরে হত! তবু ওঠে সেই গাড়ীতেই চোখ বুজে। বেঞ্চেব উপব গাল রেখে তাতিয়ে নিয়ে উঠে বসে, আর কেউ নেই। একা মেলট্রেন চলে, হুস্ হুস্।

বড় ষ্টেশন। মেল থামে। "গরম দুধ" হেঁকে যায় ঘাগরা ঘেরা আহিরিণী। ভরা গাঙ্গে গা ডুবিয়ে ডাহুকী যেন আসে। বয়স কত ঠাওর হয় না। পলক ভাবে, দুঃখী পলক! দুটো হেসে কথা কয়। দুধ খায় না, তবু কেনে?

নাম কি তোমার?

রাম-পিয়ারী।

ফিরবার পথে পিয়ারী বলে ডাকব তোমায়, আসবে? দুঃখী পলক ব্যাকুল চোখে তার মুখের পানে চেয়ে শুধোয়।

শুকনো ঠোঁটে হাসি ফোটে—পিয়ারী বলে, আসব। একটু গিয়ে মুখ ফেরায়, তেরছা চোখে হেনে চায় একটি শাশ্বত খোঁচা—বুকে হাত চেপে দুঃখী পলক বসে পড়ে।

গার্ড বাঁশী দেয়। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে। দরজা খুলে ঢুকে পড়ে এক তরুণী—

যেন একটি স্বর্ণলতা সবুজ শাড়ীর পাতায় ঢাকা। দাম চুকিয়ে কুলীরা যায়। গাড়ী ছাড়ে।

পলকের চোখে পলক পড়ে না। মেয়েটি ঘুরে দাঁড়ায়—চোখ দুটো বড় করে শুধোয়—আপনি এ গাড়ীতে!

পলকের বুক কাঁপে, কথা কয় না।। মেয়েটি নিজেই বলে, মেয়েগাড়ী যে!

মেয়ে গাড়ী! মুখ বাড়িয়ে পলক বলে—নামি তবে?

মেয়েটি হাসে, বলে—নামবেন কি? গাড়ী যে চলছে!

তবে?

থাকুন না এই গাড়ীতে। যাবেন কোথায়?

লক্ষ্ণৌ।

বেশ হয়েচে! আমিও যাব। দু জনে এক সাথে! কান্নায় পলকের গলা শুকোয়, ফুঁপিয়ে ওঠে দুঃখী পলক।

মেয়েটি বুঝতে পারে, কাছে এসে বলে, আপনাকে থাকতে হবে এখানেই। কেউ এলে বলব—ঝি, শাড়ী আছে, পরিয়ে দেব!

পলক আকাশের চাঁদ হাতে পায়, হেসে উঠে—বেশ হবে সে। রোমান্স হবে।

আমি খেয়া—মেয়েটি বলে। লক্ষ্ণৌ বেড়াতে যাচ্ছি। একাই। কে আছেন?

সবাই। থাক সে কথা—বলে ঘুরে দাঁড়ায়। ইচ্ছা করেই যেন সবুজ শাড়ীর আঁচলটা পলকের গায়ে বুলিয়ে দেয়! পলক কাঁপে, দুঃখী পলক।

সন্ধ্যা নামে। গাড়ীতে বিজলী বাতি। সামনের বেঞ্চে কাৎ হয়ে খেয়া ষ্ট্রীণ্ডবার্গ খুলে বসে। পলক থিওফিল গতিয়ের পাতায় হাত বুলোয়। দু জনের কথা নেই।

গাড়ী ঢালু পথে নামছে—ঝাঁকানি। তারি সঙ্গে তাল রেখে খেয়ার দেহের ভরা গাঙে বুকের সোণার গাগরী দুটী দুলছে। দুঃখী পলক আড় চোখে চায় আর দোলন গোণে। হঠাৎ খেয়া বলে ওঠে—রাত হল যে খাবে না?

যেন কত কালের পরিচয়! পলক শিউরে ওঠে, বলে—খিদে তেষ্টা ভুলেই গেছি। খেয়ে ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলে বলে—শুধু পেটের খিদে ভুললেই কি হয়?

তারপর ষ্টোভ ধরিয়ে গুনগুনিয়ে তানা ধরে, একটা স্কচ্ গজল।

ষ্টোভের আলোয় শাড়ীর ফাঁকে খেয়ার নিটোল দেহ দেখা যায়—পলক নিশ্বাস ফেলে—দুঃখী পকল!

খেতে বসে। বলে, এত এল কোত্থেকে?

এত কি?

ছোলা, মটর, পাঁপর-ভাজা, লুচি, পুরী?

সঙ্গে ছিল। এস খাই দু'জনে—খেয়া বলে।

এক থালায় দু জনে মুখোমুখী খায় আর হাসে—খাওয়া নয়তো যেন খেলা, হাত কাড়াকাড়ি।

মাঝে মাঝে পলক আড়চোখে চায় ব্যাগের দিকে। খেয়া বোঝে।

কি ও?

ওষুধ।

বের কর না।

না, থাক—পলক বলে।

খেয়া গিয়ে ব্যাগ খোলে, চ্যাপটা শিশি বেরিয়ে আসে। খেয়া হাসে, বলে, এ নইলে ঘুম হয় না আমার।

এক চুমুক খেয়ে খেয়া বলে—আঃ! পলক ভাবে এ যেন তার মর্ম-ছেঁড়া রক্তধারা খেয়া পান করছে। শিশির ওষুধ ফুরোয়। ছোলা ভাজা ফুরোয় না। জানলা দিয়ে খেয়ে ফেলে দিয়ে বলে যাকগে।

মেলট্রেণ চলে হুস্ হুস্। পলক Bel Ami খুলে বসে, পড়ে না। আর বেঞ্চে Heptamoronএর পাতায় চোখ বুলোয় খেয়া—মাঝের ফাঁকটুকু যেন একটা নদী, এ পারে তার চখা ওপারে চখী।

দুঃখী পলক বই পড়ে না। ফাঁকটির দিকে চেয়ে কাঁদে। খেয়া দেখে উঠে আসে, বলে, কাঁদছ! ছি লক্ষীটি!

পলক চোখ মুছে বলে, না। খেয়া বলে কাল সন্ধ্যাবেলায় লক্ষ্ণৌ নামব। আরো আঠারো ঘণ্টা।

পলক চমকে বলে—এত শীগগির!

খেয়া বলে—তোমার কাছে লুকোব না। বিয়ে হয়েছে আমার অনেক দিনই। যাচ্ছি বাবার কাছে একাই, যাওয়া আসা একাই করি।

পলকের মুখ শুকোয়, বলে, তুমি পরের!

পলকের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে খেয়া; বলে আমি তোমার! আমি তোমার!

এই আঠারো ঘণ্টার জন্তে আমি তোমারি! জীবনটা ত ছোট নয়, অনেক বড়! একটা যেন বড় বাগান, তার সব ঋতুতেই, সকল রাতেই ফুল ফোটে। তার একটা ঋতুর—একটা রাতের ফুল আমি তোমায় দিলুম—বলে গরম চুমোয় পলকের মুখ ভাপসে দেয়। দুঃখী পলক খেয়ার বুকে এলিয়ে পড়ে—যেন ঝড়ো দাঁড়কাক তার নীড় পেয়েছে!

ঝড়ের রাত পুইয়ে যায়, সকাল হয়; সূর্য্যি উঠে।

চারটে বাজে। লক্ষ্ণৌ এল! পলককে বুকে টেনে চুমু দিয়ে খেয়া বলে, এইটি আমার শেষ ফুল। নতুন ফুল ফুটবে আবার লক্ষ্ণৌ গিয়ে, সন্ধ্যা হলে। তখন তুমি কোথা! পথের খেলা পথেই শেষ। আবার নতুন পথে নতুন পথিক, নতুন পরিচয়। পলকের হাত-পা টাটায়, কথা কয় না।

লক্ষ্ণৌ—!

যাবে কোথায়?—পলক শুধোয়।

আমার বাবা নিতাই রাহা—খেয়া বলে।

পলক একটু থামে, শেষে বলে, নাম শুনেছি, দেখিনি। আমার মামা।

খেয়া হাসে, বলে—কি হয় তাতে? ঝড়ের রাতের আইন আছে?

লতায় লতায় গাছে গাছে হামলা-হামলি—কোন পাখী কার নীড়ে ছিটকে পড়ে, কোন বিহগীর পাখার তলায় কোন পাখীটি রাত কাটায়, ঝড়ের রাতের অন্ধকারে কেইবা দেখে? সকাল হলে যে যার নীড়ে ফিরে চলে তাই না?

দুঃখী পলক! পলক বলে—হায়! ঝড় যদি চিরকাল রইত!

ঝড় যে দমকা আসে, দমকা যায়—খেয়া বলে।

মেলট্রেণ আর চলে না, থামে। লক্ষ্ণৌ।

খেয়া দরজা খুলে বলে—ঝড়ের রাত ভোর হয়েছে, এখন আবার যে যা ছিলুম। এস দাদা।

পলক নিশ্বাস ফেলে, বলে পথের স্বপন শেষ হয়েছে। চল বোন! ব্যাগ হাতে পলক নামে, দুঃখী পলক, ঝড়ের রাতে ঝরে পড়া যেন একটা কুমড়ো ফুল—পাঁপড়ি খসা—কাদা মাখা।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

হাসির অশ্রু

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গাড়িতে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল বিকেলটা যে সন্ধ্যা হয়ে উঠেছে। একটা ঝাপসা নীল মেঘের স্তর দক্ষিণ দিকে উঠে সমস্ত আকাশটা ছেয়ে ফেললে, তারপর ক্রমাগতই হাল্‌কা হাল্‌কা মেঘের স্তূপে সেটা পুরু হয়ে উঠছে। রেন-কোটটা বাসায় ফেলে এসে ভুল করেছে গিরীন। মেঘ দেখে আজ বড় অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে, তবুও কথাটা এক একবার মনে পড়ছিল; এ যা বৃষ্টি নামবে, শুধু ছাতায় তার কিছুই আটকানো যাবে না।

গাড়ি থেকে নেমে যখন রিক্‌সতে উঠেছে, একেবারে মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। তখন মনে পড়ল ছাতাটাও গাড়িতে এসেছে ভুলে। তখন কিন্তু আর উপায় নেই, গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, প্ল্যাটফর্মের শেষে গার্ডের গাড়ির লালটুকু যাচ্ছে দেখা।

পাড়াগাঁয়ের সাইকেল-রিক্‌স, ছইয়ের কাপড়টা শতছিন্ন। চেনা রিক্‌সওলা দুলাল সেই লজ্জাতেই বললে, "না হয় ফিরে যাবেন দাদাবাবু ইস্টিশেনে?… কাপড়টা আজ কাল করে পাল্‌টানো হয় নি…"

"তোর কষ্ট হবে?…ফিরে গেলে কিন্তু আজ আর বেরুতে পারা যাবে না স্টেশন থেকে!"

"কি যে কন দাদাবাবু! আমার কথাই যেন ভাবছি!"

জোরে পা চালিয়ে দিলে দুলাল।

গিরীনই কি নিজের কথা ভাবছে? নিজের কথা যে ভাবে, সে কি ভরা শ্রাবণে নিজের রেন-কোট বাসায় ফেলে আসে? তার পরেও কি চৈতন্যোদয় না হয়ে, অমন ঘনঘটা দেখেও ছাতাটা দাতব্য করে আসে রেলগাড়িকে?…… অথচ এই বর্ষার চিত্রই অনুক্ষণ তার চোখের সামনে ভাসছিল।

অবশ্য তার কোলে আছে আরও একটি চিত্র, মেঘের কোলে বিদ্যুতের মতই। প্রভেদ এই যে বিদ্যুৎটি স্থির, নিরবচ্ছিন্নতার দীপ্তি মনের আকাশে;

বাড়ীতে সুরবালা এসেছে আজ দিন সাত হলো। মাঝের এই কটা দিন যে কি করে কেটেছে, তা যার কেটেছে সে-ই জানে। কিন্তু বৃষ্টির জলের সঙ্গে সে আপসোসটা ধুয়ে যাচ্ছে গিরীনের। ও-যেন আদর করে গা পেতে নিচ্ছে বর্ষার ধারাকে। আজকের এই মেঘ-মেদুর অম্বর, সব লুপ্ত করা অবিরাম ধারাপাত—এ যে একান্তই ওদের দু জনের জন্যে। এই যে সন্ধ্যাকে এগিয়ে আনা, এ তো ওদের মিলন-রজনীকে দীর্ঘ করবার জন্যেই—দিনের খানিকটা অংশ ছিন্ন করে নিয়ে তার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে।—কার উপর অসীম কৃতজ্ঞতায় মনটা আসছে ভরে।

দুলাল বলছে, "জ্বর-জ্বালা যে হচ্ছে বড় গাঁয়ে, সেই ভয়—নইলে বর্ষায় কি আর ভিজে না লোকে? ভিজে—তবে, ঐ জ্বর-জ্বালা যে হচ্ছে বড—"

—তা হোক জ্বর, সে ত আশীর্বাদ। ছুটি নেবার পথ খুলবে। সেবায় হাতে সুরবালা থাকবে বসে পাশটিতে। কিছু একটা বলতে হয়, সেইজন্যেই বললে, "তা হোক, তুই একটু জোরে পা চালা দিকিন—"

—আজ সব চিন্তার মাঝেই যে সুরবালা এসে পড়ছে। রাস্তার সামনেই যে দোতলার ঘরটা, ফুলশয্যা দিয়ে যেটা ওদের দুজনের ঘর করে দেওয়া হয়েছে, তার জানলার গরাদ ধরে সুরবালা আছে পথের পানে চেয়ে—ভাগ্যিস বৃষ্টিটা সামনা-সামনি নয়—কিন্তু তবুও তো পাশ ঘেঁষে আসছেই খানিকটা ছাট—সুরবালার কি সাড় আছে কতটা ভিজল, কতটা শুকনো রইল?—চারিদিকে এই জ্বর-জ্বালা!—"আর একটু পা চালাতে পারিস না দুলাল? তোর জন্যেই বলছি, যতটা কম ভিজিস—"

"ছাটটা যে উলটো আসছে, নইলে—এই ত সিদিন লতুন বৌদিদিরা এল—তেনার কাকা, ছোট বোন—বৌদিদি দু বোনেরা আমারই রিকসায় ছেলো তো—বলোদ-গাড়িতে মালপত্তর—সিদিনও ত বিষ্টি ছেলো গো, তবে এই রকম উল্‌টো ছাট কি?—শুদিও না লতুন বৌদিকে—ড্যাংডেঙিয়ে নে গিয়ে দরজায় দাখিল করলুম—"

—গিরীন হাতটা সীটের গদির ওপর আস্তে আস্তে বুলাতে লাগল—সুরবালার বসে থাকাটুকুকে যে শত বৃষ্টিতেও ধুয়ে ফেলতে পারে না। বললে, "না হয় আস্তেই চালা, তাড়া কিসের এমন? ট্রেন ধরতে তো যাচ্ছে না লোকে।—হ্যাঁরে, ওরাও তোর এই ছেঁড়া রিক্‌সয় বিষ্টি মাথায় করে—।"

"কি যে বলে দাদাবাবু!—তিনখানা রিক্সা। য'তে ভাবছে আমার রিক্সায় চাপুক নতুন বৌদি, ব'দে ভাবছে আমার রিক্সায় চাপুক, আমিও কোন্ না সেই কথাই ভাবছি মনে মনে। কর্তা বললেন, দুলালের থানাতেই উঠুক বৌমা ওর বোনকে নিয়ে, ওর হুডের কাপডটা ভালো। ভালোই ছেলো কিনা, এই শয়তানকার ঝড়ে রিক্সাসুদ্ধু উল্টে দিয়ে দিলে যে ফাৎরাফাই করে—"

গিরীন সীটটাতে সেই রকম আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। ঝড়ে উল্টেছিল বলে আরও যেন মায়া পড়ে গেলে রিক্সাটার উপর। বললে, "তা মেরামত করিয়ে নে কাপডটা।"

"আমার নাম দুলাল হাজরা দাদাবাবু। ওদের মত সেলাই তালি দেওয়া রিক্সা ঠেলতে আমার পা ওঠে না।—তা পয় আছে নতুন বৌদির, সমস্ত হপ্তাটা কামালুম কি রকম! এবাব যা হুডের কাপড কিনব ভেবে রেখেছি—"

গিরীন একটু হেসে বললে, "কিন্তু পয় যে বলছিস, রিক্সা তো তোর গেল উল্টে—"

"আর ব'দের যে চাকাই দিলে তেউড়ে। য'তে এখনও পায়ে চুণ-হলুদ লাগাচ্ছে—হিসেব করে দেখুন নোকসানটা। দাদাবাবু বলে পয় নেই!"

একটু চুপ করে রইল গিরীন। তাবপব প্রশ্ন করলে, "তা কত জমল তোর—নতুন কাপড যে কিনবি?"

"ন'টা টাকা লাগবে, সাতটা জম্যে ফেলেছি - কাল হাটের মোয়াডাটা একাই সামলালুম তো।"

বাইরেটা যে পরিমাণ ভিজল, ভেতরটা ভিজেছে তার চেয়ে ঢের বেশী। সেখানে তো সাতটা দিনের মেঘ জমে গুমরাচ্ছিল। রিক্সা থেকে নেমে, ভাডার উপর দুটো টাকা বেশী দিলে দুলালকে। ছেলেটা ভাল, একটু লজ্জিতভাবে বললে, "তা আপনি কেন গুনোগাৎ দেবে দাদাবাবু। ঝড়ে লোকসান করেছে—সবারই করেছে—"

গিরীন হেসে বলল, "এ তো গুনোগাৎ নয়—আর তা যদি বললি, আমি নিজের পকেট থেকে দিচ্ছি নাকি? আদায় করব না তোর বৌদির কাছ থেকে!"

বেশ লাগছিল—গরীব, বিত্তর প্রভেদ, গ্রাম-সুবাদে বৌদিদি পাতিয়ে বসেছে। হয়তো নিজের অন্তরের প্রেরণাতেই। এনে যে পৌঁছে দিয়েছে তার

ওমর রাখবার জায়গা নেই। আজকের যে সুর তার সঙ্গে চমৎকার মিলে যাচ্ছে।

দুলালও কি ভেবে হাসলে, বললে "তা যদি বলছ তো তাও। তা হলে ভিতবকার কথাটাও বলি দাদাবাবু। আনলুম নতুন বৌদিকে—রিক্সার এক হিসাবে জন্ম পালটে যাওয়াই তো, তা কর্তাবাবু বকশিশ করলেন মোটে চার গণ্ডা পয়সা। ভাগ্যিস একটু আড়ালে ছিলুম বলে কারুর নজরে পড়ে নি—সেটাকে আট গণ্ডা বলে চালিয়ে দিলুম।—তা তাও—গোয়ালী হোল গিয়ে ইস্তিরীর অর্ধাঙ্গিনী। মনে করব নতুন বৌদিদির পয়মন্ত হাত থেকেই নিলুম।"

এ পর্যন্ত গৌরচন্দ্রিকা তো বেশ হলো, কিন্তু মূলগান এসে পড়া পর্যন্ত যে ক্রমাগতই বেসুরা চলেছে। তার কি করা যায়?

রিক্সাটাকে রাস্তা থেকেই বিদায় করে দিয়েছিল। তারপর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করে পুকুরের পাশ দিয়ে খানিকটা গিয়ে বাড়িটা। জল-কাদার মধ্যে দিয়ে মাইল দেড়েকের পথ। সন্ধ্যা প্রায় হয়েই এসেছে। গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গেলে সুরবালা যে জানালা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, সুরকবাটি দেখা যাবে। নইলে রিকসা আসছে দেখে সে আগে-আগেই সরে দাঁড়াবে না?

গোটাতিনেক গাছের আড়াল কাটিয়েই একটা বাঁকের মুখ থেকে উপরের জানালাটা দেখা যায়। জানালাটা নিতান্ত নির্বিকার ভাবেই রয়েছে বন্ধ।

একটা আঘাত লাগল। তবে খুব বেশী নয়। দাঁড়িয়ে যে থাকবেই একথা তো লেখা ছিল না চিঠিতে। একটা আন্দাজ করে নেওয়া। নানা কারণেই যে আন্দাজ না ফলতে পারে। কিংবা হয়ত ছিল দাঁড়িয়ে, বিলম্ব দেখে সরে গেছে। আর এও তো ভাববার কথা—এক বাড়ি লোক, নূতন বউ সে, স্বামীর পথ চেয়ে কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে?—আন্দাজটাই কি ভুল হয় নি?

তবুও হলো নিরাশ। নব-বিবাহিতের মন—কোথা দিয়ে কি হয়, সে যেন কোন যুক্তিই মানতে চায় না। একটু যেন অভিমান নিয়েই বাড়িতে প্রবেশ করলে গিরীন।

তারপর এই অভিমানই যাচ্ছে যেন ক্রমশ বেড়ে। চেষ্টা করছে ঠেকিয়ে রাখতে যুক্তি দিয়ে, কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে যেন।

প্রথমত তার এই ধারাস্নান—এই ভিজে চুপসে যাওয়া নিয়ে বাড়িতে যে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল—"তোয়ালে আন্—কাপড় দে শুকনো—চা করু শিগগির—একি কাণ্ড!—নাহয় না-ই আসতে আজ!—"

—আশঙ্কা, অনুযোগ, ভৎসনা। এর মধ্যে সুরবালা কোথায়? মন বোঝায় —মা, বোন, ভাজ ওঘর থেকে বাবাও যোগ দিচ্ছেন, এর মধ্যে সুরবালার স্থান হয় কি করে? কিন্তু বোঝালে শোনে কে?—

মনে হয়—তবুও—

তবুও কি?—তবুও একজনের ডুরে শাড়ির একটুখানি আঁচল কি এই বাহুলে হাওয়ায় কাছের কোন দোরের আড়াল থেকে একটু উড়ে আসতে পারত না? গুরুজনদের সামনে একজনের সংযম কি দুটো চুড়ির শিঞ্জনেও একটু শিথিল হয়ে যেতে পারত না?

নীচেই অনেকক্ষণ দেরি করলে গিরীন। জামা-কাপড় নীচেই ছাড়লে। তারপর গল্প গুজব। কিন্তু সুরবালা বলে যে কোনও জীব বাড়িতে আছে তার তো কোন লক্ষণই নেই। তারপর মনে হলো উপরেও তো থাকতে পারে তারই প্রতীক্ষায়। যেমন বলা উচিত, উপরেই সবাইকে আসতে বলে সিঁড়ির দিকে এগুল। কেউ আসছে না দেখে একটু আশাও হলো। তারপর গিয়ে দেখে উপরের ঘরও শূন্য।

নূতন করে এই অভিমানটুকু বেশ ভাল হয়ে জমে উঠবার আগেই কিন্তু সুরবালা এসে উপস্থিত হলো। হাতে খাবারের রেকাবি আর চায়ের পেয়ালা।

গিরীন প্রথম সম্ভাষণ করলে—"তুমি এখানেই আছ নাকি?

সুরবালা একটু চোখ তুলে চেয়ে হাসলে। রেকাবি আর ডিস-সুদ্ধ চায়ের পেয়ালা একটা ছোট টেবিলের উপর রেখে টেবিলটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে, "না থাকলে কি একজন এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে—"

"আসত? ঠিক কথা। কিন্তু এল যে, সেকথা কি একজনের মনে ছিল?"

"এই দেখ, এসেই কবিত্ব, আমার ঘর বিছানাপত্তর ভিজে যাবে যে!"—

তাড়াতাড়ি গিয়ে সুরবালা সামনের জানালাটা বন্ধ করে দিলে। তারপর বিছানার একটা কোণে, গিরীনের চেয়ারের সামনা-সামনি হয়ে বসে বললে, "চাটুকু আগে খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।—মনে থাকবার কথা বলছ, নিজের পায়ের তদারক করেই ফুরসত নেই তো পরের কথা মনে থাকবে কি?

চায়ের কাপটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়ে গিরীন থমকে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, "কি হলো পায়ে?"

"মচকে গিয়ে যা ব্যথা! রান্নাঘরে বসে ফোমেণ্ট দিচ্ছিলাম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেড়াচ্ছি বিকেল থেকে—কে জিজ্ঞেস করে বল সে কথা?"

"কই, এখন তো খোঁড়াচ্ছিলে না—মানে, তাইতে জিজ্ঞেস করি নি আমি ...কই, দেখি কোনখানটা ?"

উঠে এগিয়ে যাবার আগেই স্বরবালা চাপা গলায় খিল খিল করে হেসে উঠল। বললে, "বসো, কি জ্বালা! ফোমেণ্টের ব্যবস্থা না হলে তোমার চায়ের জল তৈয়ের থাকত কি করে? কাপড় ছেড়েই যে এক কাপ পেলে! হ্যাঁ, এইবারি গিয়ে বলে দাও যে ওঁদের বউ উপরে এসে আর খোঁড়াচ্ছে না।"

মুখে কাপড় চেপে হাসতে লাগল।

মুখে অল্প হাসি নিয়ে ছোট ছোট চুমুকে চা খেতে লাগল গিরীন। দুষ্টুমির কথাটুকু ভেবে মাঝে মাঝে চাইছে স্বরবালার দিকে। বৃষ্টিটা একটু যেন নরম হয়েছিল। জানালার উপর ঝাপটায় মনে হচ্ছে আবার জোর হলো।

বললে, "খুলে দেবে না জানালাটা ?"

"কি গেরো! জানালা না খুললে—আমার কিন্তু মচকানো পা, বারবার ওঠা-নামা করতে পারব না, জানালা খুলে ঐদিক দিয়ে নেমে যাব। আমার কাজ রয়েছে বিস্তর।"

"মচকানো পা নিয়ে শুয়ে থাকাই ভাল।"

"মচকানো পা নিয়ে খেটে বেড়ানো আরও ভাল। সবাই ভাববে—দেখেছ, কি কাজের বউ! এ বউ কি কে এল বাড়িতে, কে গেল, তার খোঁজ রাখতে পারে?"

গিরীন নিজেই গিয়ে জানালাটা খুলে দিলে। ফিরে দেখলে কিন্তু স্বরবালা একেবারে সিঁড়ির কাছে। দু পা এগিয়ে এসে বললে,—"খেয়ে নাও ওগুলো, দিব্যি রইল। আমার ফুরসত নেই এখন বসবার।...বিকেলে মাছ পায় নি, পুকুরে জাল ফেলতে বলেছেন বাবা—"

"তুমি ফেলবে ?"

সিঁড়ির একটা ধাপে পা দিয়েছে স্বরবালা, আঙুলটা উচিয়ে ঠোঁট নেড়ে জানালে—"পাবে উত্তর।"

এই রকম করে ক্রমাগতই যতিভঙ্গ করে চলেছে স্বরবালা—ক্রমাগতই। বাইরের দুর্যোগ অন্তরের ব্যাকুলতাকে যত দিচ্ছে জাগিয়ে, যত মনে হচ্ছে সার্থক করে তুলি আজকে এই দুর্লভ রাত্রিটিকে, ততই সে ওর এই ছোট ছোট আঘাত দিয়ে, ওর এই অকরুণ হাসি দিয়ে যেন সেটাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। বিশেষ

করে এই হাসি—এতটুকু ভাবালুতাকে একমুহূর্তের জন্যও দাঁড়াতে দিচ্ছে না। এ কি রোগ দাঁড়িয়েছে নূতন!

ভাল হয়তো লাগছে, তার কারণ সুরবালার সবকিছুই ভালো। কিন্তু তবুও আজকের রাত্রিটি যদি এই করে হয় বিফল—ওর মনের সুরের সঙ্গে সুরবালার মনের মিল না থাকে—তা হলে সে আপসোস রাখবার জায়গা কোথায় ওর? বিয়ের পর এই প্রথম এই রকম একটি বর্ষা রজনী—

কোন রকমে ওর মনের ঠিক তন্ত্রীটিতে দেওয়া যায় না একটু আঘাত?

সেই উদ্দেশ্যে গল্পটা বলছে গিরীন। মনে করেছিল কখনও বলবে না।—তোমায় পেতে আমার যে কি আত্মত্যাগ—তোমার মহিমায় মুগ্ধ হয়ে একদিন আমার মনও যে কি মহিমময় হয়ে উঠেছিল, একথা কি যায় মুখ ফুটে বলা? তবু হচ্ছে বলতে—আজ ওর জন্যে যতই দু হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, ততই আলেয়ার মত ও যাচ্ছে পেছিয়ে। অথচ এক দিন কত আশা নিয়েই না এই সুরবালার দ্বারে উপস্থিত হয়েছিল সে। ওর মত নিঃশেষ করে কেউই বোধ হয় নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবে না—

সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে এতক্ষণ পরে পেয়েছে সুরবালাকে। সমস্ত সংসারের চঞ্চলতা, সব শব্দ থেমে গিয়ে বর্ষার সঙ্গীতটুকু আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—শুধু ঝরঝর শব্দের সঙ্গে ভেকের অবিরাম কলরব। রাত্রিটুকু দুটি প্রাণীর হাতে তুলে দিয়ে সমস্ত পল্লী গভীর সুপ্তিতে মগ্ন।

জানালাটা খোলা। সামনে একটা কৌচের একটি ধারে গিরীন বসে অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। সুরবালা আসে নি। পাশেই বিছানা, তাইতেই আছে শুয়ে। অবশ্য জেগেই আছে। গল্পও করছে।

আহ্বানের উত্তরে হেসে বললে—"কি করব, আমি কবি নই, খেটেখুটে এসে বিছানাটাই লাগছে ভাল।"

গল্পই হচ্ছিল—একথা-সেকথা নিয়ে। গিরীন বললে, "যখন এসে পড়ে কবিত্বের লগ্ন তখন কবি হওয়াতেই লাভ—এই রকম একটি লগ্নে সাড়া দিয়ে আমি একদিন আমার জীবনের যা সবচেয়ে পরম সম্পদ তাই পেয়েছি।"

সুরবালা মাথাটা ঘুরিয়ে দুষ্টুমি করে ভ্রূ কুঁচকে বললে, "তোমার পরম সম্পদ তো শ্রীমতী সুরবালা দেবী—এই তো এতদিন জানতাম।"

উপরে শুধু ওরা দুজনেই ! ছাতের দরজাও বন্ধ। তার উপর বর্ষণের শব্দ—বেশ মুক্তভাবেই হেসে উঠল একটু।

গিরীন বললে, "শ্রীল শ্রীযুক্তেশ্বরী সুরবালা দেবীরই কথা হচ্ছে।"

"মহারাণী'টা জুড়ে দাও—পরম সম্পদই তো।"

"শ্রীল শ্রীযুক্তেশ্বরী মহারাণী সুরবালা দেবীর কথা।"

"শুনতে হয় তো তা হলে।"

"তা হলে আসতে হয় এখানে।"

সুরবালা খিলখিল করে হেসে ঘুরে শুল।

"কি হলো আবার ?" – বিস্মিত ভাবেই প্রশ্ন করলে গিরীন।

"মহারাণীর হুকুম—এইখানে এসে কবিকে তার কাব্যকাহিনী শোনাতে হবে।"

এই পথেই চালিয়ে নিয়ে আসছিল, বিজয়িনীর মত আরও মুক্ত কণ্ঠে হেসে উঠল।

গিরীন উঠে গেল, একটা হাত চেপে ধরে বললে, "দোহাই তোমার সুরো, এই রকম হাসি দিয়ে আজকের এমন রাতটা আর দিও না ছিঁড়ে খুঁড়ে। ওঠ, লক্ষ্মীটি।"

খানিকটা জোর করেই টেনে নিয়ে এসে কৌচটাতে দিলে বসিয়ে। সামনের অন্ধকারের গায়ে স্মৃতির বাতিটা যেন উজ্জ্বল করে দিয়ে বলতে লাগল—

"তোমায় আমি যেচে বিয়ে করতে গেলাম কেন—এ নিয়ে সবাই আশ্চর্য হয়েছে।"

আবার পাশে চোখ তুলে হাসলে সুরবালা।

গিরীন বললে—"কেন, তুমি জানতে ব্যাপারটা? কৈ, বল নি তো তা হলে আর নতুন কি শোনাচ্ছি !"

"কি ব্যাপার তা জানি না, তবে আমি যে সুন্দরী এটা তো জানতাম।"

"ও, আবার সেই দুষ্টুমি !"

আবার বলতে আরম্ভ করলে -

"প্রথম হয়ে পাস করেছি ! শ্বশুর হবার জন্যে চারিদিকে রেষারেষি পড়ে গেছে—বিলেত পাঠিয়ে কেষ্ট-বিষ্টু করে আনবে, মেয়েদের ফটো যা আসতে লাগল মাথা ঘুরিয়ে দেয়, এমনও নয় যে বিলেত যাবার অসাধ বা সুন্দরী চেনবার চোখ নেই—এমন অবস্থায় হঠাৎ একি মতিগতি হলো !—হ্যাঁ, মেয়েও যে খুব সুন্দরী তাও তো নয়।"

"ইস্!—নয়—"

"সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। আসল কথাটা কাউকে বললাম না। শুধু জিদ ধরে রইলাম—ঐ মেয়ে না হলে করবই না বিয়ে। একটু মোলায়েম করে বললাম অবশ্য—এখন থাক, নিজের পায়ে দাঁড়াই—মিথ্যে কথা সব—"

"এখন তার ফল ভুগছি—" একটু খুক্ খুক্ হাসি উঠল কথাগুলোর সঙ্গে।

"বিয়ের চিন্তাতেই কিন্তু মনটা আমার পূর্ণ হয়ে রয়েছে, তবে আমার রোমান্স একটু অন্য ধরনের। তাই নিয়ে তোমাদের বাড়িটা আমায় বড় টানত। আমি তখন ঐ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ নিয়ে কাজ করছি। অজ পাড়াগাঁ, তার মধ্যে এক প্রান্তে ঐ রকম একটা প্রকাণ্ড বাড়ি জীর্ণ হয়ে আস্তে আস্তে ভেঙে পড়েছে. লোক নেই। বড় নাড়া দিত মনটাকে। বড় রাস্তা থেকে একটু ঘুরে বাড়িটা। কাজে থাকতাম ব্যস্ত, মনও শ্রান্ত থাকত, কাছ দিয়ে কখনও যাই নি। পুরনো ঝাউ আর বটল-পামের ফাঁকে ফাঁকে ওপরের যেটুকু দেখা যেত সেটুকু নিয়েই রোমান্স সৃষ্টি করতে করতে বেরিয়ে যেতাম আমাদের ক্যাম্পের দিকে। বলা বাহুল্য, সেই রোমান্সের কল্পলোকে একটি মেয়েও ছিল, বিয়ে না করায় সম্ভব-অসম্ভব জায়গায় বিয়েরই স্বপ্ন দেখছি তখন। তারপর একদিন সন্ধ্যায় কি মনে হলো—বড় রাস্তা ছেড়ে ঐদিক ঘুরেই আসব, টের পেলাম বাড়িটার নিচের একটা অংশে রয়েছে লোক। যেতে যেতেই দরজার মধ্যে দিয়ে চোখে পড়ল রকে একটা লালঠেম জ্বলছে আর তারই আলোয় রকের উপর দেয়ালে ঠেস দেওয়া এক গোছা বাসন ঝক ঝক করছে। রোমান্স খানিকটা খোরাক পেলে। দুদিন বেশ অন্যমনস্ক রইলাম, তৃতীয় দিনে আবার ঐ পথে আসতে হওয়ায় ঐদিক হয়েই ঘুরে আসতে আসতে দেখি মেয়েটিও কল্পলোক থেকে নেমে এসেছে। তার কণ্ঠস্বর শুনলাম—ছোট্ট একটি কথায়। তুমি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছ যে সুরো?"

"কল্পলোক থেকে নামতে পারছি না।" এবারের হাসিটা যেন জোর করেই হাসলে সুরবালা।

"কিছুদিন আবার অন্য গ্রামে গিয়ে কাজ করতে হলো। তাতে রোমান্স শুকিয়ে নিশ্চিন্দি হবারই কথা, কিন্তু দিনদিনই যেন আরও শাখা-পল্লবে সজীব হয়ে উঠতে লাগল। আনন্দটা ক্রমে যেন যন্ত্রণায় দাঁড়াচ্ছে। এই সময়ে মনের অবস্থা অন্যদিক দিয়েও ভাল নয়। দুর্ভিক্ষের অনেক দিন হয়ে গেছে। লোকের দেবার ক্ষমতা বা স্পৃহা এসেছে কমে। প্রথমটা যেমন পাবার বা দেবার উন্মাদনায়

মুখের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠেছিল, তেমনটি আর নেই। কেউ দিতে জানে না নিজেকে ..একেবারে নিজেকে ভুলে যদি বিলিয়ে দিতেই না পারলে তো কেমন করে মেটাবে ক্ষুধা? ঐটেই তখন মূল চিন্তা মনের, তার পর এক সময় চিন্তাটা কি করে স্থান আর পাত্র পরিবর্তন করলে, দেখলাম বুভুক্ষুদের জায়গায় এসে পড়েছি আমি আর দাতার জায়গায়...”

“সেই মেয়েটি।..কী উদ্ভুটে ধোঁয়াশা বাবা!” এবারেও হেসে উঠল সুরবালা। কিন্তু সে অকৃত্রিম সুর ফোটাতে পারলে না।

বর্ষার বিরাম নেই। ঘোরটা এবার কাটল না গিরীনের; আবিষ্টভাবেই বললে—“এই সময় সেই ঘটনাটুকু চোখে পড়ল।”

একটু চুপ করলে, মনটা যেন সিক্ত অন্ধকারের মধ্যে কোথায় গেছে তলিয়ে। সুরবালাকে তাগাদা দিতে হলো—“ঘুমে এদিকে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে ”

“সেদিন কিন্তু মেয়েটি নিজের কথা একেবারেই ভাবে নি।..কাজ খুব কম, যোগানের অভাবেই প্রায় গুটিয়ে এসেছে। তাইতে নিজের কথাই বড় হয়ে পড়েছে বলে ঐ বাড়িটার ওদিক দিয়েই ক্যাম্পে ফিরে আসছি—বর্ষার সন্ধ্যাই, তবে বৃষ্টি নেই, আকাশে মেঘ থমথম হয়ে রয়েছে। দেখি একজন ভিখিরী নয়, দুর্ভিক্ষ যাদের ভিখিরী করে তুলছে তাদেরই একজন, আর তো আমাদের কাছেও বড় একটা পাচ্ছে না কিছু।”

“যারা এই সব কাজ নিয়ে থাকে তাদের মনটা যে সর্বদাই করুণায় ছল ছল করতে থাকে এমন নয়, বরং দেখে শুনে ঘেঁটেঘুঁটে খানিকটা নির্বিকারই হয়ে যায়। এগিয়েই যেতাম, কতবার গেছি এই রকম, সেদিন কিন্তু কি হলো, হঠাৎ মনটা বড় টনটনিয়ে উঠল, মনে হলো ঐ মানুষটা শুধু ঐ মানুষই নয়, জগৎ জুড়ে যারা দীন-নয়নে রয়েছে হাত পেতে তাদের যেন প্রতীক। একটু এগিয়েই গিয়েছিলাম, ঘুরে দাঁড়ালাম।

“দোরের দিকে একটু তেরছা হয়ে বসে ছিল, ঘুরে দাঁড়াতে ভাল করে নজর পড়ল। পুরুষ নয়, মেয়েছেলে। শীর্ণ, কালো, মাথার চুলগুলি এলোমেলো হয়ে ঘাড়ের উপর লুটিয়ে পড়েছে; পরনে একটা শতছিন্ন ময়লা কাপড়, গুটিয়ে সুটিয়ে উবু হয়ে বসে রয়েছে বলেই যেন কোন রকমে লজ্জা নিবারণ হয়েছে; ঐ কাপড়েরই খানিকটা পিঠের উপর টানা।

"মুখে কথা নেই। যেন ডেকেছে, সাড়া পায় নি, আর ডাকবার শক্তি নেই ওঠবারও শক্তি নেই, তাই হাত পেতে আছে বসে। চারিদিকের ঘন গাছ-পালার ছায়ার উপর মেঘলা সন্ধ্যার ছায়া এসে পড়ায় সমস্ত দৃশ্যটি অস্পষ্ট, সেই জন্যই যেন আরও করুণ :

"বলতে বাধা নেই, আমায় একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল। কি রকম গৃহস্থ জানি না, তবে ইচ্ছে থাকলেও তো এই ভর-সন্ধ্যার সময় কিছু দেবে না ; হাত দুটো আপনিই কখন পকেটে গিয়ে সেঁদিয়েছে, এক পকেটে একটা দোয়ানি আর এক পকেটে আধখানা পাঁউরুটি ঠেকল।···দিয়ে আসি, তার পর এক পাশে বসিয়ে ক্যাম্প থেকে আরও কিছু না হয় নিয়ে আসা যাবে।

"পা বাড়িয়েছি, বাধা পড়ল। দরজার ভেতর দিয়ে উঠোনটার খানিকটা নজরে পড়ে, দেখছি একটি মেয়ে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে যেন বাড়ির সবাইকে লুকিয়ে এগিয়ে আসছে।···বুকটা ধড়াস ধড়াস করে উঠল—দুটি ভিখিরীকে একসঙ্গে দয়া—এ যে কল্পনাতীত, একজনকে না হয় শুধু দেখা দিয়েই···

"একটু আড়াল হয়ে দাঁড়ালাম। আড়াল থেকে আরও একটু অস্পষ্ট, তবু যা দেখবার তা পাচ্ছি দেখতে।···দরজায় এসে একবার ঘাড় ফিরিয়ে ভেতরে দেখে নিলে মেয়েটি, তার পর গলা বাড়িয়ে বাইরেটাও চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রথমে একটা শাড়ি দিলে কোলের উপর ফেলে, তার পর চাপা-গলায় তার-ই একটু আঁচল মেলে ধরতে বলে কোঁচড় থেকে কতকগুলো মুড়ি বের করে দিলে, খান দুই রুটি, আর একটু লম্বাগোছের গোটা দুতিন কি তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভিখারিণী বোধ হয় হাত তুলে আশীর্বাদ করতে যাচ্ছিল, হাত তুলে চাপা গলায় বললে—"চুপ।" দাঁড়িয়ে পড়ে একটু যেন কি ভাবলে, তার পর আর একবার ভেতর-বার দেখে নিয়ে পিঠের আঁচলটা আস্তে আস্তে নামিয়ে দিলে! আবার সতর্ক চাউনি, তার পর নিজের গায়ের ব্লাউজটা তাড়াতাড়ি খুলে নিয়ে ওর কোলে ছুড়ে ফেলে আঁচলটা আবার জড়িয়ে উঠোনে অদৃশ্য হয়ে গেল।"

গিরীন চুপ করে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল—অনেকক্ষণ। তারপর বললে, "আমার মনে হলো পেয়েছি। যে এই রকম ভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলে তার কাছে হাত না পেতে অন্য কার কাছে দিতে যাব ধরনা? তার পর দিনই বাড়িতে চিঠিটা লিখি—খোঁজ নিয়ে জানা গেল অভিভাবক দাদা—লিখলাম দাদাকে বোনের বিয়ের প্রস্তাব করে চিঠি দিন।"

মনে আছে সুরবালার। যদিও ঐ সূত্রেই যে ·বিবাহ এটা জানলে এই প্রথম। ওরা দুশো টাকা পেয়েছিল সেদিন। কোনও সিনেমার একটা অংশ, পুরানো জীর্ণ জমিদারের বাড়ি দরকার, একটি হৃতগৌরব অভিজাত বংশের মেয়ের চরিত্র নাকি দেখান হচ্ছে।—তারই শুটিং হচ্ছিল সেদিন—আরও একদিন হয়েছিল। ..মেয়েটির সঙ্গে ওর একটু আলাপও হয়েছিল—তবে মা দিদি কিন্তু পরিচয়টা বাড়তে দেয় নি।

এত বড় হাসির কথা—নির্জলা কবিত্বের এতবড় হাস্যকর পরাজয় আর হয় না। মুখে আঁচল চেপে উঠলই যেন একটু খিলখিল করে সুরবালা; তার পরেই একটু চুপ, তার পরেই স্পষ্ট মনে হলো যে আঁচলের মধ্যে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ।

অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে এগিয়ে বসল গিরীন—সত্যিই কোঁপাচ্ছে সুরবালা! বুকে চেপে ধরে বললে—"কি! কি হলো সুরো?—হঠাৎ…"

সুরবালার মুখটা বুকে চেপে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গেই পারলে না কিছু উত্তর দিতে। তার পর ভাঙা ভাঙা কথায় কান্নার মধ্যে দিয়ে বলে চলল—"একদিন শুনবে—যেদিন হাসির মধ্য দিয়েই বলবার ক্ষমতা পাব ফিরে…তার আগে একটা কথার উত্তর দাও—পোড়া হাসির রোগ রয়েছে বলে তোমার কি একটুও এমন সন্দেহ আছে যে, আমি সেদিনকার চেয়ে আরও নিঃশেষ করে তোমার পায়ে লুটিয়ে দিই নি নিজেকে? ··বল না। এই রকম একটা রাতেই যে বলবার কথা-সেটা·"

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ছায়া

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপ স্বতন্ত্র বস্তু—রূপ তাহার কোন কালে ছিল না; তবে অন্ন-বস্ত্রে দেয় যে শ্রী—সে শ্রী তাহার ছিল। কিন্তু সেটুকুও তাহার থাকিল না। অন্নবস্ত্রের অভাবে নয়, কয় মাসের কারাক্লেশ জলৌকার মত শ্রীটুকু যেন শোষণ করিয়া লইল। জেলে ক্লেশ কিছু সে পায় নাই, কিন্তু তবুও চার মাসের মধ্যেই আমাশয় ও চোখের অসুখে কুজ, শ্রীহীন হইয়া ফিরিল। স্থূলতা বর্জিত শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; খদ্দরের পোষাকও ভারী বোধ হইতেছিল। অবয়বের লাবণ্য নিঃশেষে ঝরিয়া গেছে—দেহের শ্যামবর্ণ প্রায় কালো হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সে লাবণ্য আর ফিরিল না। শ্রী না ফিরুক দেহ সুস্থ হইল।

জেল হইতে ফিরিয়া তাহার নেশা পড়িল লেখায় এবং গাছ পোঁতায়। নিজেই মাটী কোপাইয়া ফুলের বাগান করে, গ্রামের প্রান্তের প্রকাণ্ড বড় বাগানটায় বট অশ্বত্থের ডাল ও চারা পোঁতে, ফুলের গাছও পোঁতে—কিন্তু সংখ্যায় কম। রৌদ্রে বৃষ্টিতে তাহার শ্রীহীনতা উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। আন্দোলনের পূর্ব হইতেই জামা জুতা সে ত্যাগ করিয়াছিল; তাহার পরণে থাকে মোটা কাপড় আর কাঁধে চাদর। চাদর আবার সব সময়ে নয়, কোথাও যাইতে আসিতে হইলে চাদরটা কাঁধে চাপে। অন্য সময়ে খালি গা, খালি পায়ে সে মূর্তিমান শ্রীহীনের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। সে জেলে থাকিবার সময় ছোট ভাই সংসার ঘাড়ে লইয়াছিল—সে সংসার তাহার স্কন্ধে দৈত্যের স্কন্ধের আকাশের মতই চাপিয়া রহিল। শিবনাথ সে আর ঘাড়ে করিল না। তবে উপদেশ দেয়—সময়ে সময়ে কিছুদিন ধরিয়া কঠোর পরিশ্রমে ত্রুটীগুলি সংশোধন করিয়া দিয়া সংসার রথখানিকে অপেক্ষাকৃত সবল ও দ্রুত গতিশীল করিয়া দেয়।

দ্বিপ্রহরে এক গা ঘামিয়া সেদিন শিবনাথ বাড়ী ফিরিল। খালি গা, খালি

পা—কোমরে গুঁজিয়া কাপড়খানা পর্যন্ত হাঁটুর উপর টানিয়া তোলা; সাড়া ন
দিয়াই বাড়ী ঢুকিল।

শিবনাথের স্ত্রী গৌরী ও ছোট বৌ অমলা বারান্দায় থামের আড়ালে বসিয়
পান সাজিতেছিল, গৌরী বলিল. শম্ভু এদিকে শোন দেখি।

শম্ভু শিবনাথের বাড়ীর মাহিন্দার।

শিবনাথ সটান খিড়কীর বাগানের দিকে চলিয়া গেল। গৌরী উঠিয়
বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিল—শম্ভু কোথায় গেল মন্নুর মা?

রন্ধনশালে ব্যস্ত পাচিকা মন্নুর মা বলিল—কে জানে বৌদিদি, দেখি নাই
ত। কেউ আসে নাই ত!

ছোট বৌ অমলা মিহিভাবে বলিল, আসবে না কেন—খিড়কী দিয়ে গেল
চোখের সামনে।

গৌরী রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল—চাকর বাকর অবাধ্য হয়েছে দেখেছ! ডাকলে
সাড়া পর্যন্ত দেয় না। তা বলব কাকে বল? বড়বাবুই চাকর বাকরের মাথা
খেলে। এখুনি শম্ভু খিড়কী দিয়ে গেল।

খিড়কীর রাস্তাঘরে পদশব্দ উঠিল। মন্নুর মা বলিল—ওই যে, ওই যে বাবু
আসচেন।

গৌরী বলিল—এই শম্ভু, বেয়াদপ চাকর কোথাকার—

প্রথমটা না লক্ষ্য করিলেও শিবনাথ খিড়কীর বাগানে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা
শুনিয়া সব বুঝিয়াছিল। সে হাসিমুখেই জোড় হাতে দাঁড়াইয়া বলিল—অধম
কি একান্তই শম্ভু পদবাচ্য হ'ল হুজুরাইন?

মন্নুর মা মুখে কাপড় গুঁজিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ছোট বৌ-এর চাপা
হাসির খুক্ খুক্ শব্দ বেশ শোনা যাইতেছিল। গৌরী নিজেও না হাসিয়া
পারিল না—বলিল, মা গো মা, কি অপ্রস্তুত করতে পার তুমি মানুষকে—না
বাপু, ছি, ও কি?

শিবনাথ হাসিয়া বলিল—আমার কথাটার উত্তর দাও, আমি কি শম্ভুর
কেলাসে পড়লাম তা হ'লে?

গৌরী স্বামীকে বেশ করিয়া দেখিয়া বলিল—কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে
বল দেখি? সর্বাঙ্গে ধুলো, শরীরের এই অবস্থা—ছি ছি ছি। বস দেখি, একটু
বাতাস করি। ভোলাদাসী, জল দে ত এক বালতী! ছোট বৌ আমার সাবান
আর তোমার ভাসুরের গামছা দেখে দাও ত।

ভোলাদাদী বাড়ীর ঝি।

খেয়ালের সুর চাপা পড়িয়া ধ্রুপদ ধামার আরম্ভ হয় দেখিয়া শিবনাথ ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে বলিল—ধীরে মহাশয়া ধীরে, ধ্রুপদ ধামার আরম্ভ করতে হয় ধীরভাবে সুস্থচিত্তে। একটু অপেক্ষা কর, এই গাছ কটা পুঁতে আসি।

গৌরী বলিল—হাত মুখ ধোও, জল খাও, তারপর। সে স্বামীর হাত হইতে গাছের চারা কয়টা টানিয়া লইল। আর উপায় ছিল না—শিবনাথকে বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইল। অতঃপর কিন্তু শিবনাথের মন্দ লাগিল না—তপ্তদেহে শীতল বারি সিঞ্চন, তাহার সঙ্গে পাখার মৃদু বাতাস, সকলের উপর মিছরীর সরবৎ—মন্দ কেন, খুব ভালই লাগিল। সে চোখ মুদিয়া পরম আরামে বলিল—আঃ!

গৌরী বলিল দেখ, কিছুদিন কোথাও গিয়ে শরীর সেরে এস তুমি। আর জামা জুতো পর—ও ছেড়ে আর—

মধ্যপথেই শিবনাথ বলিল—কেন, অমনি আর পছন্দ হচ্ছে না আমাকে!

গৌরী বলিল—আমার কথাই তোমার পছন্দ হয় না। কিন্তু মা থাকলে তিনিও ঠিক এই কথাই বলতেন।

শিবনাথ বলিল—তনয় যদ্যপি হয় অসিত বরণ, প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন; কিন্তু, কন্যা কাময়তে রূপং—সখি, আশঙ্কা আমার তোমার সম্বন্ধে।

গৌরী এবার বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সে বলিল—তোমাকে যেতে হবেই। আর জামা জুতো তোমাকে পরতেই হবে।

শিবনাথ উত্তর দিল—শরীর ত আমার অসুস্থ নয় গৌরী। আর বেশভূষা জীবনের পক্ষে বাহুল্য বলেই আমি মনে করি।

গৌরী বলিল—ও শরীর তোমার ভাঙতে কতক্ষণ? তা ছাড়া শ্রী বলে জিনিষটাও ত' দরকার। আমি টাকা দিচ্ছি।

শিবনাথ মুদিত চোখেই উত্তর দিল—কি হবে রূপ, কি হবে বেশভূষা, মহাকালের দরবারে—

গৌরী রাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

শিবনাথ তবুও একটু রসিকতা করিবার চেষ্টা করিল—রূপ দেখে যদি ভালবাস সখি—।

কিন্তু রসিকতা জমিল না, গৌরীর মুখ দেখিয়া গানের কলিটা সে সম্পূর্ণ আবৃত্তি করিতে পারিল না।

শিবনাথ স্ত্রীর অনুরোধ রাখিল না। তাহার সেই এক উত্তর—কি হবে? সে গ্রাম প্রান্তের বাগানে ঘুরিয়া বেড়ায়, কত ধারার চিন্তা করে. লেখে—মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইলে গাছ পোঁতে।

গৌরী অবশেষে দেবর দেবনাথকে দলে টানিয়া শিবনাথকে পরাজিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। এবার ফল কিছু ফলিল, স্থির হইল, যখন কয়েক মাস আর এমন করিয়া শিবনাথের ঘুরিয়া বেড়ান হইবে না। বাড়ীতে বসিয়া সেরেস্তার কাজ কর্ম দেখিয়া দিতে হইবে। শিবনাথকে স্বীকার করিতে হইল। কর্তব্যে সে অবহেলা করে না।

গৌরী বলিল, তবু আমার কথাটা রাখলে না।

শিবনাথ বলিল—তোমার কথাই ত' রাখলাম।

—না, ভাই-এর কথা রাখলে। কেন—সে কথাও আমি জানি।

—কেন শুনি?

—বই ছাপাতে টাকা চেয়েছিলে তুমি, আমি দিইনি—তাই। আমার টাকায় শরীর সারতে পর্যন্ত যাবে না তুমি। আমার ব্রতের কাপড় জামা জুতো ছাতা—সে পর্যন্ত নিলে না তুমি।

শিবনাথ বলিল—পাগল তুমি! গৌরীর কথা তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিতেছিল টাকা দেবার আমি কে? টাকার মালিক ছেলেরা। তারাই মায়ের দৌহিত্র। একথাটা তুমি বুঝলে না, আমার উপর রাগ করলে।

শিবনাথ বলিল—ও তোমার ভুল ধারণা গৌরী। বলিয়া সে বাহিরে চলিয়া আসিল। কিন্তু কথাটা সে চিন্তা না করিয়া পারিল না। বৈঠকখানাটা জনশূন্য—চাকরটা বাজারে গিয়াছে, চাপরাশীটা ওই মাত্র গেল দেবনাথের সঙ্গে মাঠে, নায়েব স্থানীয় ব্যক্তি, কি কারণে সে আজ আসিতে পারে নাই। শিবনাথ একা বসিয়া ঐ কথাটাই ভাবিতেছিল।

গৌরী কিছু মাতৃধন পাইয়াছে—হাজার নয় টাকা। টাকাটা কতক ক্যাস সার্টিফিকেটে আবদ্ধ আছে, কতক গৌরীর পিতৃকুলের এক ব্যবসায়ে ধার দেওয়া আছে—সুদটা তাহার মাসে মাসে পাওয়া যায়। কিছু টাকা শিবনাথ একবার

চাহিয়াছিল,, কিন্তু গৌরী দেয় নাই। শিবনাথ ভাবিতেছিল, গৌরীর কথাটা কি সত্য ?

চিন্তাটা সুখপ্রদ মনে হইতেছিল না, মনে মনে যেন অপরাধ আংশিক ভাবেও স্বীকার করিতে হইতেছিল। শিবনাথ উঠিয়া সেরেস্তার খাতাপত্রগুলা লইয়া বসিল।

কাহার জুতার শব্দে মুখ তুলিয়া শিবনাথ দেখিল এক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় আসিতেছে। ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—নমস্কার।

শিবনাথও প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল—বসুন। বসিয়াই ভদ্রলোক বলিলেন—নতুন বহাল হয়েছেন বুঝি আপনি ?

নগ্ন গাত্র শিবনাথ বুঝিল ভদ্রলোকের ভুল হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবে কেমন করিয়া সে ভ্রম সংশোধন করিয়া দেওয়া যায়, তাহাই সে দ্রুত চিন্তা করিতেছিল। কিন্তু তাহার পুর্বেই ভদ্রলোক তাহার হাতদুটী জোড় করিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল—পাঁচটি টাকা আপনাকে পান খেতে দোব নায়েব বাবু। আমার একটি কাজ ক'রে দিতে হবে।

শিবনাথ অগাধ জলে পড়িয়া গেল। দুই কুল বজায়ের উপায় না পাইয়া সে নায়েব সাজিয়াই বসিল।

বলিল—কি কাজ বলুন।

ভদ্রলোক বলিল—বাবুদের দরবার থেকে পাঁচ টাকা ক'রে বার্ষিক বৃত্তি ছিল আমাদের। গত বছর থেকে সেটা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন বড়বাবু। তা সেইটী আপনাকে উদ্ধার করে দিতে হবে।

শিবনাথ প্রশ্ন করিল—বৃত্তি বন্ধ হ'ল কেন ? বড়বাবু ত--

বিরক্তিভরে ভদ্রলোক বলিয়া বসিল—আর মশায়, নতুন লোক আপনি—ক্রমে বুঝতে পারবেন। সে এক আচ্ছা লোক। এখন ব্যাপারটা শুনুন। বাবুদের মহাল ২১৯ নং তৌজি পাবনায় আমার শ্বশুর বাড়ী—বৃত্তি আমার শ্বশুরদের পৈত্রিক। আমিই সব সম্পত্তি পেয়েছি—শ্বশুরের ছেলেপিলে নাই। শ্বশুরের পৈত্রিক দুর্গাপূজা ছিল ; বিজয়ার পর যাত্রার দিন আমার শ্বশুর প্রতিমার গলার পৈতে নিয়ে আসতেন—বাবুরা পাঁচটী টাকা দিতেন। এখন এবার আসতেই ছোটবাবু বললেন—বৃত্তি আপনি পাবেন না ; কেন মশায়, জিজ্ঞাসা করলাম। শুনলাম শ্বশুরের দুর্গাপূজো ত আমি আর করি না। সেই জন্যে বড়বাবুর হুকুম।

শিবনাথের ব্যাপারটা মনে পড়িয়া গেল। সে বলিল—পূজোটা বন্ধ না করলেই হ'ত !

হাসিয়া ভদ্রলোক বলিল—বেশ মশাই আপনি। খরচ কত ! তা ছাড়া ইস্কুল মাস্টারী করি, ছুটী হয় সেই পঞ্চমীর দিন। কখনই বা কি করি !

শিবনাথ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—তা আমি বলব বাবুকে।

ভদ্রলোক বলিল—হ্যাঁ, ছোটবাবুকে নয়, বড়বাবুকে বলবেন। আচ্ছা ঘড়েল লোক মশাই—ছোট ভাইকে শিখণ্ডীর মত সামনে রেখে আড়াল থেকে হুঁঃ—বেশ ! আরে মশাই পাঁচ দিন এসে দেখাই পেলাম না। কোথা ! না, বাড়ী নাই—মাঠে নয় বাগানে।

তারপর সহসা মুখটা খুব কাছে আনিয়া বলিল—এত বাগানে কেন মশাই, বলি মালটাল—এঁ্যা ? এদিকে ত স্বদেশীতে জেল টেল খেটে এলেন।

শিবনাথের এর পর হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। সে কোন-রূপে বলিল—কই, সে রকম ত শুনি টুনি নাই।

চোখের ইসারা করিয়া ভদ্রলোক বলিল—আরে মশাই, ডুবে ডুবে জল খেলে একাদশীর বাবাও জানতে পারে না।

শিবনাথ ভদ্রলোককে বিদায় করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল—এখনি কে হয়ত আসিয়া তাহার পরিচয় ব্যক্ত করিয়া দিবে। সে বলিল—আমি বলব। আচ্ছা, নমস্কার।

ভদ্রলোক আবার তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আজ্ঞে বলব বললে হবে না। ব্রাহ্মণের বৃত্তি উদ্ধার করে দিতেই হবে। আমি বরং আরও কিছু—

বাধা দিয়া শিবনাথ বলিল—আমাকে কিছু লাগবে না। তবে বড়বাবু যে ধারার মানুষ—

ভদ্রলোক বলিল—আরে, দেখা পেলে যে দেখি কি ধারার মানুষ। বুড়োছেলে শাসন করার অভ্যেসও আমার আছে। এই দেখুন, আপনাকে দশটাকা দোব আমি। আচ্ছা চললাম আজ—নমস্কার।

ভদ্রলোক চলিয়া যাইতেই শিবনাথ তক্তাপোষের উপর গড়াইয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। একা একা এতটা কৌতুক ভোগ করিতে তাহার ভাল লাগিল না। সে উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। শিবনাথের বাড়ী ও বৈঠকখানার মধ্যে খানিকটা ব্যবধান আছে—একটা রাস্তা পার হইয়া সামান্য একটু যাইতে হয়।

বৈঠকখানা হইতে রাস্তায় নামিয়াই কিন্তু তাহাকে দাঁড়াইতে হইল। সেই ভদ্রলোক তাহারই এক বন্ধুর সহিত কথা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন।

শিবনাথ সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল, কিন্তু তাহার পূর্বেই বন্ধুটী বলিয়া উঠিল—এই যে শিবনাথ। এই ভদ্রলোক—ও মশায়, ও সীতারামবাবু—চলে যাচ্ছেন কেন, এই যে শিবনাথ।

সীতারামবাবু ততক্ষণে বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে অনেকটা চলিয়া গিয়াছেন।

শিবনাথের হাসিতে নূতন জোয়ার ধরিয়া গেল। তবুও সে ডাকিল—শুনুন, শুনুন সীতারমবাবু।

অল্প দূরেই পথটা একটা মোড় ফিরিয়াছে। সীতারামবাবু সেই মোড়ের মধ্যে তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। বন্ধুটী হতবাক হইয়া শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে বলিল—কি ব্যাপার বল ত শিবনাথ? ভদ্রলোক আমার জানা লোক, তাই দেখা হতেই বল্লেন শিবনাথবাবুকে ধরে একটী কাজ করে দিতে হবে আমার। তাই সঙ্গে আসছিলেনও আমার, কিন্তু তোমাকে দেখেই—কি ব্যাপার বল ত?

শিবনাথ তখনও প্রচুর হাসিতেছিল—সে হাসির মধ্যেই কোনরূপে বলিল—পরে বলব দাদা, এখন হাসতে দাও!

বলিয়া সে হাসিতে হাসিতেই বাড়ী চলিয়া গেল। বাড়ীর সকলেও হাসিয়া আকুল হইল। গৌরী, ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর সিংহাসন পরিষ্কার করিতেছিল। সে গম্ভীর মুখে বাহির হইয়া আসিল।

বাড়ীর পুরাতন ঝি সতীশের মা বলিতেছিল—তা বাপু লোকের দোষ কি! বাবুলোকের চেহারা হবে এ্যাই থল্‌থলে—এই ভুঁড়ি! এ্যাতখানি জায়গা জুড়ে বসে থাকবে পাহাড় পর্বতের মত! এই জামা, চক্‌চকে জুতো, মস্ মস্ করে যাবে! তা-না ই এক ঢং বাবু তোমার।

শিবনাথ গৌরীর দিকে চাহিয়া বলিল—শুনলে হাসির কথা!

কাজের অজুহাতে ওঘরে যাইতে যাইতেই গৌরী উত্তর দিল—কালা ত নই, শুনলাম বৈকি! কিন্তু হাসির ত এতে কিছু নাই।

শিবনাথ প্রশ্ন করিল—কি রকম?

—তা বৈ কি। আড়ি পেতে শোন যদি তবে নিরেনব্বুই জনকে অমনি

ধারার কথা বলতে শুনবে। নিজের পরিচয় গোপন করে নিজের সম্বন্ধে কথা শোনাও আড়িপাতারই সামিল। ও অতি ছোট কাজ।

গৌরীর কথার সুরে ও অর্থে বাড়ীর হাস্যচটুল বায়ুস্তর যেন দেখিতে দেখিতে স্তব্ধ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সকলেই যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। শিবনাথও মনে যেন একটু আঘাত পাইয়াছিল, তবুও সে রহস্য করিবার চেষ্টা করিল—হতভাগ্য শিবের কপালে পতিনিন্দা শুনে গৌরীও শেষে সতীর মত দেহত্যাগ না করেন—আমি তাই ভাবছি!

গৌরী শান্তস্বরে উত্তর দিল—দেহত্যাগ করে আর লাভ কি বল? গৌরী দেহত্যাগ করলে মহাদেব আবার বিবাহ করবেন, মাঝখান থেকে গৌরীর কার্তিক গণেশই ভেসে যাবে।

কথাগুলির গঠনের ভঙ্গীকে রহস্য বলিয়াও ধরা যায়—কিন্তু অতি কুৎসিত ব্যক্তির রোদন-বিকৃত মুখ দেখিয়া যেমন হাসা যায় না—তেমনি এ কথাগুলি শুনিয়াও কেহ হাসিতে পারিল না। শিবনাথও নীরব হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে শিবনাথ বলিল—এত রূপের আকাঙ্ক্ষা কেন বল ত তোমার?

অতি রুষ্ট কণ্ঠস্বরে গৌরী উত্তর দিল—এত বড় জঘন্য কথাটা তুমি বললে আমাকে! অতি ইতর তুমি!

শিবনাথের কর্কশ কৃষ্ণমূর্তি ক্রোধে কুৎসিত হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল—যা সত্য তাই বলেছি। সত্য কথা ইতরে বলে না—ইতরেই সত্যকথা সসম্মানে গ্রহণ করতে পারে না।

পাচিকা মনুর মা বলিল—তা বাবু একবার ঘুরেই আসুন না। বৌদিদি ত ভাল কথাই বলছেন!

শিবনাথ উত্তর দিল—সে খরচ করবার মত অবস্থা আমার নয়। তার চেয়ে স্নো-পাউডার মেখে রূপ বাড়ান কম খরচে হয়। বলিতে বলিতেই সে উঠিয়া বৈঠকখানার দিকে চলিয়া গেল।

ইহার পর দুই বৎসর চলিয়া গেছে। শিবনাথ তখন খ্যাতিসম্পন্ন লেখক। দুই চারিখানা কাগজের লেখার তাগিদ, পত্রের জবাব তাহাকে নিত্য দিতে হয়। পরিশ্রমও সে করে অগাধ। কিন্তু গাছের নেশা—উদ্দেশ্যহীন ভাবে মাঠে মাঠে ঘোরার নেশা, বেশভূষায় উদাসীনতা এখনও তাহার তেমনি আছে।

সেবার বর্ষার সময় খেয়াল হইল ঘর মেরামতের। রাজমিস্ত্রী লাগাইয়া নয়—রাজমিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি কিনিয়া সে নিজেই কাজ আরম্ভ করিল। বাগানের ভিতর দিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশের পথ ছিল না—সেখানে সে পাচিল ভাঙ্গিয়া এক নূতন ফটক ও একপ্রস্থ সিঁড়ির প্রয়োজন অনুভব করিল। আর তৈয়ারী করিতে হইবে বাগানের মধ্যে একটা পাকা বেদী।

ছোট ভাই বলিল—তোমার অদ্ভুত খেয়াল দাদা। বেশ ত, রাজমিস্ত্রী লাগান হোক।

শিবনাথ নিজের হাতেই বনিয়াদ খুঁড়িতেছিল। সে বলিল—উঁ-হু। দেবনাথ জানে এ লোকের সঙ্গে বাক্যব্যয় করা বৃথা; সে দাদাকে কিছু না বলিয়া বাড়ীতে গিয়া গৌরীকে ধরিল—পার ত তুমি পারবে বৌদি—তুমি বল।

গৌরী বলিল—পাগল তুমি দেবু! মহাপুরুষ যারা হয় তাদের ঐ ধারা! কারও কথা তাদের রাখতে নাই। আমি পারব না ভাই, আমাকে বলো না।

দেবু বলিল—প্রজা সজ্জন আসে যায়, তারা দেখলে কি বলে বল ত? মাথার ওপরে এই কড়া রোদ, কখনও বৃষ্টি!

গৌরী বলিল—তারা হীন ব্যক্তি, তাদের বলা কওয়ায় কি আসে যায়! আর রোদ বৃষ্টি প্রকৃতির দান—ওতে কি শরীরের অনিষ্ট হয়? তা ছাড়া খালি গায়ে, খালি মাথায়, রোদ বৃষ্টিতে মহাপুরুষদের কষ্টও হয় না।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। গৌরী জল খাবার সাজাইয়া একখানা রেকাবী দেবুর হাতে দিয়া বলিল—খাইয়ে এস দেখি। চাকর বাকরের হাতে দেওয়া ত মিথ্যে—পড়েই থাকবে।

পনর দিনেও সিঁড়িটা শেষ হইল না। সেদিন সকালে শিবনাথ মাথায় এক মাথালী দিয়া সিঁড়ির উপর সিমেণ্ট চালাইতেছিল। পনর দিনেই রৌদ্রে তাম্রাভ রংএ তাহার কালো ছোপ ধরিয়াছে—পিঠখানার রং গাঢ় কালো হইয়া উঠিয়াছে।

পিওন আসিয়া প্রশ্ন করিল—এই, বাবু আছেন রে?

শিবনাথ মুখ তুলিয়া চাহিতেই সে লজ্জায় জিভ কাটিয়া বলিল—আজ্ঞে, চিনতে পারি নাই আপনাকে। একটা রেজেষ্ট্রি আছে, খারিজ ফিজের নোট্টিশ!

চিঠি কয়খানা হাতে লইয়া সে হাসিয়া বলিল—রেজেষ্ট্রি ছোট বাবুকে দাও গে যাও।

চিঠিগুলোর কয়খানা কাগজের পত্র, একখানা তাহার মামার, অপর খানা দিয়াছেন তাহার ভগ্নীপতি। ভাগ্নীর বিবাহ আগামী সপ্তাহে. তিনি তাহাকে যাইতে লিখিয়াছেন। দিদিও পত্র দিয়াছেন—এবার দেবুকে পাঠাইলে চলিবে না। তাহাকেই আসিতে হইবে, অন্যথায় তিনিও কখনও আব শিবুর বাড়ী আসিবেন না।

শিবু এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিল না। ভগ্নীপতিব দেশ বর্দ্ধমান জেলার এক পল্লীগ্রামে—রেল স্টেশন হইতে মাইল পাচেক দূরে যাইতে হয়। কাঁচা রাস্তা বর্ষার জলে কাদায় অব্যবহার্য হইয়া উঠিয়াছে। পৌছিবামাত্র ভগ্নীপতি সম্বর্দ্ধনা করিলেন—এস এস ভাই, এস। কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে তোমার শিবু? খালি পা—খালি গা—এ কি!

শিবু হাসিয়া বলিল—চাষার চেহারা আবার কবে সজ্জনের মত হয় জামাই-বাবু! এই ত চাষীর পোষাক।

ভগ্নীপতি উপস্থিত ভদ্রলোক কয়টীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ডাক্তার-বাবু, ইনিই আপনাদের প্রিয় লেখক শিবনাথ—আমার তালব্য শয়ে আকার লয়ে আকার। কেমন হে? আর ইনি—

তৎপুর্বেই ডাক্তারবাবুটী আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—আমার পরিচয়—এ ভিলেজ ডক্টর, সামান্য ব্যক্তি। ভারী সুখী হলাম! ভারী ভাল লাগে আপনার লেখা। আমাদের ক্লাবের লাইব্রেরীতে কিন্তু একদিন যেতে হবে আপনাকে।

ভগ্নীপতি বলিলেন—হবে ডাক্তার, হবে। এখন পনর দিন ছাড়ব মনে করছ? তবে চোয়াড়ের গলায় ফুলের মালা দিয়ে কি করবে? চলহে. বাড়ীর ভেতরে চল—দিদি তোমার দশবার খোঁজ করেছে এর মধ্যে—শিবু এল?

শিবু বলিল—যে রাস্তা আপনাদের!

বাড়ীর মধ্যে দিদি তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—এ কি দশা হয়েছে তোর শিবু? এ্যাঁ, সেই শিবু তুই! বলে না দিলে ত তোকে আমি চিনতেই পারতাম না। বৌ লেখে, শরীর খারাপ হয়েছে তোর, কিন্তু এত খারাপ! সে

রাক্ষুসী সেবা যত্ন করে না নাকি ? বস, বস, আমি বাতাস করি। আর এ কি পোষাক পরিচ্ছদের শ্রী-রে তোর ?

শিবনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল—এক কাপ চা দাও দেখি আগে।

দিদি ডাকিয়া বলিলেন—অ ভাই বিনী, চায়ের জল চড়িয়ে দাও ত। আর ওরে নবীন—হাত মুখ ধোবার জল দে।

ওদিকের বারান্দায় মেয়েরা দাঁড়াইয়াছিল, সম্মুখেই কতকগুলি ঝিউরী মেয়ে—তাদের পিছনে কতকগুলি বধূ। দিদি বলিলেন—মেয়েরা সব দেখতে এসেছে তোকে। আমাদের এখানে লাইব্রেরীতে তোর বই সব আছে কি না—আর সব কাগজই আসে ত।

শিবু হাসিয়া বলিল—তা ছাড়া তোমার মত সজীব বিজ্ঞাপন যখন রয়েছে, তখন এখানে শিবুর খ্যাতির অভাব কি ?

দিদি বলিল—না রে না, আমি মিথ্যে বড়াই ক'রে বেড়াই না। কিন্তু ও চেহারায় তোকে দেখবে কি বল্ ত ?

শিবু বলিল—ভয় কি দিদি ? জামাই বাবুর অনূঢ়া ভগ্নী ত নাই যে এই চেহারায় বরমাল্য গলায় নিতে হবে—টোপর পরতে হবে !

শিবুর মাথায় এক, চপেটাঘাত করিয়া ভগ্নীপতি বলিলেন—ওরে শালা, আমাকে পাল্টে শালা বলতে চাও তুমি !

দিদির ননদ বিনী বা বিনোদিনী হাসিতে হাসিতে আসিয়া এক কাপ চা হাতে দিয়া বলিল—দুধ বেশী হয়ে গেছে, গরমও নেই, শিগ্‌গির খেয়ে নিন।

দিদি বলিল—খাসনে শিবু খাসনে, মাড় মাড়—চা নয়।

তাহার পূর্বেই শিবু চুমুক দিয়াছিল—সেটুকু ফেলিয়া দিয়া শিবু বলিল, মাড় খুব পুষ্টিকর জিনিষ, সেণ্ট পারসেণ্ট ভিটামিন। আর আমার মত চাষার পক্ষে উপযুক্ত বস্তু।

সকলে হাসিয়া উঠিল।

শিবনাথের উপর পড়িল বরযাত্রী সম্বর্দ্ধনার ভার।

ভগ্নীপতি গোপালবাবু বলিল—দেখো ভাই, সহুরে জীব সব, তার ওপর আসছেন বরযাত্রী, বিজয়ী প্রুসিয়ান সৈন্যের মত বিক্রমে আসবেন। প্রথম মোহড়া তোমাকেই নিতে হবে।

মাথায় এক তোয়ালে জড়াইয়া শিবু যাইবার জন্য সাজিল, বলিল—কোন চিন্তা নাই আপনার। খান দশেক গো-গাড়ী ও খান দুয়েক পাল্কী লইয়া শিবু স্টেশন হইতে বরযাত্রী আনিবার জন্য যাত্রা করিল। রাস্তায় স্থানে স্থানে এক হাঁটু করিয়া কাদা জমিয়াছে। শিবু যখন স্টেশনে পৌঁছিল তখনও ট্রেণের বিলম্ব ছিল। একজন খাবারওয়ালাকে ধরিয়া সে চায়ের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিল।

বরযাত্রীর দল স্টেশন হইতে বাহির হইয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল।

কাদা! এ কি দেশ বাবা! এ কথা তো ছিল না!

শিবু জোড়হাত করিয়া বলিল, এই আমাদের দেশ। তবে কষ্ট বিশেষ করতে হবে না, যেটুকু কষ্ট ঐ দোকান পর্যন্ত। ওখানে চা খেয়ে গাড়ীতে উঠবেন, বাড়ীর দোরে নামবেন।

একজন বলিল—বলিহারি ইয়ার! জুতোর কাদা ঘুচোবে কে?

বরকর্তা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, করবে কি আর, উপায় কি? এক কাজ কর, জুতো খুলে ফেল সব।

তরুণ দলের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল—জুতো হাতে করে বরযাত্র যাওয়া, এ ত নতুন।

বরকর্তা বলিলেন—তোমরা জুতো হাতে করবে কেন, ঐ যে চাকর না সরকার ওকেই দাও সব। এই, জুতোগুলো সব নাও হে তুমি। একখানা বস্তা আন বরং।

শিবু অদূরবর্তী একজন গাড়োয়ানকে ডাকিল—ওরে –

একজন বরযাত্রী তাহার মাথায় সজোরে এক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—ওকে বলা হল ত উনি আবার বলেন ওকে। নে বেটা, তুই নে না। তোকেই নিতে হবে।

ভাবী বৈবাহিক তখন ক্রুদ্ধ মার্জারের মত গোঁফ ফুলাইয়া বলিতেছেন—লোক নাই জন নাই, কি ব্যাপার সব? পাড়াগাঁয়ের ভদ্রলোক means হাফ চাষা।

শিবু হাসিমুখেই বস্তা ঘাড়ে লইয়া জুতা সংগ্রহ করিতেছিল। সে বেয়াইকে বলিল, আপনার জুতো জোড়াটা?

দোকানে আসিয়া আর এক হাঙ্গামা, ভাঁড়ে চা কি ভদ্রলোকে খায়?

শিবু বলিল—আজ্ঞে কাপের চেয়ে ভাঁড় ভাল, কাপে কত জনে খায়!

একজন বলিয়া উঠিল—আচ্ছা ইম্পার্টিনেন্ট চাকর ত! দে ত রে বেটার কান মলে।

শিবুর সঙ্গে চাপরাশী ছিল জন কয়েক। তাহারা রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইসারা করিয়া শিবনাথ তাহাদিগকে নীরব থাকিতে আদেশ করিল। যাই হোক—নেশার বস্তু চা এবং সে চা যখন আর রাস্তার মধ্যে পাওয়া যাইবে না, তখন অগত্যা ভাঁড়েই খাইতে হইল। ভাঁড়ে চা বিস্বাদ লাগিল কিনা সে প্রশ্ন করিতে শিবু সাহস করিল না। গাড়ীতে উঠিবার সময় জুতো চাই—শিবনাথ পূর্বেই জুতোগুলি জোড়া মিলাইয়া সারিবন্দী করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিল। বরযাত্রীরা বলিল—পায়ে যে কাদা, জুতো পায়ে দিই কি করে?

শিবু গাড়োয়ানদের হুকুম করিল—জল এনে দে, বাবুরা পা ধোবেন।

একজন গাড়ীতে বসিয়া পা বাড়াইয়া দিয়া বলিল—এইখানে পা ধুয়ে দাও বাবা, কাদার ওপরে পা ধুয়ে ফল কি?

সহযাত্রীরা তাহাকে তারিফ করিয়া উঠিল—দি আইডিয়া। বেশ কি রে বাবা!

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই গাড়ীতে চড়িয়া পা বাড়াইয়া বসিল। গাড়োয়ান পা ধুইয়া গামছা দিয়া মুছিতে উদ্যত হইতেই বরযাত্রীরা বলিয়া উঠিল—থাক্ থাক্। শোন ত হে ইয়ার খানসামা, শোন ত।

শিবনাথ কাছে আসিতেই সে বলিল—খোল ত বাপধন মাথার তোয়ালে-খানি, মোছ, পা মুছে দাও।

একে একে সকলের পা মুছিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতেই সে গাড়ীর সঙ্গ ধরিল। গাড়ীতে স্থান তাহাকে কেহ দিল না; অগত্যা সে একজন গাড়োয়ানের স্থানে বসিয়া পাঁচন হাতে গরু ঠেঙাইতে বসিল—হেৎ-তা-তা বাপধন রে আমার!

ভগ্নীপতি গোপালবাবু বলিল—ব্যাপার কি হে শিবু, চাপরাশীরা বল্লে আমায়, ওরা নাকি তোমার মাথায় চড় মেরেছে, জুতো বইয়েছে—

হাসিয়া বাধা দিয়া শিবনাথ বলিল—যেতে দিন না জামাইবাবু, ওসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে শেষে শুভকর্মে একটা ব্যাঘাত ঘটাবেন?

সজল চক্ষে গোপালবাবু শুধু বলিল—ভাই শিবু!

শিবনাথ তাড়া দিয়া বলিল—যান, কাজে যান। কোথায় কি হয়ে যাবে। শেষে আপনাকে হয়ত কান নাক মলিয়ে ছাড়বে।

গোপালবাবুও এবার অল্প একটু হাসিয়া বলিল—তোমাকেই ডাকতে এসেছি, আলাপ করবেন বেয়াই মশায়। উনি আবার সাহিত্যরসিক লোক কিনা।

শিবু বলিল—না না, সে হয় না জামাইবাবু। ভারী অপ্রস্তুত হবেন ওরা।

গোপালবাবু বলিল—তুমি না গেলে হয়ত ভাববে তুমি রাগ করেছ, কারণ, জানতে ওরা পারবেই যে তুমিই স্টেশনে আনতে গিয়েছিলে।

শিবুকে দেখা দিতে হইল।

গোপালবাবু শিবুকে সঙ্গে লইয়া আসরে আসিয়া পরিচয় দিতেই গমগমে গরম আসরখানায় কে যেন জল ঢালিয়া দিল। বরযাত্রী সকলেরই মুখ কালো হইয়া গেল। বরকর্তা উঠিয়া আসিয়া জোড় হাতে সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শিবু বলিয়া উঠিল—ডিটেক্‌টিভ নভেল লিখব বে-ই মশাই, তাই ছদ্মবেশ প্র্যাক্‌টিস করছি।

তুচ্ছ রসিকতা, কিন্তু ইহাতেই সকলে প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহার পর কিন্তু দুরন্ত বরযাত্রীর দল সুবোধ বালক হইয়া গেল—যাহা পাইল তাহাই খাইল—যাহা অনুরোধ করা হইল তাহাই রাখিল।

বাড়ীতে আসিয়া একথা শিবনাথ প্রকাশ করিল না—গৌরীর উষ্মা আশঙ্কা করিয়া।

সেদিন সে পড়িবার ঘরে বসিয়া একখানা সাপ্তাহিকের একটা প্রবন্ধ পড়িতেছিল। প্রবন্ধটা গল্প সাহিত্যের উপরে লেখা—তাহাতে তাহার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হইয়াছে। গৌরী ঘরে ঢুকিয়া একখানা খোলা চিঠি তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। শিবনাথ দেখিল, দিদি লিখিয়াছেন চিঠিখানা। সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে গৌরীকে তিরস্কার করিয়াছেন—তুমি নিশ্চয়ই শিবনাথের সেবা যত্নে মনোযোগী নও। রত্ন পাইয়া তুই চিনিলি না পোড়ারমুখী!

শিবনাথ মুখ তুলিয়া গৌরীর দিকে চাহিল, তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, বলিনি তোমাকে আমি।

অকস্মাৎ ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া গৌরী কহিল—তুমি ছেড়ে যাবে কি না বল? নইলে—কথা তাহার অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল।

শিবু বলিল—আবেগ ভাল নয় গৌরী, শোন, আমার কথা শোন!

গৌরী চোখ মুছিল, কিন্তু তাহার ঠোঁট দুইটা কাঁপিতেছিল। সে বলিল—লোকে তোমায় চাকর ভেবে অপমান করে, কতজনে কত কথা বলে। ও বাড়ীর হরির বৌ সেদিন কি বল্লে জান, বল্লে—দিদি, বড়ঠাকুর কি নেশা টেশা করেন যে এমন পাক দেওয়া—

তাহার কণ্ঠস্বর আবার রুদ্ধ হইয়া গেল।

শিবু হাসিয়া বলিল—এ যে তোমার মিথ্যে দুঃখ গৌরী!

গৌরী বলিল—না, মিথ্যে নয়। নিজের স্বামী সন্তান কুৎসিত হলেও কেউ সে কথা বল্লে বড় দুঃখ হয়। বুলুর কথা কি মনে নেই তোমার?

শিবু চমকিয়া উঠিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে।

গৌরী বলিল—বুলুর কথা ত তোমার ভোলবার নয়!

বুলু শিবনাথের মৃতা কন্যা। মেয়েটি শিবনাথের বড় প্রিয় ছিল। কিন্তু সে ছিল কালো, তাহার উপর চোখ দুটী ছিল ছোট ও ট্যারা।

গৌরী বলিল—মনে পড়ে তোমার, গাঙ্গুলীবাবুদের ঠাকুরবাড়ী থেকে যেদিন সে কাঁদতে কাঁদতে—

ঝর ঝর করিয়া গৌরী নিজেই কাঁদিয়া ফেলিল।

শিবনাথের মনশ্চক্ষের উপর ছবিটী ভাসিয়া উঠিল।

শিবনাথ বসিয়া জল খাইতেছিল সেদিন। অঝোর ঝরে কাঁদিতে কাঁদিতে চার বছরের মেয়ে বুলু আসিয়া দাড়াইল। সে তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকে লইয়া প্রশ্ন করিল—কি হল মা, কে মারলে তোমাকে?

বুলু উত্তর দিতে পারিল না—চোখের জলে বুকের দুঃখ তখনও তাহার নিঃশেষিত হয় নাই। উত্তর দিল গঙ্গা, শিবনাথের বড় মেয়ে। সে বলিল—ওই ঠাকুরবাড়ী গিয়েছিলাম আমরা পুজো দেখতে। তাই ওদের গিন্নী বল্লে, এই কাদের ছেলে তুই? সরে যা! তা আমি বল্লাম—ও আমার বোন। তাই ওরা কি বল্লে জান বাবা—বল্লে, শিবুর মেয়ে! ওমা কি কুচ্ছিৎ হয়েছে এটা, চোখ দুটো আবার দেখ। শিবু বিয়ে দেবে কি করে গা! বুলু ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এল। রাস্তা থেকে কাঁদতে কাঁদতে আসছে।

শিবনাথের মনে পড়িল, সেদিন সে বলিয়াছিল—মিথ্যে কথা মা, ওরা মিথ্যে কথা বলেছে; এই দেখ তুমি—আমার চেয়ে কত সুন্দর তুমি!

বুলু সান্ত্বনা পাইলেও শিবনাথের কথা বিশ্বাস করে নাই, সে বলিয়াছিল—বাবা, তুমি কালো আর আমি কালো? ওরা সব সুন্দর!

গৌরী তখন বলিতেছিল—সে আঘাত আমি জীবনে ভুলব না। তুমিও ত সেদিন কেঁদেছিলে।

শিবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ভুলি নি গৌরী!

গৌরী বলিল—তুমি হাস, কিন্তু আমার বুকে তেমনি আঘাত লাগে! তোমার খ্যাতিতে আমার তৃপ্তি হয় না। তোমার স্বাস্থ্য, তোমার শ্রীতে আমার বেশী তৃপ্তি।

শিবনাথ গৌরীর হাতখানি টানিয়া আপনার কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল—এখানটা বড় ধরেছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও ত।

গৌরী নীরবে স্বামীর ঘাড়ে হাত বুলাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। আরামে শিবনাথের চোখ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। মাথাটি হেলাইয়া সে গৌরীর বুকের উপর স্থাপন করিয়া বলিল—আজ থেকে তোমার হাতেই সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করলাম গৌরী। যা করবার তুমি কর।

চোখে জল মুখে হাসি মাখিয়া গৌরী বলিল—তা হ'লে আসছে সপ্তাহেই দিন দেখাই!

এবার চোখ খুলিয়া চোখে চোখ মিলাইয়া শিবু বলিল—কিন্তু আমি সুন্দর হলে আমাকে দেখে তোমার মনে কি বেশী আনন্দ হবে?

গৌরী আরক্তিম হইয়া উঠিল, বলিল—হবে, এর চেয়ে ঢের বেশী আনন্দ হবে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু বিয়ানি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বৌভাতের ভোজ শেষ হইয়া বাড়ির লোকের খাওয়া-দাওয়া চুকিতে রাত্রি সাড়ে এগারোটা বাজিয়া গেল। আজই আবার ফুলশয্যা।

ফাল্গুন মাস—অর্ধ-বিস্মৃত সুদূর জনশ্রুতির মত বাতাসে এখনো শীতের আমেজ লাগিয়া আছে। তে-তলার দক্ষিণ দিকের কোণের ঘরটাই নিখিলের শয়নকক্ষ—সেই ঘরেই আজ ফুলশয্যা হইবে। ঘরটি আগাগোড়া ফুল দিয়া সাজানো হইয়াছে। বিছানায় রাশি রাশি শাদা ফুল, মশারির চারিধারে ফুলের মালা লতার মত জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিয়াছে। ঘরে দুটি ইলেকট্রিক বাতি আছে—একটা শাদা, অন্যটাতে লাল বাল্‌ব। দুটিতেই ফুলের দুল দুলিতেছে।

শাদা আলোটা জ্বালিয়া নিখিল দক্ষিণের খোলা জানালার পাশে আরাম-কেদারায় বসিয়াছিল। চোখের সম্মুখে একটা খবরের কাগজ ধরা ছিল—বাহির হইতে কেহ আসিয়া হঠাৎ দেখিলে মনে করিত সে বুঝি পড়ায় একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু যিনি রসিক, চব্বিশ বছর বয়সে একদা ফাল্গুনের রাতে যিনি নব-বধূর চরণ-ধ্বনির আশায় উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিয়াছেন, তিনি নিখিলের মনের অবস্থা বুঝিবেন। চক্ষুই কাগজে নিবদ্ধ, কিন্তু মন? —হায়, চব্বিশ বছরের মন!

অধিকন্তু, বধূটি নিখিলের সম্পূর্ণ অপরিচিতা নয়; চোখে চোখে হাসিতে হাসিতে একটু আলাপ বহুপূর্বেই হইয়া গিয়াছিল। তিন বছর আগে নিখিলের ছোট বোনের বিবাহের রাত্রে সে প্রথম ললিতাকে দেখিয়াছিল, সেই অবধি—

যে জিনিস তিন বছর ধরিয়া অহরহ কামনা করা যায়, পরিপূর্ণ প্রাপ্তির শুভলগ্ন যতই নিকটবর্তী হইতে থাকে, মুহূর্তগুলি ততই যেন অসহ্য বলিয়া মনে হয়। নিখিল কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া জানালার বাহিরে তাকাইল; দখিনা বাতাস ক্রমেই যেন উন্মাদ হইয়া উঠিতেছে, আর যেন শান্ত হইয়া

থাকিতে পারিতেছে না। একটা পাপিয়ার কণ্ঠ পর্দায় পর্দায় ঊর্ধ্বে উঠিয়া রঙীন আতসবাজির মত ভাঙিয়া ঝরিয়া পড়িল। পিউ কাঁহা! পিউ কাঁহা! পিউ কাঁহা!

বারোটা বাজিল। দ্বারের বাহিরে ফিস্‌ফিস্ গলার আওয়াজ ও চুড়ি-চাবির মৃদু শব্দ কানে যাইতেই নিখিল সচকিত ভাবে চোখ তুলিয়াই আবার সংবাদ-পত্রে নিবদ্ধ করিল।

বড় বৌদিদি বধূর হাত ধরিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন; বলিলেন—'এই নাও ভাই তোমার জিনিস।'

নিখিল কাগজ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বড় বৌদিদি বয়সে তাহার জ্যেষ্ঠা; চিরদিনই নিখিল তাঁহাকে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম করিয়া চলে। সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বড় বৌদিদি হাসিয়া বধূর হাতটি নিখিলের হাতে ধরাইয়া দিয়া বলিলেন—'নাও। এবার আমি চললুম।—একটু সাবধানে কথাবার্তা কোয়ো কিন্তু। সবাই আড়ি পাতবার জন্যে ওৎ পেতে আছে।' বলিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বাহিরে অনেকগুলি চাপা গলার ফিস্‌ফিস্ ও তর্জন শুনা গেল—'কেন তুমি বলে দিলে—' বৌদিদি বলিলেন—'নে, আর ওদের জ্বালাতন করিস্ নি। অনেক রাত হয়ে গেছে; এখন যে-যার নিজের ঘরে গিয়ে ফুলশয্যে করগে যা।'

নিখিলের একটু দুর্ভাবনা হইল। বাড়িতে গুটি-চারেক নবীনা বৌদিদি আছেন, তাঁহারা রেয়াৎ করিবেন না; দুটি কনিষ্ঠা ভগিনী—না, তাহারাও আজ কোনো বাধা মানিবে না। তাছাড়া একটি পঁয়তাল্লিশ বছরের শিশু ভগিনীপতি আছেন, তিনি তো আগে হইতেই শাসাইয়া রাখিয়াছেন।

কিন্তু বধূর হাতটি নিখিলের মুঠির মধ্যে। ললিতা কম্প্রবক্ষে নম্রতনয়নে দাঁড়াইয়া আছে—মাথার অনভ্যস্ত ঘোমটা খসিয়া পড়িতেছে। কপালে, ঠোঁটের উপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তাহার টানাটানা চোখে কে সরু করিয়া কাজল পরাইয়া দিয়াছে। অপূর্ব হর্ষাবেশে নিখিলের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল। এই নারীটি তাহার! সে ললিতার হাতে একটু টান দিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—'ললিতা!'

ললিতার চোখ দুটি একবার স্বামীর মুখের পানে উঠিয়াই আবার নামিয়া পড়িল; ঠোঁট দুটি একটু নড়িল—'আলো নিবিয়ে দাও।'

বধূর হাত ছাড়িয়া নিখিল উজ্জ্বল আলোটা নিবাইয়া লাল আলো জ্বালিয়া দিল। ঘরটি স্বপ্নময় হইয়া উঠিল। জানালা-পথে দখিনা বাতাস তখন আরো অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বধূর কাছে ফিরিয়া আসিতেই বধূ একটু হাসিয়া খাটের নীচে আঙুল দেখাইয়া দিল। নিখিল প্রথমটা বুঝিতে পারিল না, তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া খাটের নিচে উঁকি মারিল। খাটের নিচে বধূর দুটো বড় বড় তোরঙ্গ ছিল, তাহাদের মাঝখানে একটি বড় পুঁটুলির মত বস্তু দেখিতে পাইল। টিপ করিয়া নিখিল পুঁটুলির গোলাকার স্থানটিতে প্রচণ্ড একটা চপেটাঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়া ভগিনীপতি বাহির হইয়া আসিলেন। 'উঃ শালা বোম্বাই চড় জমিয়েছে রে!' বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে দরজা খুলিয়া পলায়ন করিলেন।

ললিতা হাসি চাপিতে না পারিয়া মুখে আঁচল দিল।

জামাইবাবুকে ঘরের বাহিরে খেদাইয়া, দ্বারে খিল দিয়া নিখিল ঘরটা ভাল করিয়া তদারক করিল। ওয়ার্ডরোবের দরজা হঠাৎ খুলিয়া দেখিল ভিতরে কেহ আছে কিনা। আর কাহাকে না পাইয়া সে নিশ্চিত হইয়া বলিল— 'আর কেউ নেই।'

ললিতার হাত ধরিয়া শয্যার পাশে লইয়া গিয়া বসাইল। ললিতার পা চলে চলে চলে না। ঐ পুষ্পাস্তীর্ণ শয্যাটি চিরজন্মের জন্য তাহার—আর এই লোকটি—জীবনে মরণে সেও তাহার। তবু পা চলে না—পায়ে পায়ে জড়াইয়া যায়। হায় আঠারো বছরের যৌবন! হায় প্রথম-প্রণয়-ভীতি!

বধূর পাশে বসিয়া নিখিল চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল –'শুভদৃষ্টির সময় অমন মুখ টিপে হেসেছিলে কেন বল তো?'

বাহিরের অশান্ত দখিনা বাতাসটা আর শাসন মানিল না—হু হু করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মশারি উড়াইয়া, আলনার কাপড়-চোপড় ছত্রাকার করিয়া, বধূর বসনাঞ্চল এলোমেলো করিয়া খবরের কাগজের কয়েকটা পাতা সঙ্গে লইয়া আকস্মিক দুরন্ত বিপ্লবের মত উত্তরের জানলা দিয়া বাহির হইয়া গেল!—বসন্তের মাতাল বাতাস—নাহি লজ্জা নাহি ত্রাস—আকাশে চড়ায় অট্টহাস—

পাগলা বাতাসটা চলিয়া গেল···গোলাপী ছায়াময় ঘরটি আবার নিস্তব্ধ হইল। আলোটা দোলনার মত দুলিতে রহিল।

হাওয়ায় এই বিঘ্নকারী উৎপাতে নিখিল মনে মনে একটু বিরক্ত হইল। বধূকে জিজ্ঞাসা করিল—'দক্ষিণের জানালাটা বন্ধ করে দেব নাকি?'

ললিতা মাথা নাড়িল—'না, থাক।'

নিখিল তখন ললিতার পাশে আরো একটু সরিয়া বসিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া মৃদুস্বরে বলিল—'ললিতা!'

ললিতা তাহার বুকের উপর হাত রাখিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল—'ছাড়ো।'

নিখিল ডান হাতে তাহার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া বলিল—'না, ছাড়বো না।'

এই সময় খুব নিকট হইতে ভারী গলায় কে বলিয়া উঠিল, 'খবরদার।'

চমকিয়া নিখিল ললিতাকে ছাড়িয়া দিল, ললিতাও জড়সড় হইয়া সরিয়া বসিল।

নিখিল আবার ঘরের চারিদিক ঘুরিয়া দেখিল, খাটের তলাটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল—কিন্তু কেহ কোথাও নাই। তবে কে কথা কহিল? গলাটা ইচ্ছা করিয়া বিকৃত করিয়াছে—এ জামাইবাবু না হইয়া যায় না। কিম্বা হয়ত সেজ বৌদিদি—তিনি পরের গলা চমৎকার নকল করিতে পারেন। কিন্তু যিনিই হোন্—কোথায় তিনি? দুই জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল—কিন্তু সেখানে কাহাকেও চোখে পড়িল না। দরজায় কান পাতিয়া শুনিল—কাহারো সাড়া-শব্দ নাই। ব্যর্থ হইয়া সে ফিরিয়া আসিয়া ললিতার পাশে বসিল।

ঠং করিয়া সাড়ে বারোটা বাজিল।

নিখিল বলিল—'বোধ হয় শোনবার ভুল—কিন্তু ঠিক মনে হল, কে যেন বললে—খবরদার। তুমি শুনেছিলে?'

ললিতা বুকে ঘাড় গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল। সেও 'খবরদার' শুনিয়াছিল—লজ্জায় লাল হইয়া ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয় কেহ দেখিয়া ফেলিয়াছে।

নিখিল আবার তাহাকে কাছে টানিয়া আনিল, বলিল— 'ও কিছু নয়।'

ললিতা তাহার হাত ছাড়াইয়া সরিয়া বসিয়া চাপা উৎকণ্ঠার স্বরে বলিল—'না না, এক্ষুনি কে দেখতে পাবে।'

নিখিল উঠিয়া গিয়া উত্তরের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল—সে দিকে ছাদ, সুতরাং আড়ি পাতিবার সুবিধা বেশি। দক্ষিণ দিক ফাঁকা—সেদিক হইতে কোনো ভয় নাই—তাই সে জানালাটা খোলাই রহিল।

'এবার আর কোনো ভয় নেই' বলিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া নিখিল ললিতার পাশে আসিয়া বসিল। তাহার 'একটি হাত তুলিয়া লইয়া আঙুলের ডগায় একটা চুম্বন করিল। ললিতা হাত কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। নিখিল হাত ধরিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—'দুষ্টুমি কোরো না, লক্ষ্মী মেয়েটির মত একটি—'বলিয়া মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল। ললিতার তপ্তনিশ্বাস তাহার অধরে লাগিল।

ঠিক এই সময় তেম্নি ভারী গলায়—'এই! ও কি হচ্চে?'

তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া নিখিল চারিদিকে চাহিল। শব্দটা কোন দিক হইতে আসিতেছে তাহা উৎকর্ণ হইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু আর কোন শব্দ শুনা গেল না। নিখিলের মনে হইল শব্দটা যেন ঘরের ভিতর হইতেই আসিতেছে—অথচ ঘরের ভিতর কেহ নাই, সে বেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছে।

. নিখিলের বড় রাগ হইল। বার বার বাধা! কথা যে-ই বলুক, সে নিশ্চয় তাহাদের কার্যকলাপ দেখিতে পাইতেছে—নচেৎ ঠিক ঐ সময়েই—

একটি মলক্কা বেতের লাঠি হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া নিখিল সন্তর্পণে দ্বার খুলিল—ইচ্ছাটা, সম্মুখে যাহাকে দেখিবে তাহাকেই এক ঘা বসাইয়া দিবে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! সেখানে কেহই নাই। তবু নিখিল বাহির হইল—কে বজ্জাতি করিতেছে তাহাকে ধরিতেই হইবে; রসিক লোকটিকে আজ ভাল করিয়া জব্দ করা চাই।

পনের মিনিট বাড়ির চারিদিকে ঘুরিয়া নিখিল হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। বাড়ি নিশুতি—ঘরে ঘরে দ্বার বন্ধ। চাকর দাসীরা পর্যন্ত সমস্ত-দিনের ক্লান্তির পর যে যেখানে পাইয়াছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বৌদিদি প্রভৃতিরা বোধ করি প্রথমে খানিকক্ষণ নিখিলের ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া শেষে প্রবলতর আকর্ষণে স্ব স্ব শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন।

লাঠিটি ঘরের কোণে রাখিয়া দিয়া নিখিল বলিল—'না, কাউকে দেখতে পেলুম না, সবাই ঘুমিয়েছে।' সে আশ্চর্য ও উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল—কি এ! ভৌতিক ব্যাপার? ভেন্টীলোকুইজ্‌ম্?

ঘড়িতে একটা বাজিল।

তখন নিখিল আবার ললিতার হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বসিল। তারপর, কি ভাবিয়া উঠিয়া গিয়া দক্ষিণের জানালাটাও বন্ধ করিয়া

ললিতা মৃদুকণ্ঠে বলিল—'শুয়ে পড়লে হত না?'

নিখিল কিন্তু এখনি ঘুমাইতে রাজি নয়। বধূর সহিত নব পা৯ যখন সবেমাত্র পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়াছে—তখন ঘুম!

নিখিল ললিতার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—'এখনি ঘুমুবে. আচ্ছা, আগে একটা চুমু দাও, তারপর বিছানায় শুয়ে গল্প করব।'

'আলো নিবিয়ে দাও।'

'না—আলো থাক। ললিতা—' বলিয়া ঠোঁটের কাছে ঠোঁট লইয়া গেল।

পুনরায় সেই গম্ভীর স্বর—'দাঁড়াও তো মজা দেখাচ্ছি।'

এবার নিখিলের মনটা সতর্ক ছিল। সে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল, তারপর উঠিয়া গিয়া সুইচ টিপিল।

বড় আলোর আকস্মিক তীব্র দীপ্তিতে ঘর ভরিয়া যাইতেই কার্নিসের উপর হইতে শব্দ হইল—'রাধে কৃষ্ণ! রাধে কৃষ্ণ!'

কার্নিসের দিকে তাকাইয়া নিখিল হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ললিতাও সেদিকে একবার তাকাইয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া হাসিতে লাগিল।

একটা পাহাড়ী ময়না কার্নিসের উপর বসিয়া আছে এবং গম্ভীরভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া তাহাদের নিরীক্ষণ করিতেছে।

নিখিল হাসিতে হাসিতে গিয়া ললিতাকে বিছানা হইতে ধরিয়া তুলিল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বধূকে শক্ত করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া পাখীটার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—'হতভাগা পাখী! বোধ হয় সেই ঝড়ের সময় কারুর খাঁচা থেকে পালিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। দাঁড়াও ওকে শায়েস্তা করছি।'

এক ঘর আলো—তাহার মাঝখানে স্বামীর একি কাণ্ড! ললিতা তাহার বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—'ও কি করছ! ছেড়ে দাও—আলো নিবিয়ে দাও।'

নিখিল বলিল—'না—ও বেটা পাখীকে আমি আজ দেখিয়ে দেব যে ওকে আমি গ্রাহ্য করি না। এ যে আমার নিজের স্ত্রী তা বেটাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।' বলিয়া ললিতার ঠোঁটে চোখে কপালে চার পাঁচটা চুম্বন করিল। ললিতাও বিবশা হইয়া স্বামীর বুকের উপর চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল।

পাখীটা বলিল—'খবরদার! ও কি হচ্ছে! দাঁড়াও তো—'

নিখিল ললিতার নরম গলার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অর্ধরুদ্ধ স্বরে বলিল—'ললিতা, এবার তুমি একটা।'

‘এবার আর (অঙ্গে একটু সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে বলিল—‘আলো ললিতার পাশে ছুটোই।’

ডগায় এর্ল বলিল—কিন্তু পাখীটা যে দেখতে পাবে না!’

পাখি তা হোক।’

তখন যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেখান হইতে হাত বাড়াইয়াই নিখিল সুইচ টিপিয়া দিল। ঘর একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল।

‘ললিতা!’

‘কি?’

‘আলো নিবিয়ে দিয়েছি।’

মিনিটখানেক পরে একটি ভারি মিষ্টি ছোট্ট শব্দ হইল।

পাখীটা অন্ধকারে তাহা শুনিতে পাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিল—‘রাধেকৃষ্ণ!’

দেওয়াল

বনফুল

টেলিফোনটা বেজে উঠল। বেশ আশ্চর্য হয়ে গেল শোভনলাল। তার ধারণা হয়েছিল টেলিফোনটাও খারাপ হয়ে গেছে। সে খাটে বসে ছিল। খাট থেকেই শুনতে পাচ্ছিল টেলিফোনটা বাজছে। কে এ সময়ে টেলিফোন করছে? তার উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিলনা, ঘরের ভিতর ঢুকতে ভয়ও করছিল। এ সময় কে টেলিফোন করতে পারে? তাকে টেলিফোন করবার মতো কে-ই বা আছে এ শহরে। সুজাতার সঙ্গে টেলিফোনে কথা কইবার লোভেই সে অনেক খরচ করে ফোনটা নিয়েছে। ওই ফোনেই সুজাতার সঙ্গে সামান্য যা একটু যোগাযোগ হয় কচিৎ। তা-ও সুজাতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কখনও কথা বলে না। শোভনলাল ফোন করলে তবে এসে ফোনটা ধরে। যখন কথা বলে, তখন পাশে নাকি তার মা দাঁড়িয়ে থাকে। তবু তার কথা শোনা যায় তো। এইটুকুই শোভনলালের তৃপ্তি। সুজাতার জন্যেই এই বিহারে এসে পড়ে আছে সে। সুজাতার কাছাকাছি আছে এই সান্ত্বনা।

······ফোনটা বেজেই চলেছে।

হঠাৎ শোভনলালের মনে হল সুজাতা ফোন করছে নাকি? কিন্তু সুজাতা তো নিজের থেকে কখনও ফোন করে না তাছাড়া সে তো এখানে নেই, কাল মুঙ্গেরে গেছে। ফিরেছে কি এর মধ্যে? বলেছিল সাত আট দিন পরে ফিরবে। হয়তো ফিরেছে।

শোভনলাল খাট থেকে উঠে ভিতরে গেল। ভিতরে যেতেই থেমে গেল ফোনটা। তবু তুলে নিল সে রিসিভারটা।

'হ্যালো—কে—'

কোন সাড়া নেই।

'হ্যালো - হ্যালো—'

কোন সাড়া নেই।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আবার খাটে এসে বসল।

সুজাতার কথাই ভাবতে লাগল। ছেলেবেলা থেকে সুজাতার সঙ্গে আলাপ। বাল্যকালে একই স্কুলে পড়েছিল দুজনে। একসঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিল। তারপর সে কলেজে পড়বার জন্যে কোলকাতা চলে গেল। সুজাতাকে চিঠি লিখত সেখান থেকে। সুজাতা কি সে চিঠিগুলি রেখে দিয়েছে এখনও? ফোনে একদিন বলেছিল পুড়িয়ে দিয়েছি। সুজাতার কয়েকখানা চিঠিও তার কাছে আছে। অতি সংযত সাধারণ চিঠি, কিন্তু তার মধ্যেই, ওই সহজ অনাড়ম্বর কথাগুলোর মধ্যেই শোভনলাল নূতন মানে খুঁজে পেত। সে কখনও লিখত না আমি ভাল আছি। লিখত আমার শরীরটা ভাল আছে। এর মধ্যে অনেক নিগূঢ় ইঙ্গিত পেত শোভনলাল। 'শরীরটা ভাল আছে,' মানেই মনটা ভাল নেই, মন কেমন করছে। একথা তো লেখা যায় না। লিখত, আপনি কোলকাতায় কলেজে অনেক বন্ধুবান্ধব পেয়ে আনন্দেই আছেন নিশ্চয়। কখনও লেখেনি, আমাকে বোধহয় ভুলে গেছেন। ওটুকু উহ্য থাকত কিন্তু তা বুঝতে শোভনলালের অসুবিধা হত না। সুজাতার অনুক্ত কথাগুলিই বেশী অর্থ বহন করত শোভনলালের কাছে। শোভনলালের মনে হত যেটুকু ও বলেনি সেটুকু যেন আরও ভাল করে বলা হয়েছে। বললে. সব ফুরিয়ে যেত। না বলাতে অসীম অনন্তের পর্য্যায়ে গিয়ে পড়েছে সেটা। সীমা নেই শেষ নেই। সুজাতার ছোট ছোট চিঠিগুলো কতবার যে পড়েছে শোভনলাল তার ঠিক নেই। প্রতিবারেই নূতন একটা অর্থ আবিষ্কার করেছে। একটা চিঠিতে লিখেছিল—'পড়াশোনার কোনও ব্যাঘাত হচ্ছে না আশা করি।' এর মধ্যে যে নীরব ব্যঙ্গটা ছিল তা খুব উপভোগ করেছিল শোভনলাল। সুজাতার চিন্তাতেই তন্ময় হয়ে গেল শোভনলাল। সন্ধ্যার অন্ধকারে, ঝিঁ ঝিঁ পোকার অশ্রান্ত ঝনৎকার, আকাশের কালো কালো মেঘ আর তার ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা তারা স্তূপীকৃত অন্ধকারের মতো ওই বিরাট বটগাছটা সব যেন সুজাতা-ময় হয়ে উঠল। শোভনলালের মনে হতে লাগল—এই যে অন্ধকার এ তো সুজাতারই জীবনব্যাপী অন্ধকারের মতো। এই অশ্রান্ত ঝিল্লীর ঝঙ্কার—এ তো আমরা রোজই শুনি, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত আকুতি অনুভব করি কি? সমস্ত অন্ধকারকে যে বাণী স্পন্দিত করছে তার মর্মন্তুদ মর্ম কি আমরা বুঝতে চেষ্টা করি? সুজাতাকে কি আমরা বুঝেছি? মেঘের মাঝে মাঝে দুএকটি উজ্জ্বল তারার মত তার কচিৎ দীপ্ত আনন্দ-প্রকাশকে কি আমরা মূল্য দিতে পেরেছি? ওই ঘনীভূত অন্ধকারের ভিতর যে এক

প্রাণবন্ত বটগাছ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, যার শিরায় উপশিরায় প্রাণ-প্রবাহ, যার পাতায় কিশলয়ে আনন্দের উন্মুখতা, যার নীরব সত্তায় প্রচ্ছন্ন উৎসবের সমারোহ তাকে আমরা চিনেছি কি? চিনিনি। সুজাতাকেও চিনিনি। সুজাতা একবার বলেছিল, 'আমাদের স্বাধীনতা কাগজে কলমে। আমাদের চারিধারে যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া হয়ে আছে, তার রংটা মাঝে মাঝে বদলেছে হয়তো, কিন্তু দেওয়ালটা ভাঙেনি। তা আগেকার মতোই দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে আছে।' সুজাতার মা মারা যাওয়াতে প্রাচীরটা আরও দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে। সুজাতার মা শোভনলালকে ভালবাসতেন। তাঁকে বললে, তিনি হয়তো রাজী হতেন। বৈদ্য-ব্রাহ্মণে বিয়ে তো আজকাল কত হচ্ছে। কিন্তু তাঁকে বলবারই সুযোগ পায়নি শোভনলাল। হঠাৎ মারা গেলেন তিনি হার্টফেল করে। তারপর সুজাতার বাবা বদলি হয়ে এলেন বিহারে। শোভনলালও চেষ্টাচরিত্র করে বিহারে এল। কারণ সুজাতার কাছ থেকে দূরে থাকা অসম্ভব ছিল তার পক্ষে। কোলকাতাতেও বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হত, এখানেও বাড়ি ভাড়া করেছে। এখানে বাড়ি ভাড়া কম। বেশী হলেও শোভনলাল আসত। তার কোন বাধা নেই, কারণ কোনও বন্ধনই নেই তার। বাপ মা ভাই বোন তো নেই-ই, পেশা বা চাকরির বন্ধনও নেই। সে কবি, লেখক। বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স না থাকলে অকূলপাথারে পড়ত। কিন্তু পড়েনি। সুজাতার বাবা বেহারে আসবার ছ' মাস পরে শোভনলাল এসেছিল। এসেই গিয়েছিল সে সুজাতাদের বাড়ি। গিয়ে দেখল সুজাতার বাবা বিয়ে করেছেন। আর বিয়ে করেছেন অমিতাকে। অমিতা শোভনলালের সহপাঠিনী ছিল। শুধু তাই নয়, তার প্রেমে পড়েছিল। তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। অমিতার লেখা অনেক চিঠি অনেক দিন সে রেখে দিয়েছিল সুজাতাকে দেখাবে বলে। কিন্তু সে সুযোগ হয়নি। পুড়িয়ে দিয়েছে চিঠিগুলো। সেই অমিতা যে সুজাতার সৎমা এবং অভিভাবিকা হয়ে দাঁড়াবে তা কে কল্পনা করেছিল! এখানে এসে প্রথমে যখন সে সুজাতার বাড়ি গিয়েছিল, তখন অমিতাকে দেখে চমকে উঠেছিল। অমিতাও উঠেছিল নিশ্চয়। কিন্তু বাইরে সে ভাব প্রকাশ করেনি। শোভনলালকে দেখে আধ-ঘোমটা দিয়ে ভিতরের দিকে চলে গিয়েছিল সে। যেন চেনে না, যেন কখনও দেখেনি। শোভনলালও আর বেশীক্ষণ থাকতে পারেনি সেখানে। সুজাতার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাবটা সে করেছিল পত্রযোগে। যে উত্তরটা এসেছিল, তা এখনও মনে আছে শোভনলালের—

প্রিয় শোভনলাল,

তুমি শিক্ষিত। তোমার নিকট এ পত্র প্রত্যাশা করি নাই। তোমাকে নিজের ছেলের মতো স্নেহ করি; সুজাতাকেও তুমি নিজের ভগ্নীর মতো দেখিবে ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। তাছাড়া সুজাতা ব্রাহ্মণ-কন্যা, তুমি বৈদ্য। বৈদ্যরা নিজেদের আজকাল ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সমাজে এখনও তাহা স্বীকৃত হয় নাই। সুজাতার মা, যদিও তাহার সৎমা, কিন্তু সে প্রকৃতই তাহার হিতাকাঙ্ক্ষিণী, সে এ বিবাহে কিছুতেই রাজি হইবে না। তাহাকে তোমার পত্র দেখাইয়াছিলাম, সে বলিল, যদি এ বিবাহ দাও আমি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। সুজাতার মা আর একটা কথাও বলিয়াছে তোমার মনের ভাব যখন এইরূপ তখন তোমার আমাদের বাড়িতে না আসাই ভালো। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ভগবান তোমাকে সুমতি দিন। ইতি—

আশীর্বাদক

শ্রীহরানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সত্যিই প্রাচীরটা দুর্লঙ্ঘ্য। অমিতা আসাতে আরও দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে। অমিতা যে কেন এত হিতাকাঙ্ক্ষিণী হয়েছে তা শোভনলালের বুঝতে দেরি হয়নি। অমিতা যদি না থাকত তা হলে হরানন্দবাবুকে হয়তো রাজি করতে পারত। হরানন্দবাবুর সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল ঝাউ-কুটির মাঠের ধারে। ওই নির্জন জায়গাটায় শোভনলাল রোজ বেড়াতে যায়। ঝাউ-কুটি একটা প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়ি। খাপরায় ছাওয়া, বাংলো ধরনের। চারদিকে বড় বারাণ্ডা, লম্বা লম্বা সিঁড়ির সারি আর চারদিকে প্রকাণ্ড হাতা। জায়গাটা বড় ভালো লাগে শোভনলালের। রোজ বিকেলে বেড়াতে যায় সেখানে। সুজাতাকে একদিন ফোনে সে বলেছিল 'আমার তো তোমার বাড়ি যাওয়ার উপায় নেই। তুমি একদিন কোনও ছুতো করে ঝাউ-কুটিতে এস না, তোমাকে অনেকদিন দেখিনি।' সুজাতা আসতে রাজি হয়নি। তার দিন দুই পরে হরানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঝাউ-কুটির মাঠে। গভর্নমেন্ট নাকি বাড়িটা কিনতে চান, গভর্নমেন্টের তরফ থেকে তিনি বাড়িটা দেখতে এসেছিলেন।

'কি শোভন এখানেই আছ এখনও?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'কতদিন থাকবে?'

'বরাবরই থাকব।'

উত্তরটা শুনে একটু থমকে গেলেন হবানন্দবাবু।

তারপর জিগ্যেস করলেন, 'তোমার মাথা ঠিক হল?'

সবিনয়ে উত্তর দিয়েছিল শোভনলাল—'আমার মাথা তো কখনও খারাপ হয়নি। আমি আপনাকে যা লিখেছিলাম তা বাজে কথা নয়। আমি সুজাতার জন্যে সারাজীবন অপেক্ষা করব। আপনারা যদি সহজ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতেন, আমার উপর রাগ করতেন না।'

হরানন্দবাবু কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। তারপর বললেন, 'সুজাতাকে আমি জিগ্যেস করেছিলাম, তার অমত নেই। যা যুগের হাওয়া তাতে আমিও শেষ পর্যন্ত হয়তো রাজি হতুম, কিন্তু মুস্কিল হয়েছে সুজাতার মাকে নিয়ে। তোমাকে যে চিঠি লিখেছিলাম তা ওঁরই ডিক্‌টেশনে। ও বলেছে এ বিয়ে হলে হয় বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, না হয় গলায় দড়ি দেবে। এ অবস্থায় কি করি বল। অপেক্ষা কর, দেখা যাক যদি ওর মত বদলায়।

শোভনলাল জানে মত বদলাবে না। আর এ-ও জানে হবানন্দবাবু বৃদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্যার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবেন না।

...সুজাতার কথাই ভাবতে লাগল শোভনলাল। হঠাৎ একবার তার মনে হল পিছন দিকে কে এসে দাঁড়াল যেন। সে-ও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কই, কেউ নেই। আবার বসল। হু হু করে কনকনে হাওয়া বইছে। তবুও বসে রইল সে। একটু পরে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। আবার উঠে দাঁড়াল শোভনলাল। টর্চ ফেলে ফেলে দেখল চারিদিকে। কেউ নেই। কুকুরটা খানিকক্ষণ ডেকে থেমে গেল। তারপর ডাকতে লাগল পেঁচাগুলো। কর্কশকণ্ঠে কি একটা যেন বলতে চাইছে তারা, শোভনলাল বুঝতে পারল না। একটু পরে মনে হল ওরা যেন বলছে—দেখছ না, দেখছ না, দেখছ না। কি দেখবে? অন্ধকার ছাড়া কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। ক্লান্ত হয়ে গা এলিয়ে দিলে সে ইজিচেয়ারটার উপর। কিন্তু তার মনে হতে লাগল কে যেন তার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিঃশব্দ সঞ্চরণে কার আভাস যেন পাওয়া যাচ্ছে, চুলের মৃদু গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে যেন। আবার সব থেমে গেল। অসাড়ের মতো পড়ে রইলো শোভনলাল।

... ফোনটা বেজে উঠল আবার।

তাড়াতাড়ি ছুটে ঘরের মধ্যে চলে গেল শোভনলাল।

'হ্যালো, কে, সুজাতা? ও, সুজাতা—কি খবর?'

'আপনি একবার আসুন। এবার এলে দেখা হবে—'

কোন সুদূর থেকে যেন ভেসে আসছে—সুজাতার স্বর।

'তোমাদের বাড়িতে যাব?'

'না, ঝাউ-কুটিতে। আপনি একদিন যেতে বলেছিলেন, তখন যেতে পারিনি। আজ এসেছি। আপনি আসুন—'

'এত রাত্রে ঝাউ-কুটিতে কি করে গেলে—'

'আসুন, এলে বলব।'

ঝাউ-কুটিতে গিয়ে শোভনলাল দেখল, সিঁড়ির উপর সুজাতা বসে আছে। একা। প্রথমে দেখতে পায়নি। টর্চ জ্বালবার পর দেখা গেল।

'সুজাতা?'

'হ্যাঁ। এইবার আমার চারদিকের দেওয়ালগুলো ভেঙে গেছে, আমি মুক্তি পেয়েছি—আর কোন বাধা নেই।'

টর্চের আলোতে শোভনলাল দেখতে পেল সুজাতার চোখে-মুখে আনন্দ ফুটে উঠেছে।

'মুক্তি পেয়েছ মানে?'

'মুঙ্গের গিয়েছিলাম। একটু আগে মারা গেছি বাড়ি চাপা পড়ে। এখানে ভূমিকম্প হয়নি?'

'হয়েছিল—'

'আপনি, তাহলে—'

'না, আমার কিছু হয়নি। আমি বেচে গেছি—'

'তাহলে তো আপনার দেওয়াল ভাঙেনি। আমরা তাহলে মিলব কি করে?'

হাত দুটো বাড়িয়ে দিলে সুজাতা। শোভনলাল ধরতে গেল, কিন্তু ধরা গেল না। সব হাওয়া, সুজাতা অশরীরী।

'আমরা তাহলে মিলব কি করে? আমার সব দেওয়াল তো ভেঙে গেছে। কিন্তু আপনার তো ভাঙেনি। মিলব কি করে—'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সুজাতা।

'তুমিই বল কি করে মিলব। তুমিই আমাকে বলে দাও সুজাতা—'

'ওই যে। লাফিয়ে পড়ুন ওর মধ্যে। ভেঙে ফেলুন দেওয়াল—'

সুজাতা আঙুল দিয়ে প্রকাণ্ড বড় সেকেলে ইঁদারাটা দেখিয়ে দিলে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শোভনলাল।

'আসুন—'

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সুজাতা ইঁদারাটার দিকে। শোভনলালও অনুসরণ করতে লাগল তাকে যন্ত্রচালিতবৎ।

ইঁদারার ধারে এসে সুজাতা বললে—'লাফিয়ে পড়ুন। ভেঙে ফেলুন দেওয়াল, দূর করে দিন সব বাধা—'

শোভনলাল কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর লাফিয়ে পড়ল।

বনের হরিণ ছিল বনে

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সাঁওতাল দেখেছ? সাঁওতালদের বস্তি?

কোনদিন দেখো নি, না? চল, আজ তোমায় দেখাব। এস আমার সঙ্গে

ওই যে দূরে দেখছ প্রকাণ্ড ওই পাহাড়, আর ওই যে দেখছ সবুজ গাছের সারি—সারা দক্ষিণ দিকটা জুড়ে সোজা চলে গিয়ে ওই আকাশটাকে ছুঁয়েছে, ওই জঙ্গলের ভেতর পাহাড়ের নীচে আছে সাঁওতালদের ছোট ছোট গ্রাম।

ছোট্ট একটি নদী পেরোতে হবে। নদীতে জল অবশ্য এখন নেই, এখন আছে শুধু শুকনো বালি। কিন্তু বর্ষাকালে একবার এসে দেখো—দু কূল ছাপিয়ে বানের জল ঠিক তীরের মত সোঁ সোঁ করে ছুটে চলেছে। বানের তোড় না কমলে পারাপার বন্ধ।

জঙ্গলের এই গাছগুলোর নাম জান?

শহরের মানুষ। কেমন করেই বা জানবে! এই শাল, আর এই মহুয়া। এখানে এই শাল-মহুয়াই বেশী।

কিসের ওই মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছ বল দেখি? শালফুলের গন্ধ। আর কয়েকটা দিন পরেই মহুয়ার ফুল ফুটবে। তখন যদি একবার এই বনের ভেতর ঢোক তো সহজে আর বেরোতে চাইবে না। শালফুলের গন্ধ বেশ মিষ্টি, কিন্তু মহুয়াফুলের গন্ধ বড় তীব্র। মগজের ভেতর ঢুকে মানুষকে যেন পাগল করে দেয়। দেখেছ কত রঙ-বেরঙের প্রজাপতি ঘুরে বেড়াচ্ছে?

ওই তো কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছি। আর-একটুখানি।

ওই শোন মাদল বাজছে, বাঁশি বাজছে। গান আরম্ভ হয়েছে। বাঃ, বেশ ভাল সময়েই এসেছ। ওদের নাচ দেখতে পাবে।

এই তো এসে গেছি।

প্রকাণ্ড একটা বটগাছের নাবাল ধরে একটা সাঁওতাল মেয়ে দোল খাচ্ছিল দোল খাচ্ছে আর গান গাইছে মেয়েটা—

"বনের মাথায় সোনার আলো
আকাশের একদিকে মেঘ উঠেছে
আমার দোলনা দুলছে
আমি আর গাঁয়ে ফিরবো না
হেঁইয়া হো ! হেঁইয়া হো !"

গানের ভাষা আলাদা, ছন্দে বাঁধা গ্রাম্য সাঁওতালী গান।

হো হো বলে নিজের পা দিয়ে জোরে ঠেলা মারতেই নাবালটা উঠে গেল ওপরে, আবার নেমে এল, আবার উঠল।

ভারি মজা লাগছিল মেয়েটার। দুলছে আর হাসছে।

সুন্দরী মেয়ে। সাঁওতালের মেয়ে সুন্দরী বলতে যা বুঝায় মেয়েটা তাই। কালো গায়ের রং, শরীর নিটোল, যৌবন যেন ফেটে পড়ছে তার সর্ব অঙ্গ দিয়ে।

দূরে স্নিগ্ধ শ্যামল তরুছায়াচ্ছন্ন কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড়ে-ঘেরা তাদের গ্রাম দেখা যাচ্ছে। গ্রাম মানে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাঁওতালের বস্তি।

মেয়েটির মাথার চুল উড়ছে, শাড়ির আঁচল উড়ছে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে মুকরিকে। মুকরি এই দোলন দোলায় এমনি তন্ময় হয়ে ছিল—সে দেখতে পায় নি, তার কাছেই এসে দাঁড়িয়েছিল একজন বাঙালী বাবু। গায়ে হাতকাটা জামা, ফরসা কাপড় আর হাতে একটা লাঠি।

মুকরির সেদিকে চোখ পড়তেই বলে উঠল, ও কারিন তুহিন কানা? (কোথায় থাকিস তুই ?)

লোকটা সাঁওতালী ভাষা জানে না। কাজেই চুপ করে ফ্যালফ্যাল করে সে তাকিয়ে রইল মুকরির দিকে। তারপর হাতের ইশারায় কোন রকমে বুঝিয়ে দিলে যে সে যদি তাকে তাদের গ্রামে নিয়ে যেতে পারে তো খুব ভাল হয়।

হাটের দিনে দূরের একটা গ্রামে তাদের 'সওদা' করতে যেতে হয়। বাঙালী দোকানদার লোকজনের সঙ্গে তাদের হরদম কারবার। কাজেই এখানকার সাঁওতালরা সবাই একটু আধটু বাংলা জানে। বলতেও পারে ভাঙা ভাঙা বাংলা।

মেয়েটা হেসে উঠল। ভারি সুন্দর হাসি মেয়েটার। সুন্দর দাঁত গুলি দেখা গেল, চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, তুদের বাংলা আমি জানি।

বলেই গাছের নাবাল ছেড়ে দিয়ে বললে, আর আমার সঙ্গে।

মুকরি আগে আগে যাচ্ছে, বাঙ্গালী ছোকরাটি যাচ্ছে তার পিছু পিছু।

মুকরি পেছন ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, কার ঘরকে যাবি?

ছোকরাটি বললে, তুদের গাঁয়ে মুরুব্বি-মাতব্বর লোক কেউ নাই? তার ঘরকে নিয়ে চল্। আমি কে জানিস?

মুকরি আবার হাসলে। লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে ছুটে চলছিল সে। গাছের একটা পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললে, যেই হোস্ না আমার কী?

—আমি পুলিসের লোক।

পুলিসের নাম শুনে মুকরির মুখের হাসিটা বন্ধ হয়ে গেল। কারণ সে জানে এই পুলিসের জ্বালায় এ-গাঁয়ের অনেকের মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেছে। মুকরি তার মুখের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলে। তারপর বললে, ও।

বলেই আবার চলতে লাগল।

পুলিস!

মুকরি চলতে চলতেই বললে, তুর্ পাগুড়ি কই?

লোকটি বললে, আছে। পরি নাই।

মুকরি বললে, তুরা ভারি বজ্জাত কিন্তু।

বলেই ফিক করে হাসলে।

লোকটি বললে, কেন? বজ্জাতি করেছে নাকি কেউ তুদের সঙ্গে?

—করে নাই? সে-বছর দশজনকে ধরে নিয়ে চলে গেল। তারা আর ফিরে এল নাই। সবাই বলছে চা-বাগানে চালান করে দিয়েছে।

কথাটা সত্যি। পুলিস বলে এসেছিল একটা লোক। আসলে কিন্তু সে পুলিস নয়। চা-বাগানের রিক্রুটার। আড়কাঠী বলে এরা। এখান থেকে সে অনেক লোভ দেখিয়ে কুলি সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে।

এ-ও কিন্তু সেই দলেরই একজন। কয়লাকুঠির রিক্রুটার। এসেছে কুলি কামিন সংগ্রহ করতে। এরা পুলিস বলে এসে ঢোকে, তারপর নিজের মূর্তি

পরিগ্রহ করে। তার কারণ, অনেক জায়গায় গিয়ে দেখেছে সে—পুলিসকে এরা ভয় করে, দুটো কথা বলে সমীহ সম্মান করে কিন্তু আড়কাঠীকে সহজে আমল দেয় না।

একটি গাছের তলায় ছোট একটি ঘর। ঘর না বলে কুঁড়ে বললেই চলে। মুকরি তাকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে গাছের ছায়ায় দড়ির একটা খাটিয়া বিছিয়ে দিয়ে বললে, বোস এইখানে। আমি ডেকে আনছি।

লোকটি বসলো। বসে বললে, তুর নাম কি?

মুকরি বললে, আমার নাম জেনে তুর কি হবেক? আমার নাম মুকরি আছে। ইটি আমার ঘর বটে। আমার আর কেউ নাই। আমি একাই থাকি।

—তুই খাস্ কি করে?

—আমাদের আবার খাবার ভাবনা! মুকরি বললে, আমাকে সবাই ভালবাসে। সবাই খেতে দেয়।

লোকটি বললে, অমন করে এর ওর বাড়ি খেতে তুর্ ভাল লাগে? চল্, কয়লা খাদে চল্। সেখানে দেখবি কত টাকা, কত সুখ! যাবি?

মুকরি তার কাছ থেকে চট্ করে একটু দূরে সরে গেল। ইখারে বুঝে নিয়েছি তুঁই পুলিস লোস্, তুঁই আড়কাঠী বেটিস্।

এই বলে হাসতে হাসতে সে চলে যাচ্ছিল। লোকটি চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, যাবি কিনা বললি না তো?

—দূর মুখপোড়া! আমি কুন্ দুঃখে যাব খাদে খাটতে? আর কেউ যায় তো ছাখ। আমি সর্দারকে ডেকে দিচ্ছি।

মুকরি চলে গেল। লোকটি তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, আমি আড়কাঠী নই, আমি পুলিস।

নতুন লোক দেখে জনকতক সাঁওতাল ছেলে এসে দাঁড়াল সেখানে। সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলে, কে বেটিস্ তুই?

—আমি পুলিস।

ছেলেগুলো পুলিসের নাম শুনে ছুটে পালাল। যাবার সময় হাত তালি দিতে দিতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে গেল, ওরে পুলিস রে। মুকরিকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। পালা সব পালা।

সরল বিশ্বাসী এই সব সাঁওতাল। এরা মিথ্যা কথা বলে না, মিথ্যাচার করে না। আর কেউ যে করতে পারে সে-কথাও সহজে বিশ্বাস করতে চায় না।

পুলিসের নাম শুনে সর্দার এলো একটি পাকা কাঁঠাল হাতে নিয়ে। খালি হাতে পুলিসের সঙ্গে দেখা করা উচিত নয়। একে পুলিস, তার ওপর অতিথি।

অতিথি সৎকার করা তাদের ধর্ম।

কাঁঠালটি তার পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে সর্দার হাত জোড় করে বললে, লে বাবু খা। তা বাদে বল্ কি জন্যে এসেছিস?

লোকটি তার পকেট থেকে একটা খাতা আর একটা পেন্সিল বের করে বললে, তুই সর্দার?

—হুঁ গ, আমি সর্দার আছি।

—সোনা কোথা? যমুনা আর লখাই। সবাইকে আমি ধরে নিয়ে যাব।

সর্দার জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

—ওদের নামে ওয়ারেণ্ট আছে।

সর্দার জিজ্ঞাসা করলে, কি করেছিল উয়ারা?

—কাঠ কেটেছিল রাজার জঙ্গলে।

—উখানে কাঠ তো আমরা কাটি না। আমরা হোই পাহাড় থেকে কাঠ আনি।

লোকটি বললে, তা বেশ, ওখানে গিয়ে ওরা বলবে সেই কথা। বললেই ছেড়ে দেবে।

সর্দার বললে, ছাখ্ বাবু, ছেড়ে দিবেক তো? ই-গাঁয়ের পাঁচজন জোয়ান সাঁওতাল সেই যে গেইছে আর আইসে নাই।

লোকটি বললে, আমি বলছি ছেড়ে দেবে।

সর্দার ডাকলে, হেই মুকরি। ডাক সোনাকে।

—আর যমুনা? আর লখাই?

—আমি দেখছি উয়াদের।

এই বলে সর্দার উঠে গেল। উঠে গেল বোধহয় যমুনা আর লখাইকে ডাকতে। আর মুকরি গেল সোনাকে খুঁজতে।

সাঁওতালদের একটা ছেলে দাঁড়িয়েছিল, লোকটি তাকে কাছে ডাকলে। ডেকে বললে, কাঁঠালটা ভাঙ্। বলে বসে কী করব, খাই।

পাকা কাঁঠালটা তক্ষুনি ভেঙে দিলে ছেলেটা। লোকটি পেট ভরে খেলে যতগুলো পারলে। কিন্তু একটা কাঁঠাল খাবার সাধ্য তার ছিল না। বাকীটা সেই ছেলেটার হাতে তুলে দিয়ে বললে, যা খেগে যা।—হাঁ রে, জল দিতে পারিস এক গ্লাস?

সাঁওতাল ছেলেটা বললে, জল তুঁই খাবি আমাদের ঘরে?

খেতে আপত্তি তার ছিল না। কিন্তু না খেলেই বোধকরি খাতিরটা বাড়বে। তাই বললে, জল তোরা খাস্ কোথেকে?

—চল তুখে সেইখানে নিয়ে যাই। এই কাছেই বেটে।

ছেলেটির পিছু পিছু সে জল খেতে গেল। ছোট একটা পাহাড়ের তলায় ছায়াঘেরা একটি তমাল গাছের নিচে পাথর দিয়ে বাঁধানো ছোট্ট একটুখানি জায়গা—স্ফটিক জলে ভরা।

ছেলেটা বললে, ওই পাথরে বসে বসে জল খা কেনে কত খাবি।

—এই জল তোরা খাস্?

—হুঁ, খাই।

লোকটি জিজ্ঞাসা করলে, এই টুকু তো জল। এ জল যখন ফুরিয়ে যাবে?

ছেলেটা বললে, ফুরোলেই হল! ইটো তো ঝরনা। যত লিবি লে কেনে। উ জল অমনিই থাকবেক্।

লোকটি জল খেয়ে যেই উঠে দাঁড়িয়েছে, দূরে কারা যেন ঝগড়া করছে শুনতে পেল। সাঁওতালী ভাষা বুঝতে পারছিল না, কিন্তু কথাগুলো তার কানে আসছিল ঠিক। যে-ছেলেটা তাকে ঝরনা দেখাবার জন্য এখানে নিয়ে এসেছিল সে তখন পালিয়েছে।

লোকটি চেঁচিয়ে উঠল, কে ওখানে?

ঝোঁপের আড়াল থেকে দুটো মাথা উঠে দাঁড়াল। মুকরি আর সোনা!

—তোরা এখানে?

সর্বনাশ! মুকরি ভাবে নি যে, সে এমন ভাবে ধরা পড়ে যাবে লোকটার কাছে।

ধরা যখন পড়েইছে, তখন এগিয়ে আসতে দোষ কি?

এগিয়ে তারা এল এবং ঝগড়ার ব্যাপারটা সবই তাকে খুলে বললে।

মুকরি বললে, তুঁই এগুতে বল্, তুঁই কে?

লোকটি বললে, আমি পুলিস।

—মিছে কথা। তুরা ভারি মিছে কথা বলিস। চল সোনা, আমরা পালাই।

সোনার হাত ধরে মুকরি তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, লোকটি বললে, সোনা কোথা যাচ্ছ?

—যেথানেই যাক্, তুর্ কি?

—সোনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবেক্।

—না গেলেই নয়! তুই যদি পুলিস হোস্ তো উ পালাবেক।

লোকটি বললে, যেথানেই যাক্, ধরে আনব।

মুকরি বললে, ভারি মরদ? বনের বাঘকেও জানবি উয়াকেও জানবি। উ যদি পালায় তো তুঁই তো তুঁই, তুর্ বাপ লারবেক্ উয়াকে ধরতে।

—আর যদি আমি আড়কাঠী হই?

মুকরি বললে, তা হলে সোনা বলছে উ যাবেক তুর সঙ্গে।

—আর তুই?

মুকরি বললে, ও যদি যায় তো আমাকেও যেতে হবেক্।

মুকরি মুখ নিচু করে লজ্জায় সেথান থেকে ছুটে পালাচ্ছিল, লোকটি বললে, শোন্ শোন্ আমি পুলিস নই, কয়লাথাদের আড়কাঠী।

মুকরি আর সোনা দুজনেই চলে এল কয়লাকুঠিতে।

এমনি অযাচিত ভাবে আড়কাঠীর সঙ্গে চলে আসাটা কম আশ্চর্যের নয়। লোকটি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিল—কেন এল তারা।

মুকরি সব কথাই তাকে খুলে বলেছিল। মুকরি সোনাকে ভালবাসে। তারা বিয়ে করতে চায়। কিন্তু সর্দার কিছুতেই রাজি নয়! কারণ সোনার বাবা নাকি কী একটা বিশ্বাসঘাতকের মত কাজ করেছিল, তার জন্যে তার শাস্তি হয়েছিল—তার বংশের কেউ এ গ্রামের কোনও ছেলেকে বা মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না। সোনার ভাই বোন কেউ নেই, সোনার বাবাও মরে গেছে। সোনা একা। মুকরিও একা। তবু সর্দারের ইচ্ছে নয় যে বিয়ে

হোক। কারণ পূর্ববর্তী সর্দারের হুকুম মান্য করতে সে বাধ্য। এর জন্যে সোনা তাকে কম খোশামোদ করে নি। কিন্তু সাঁওতালেরা যা বলে তা করে। কাজেই সোনা চেয়েছিল গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে। মুকরিকে বলেছিল, তুইও চ। মুকরি কিন্তু এ-গ্রাম ছেড়ে যেতে চায় নি। এরই জন্যে হচ্ছিল তাদের ঝগড়া।

এখন মওকা মিলে গেল, তাই চলে এল কয়লাকুঠিতে।

ওদিকে যমুনা আর লখাই-এর আশা রিক্রুটারকে ছেড়ে দিতে হল। পুলিসের নাম শুনেই তারা উধাও।

কয়লাকুঠিতে এসে দিনগুলো তাদের মন্দ কাটছিল না।

মুকরি কাজ করছিল ডিপোতে, আর সোনা কয়লা কাটছিল খাদের নিচে। সেখানকার সর্দারকে বলেছিল সোনা, আর কয়েকটা দিন যাক, আমরা টাকা জমাচ্ছি। মুকরিকে বিয়ে করব।

দিনকতক পরে—মুকরি তখন গাড়িতে কয়লা বোঝাই দিচ্ছিল, হঠাৎ একজন চাপরাসী এসে তাকে বললে—আয় তুই আমার সঙ্গে। সাহেব ডাকছে।

—দূর মুখপোড়া—সাহেব আমাকে কি জন্যে ডাকবেক্।

সোনার সঙ্গে তার প্রণয় ঘটিত ব্যাপারটা এরই মধ্যে সব জানাজানি হয়ে গেছে। চাপরাসী বললে, সোনা রইছে সাহেবের কাছে বসে।

সোনার নাম শুনে মুকরি আপত্তি করলে না যেতে।

গিয়ে কিন্তু বিপদে পড়ল। সাহেব মদ খেয়ে চুর হয়ে বসেছিল। তার বাংলোর ভেতর মুকরি গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কোথায় সোনা?

সাহেব বললে, সোনা? Gold? You are gold.

এই বলে সাহেব তার একখানা হাত চেপে ধরলে। বললে, ভাল মদ খেয়েছিস কখনও? আয় মদ খাবি।

মুকরি বললে, মদ আমি খাই না। ছাড়্!

হাতটা সে টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করলে, কিন্তু অসুরের মত দানবটার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া বড় সহজ নয়। টানাটানি করে ছাড়াতে পারলে না কিছুতেই।

সাহেব তখন বাঁ হাতটা বাড়িয়ে মুকরিকে ধরতে গেল।

মুকরি সাঁওতালের মেয়ে। রাগলে আর রক্ষে নেই। চট্ করে ডান হাতটা শক্ত করে সাহেবের পেটে মারলে এক ঘুষি।

সাহেব যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল, My God.

বলেই সে পেটে হাত দিয়ে বসে পড়ল।

মুকরি ছুটে পালিয়ে গেল বাংলো থেকে। সোজা একেবারে তাদের ধাওড়ায়। শুনলে, সোনা এখনও আসে নি। ছুটল খাদ-মোহনায়। টাইমবাবু খাতা খুলে বললে, চলে গেছে হাজরি নিতে। মুকরি ছুটলো হাজরি ঘরে। ধরলে সোনাকে। বললে এখানে আর নয়। চল্ পালাই।

সব কিছু শুনে রাগে সে ফুলতে লাগল—বললে, পালাব! সাঁওতালের বাচ্চা আমি। যে হাত দিয়ে সাহেব তুখে ধরেছিল সেই হাতটো দিয়ে আসি ভেঙে।

মুকরি বললে, না চল্। আমাদের গাঁয়ে চলে যাই।

সোনা গ্রামে ফিরে যেতে রাজী হল না কিছুতেই।

কয়লাকুঠির অভাব নেই এখানে।

দূরের একটা কুঠিতে গিয়ে আশ্রয় নিলে তারা।

কাজ করবার আগেই মুকরি সর্দারকে জিজ্ঞাসা করলে—এখানকার সাহেব কেমন সর্দার?

সর্দার বললে, বুঝেছি তোরা বাগাজোড়া থেকে এসেছিস।

—কেমন করে জানলি?

—ওখানকার সাহেবটা অমনি। এখানে থাক্ তোরা, কুমু ভাবনা নাই।

ওদিকে কিন্তু বাগাজোড়া কোলিয়ারীর ম্যানেজার সাহেব মুকরির হাতের মার ভুলতে পারলে না। তক্ষুনি লোক পাঠালে মুকরিকে খুঁজতে।

কোথায় মুকরি? মুকরিও নেই, সোনাও নেই।

সাহেব তবু নিশ্চিন্ত হল না।—যেখানে পাও খবর এনে দাও। পঁচিশ টাকা বকশিশ পাবে।

খোঁজ মিলল দশদিন পরে।

সিজারন কুঠির তিন নম্বর ধাওড়ায় সেদিন তাদের বিয়ে।

জন পঁচিশেক বসেছিল একসঙ্গে। মদ খাচ্ছে আর গান গাইছে। সোনাও বসেছে, মুকরিও বসেছে একপাশে।

সিজারনের ম্যানেজার সাহেবের বাংলোটা এ ধাওড়ার কাছেই।

সাহেবের একজন খানসামা এসে বললে, তোরা গানবাজনা থামাবি?

—কেনে?

—সাহেব ঘুমোতে পারছে না।

মুকরি বলে উঠলো, বাহারে, সাহেবের কুকুরটা যে ঘেউঘেউ করে চেঁচাচ্ছে, তার বেলায়?

খানসামা বললে, সাহেবের কুকুর চেঁচাবে, তাই বলে তোরাও চেঁচাবি নাকি?

—আমরা গায়েন করছি। যা বল্‌গা তুদের সাহেবকে। গায়েন আমরা থামাব না!

খানসামা চলে যেতেই মুকরি সোনার কাছে গিয়ে বসল। বললে, দ্যাখ্‌, সাহেবগুলা সবাই সমান। এখান থেকেও পালাতে হবেক্ দেখছি।

সোনা বললে, এখন আর ভাবি না। আমাদের বিয়ে হঁয়ে গেইছে।

আবার তাদের গান বাজনা চলতে লাগল।

হঠাৎ একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল ধাওড়ার কাছে। গাড়ি থেকে নামল একটা লোক আর তার পেছনে বাগাজোড়া কোলিয়ারীর সেই মাতাল ম্যানেজার। ম্যানেজার সাহেবের হাতে একটা চাবুক।

মুকরির বিয়ের আসরে যারা গান-বাজনা করছিল তারা এদের দেখতে পায় নি। অতর্কিতে সাহেব একেবারে মুকরির কাছে এসে দাঁড়াল। ডাকলে, মুকরি!

মুকরি মুখ তুলে তাকাতেই সাহেবের হাতের চাবুক এসে পড়ল তার গায়ে।

গান্‌-বাজনা তখন থেমে গেছে। সাহেব দেখে জনকতক সাঁওতাল ছুটে পালিয়ে গেল। পালাতে পারলে না তাদের সর্দার। সর্দার এগিয়ে যখন এল, সোনা তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে সাহেবের ওপর। সাহেবের হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নিয়ে তার হাতটা দিয়েছে মুচ্‌ড়ে।

এ রকম ঘটনা যে ঘটবে সাহেব তা ভাবতে পারে নি। কারণ সাহেবের গায়ে হাত দেয় সে-রকম সাঁওতাল কুলি সে দেখে নি কখনও। তার জন্যে অবশ্য সে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। হাতের আঙুলগুলো পর্যন্ত নাড়তে পারছে

না, তবু তার সেই হাত দিয়েই প্যান্টের পকেট থেকে গুলিভরা রিভলভারটা বের করে বললে, খবরদার! একদম শেষ করে দেব।

চাবুকটা সাহেবের গায়ে চালাবার জন্যে সোনা তার হাতটা তুলেছিল, কিন্তু পিস্তল দেখে সে থেমে গেছে। সর্দার এসে দাঁড়িয়েছে সাহেবের সুমুখে। বলছে, বল্ সাহেব, তুর কি দরকার তাই বল্।

সাহেব ভাবলে রিভলভার দেখে ব্যাটারা ভয় পেয়ে গেছে। তাই সে পরিষ্কার বাংলায় বলে বসল, ওই মুকরিকে আমার চাই।

সোনা রিভলভারের ভয় করলে না, চাবুক হাতে নিয়ে এগিয়ে এল। বললে, আর একবার বল্ সাহেব! একটা হাত তো দিয়েছি ভেঙে—এইবার তোর মুখটা যদি আমি ভেঙে দিতে না পারি তো আমার নাম—

সর্দার বললে, থাম্ সোনা, চুপ কর্!

সোনা চেঁচিয়ে উঠল, না, চুপ করব না।

সাহেব বললে, alright—ডান হাত দিয়ে তখন সে রিভলভার ধরতে পারছিল না, বাঁ হাতে নিলে রিভলভারটা। বাগিয়ে ধরলে ভাল করে। বললে, মুকরি আমাকে অপমান করেছে তা জানিস?

—আর তুঁই কিছু করিস্ নাই, লয়?

সাহেব গর্জে উঠল, আমার মুখের ওপর এতবড় কথা?

বলেই সে সর্দারকে তার সুমুখ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিলে।

সোনা এতক্ষণ ছিল সর্দারের আড়ালে। এবার সাহেবের মুখোমুখি।

মুকরি চেঁচিয়ে উঠল, সরে আয় সোনা।

সোনা তাক করেছিল সাহেবের হাতের দিকে। ভেবেছিল, ডানহাতটা সাহেবের অকেজো হয়ে গেছে. এইবার ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁহাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নেবে। মুকরির দিকে না তাকিয়ে বললে, তুই সরে যা।

বলে সে সত্যি সত্যি ঝাঁপিয়ে পড়ে সাহেবের বাঁ হাতটা চেপে ধরে কেড়ে নিতে গেল রিভলভারটা। কিন্তু তার আগেই সাহেব তার বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে দিয়েছে রিভলভারটা চালিয়ে।

প্রচণ্ড একটা আওয়াজ হল। মুকরি ভাবলে সোনাকে দিলে মেরে। ছুটে এসে সোনাকে সে জড়িয়ে ধরলে।

গুলি কিন্তু সোনার গায়ে লাগে নি। সোনা তখন সাহেবের বাঁ হাতটা পেছন দিকে মুচড়ে ধরেছে। হাত থেকে পড়ে গেছে রিভলভারটা।

ঠিক সেই সময় পেছন থেকে সিজারনের ম্যানেজার-সাহেব ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালেন। ঘুম না হওয়া তার রোগ। গান-বাজনা থেমে গেছে বলে ভাল করে ঘুমোবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। এমন সময় রিভলভারের আওয়াজ হতেই ব্যাপারটা দেখবার জন্যে ছুটে এসেছেন ধাওড়ায়। দু জন খানসামা এসেছে তার পিছু পিছু।

সিজারনের সাহেব কিন্তু যে ব্যবহার করলেন তা একেবারে অপ্রত্যাশিত।

তিনি এসেই বাগাজোড়ার ম্যানেজার সাহেবকে দেখেই ইংরেজীতে বললেন, তাই তো বলি কে গুলি চালালে। মারতে এসেছো এখানে ?

বাগাজোড়ার সাহেব বললে, দ্যাখ, তোমার কুলিটার আস্পর্ধা দ্যাখ।

সিজারনের সাহেবকে দেখে সোনা তখন সাহেবের হাতটা ছেড়ে দিয়েছে। বাগাজোড়ার সাহেব তার রিভলভারটা বাঁ হাত দিয়ে তুলে নিয়ে পকেটে রাখলে।

সিজারনের সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, গুলিটা কারও গায়ে লাগে নি তো ?

বাগাজোড়ার সাহেব বললে, লাগলে ভাল হত। ব্যাটা আমার এই ডান হাতটা মুচড়ে দিয়েছে।

সিজারনের সাহেব বললেন, খুব ভাল করেছে। এমনি করেই তুমি একদিন মরবে ওদের হাতে। তোমার লজ্জাও করে না!

লজ্জার বালাই সত্যি-সত্যি তার ছিল না। থাকলে এর পরেও কখনও সোনার দিকে তাকিয়ে বলতে পারত না—তোকে একদিন প্রাণে মেরে দেব আমি। মনে থাকে যেন।

এই বলে ডান হাতটা চেপে ধরে বাগাজোড়ার সাহেব তার সঙ্গের লোকটাকে বললে, চাবুকটা তুলে নাও যোগীন।

তারপর যোগীনকে সঙ্গে নিয়ে তার গাড়িতে উঠে বললে, চল ডাক্তারখানা।

গাড়ি চলে গেল।

আবার সেই বুনো ফুলের গন্ধে ভরা পাহাড়তলির ছোট সাঁওতাল গ্রাম। আবার সেই নাথাল-ঝোলা বুড়ো বট গাছের তলা।

বনের হরিণ আবার সেই বনে ফিরে এসেছে।

মুকরি নাবাল ধরে হুলছে—

হেঁইয়া হো! হেঁইয়া হো!

সোনা এসে দাঁড়াল। এখন সোনা তার স্বামী। সোনা ডাকলে মুকরি, আয়!

—যাচ্ছি, আর একটু খেয়ে লি।

সোনা বললে, ভাত রাঁধবি না?

মুকরি জিজ্ঞাসা করলে, উনোনে আগুন দিয়েছিস?

সোনা বললে, অনেকক্ষণ। আর এই দ্যাখ কি এনেছি।

—কি এনেছিস?

মুকরি তার পিছু পিছু এসে দেখলে, সোনা জঙ্গল থেকে মস্ত বড় একটা খরগোশ মেরে এনেছে।

মুকরি খরগোশটা নেড়েচেড়ে দেখলে। দেখে বললে, আহা রে!

বলেই হঠাৎ কি মনে পড়ল তার। ফিক্ করে হেসে ফেললে।

সোনা জিজ্ঞাসা করলে, হাসলি যে?

মুকরি বললে, খরগোশের মুখটা ঠিক সেই বাগাজোড়ার সাহেবের মত।

সোনা বললে, ব্যাটাকে ঠিক এমনি করে মারবার ইচ্ছে আমার ছিল।

মুকরি বললে, না মেরে ভালই করেছিস। যতদিন বাঁচবেক, হাতের দিকে চাইবেক আর মনে হবেক ওই হাত দিয়ে মুকরিকে ও ধরেছিল।

সোনা বললে, আমি ভাবতাম—লালমুখো সাহেবগুলা সবাই সমান। কিন্তু সিদ্ধারনের সাহেবটো সত্যিই ভাল।

মুকরি হাসতে হাসতে বললে, তাহলে যাবি নাকি আর-একবার?

সোনা বললে, যাই তো একা যাব।

মুকরি বললে, আমাকে নিবি নাই সঙ্গে?

সোনা বললে, না। তুর বদলে সঙ্গে নিব বিষ-কাঁড়—যা দিয়ে একদিন বাঘ মেরেছিলাম।

রমণীর মন

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

পাঞ্জাব মেল আসানসোল স্টেশনে যখন থামল, তাতে তিল ধরবার জায়গা নেই। সুরেশ্বর মিথ্যে ছুটোটিছু করতে লাগল। তৃতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীরা হাঁফাচ্ছে। যারা বসে আছে তাদের অবস্থাও যেমন, যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদেরও তেমনি।

তখন ভোর হতে দু-তিন ঘণ্টা দেরি। অনিদ্রায় এবং সারারাত্রির ধকলে সবাই ধুঁকছে। চোখ ছোট হয়ে এসেছে। গাড়ির দরজা পর্যন্ত লোকের ঠাসাঠাসি।

সুরেশ্বর করুণ কণ্ঠে আবেদন জানাল: আমাকে একটু ঢুকতে দিন। এ গাড়িতে না যেতে পারলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কিন্তু সে আবেদন কারও কানে গেল বলে মনে হল না। অধিকাংশই নির্বিকার। নিজেকে সামলাতেই ব্যস্ত। অন্যের সর্বনাশের কথাও ভাববার সময় নেই। যাদের কানে আবেদন পৌঁছল, তারা সর্বনাশের কথাটা বিশ্বাসই করলে না। ভিড়ের সময় ট্রেনে ওঠবার জন্যে অনেকেই অনেক সর্বনাশের দোহাই দেয়। তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে হাসল। কেউ বা না-শোনার ভান করল। কেউ বা মুখ ফুটেই মন্তব্য করল: এত যদি তাড়া, আগের ট্রেনে যান নি কেন? সুরেশ্বর তারও হয়তো একটা জবাব দিলে, কিন্তু সে কেউ শুনলে বলে মনে হল না।

অবশ্য সকলেই কিছু নির্মম লোক নয়। যাদের কিছু দয়া-মায়া আছে, সুরেশ্বরের আবেদনের উত্তরে তারাও করুণভাবে হাত জোড় করে জানালে, দরজাটা যে খুলি এমন জায়গাও খালি নেই।

কথাটা সত্যি। এবং সুরেশ্বরের সর্বনাশের কথাটাও মিথ্যে নয়। সুরেশ্বর তখন মরিয়া। প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠা ছাড়া তার উপায় নেই। কিন্তু সেখানেই বা প্রবেশের পথ কোথায়? উচ্চশ্রেণীর যাত্রীরা ভিতর থেকে দরজা-জানলা বন্ধ করে সুখসুপ্ত।

সুরেশ্বর কয়েকটা দরজাতেই জোরে জোরে ধাক্কা দিলে, কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না। হতাশভাবে ফিরে এসে আবার একটা দরজায় ধাক্কা দিতে মনে হল কে যেন দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। একটা জানলার খড়খড়ি যেন নেমে গেল।

—কে? কী চান?

রমণীর কণ্ঠস্বর।

সুরেশ্বর জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। সকাতরে বললে, আমি অত্যন্ত বিপন্ন। এ গাড়িতে যেতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। একটুখানি জায়গা চাই।

মহিলাটি নিঃশব্দে ওর দিকে চেয়ে রইল। জিজ্ঞাসা করলে, কত দূর যাবেন?

ব্যগ্রভাবে সুরেশ্বর উত্তর দিলে, কলকাতা। মানে হাওড়া।

—সঙ্গে আর কেউ আছে?

—আজ্ঞে না, আমি একলা।

সুরেশ্বর অস্থির হয়ে উঠেছে। ট্রেন ছাড়তে আর দেরি নেই। এক্ষুনি গার্ড হুইস্‌ল্ দেবে এবং মেল ট্রেন সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে আরম্ভ করবে। তার সমস্ত দেহ চঞ্চল। যেন এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ছুটছে।

মহিলাটি আরও কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে তার দিকে চেয়ে রইল। সুরেশ্বরের চঞ্চল কাতর দৃষ্টি একবার গার্ডের গাড়ির দিকে, একবার ড্রাইভারের এঞ্জিনের দিকে এবং আর-একবার মহিলাটির দিকে ছুটোছুটি করছে।

মহিলাটি কী যেন ভাবলে। তারপরে দরজাটা খুলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে সুরেশ্বর বিদ্যুৎবেগে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগে এই ভোরেও সুরেশ্বর ঘেমে উঠেছিল। বেঞ্চে বসে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে এতক্ষণে সে ঘরের চারিদিকে দেখবার অবসর পেল।

যে বেঞ্চে সে বসেছে সেই বেঞ্চে একটি বছর ষোল-সতেরোর ছেলে। ফরসা রঙ। ছিপছিপে লম্বা চেহারা। পরিধানে চমৎকার স্যুট। দিব্যি স্মার্ট দেখতে।

ওদিকের বেঞ্চে আর একটি ছেলে। বছর এগারো-বারো বয়স হতে পারে। সেটিও স্যুট-পরা। দাদার মতই সুন্দর দেখতে। মায়ের গা ঘেঁষে বসে

একদৃষ্টে আগন্তুকের দিকে চেয়ে আছে। তার চোখে কিছুটা কৌতূহল, কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা বিরক্তি।

তারপরে মহিলাটি।

তার দিকে চেয়ে সুরেশ্বর থমকে গেল।

মহিলাটি অপলক তার দিকে চেয়ে রয়েছে। কৌতুকে চোখের তারা দুটি নাচছে। চোখের তারা সকল মেয়ের নাচে না। তার জন্য চাই সূক্ষ্মাগ্র তির্যক ভ্রূ, দীর্ঘ পক্ষ্ম এবং আবেশ বিহ্বল টানা চোখ।

সুরেশ্বর অনেক মেয়ে দেখেছে। কৌতুকে চোখের তারা কারও নাচত না। বাদে একজন। কিন্তু—

মহিলাটির ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি না?

সুরেশ্বর এবারে লাফিয়ে উঠল: অমিতা না?

—চিনতে পেরেছ?

—না পারারই কথা। আজকের ব্যাপার তো নয়।

সুরেশ্বরের মুখে এবং কণ্ঠস্বরে অনেকখানি খুশি এবং অনেকখানি লজ্জা খেলে বেড়াতে লাগল।

অমিতা বললে, তোমার গলার স্বর শুনেই তোমাকে চিনেছি। দরজা খুলে দেখি, মূর্তিমান তুমি। কিন্তু তোমার তখন কারও দিকে দৃষ্টি দেবার সময় নয়। একটু বসতে পেলে বাঁচ।

লজ্জিত কণ্ঠে সুরেশ্বর বললে, যা বলেছ। কোথাও এক ফোঁটা জায়গা নেই। অথচ—

—অথচ বিপদটা কী!

সুরেশ্বরের মুখ হঠাৎ করুণ হয়ে গেল। বললে, আমার মেজ ছেলেটি—তাকে বোধ হয় দেখ নি, যক্ষ্মা হাসপাতালে। রাত বারোটায় টেলিগ্রাম পেলাম, তার অবস্থা ভালো নয়।

—ও।

সমবেদনায় অমিতার মুখও বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

বললে, সুনীতিদিকে আনলে না?

—সে তো নেই। সে তো অনেকদিন হল নেই।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—কী হয়েছিল ?

সুরেশ্বরের মুখের উপর একটা কালো ছায়া খেলে গেল, যেটা অমিতার ভালো লাগল না। প্রসঙ্গটাকে এড়াবার জন্যে বললে, সে অনেক কথা অমিতা। আবার যদি কখনও দেখা হয় বলব।

ওর মনের ভাব অমিতা বুঝলে। একে সে অনেক দুঃখের বিনিময়ে খুব ভালো করেই চিনেছে। সুতরাং কিছুটা অনুমানও করতে পারলে। জেদ না করে তাই সে চুপ করে রইল।

একটু পরে সুরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কোথা থেকে আসছ এখন ?

অমিতা হাসলে। বললে, অমৃতসর থেকে।

—এ দুটি ?

সুরেশ্বর ছেলে দুটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে।

—আমার ছেলে।

উত্তর দিতে গিয়ে সুরেশ্বরের বিস্ময়-বিমূঢ় চোখের দিকে চেয়ে অমিতার গাল দুটি আরক্তিম হয়ে উঠল।

ছেলে দুটির জন্যেই সুরেশ্বর নিজেকে সামলে নিলে। সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, আর কি খবর বল'?

হেসে অমিতা জবাব দিলে, খবর তো অনেক। আবার দেখা হলে বলব।

একটু চিন্তা করে সুরেশ্বর বললে, দেখা হবে। তুমি কোথায় উঠবে ?

—প্রথমে ভেবেছিলাম, কোন একটা হোটেলে উঠব।

—তারপরে ?

—উনি বললেন, মাসখানেক থাকতে হতে পারে। তখন একটা বাড়ি ঠিক করাই ভালো। তাই থিয়েটার রোডের কাছাকাছি একটা বাড়ি ঠিক হয়েছে!

অমিতা রাস্তার নাম এবং নম্বরটা বলে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি তো নিজের বাড়িতেই উঠবে ? কোথায় যেন সেটা।

সুরেশ্বর হাসলে। অত্যন্ত ম্লান হাসি। বললে, না, সেখানে উঠব না।

—কেন ?

—সেটা বিক্রি হয়ে গেছে। সেও অনেক দিনের কথা। যাই হোক, ছেলেকে দেখে একদিন তোমার ওখানে নিশ্চয়ই যাব।

—নিশ্চয় এস। ভারি খুশী হব।

—সত্যি ?

—সত্যি।

—অণ্ডাল এসে গেল। এবারে নামতে হবে। দেখি যদি কোথাও থার্ড ক্লাসে একটা দাঁড়াবার জায়গা পাই। হাওড়া স্টেশনে আবার দেখা হবে।

অমিতা কিছু বলবার আগেই সুরেশ্বর নেমে গেল।

সুরেশ্বরের চেহারা, সাজ-পোশাক এবং কথাবার্তায় অমিতা বুঝেছিল, খুব দুঃখের মধ্যেই তার দিন কাটছে। তৃতীয় শ্রেণীতে সুরেশ্বর ভ্রমণ করতে পারে এটা অচিন্ত্যনীয়। তার কলকাতার বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। আছে এখন আসানসোলের বাড়িতে। আগে বছরে ছ-মাস আসানসোলে আর ছ-মাস কলকাতার বাড়িতে থাকত।

ধনী পিতামাতার একমাত্র সন্তান সুরেশ্বর। এই অবস্থায় অতিরিক্ত আদরে যা হয় সুরেশ্বরেরও তাই হয়েছিল। তার বিলাস-ব্যসন এবং বদ্‌খেয়ালের অন্ত ছিল না।

তার ঐশ্বর্যের চমকে বিভ্রান্ত হয়ে প্রথম যৌবনে অমিতা একদিন তার বদখেয়ালের স্রোতে কুটোর মত ভেসে গিয়েছিল।

কুটোর মত।

কী যে অমিতার হয়েছিল, নিজের বশে কিছুই যেন তার ছিল না। বাপ-মা, সঙ্গী-সাথী, লেখাপড়া কিছুই তাকে বাঁধতে পারে নি। সে যেন একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সে কি ভালবাসায়, না ওর ঐশ্বর্যের চমকে, না ওর রূপে?

হ্যাঁ, রূপ বটে!

পুরুষের এত রূপ সে কখনও দেখে নি। দীর্ঘচ্ছন্দ বলিষ্ঠ চেহারা। প্রশস্ত ললাট, বড় বড় রক্তোৎপলের মত চোখ আর কাঁচা সোনার মত রঙ!

আর তেমনি অতুলনীয় অমিতব্যয়িতা। টাকা যেন হাতের ময়লা! বিন্দুমাত্র মমতা নেই তার উপর।

মমতা নেই নিজে ছাড়া আর কারও উপর, কিছুরই উপর। টাকা আসে অনভিনন্দিত, যায়ও তেমনি। মধ্যে যে আনন্দলোক সৃষ্টি হয় তার নিজের জন্যে সেইটেই বড় কথা।

নইলে একান্তভাবে তারই উপর নির্ভরশীল অসহায় কোন মেয়েকে নিশ্চিন্তে হাওড়া স্টেশনে কেউ ফেলে যেতে পারে! শুধু সুরেশ্বরই পারে।

এবং পাঞ্জাব মেল এক সময় সেই হাওড়া স্টেশনেই অমিতাদের নামিয়ে দিলে।

অমিতা চেয়ে দেখতে লাগল।

কত কাল পরে সেই হাওড়া স্টেশনে ফিরে এল সে! বড় ছেলের দিকে চেয়ে মনে-মনে হিসাব করে দেখলে আঠারো বৎসর। তখন তার বয়সও ছিল আঠারো। আজ ছত্রিশ।

কত পরিবর্তন হয়েছে হাওড়া স্টেশনের। না কি তার নিজের চোখেরই পরিবর্তন হল? আঠারো বছর বয়সের চোখ আর ছত্রিশ বছর বয়সের চোখ এক নয়। সেদিন আর এদিনও এক নয়। যেন দুটি পৃথক জন্মের দুটি দিন।

অমিতা চারিদিকে চেয়ে চেয়ে মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল, ডাঃ অখিল নন্দীর সঙ্গে কোথায় দেখা হল? ওইখানে কি? যেখানে একটি বৃদ্ধ দম্পতি কতকগুলি ট্রাঙ্ক এবং বস্তা নামিয়ে কার জন্যে যেন অপেক্ষা করছেন?

হয়তো এ প্ল্যাটফর্মেই নয়। অন্য কোন প্ল্যাটফর্মে কে জানে? আঠারো বছর আগে কোন্ একটা অজ্ঞাত ট্রেন কোন্ প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ত আজ আর কাউকে জিজ্ঞাসা করেও জানবার উপায় নেই। অখিলের নিজেরই মনে নেই বোধ সম্ভব।

অথচ জানতে পারলে 'মনটা বড় ভালো হত। সেই জায়গাটিই তার বর্তমান জন্মের সূতিকাগার। সেইখানে নতুন করে অমিতার জন্ম হয়।

সূতিকাগার এবং সেই সঙ্গে শ্মশানও।

সেইখানে মরে গেল অমিতা মুখুয্যে। পুড়ে ছাই হয়ে গেল। জন্ম নিলে অমিতা নন্দী। ছেলে দুটির দিকে চেয়ে তার মন যেন আরও জোর পেলে যা, অমিতা নন্দী, মুখুয্যে নয়।

অথচ সে বুঝতে পারলে না, যে মেয়েটি নিজের শ্মশান নিজের চোখে দেখতে এল সে অমিতা নন্দী নয়, মুখুয্যেই। অনেক কাল পরে তার বুকের মধ্যে আঠারো বছর বয়সের রক্ত টগবগ করে উঠেছে।

কিন্তু নিজের শ্মশান নিজের চোখে দেখার কি জো আছে! এই পৃথিবী যেন নদী! নদীর স্রোতের মত, মরুভূমির মত। দাগ কেটে, চিহ্নিত করে কিছুই রেখে যাওয়া যায় না।

—চল মা।—বড় ছেলেটি তাগাদা দিলে।

—হ্যাঁ, যাই।

অমিতার চোখ চারিদিকে কী যেন তখনও খুঁজছে।

সুরেশ্বর হন্তদন্ত হয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, সব নেমেছে? আর-কিছু নেই তো?

গাড়ির ভিতর উঁকি দিয়ে উপর-নীচে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে সুরেশ্বর আশ্বস্তভাবে বললে, না। আর-কিছুই নেই। চল এখন। এই কুলি!

কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে আবার বললে, চল। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে হবে তো?

অমিতা তথাপি নড়ে না।

—কী খুঁজছ? কিছু হারাল নাকি?—সুরেশ্বর এবার রীতিমত তাড়া দিলে।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে অমিতা বললে, সেই জায়গাটা খুঁজছি।

—কোন্ জায়গাটা?

—অমিতা মুখুয্যে যেখানে মারা গেল।

কথাটা বুঝতেই সুরেশ্বরের এক মিনিট গেল। এক ঝলক কালো রক্ত মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

বললে, সে কি আর মনে আছে?

ব্যগ্রভাবে অমিতা বললে, আমার মনে আছে। সে জায়গার প্রত্যেকটি বিন্দু আমার মনে গাঁথা আছে। দেখতে পেলেই চিনতে পারি।

কিন্তু চেনা দূরের কথা, কিছুই যে দ্বিতীয়বার দেখা যায় না, অমিতা মুখুয্যেকে সে কথা বোঝায় কে?

সুরেশ্বর দারুভূত। ছেলেটি অপরিচিত মহানগরীতে এসে হতভম্ব। তাড়া দিলে কুলিরা:

—চলিয়ে না। কেৎনা ঘড়ি খাড়া রহেগা?

হ্যাঁ। দাঁড়িয়ে থাকার জো নেই। চলতে হবে। ওরাও নিঃশব্দে চলতে লাগল।

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

এই যদি ছিল মনে

অন্নদাশঙ্কর রায়

জয়দেবকে টাঙ্গায় তুলে দিতে গিয়ে কুমকুম বলল, "আবার আসবেন।"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়।" পড়ে যেতে যেতে গদি আঁকড়ে ধরে জয়দেব বলল, "যত দিন বাঁচি, আসবই, বৌদি। একটু মনে রাখবেন।"

সমীরণ চলল সেই টাঙ্গাতেই বন্ধুকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে। রাজা কী মাণ্ডি। সেখানেও সেই একই দৃশ্য।

"আবার এসো।"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়।" জয়দেব কাঁপতে কাঁপতে হাতে হাত রেখে বলল, "গুড বাই নয়। ফরাসীরা যেমন বলে, অ রিভোয়া।"

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাসায় ফিরল সমীরণ। টাঙ্গায় নয়, পায়ে হেঁটে। আধ মাইল পথ। বেশীক্ষণ লাগে না, তবু একটু বেশীক্ষণই লাগল। বন্ধুর কথা ভাবছিল।

"তোমার বন্ধুকে এবার এতটা কাহিল দেখব আশা করিনি", বলল কুমকুম।

"আমিও আশা করিনি।"

"কী হয়েছে ওঁর? বয়স তো মাত্র তেতাল্লিশ কি চুয়াল্লিশ।"

"কেমন করে বলব? তবে লক্ষণ দেখে মনে হয় নার্ভাস ব্রেকডাউন।"

"কই, এক বছর আগে তো এমনটি দেখিনি।"

"না। সেবার ওকে বেশ সুস্থই মনে হয়েছিল। তবে ওর কথাবার্তায় কেমন একটা অশান্ত ভাব লক্ষ্য করেছিলুম। এবার ওর কথাবার্তায় বাঁধুনি নেই। কেমন একটা ঢিলে ঢালা ভাব। লক্ষ্য করলে তো, 'যতদিন বাঁচি'।"

"হুঁ। 'একটু মনে রাখবেন'। বাপ রে, বিরাট বড়লোক। এক কলকাতা শহরেই চার পাঁচখানা বাড়ী। অগুন্তি চা বাগান। তাঁকে একটু দয়া করে মনে রাখব কিনা আমি, আধখানা ভাড়াটে বাড়ীতে যার অর্ধেক জীবন কেটে গেল।"

সমীরণ আহত হয়ে বলল, "তবু তো শত্তার আছো। কিছু হলে কী করতে? এই টাকায় এর চেয়ে আরাম একমাত্র আগ্রাতেই সম্ভব।"

কথাটা ঘুরিয়ে দিতে গিয়ে কুমকুম বলল, "আমি বলছিলুম কি ওঁর অগাধ টাকা। চিকিৎসা করালে সেরে যাবে।"

"ঐখানে তোমার ভুল, কুমু। ঐখানে তোমার ভুল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমরা গরিব, কিন্তু দুঃখী নই। আর আমার বন্ধু জয়দেব গরিব নয়, কিন্তু দুঃখী।"

"কেন? দুঃখ কিসের? তোমার মতো হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয় না। একটিও সন্তান হয়নি, বৌ মরে গেছে অল্প বয়সে। তারপর থেকে আজ দিল্লী কাল দিল্লী করে বেড়ানো হচ্ছে। নিকর্মার ধাড়ী। সম্পত্তিগুলো যে দেখাশুনা করবে সেটুকুও উদ্যম নেই। তুমি বলছ দুঃখী। আমি দেখছি সুখী?"

সমীরণ তার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "সুখ কিসে আর দুঃখ কিসে তা কি তুমি জানো না, কুমু? এই যে আমরা আমাদের চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে একসঙ্গে আছি, তুমি নারী আর আমি পুরুষ, এই যে আমরা এখনো তেমনি ভালোবাসি, তুমি প্রিয়া আর আমি প্রিয়, এরই নাম সুখ। আর ঐ যে ও বেচারা টাকার জন্যে বিয়ে করে টাকা নিয়ে বসে আছে, বিয়ে গেছে স্বপ্নের মতো মিলিয়ে, একটা ছেলে কি মেয়ে নেই যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে, একটা কাজও নেই যে স্নেহপ্রেমের অভাব ভুলিয়ে রাখবে, ওরই নাম দুঃখ। তোমাকে যদি কেউ জয়দেবের ভাগ্য দিয়ে এ ভাগ্য কেড়ে নিত তুমি সুখী হতে?"

"ষাট। ষাট। তোমার মুখে কিছু আটকায় না," বলে কুমকুম স্বামীর মুখে হাত চাপা দিল। মধুর হেসে বলল, "লাখ টাকার বদলে অমন ভাগ্য চাইনে।"

সমীরণ তখনো ভাবছিল বন্ধুর কথা। "তা কি জয়দেব জানত! কতটুকু দূরদৃষ্টি মানুষের! নিয়তি তাকে টোপ দিয়ে বঁড়শিতে গাঁথে। সে মাছের মতো লোভে পড়ে, মাছের মতো মরে। জয়দেবকে বাঁচাতে হবে।"

"হুঁ। সুচিকিৎসা চাই। তুমি একটা ব্যবস্থা করো।"

"ও কথা ভেবে বলিনি! এ কি দেহের রোগ যে চিকিৎসায় সারবে!"

কুমকুম বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, "তা হলে ওঁর একটা বিয়ে দাও। এখনো দাম্পত্য সুখ সন্তান সুখ হতে পারে।"

"কিন্তু," সমীরণ গম্ভীরভাবে বলল, "ব্যাপার অত সোজা নয়। প্রত্যেক বছর ও জ্যোৎস্নামহল দেখতে আসে, আমাকে টেনে নিয়ে যায় ওর সঙ্গে। তুমি

বন্ধুতে অনেক ক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি তাজমহলের দিকে চেয়ে। তার পর কথা বলি। জানতে চাই আমি, ও কি ওর মমতাজের জন্যে এখনো বিরহ বোধ করছে? ওর ব্যাথার কি অবসান নেই? ও উত্তর দেয়, বিরহবোধ অসাড় হয়ে গেছে। তাজমহল দেখে আবার জাগে কি না পরখ করার জন্যেই আসে। জাগে না। তখন জিজ্ঞাসা করি, আবার বিয়ে করতে বাধা কী? বলে, বাধা অন্য ধরনের। স্মৃতি যদিও স্মৃতি হয়ে গেছে, তার বিয়ের পণযৌতুক তো স্মৃতি হয়ে যায়নি। আরেকটি মেয়েকে বিয়ে করলে স্মৃতির পিতার দান ভোগ করা উচিত হবে না। ওটা দুর্নীতি। অথচ বাড়ীগুলো, চা বাগানগুলো ফিরিয়ে দিলে ওর চলবে কী করে, স্ত্রীকে পুষবে কী করে?"

কুমকুম বিরক্ত হয়ে বলল, "নিজেরও তো ঘটে বিদ্যাবুদ্ধি আছে। অক্স্‌-ফোর্ডের ডি. লিট.। ওঁর মতো ডিগ্রী থাকলে তোমাকে লেকচারার হয়ে পড়ে থাকতে হতো না। প্রোফেসর কি রীডার হতে।"

সমীরণ করুণ হেসে বলল, "ঐখানে তো গোল। আমি কলকাতার এম. এ বলে আমার মানহানি হয় না, আমি যেখানে হোক একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নিতে পারি। কিন্তু ও যে নামকরা বিদ্বান, অক্স্‌ফোর্ডের ডি. লিট.। ও যদি আমার মতো লেকচারার হয় তা হলে ওর মান সম্ভ্রম থাকবে না। ওকে তখন ধুতী পাঞ্জাবী পরতে হবে, হাত দিয়ে খেতে হবে, কেউ টের পাবে না যে বিলেত ফেরত বড় সাহেব।"

"তাতে কি হয়েছে?"

"এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাই তুমি ও কথা বলতে পারলে। তখনকার দিনে ওর মতো লোকের পক্ষে মান সম্ভ্রম বজায় রাখা একটা জীবন মরণের প্রশ্ন ছিল। বড় চাকরি ওর পাওনা, কিন্তু গবর্ণমেন্ট তা দেবে না। কারণ ও ভারতীয়। ওর চেয়ে যারা নিকৃষ্ট তারা ইংলণ্ডে জন্মেছে বলে ওর পাওনা কেড়ে নেবে। এর প্রতিবাদে ও ছোট চাকরি নেবেই না। দেশী স্টাইলে থাকলে গবর্ণমেন্ট বলত, তা তুমি তো শস্তায় চালাতে পারো দেখছি, তোমার অত মাইনের দরকার কী? তাই ও বিলিতী স্টাইলে থাকবে। এটাও প্রতিবাদ।"

কুমকুম বলল, "অদ্ভুত লোক তো।"

"তখনকার দিনে ওটা অদ্ভুত ঠেকত না। মনে হতো, আমরা শস্তায় থাকি বলে আমাদের বেতন কম, বড় বড় চাকরিগুলো আমাদের দিলে বেতনও

কমতে কমতে ছোট চাকরির মতো হবে। তার চেয়ে বড় চাকরির উপর দাবী রেখে বেশী খরচে থাকা ভালো।"

কুমকুম কিছুতেই সমর্থন করতে পারল না। সমীরণ হেসে বলল, "আমি আমার বন্ধুর যুক্তিটাই পেশ করছি। আমার যুক্তি নয়। ও রকম যার যুক্তি সে মনের মতো কাজ না পেলে কাজ করবেই না। বাপের অন্ন ধ্বংস করবে ক্যালকাটা ক্লাবে ঘর নিয়ে, আস্তানা গেড়ে। বছরের পর বছর কাটিয়ে দেবে সুদিনের আশায়।"

"তা হলে ওঁর মাথা তখন থেকেই খারাপ।"

"তাই যদি হতো ও অত বড় সম্পত্তির মালিক হয়ে বসত না। ক্যালকাটা ক্লাবে সকলের সঙ্গে ওর আলাপ। তাঁদের একজনের ওকে ভালো লেগে গেল। মেয়ের বিয়ে দিলেন ওর সঙ্গে। তখন আর কী? রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব। চাকরির কথা আর কে ভাবে! স্ত্রীকে ভালোবাসাই ওর চাকরি।"

কুমকুম চিমটি কেটে বলল, "এটা তোমার বানানো।"

সমীরণ বৌকে একটু আদর করে বলল, "তখনো আমার বিয়ে হয়নি। আমি তখন নেপাল রাজ্যে কোনো মতে একটা চাকরি জুটিয়েছি। জয়দেবের বিয়ের খবর পেয়ে ভাবছি, আহা, আমার যদি অমন একটি শ্বশুর মিলে যেত! তা হলে কি আর পরের চাকরি করি! ঘরের চাকরিতেই লক্ষ্মী।"

কুমকুম মাথা নেড়ে বলল, "কক্ষনো না। তুমি কক্ষনো ও কাজ করতে না।"

"কী জানি! তোমার বাবার যদি জলপাইগুড়ি জেলায় চা বাগান থাকত আর তিনি যদি ওগুলোর অর্ধেক শেয়ার আমার নামে লিখে দিতেন তা হলে কি আমি এই সুদূর প্রবাসে লেকচারার হয়ে জীবনপাত করতুম! "বলা যায় না।"

"খুব বলা যায়।" কুমকুম কঠোর হয়ে বলল, "তুমি এইখানেই থাকতে, এই বাড়ীতেই, আর আমাকে একটা রাঁধুনী রাখতে দিতে না। তুমি দিলেও আমি রাজী হতুম না। আরেক রকম মান সম্ভ্রম আছে জয়দেববাবু তার ধার ধারেন না।"

সমীরণ খুশি হয়ে কুমকুমের হাত মুখে ছুঁইয়ে বলল, "তখনকার দিনে মনে হতো জয়দেব জিতে গেছে, আমি হেরে গেছি। এখন মনে হচ্ছে কী, বলব?"

"থাক, মিথ্যে কথা বলতে হবে না।" কুমকুম হাত সরিয়ে নিল। তার চোখে মুখে আনন্দের ছটা। "তারপর ?"

"তারপর জয়দেব সপ্তম স্বর্গে বিচরণ করতে লাগল। কলকাতার অভিজাত মহলের সব ক'টা দরজা তার কাছে খুলে গেল। আজ গবর্নমেণ্ট হাউসে লাঞ্চন, কাল সার রাজেনের সঙ্গে ডিনার, পরশু বর্ধমান হাউসে ফ্যান্সী ড্রেস। স্ত্রীভাগ্যে ধন। ধন অনুসারে সম্মান। জয়দেব প্রাণপণে সতীসেবা করল। আমি তো তার সিকির সিকিও করিনি।"

"কেন করবে ? আমার বিয়েতে কী পেয়েছ যে করবে ?" ক্ষুব্ধ হলো কুমকুম।

"অমনি অভিমান করা হলো। আগে শোনই না সবটা।" এর পরে সমীরণ বলল জয়দেবের দুর্ভাগ্যের কথা। কর্মসংস্থানের জন্যে তার যেটুকু উদ্যোগ ছিল সেটুকুও চলে গেল। সে যে একজন কর্মপ্রার্থী সরকারী মহল, বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল, কোথাও কেউ মনে রাখল না, শ্বশুরের পার্টনার বলেই সে পরিচয় দিতে ও পেতে থাকল। কয়েক বছর পরে দেখা গেল সে অকর্মণ্য। অক্স্‌ফোর্ডের পাঠ বেবাক ভুলে গেছে। শত্রুরা রটায় ঘোড়ার ডাক্তার। অশ্ব চিকিৎসার জন্যে তার কাছে কল্‌ আসে।"

কুমকুম খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়তে যায়।

"তারপরে একদিন আকস্মিক দুর্ঘটনায় স্মৃতি মারা যায়। জয়দেব দেওয়ানা হয়ে মহাদেবের মতো ঘুরে বেড়ায়। সেই যে ওর ঘোরা রোগ শুরু হলো বারো বছরেও সারল না। আবার ওকে সংসারী করার অনেক চেষ্টা হয়েছিল। এমন কি শ্বশুরের তরফ থেকেও। তিনি ওকে সত্যি স্নেহ করতেন। কিন্তু ও আর ওমুখো হবে না।"

কুমকুম অভিভূত হয়েছিল। অনেক ক্ষণ নীরব থেকে বলল, "সামনে আরো দুর্ভোগ আছে। যদি নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয় কে ওঁর সেবা করবে ! নার্সকে দিয়ে আর কি সেবা হয় ! নার্স করে শুশ্রূষা। বেশ বোঝা যাচ্ছে উনি আর বইতে পারছেন না ওঁর নিঃসঙ্গতা। ওঁর আবার বিয়ে করাই উচিত আর যখন বিরহবোধ নেই বলছ।"

"হাঁ, কিন্তু বিয়ে করলে খাবে কী, খাওয়াবে কী ? শ্বশুরের সম্পত্তি তো ভোগ করতে অনিচ্ছা। এদিকে চাকরির বাজারে আরো তো অক্সফোর্ডের ডি. লিট. দেখা দিয়েছে। তাদের চাকরি না দিয়ে কে ওকে চাকরি দেবে ?

ও তো অধ্যাপনার অযোগ্য। ওর চেয়ে আমার বাজারদর বেশী।" সমীরণ সগর্বে তাকায়।

"কিন্তু শ্বশুরের সম্পত্তি যাকে বলছ তা তো এখন ওঁরই সম্পত্তি। শ্বশুর তো চিরকালের মতো দিয়েই দিয়েছেন। কেই বা কেড়ে নিচ্ছে যে ওঁকে চাকরি করতে হবে!"

"ঠিক। কিন্তু এটাও বেঠিক নয় যে প্রথম স্ত্রীর দৌলতে যা পেয়েছিল তা দ্বিতীয় স্ত্রীকে দিলে বেইমানি হবে। তোমার মতো উঁচু দরের মেয়েরা কখনো তা ছোঁবে না। বলবে, যাও, ফিরিয়ে দাও। কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করো। যেমন তেমন মেয়েকে বিয়ে করতে ওর আপত্তি আছে।"

কুমকুম চিন্তিত হয়ে বলল, "তা হলে ওঁর সমস্যার সমাধান কী?"

"আমার মতে," সমীরণ বিচক্ষণের মতো বলল "ওর এখন যে কোনো একটা কাজ নেওয়া উচিত, যে কোনো বেতনে। কাজ করতে করতেও কাজের যোগ্য হবে। নিষ্কর্মা হয়ে ঘুরে বেড়ানো একটা অভিশাপ। ওয়ার্ক থেরাপি ওর চিকিৎসার পদ্ধতি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলার মতো কল্যাণ আর নেই। কপালের ঘর্মে অন্ন অর্জন করো যীশুখৃষ্টের এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শ্রমের অন্ন খেতেও মিষ্টি লাগে। গবর্নমেন্ট হাউসের লাঞ্চের চেয়ে।"

কুমকুম গালে হাত দিয়ে বলল, "এই যদি মনে ছিল তবে অক্সফোর্ড যাওয়া কেন, এত কষ্ট করে ডি. লিট. পাওয়া কেন, বড় চাকরি না জুটলে চাকরি করব না এই ধনুর্ভঙ্গ পণ কেন, ডিগ্রী ভাঙিয়ে বিয়ে কেন, স্ত্রীর টাকায় আয়েস কেন, সম্পত্তি ত্যাগ করার কল্পনা কেন? এমন অবধূতকে কোন মেয়ে বিয়ে করতে মন থেকে রাজী হবে? ওয়ার্ক থেরাপি ছাড়া আর একটা থেরাপি আছে। তা না হলে কি ওঁর অসুখ সারবে!"

রূপকথায় আছে, রাজার ছেলে আর রাখাল ছেলে, দু'জনায় গলায় গলায় ভাব। এও কতকটা তেমনি। বড় হয়েও এর ব্যতিক্রম হয়নি। যদিও রাজার ছেলে নয় জয়দেব, রাজার জামাই। আর রাখাল ছেলে নয় সমীরণ, ছেলের রাখাল।

সমীরণ অনেক চেষ্টা করল জয়দেবকে কোনো একটা কাজে লাগাতে। সে ধরাছোঁয়া দিল না। এক নম্বর কুড়ের বাদশা। একটা না একটা ছুতো ধরে প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দেবে। যেন গরজটা তার নয়, কর্মদাতার। তার ধারণা সারা ভারতে যেখানে যত কর্মদাতা আছে সকলে তার শ্বশুরের মতো উপযাচক হয়ে তাকে ধরে বেঁধে আপিসের বেদীতে বসিয়ে দিয়ে বলবে, গৃহ্লামি।

"কেন, ওরা কী জানে না যে আমি যোগ্য পাত্র? আমিই যোগ্যতম পাত্র? কে না জানে ভূভারতে আমার নাম?" এই হলো তার জিজ্ঞাসা। তথা অভিযোগ।

এর উত্তরে সমীরণ লেখে, "সব সত্যি। তা হলেও একটা দরখাস্ত করতে হয়।"

সে দরখাস্ত করবে না। তার দাবী আগেকার দিনে যা ছিল আজকের দিনেও তাই থাকবে। দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে তাকে ধুতি পরে কলেজে পড়াতে হবে? বিশেষ যখন ছাত্ররাই কোট প্যাণ্ট পরছে?

দিল্লীতে ওর জন্যে তদ্বির করতে হলো। যাতে ওকে পররাষ্ট্রবিভাগে নিযুক্ত করে দক্ষিণ আমেরিকায় বা তিব্বতে চালান দেওয়া যায়। বলিভিয়াতে ওকে কন্সাল করার কথা উঠেছিল। কিন্তু ও নিজেই ভাংচি দেয়। স্প্যানিশ ভাষা ও শিখবে না। ওকে একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি দিতে হবে। যে দোভাষীর কাজ করবে।

আসলে ও বাবু হয়ে গেছে। খাটবে না। খাটতে অক্ষম। ওর জন্যে আরেক জন খাটবে। তাও যদি আরেক জনকে খাটিয়ে নিতে জানত। পরের উপর ছেড়ে দিয়ে ভেসে বেড়ানো ওর দ্বিতীয় প্রকৃতি। সরকারী চাকরিতেও খাপ খাবে কী করে! বে-সরকারী চাকরিতেও বাবুয়ানা চলে না। বাইরে সাহেবিয়ানা, ভিতরে বাবুয়ানা, এই দস্তুর ও এই ধাত নিয়ে কোথাও কর্মপ্রাপ্তির আশা নেই। বেচারা জয়দেব!

ওর শ্বশুর ওকে পলিটিক্‌সে নামতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। পার্টি ফাণ্ডে টাকা ঢালতে পারলে কিছু না হোক এম. এল. সি. হতে পারত। কিন্তু ভেক ধারণ করতে হবে শুনে ও বেঁকে বসল। ওকে অনেক করে বোঝানো হলো যে ভেক ধারণ করলেই বিলিতী মদ ছাড়তে হবে এমন কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। ও সাফ বলে দিল; ভণ্ডামির মধ্যে আমি নেই। শোন কথা!

ও যে নিষ্কর্মাকে সেই নিষ্কর্মা রয়ে গেল। তফাতের মধ্যে ওর স্বাস্থ্য আরো ভেঙে পড়ল। পরের বছর শীতকালে যখন আগ্রা গেল তখন ওর ঠোঁট অনবরত

কাঁপছে। কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেলছে, হয়তো একটা অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করছে, এক রাশ আবোল তাবোল হয়তো। বাক্যের উপর, কণ্ঠের উপর কোনো কর্তৃত্ব নেই। পরক্ষণেই বলছে, য়্যাঁ! বলেছি আমি অমন কথা! অত্যন্ত ক্লিষ্ট কাতর মুখভাব। হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে! ওকে না ধরলে ও পড়ে যাবে। পোশাক পরিচ্ছদও আঁটসাট নয়। রাস্তার মাঝখানে খুলে যাবে। একদিন রাতের পায়জামা পরে দিনের বেলা আগ্রা শহরের বুকের উপর দিয়ে চলেছে, খেয়াল নেই যে ওটা তার শোবার ঘর নয়। সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে বলছে, পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে, আহা, কী মনোমুগ্ধকর! থেকে থেকে ভুরু কোঁচকায়, দাঁতে দাঁত চাপে। দিনের বেলা যখন তখন হাই তোলে। ঝিমিয়ে পড়ে। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে! চোখে ভয়ের চিহ্ন।

"ভাই সমীর," জয়দেব বলে আর্ত স্বরে, "আমার সমস্ত ক্ষণ ভয় কোন দিন ঘুমের মধ্যে চলে যাব। কেউ জানতে পাবে না যে আমি মরে গেছি। আমিও না। ভাবতেই আমার হাত পা জমে হিম হয়ে যায়। মাথা গরম হয়ে ওঠে চায়ের কেটলির মতো।"

"কেন? এ রকম ভয় কেন? এত ভয় কিসের?" সমীরণ উদ্বেগের সঙ্গে সুধায়।

"জেগে থাকলে ভয় থাকে না। ঘুমিয়ে পড়লেই ভয়। সেইজন্যে আমি যতক্ষণ পারি জেগে থাকি। রাতটা এক রকম জেগে জেগেই কাটে। ঘুমোই কখন জানো? দিনের বেলা যখন লোকজন চার দিকে রয়েছে। মারা গেলে টের পাবে। তার আগে ডাক্তারকে খবর দেবে। দিনের বেলা ডাক্তারকেও পাওয়া যাবে।"

সমীরণ শুনে অবাক হয়। জয়দেব বলতে থাকে, "দিনের বেলাও কি ঘুম আসে, ভাবছ? যেই একটু অচেতন হয়ে পড়ি অমনি ধড়ফড় করে উঠে বসি। বুকে হাত দিয়ে দেখি, ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে কি না। টিকটিক করে চলছে দেখে আশ্বস্ত হই।"

"ভারী দুঃখিত হলুম শুনে। তুমি ঘুমোও। আমার সামনেই ঘুমোও।"

"কিন্তু এই ঘুম যদি শেষ ঘুম হয়?" জয়দেব বুদ্ধিমানের মতো বলে, "কী করে জানব যে শেষ ঘুম নয়?"

"এ সব মরবিড চিন্তা মন থেকে মুছে ফেল, জয়। ঘুম পেলে নির্ভয়ে ঘুমোবে। জোর করে জেগে থেকো না। কই, এ সব তো আগে শুনিনি? কবে থেকে এমন হচ্ছে?"

"অনেক দিন।"

সমীরণ জানতে চায় কোনো রকম চিকিৎসা চলছে কি না। জয়দেব বলে এক এক করে অনেক রকম চিকিৎসা পদ্ধতি পরীক্ষা করা গেছে। ইলেকট্রিক শক নেওয়াও হয়েছে।

সমীরণ শিউরে উঠল। "বলো কী! শক থেরাপি! তাতেও সারল না।"

"না। তাতে আরো খারাপ হলো।"

সমীরণ এইবার কথাটা পাড়ল। "তোমাকে আগেও বলেছি, ভাই। এখনো বলছি। তোমার হাতে কাজ নেই, অথচ টাকা আছে। এই থেকে তোমার রোগ। এর প্রতিকার হচ্ছে হাতে কাজ নেওয়া, হাত থেকে টাকা ঝেড়ে ফেলে দেওয়া। যদি না ও টাকা তোমার স্বোপার্জিত হয়। আমার পরামর্শ শোন। তোমার চিকিৎসার প্রণালী ওয়ার্ক থেরাপি। এ যদি করো তোমার সব ভয় কেটে যাবে। তুমি বাঁচবে।"

জয়দেব কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়তে থাকল। "তোমার ওই এক কথা। কাজ। কাজ। কাজ। কী কাজ? কত বেতন? কতটুকু স্বাধীনতা? কী পরিমাণ তদ্বির তোয়াজ খোসামোদ? না জেনে না বুঝে অমনি ফস করে কাজ নিয়ে আমি ছুঁচো গিলে মরি আর কী! আর ঐ টাকাটা ঝেড়ে ফেলে দেবার কথা বলছ? ওটা আমারই মনের কথা। ফী মাসে একবার করে য়্যাটর্নির বাড়ী যাই। বলি, একটা ট্রাস্ট ডীড তৈরি করে দেখাতে পারেন? এ টাকা আমার নয়। আমি ট্রাস্টী।"

"তার পরে?"

"তার পরে আর কী? য়্যাটর্নি মুসাবিদা করে। আমার পছন্দ হয় না। প্রায়ই ব্যাকরণের ভুল থাকে। অমন অশুদ্ধ ইংরেজী দলিলে আমি হেন মানুষ সই করতে পারি?"

"মুসাবিদা ক'বছর ধরে চলছে?"

"সাত আট বছর।"

সমীরণ গালে হাত দিয়ে থ' হয়ে বসল।

"হবে। হবে। ওটা পরের কথা। আগেরটা আগে। কথা হচ্ছে, কেন বাঁচব? কার জন্যে বাঁচব? তুমি এর উত্তর পেয়ে গেছ বলে দিন রাত খাটছ। সে খাটুনি শখের নয়, তবু সুখের। তুমি জানো যে তোমার উপর আরো

পাঁচটি প্রাণীর ভাগ্য নির্ভর করছে। ভাই সমীর, তুমি যখন বলো যে কর্মই হচ্ছে সর্বরোগহর তখন তোমার মনে থাকে না যে আমার উপর একটি প্রাণীরও দায়িত্ব নেই।"

এইখানে জয়দেবের ব্যথা। ওয়ার্ক থেরাপি এর কী করতে পারে! তবু সমীরণ আরো একবার বলে দেখল। "সমাজের কাছ থেকে যা নিচ্ছ সমাজকে তার বিনিময় কী দিচ্ছ? তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সমাজ যে খরচটা করছে সেটা যারই তহবিল থেকে আসুক না কেন সমাজেরই তো বটে। তুমি তার বদলে সমাজকে শ্রম দান করছ না, বিদ্যা দান করছ না, সৃষ্টি দান করছ না, আনন্দ দান করছ না। তুমি কি খাতক নও? চোর নও?"

জয়দেব এর উত্তরে বলল, "আমার বিবেকও আমাকে দু'বেলা এই বলে খোঁটা দিচ্ছে। আমি বলছি, বেশ তো। আমি চলে যাচ্ছি এ জগৎ থেকে। তা হলে তোমাকে অত বিব্রত হতে হবে না। মরণ। মরণেই আমার সমাধান।"

সমীরণ তার বন্ধুর দুটো হাত চেপে ধরে বলল, "তোমাকে বাঁচতে হবে, জয়! বলো, কী করলে তুমি বাঁচবে? তোমার শর্ত কী? তোমার জন্যে আমরা কী করতে পারি'?"

জয়দেব ভেবে বলল, "কী আর করতে পারো? আমাকে যেতে দাও। একটা মানুষ বাড়লে বা কমলে কী আসে যায় দেশের বা ধরিত্রীর?"

সমীরণ তাকে পীড়াপীড়ি করল হোটেল থেকে উঠে গিয়ে সমীরণের বাসার অপর অংশ ভাড়া নিতে। তা হলে চোখে চোখে রাখতে পারবে তাকে।

"আমার কি অসাধ! কিন্তু দুটি জিনিস আমাকে দিয়ে হবে না। মাটিতে বসতে পারব না। পঁচিশ বছর বসিনি। দিশী ধরনের পায়খানায় যেতে পারব না। পঁচিশ বছর যাইনি। সত্যি আমার কষ্ট হয়। তোমরা বলবে সাহেবিয়ানা।" জয়দেব বন্ধুকে ধন্যবাদ জানালো। কিন্তু রাজী হলো না।

তখন সমীরণ আর করে কী! কলেজ থেকে এক মাস ছুটি নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল। অবশ্য আগ্রাকেই। রাত্রে বাড়ী গিয়ে শোয়। বাকী সময়টা ওকে চোখে চোখে রাখে।

এর ফলে জয়দেবের মনের আর একটা দিক অনাবৃত হলো। এত দিন হয়নি যে এইটেই আশ্চর্য। আগে যেমন ও কথায় কথায় মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলত এখন তেমনি আর একটি প্রসঙ্গ। কথায় কথায় সেক্‌স্‌। ঘোরতর নিন্দা করত,

আদৌ অনুমোদন করত না, তবু পঞ্চাশ বার মুখে আনত। কান দুটো লাল হয়ে উঠত সমীরণের। পণ্ডিত হলে কী হয়, কাণ্ডজ্ঞান এত কম যে অন্য লোক শুনছে কি না গ্রাহ্য করত না। এক দিন তো কুমকুমের সাক্ষাতেই এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করল যে কুমকুম দৌড় দিয়ে উঠে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। ভাগ্যিস ছেলেমেয়েরা তখন বাড়ী ছিল না।

"জয়, তোমাকে আর একটা থেরাপি পরীক্ষা করতে হবে। আমার বৌ বার বার বলছে। আমি বলতে চাইনি, বিশ্বাস করিনি, কিন্তু মনে হচ্ছে তোমাকে বাঁচাতে হলে মেয়েলি টোটকাও কাজে লাগতে পারে।"

"কে বলছেন? বৌদি? তা হলে তো অবশ্য শুনতে হয়।"

"হাঁ। কিন্তু কী করতে বলছে, জানো?"

"কী?"

"আর একবার বিয়ে।"

জয়দেব মনে মনে খুশি হলো। বাইরে এমন ভাব দেখাল যেন ফাঁসীর হুকুম হয়েছে। তার পরে যা বলল তা সমীরণের কাছে নবসংবাদ!

বছর দুই আগে মুসৌরী বেড়াতে গিয়ে সে তার বন্ধু শার্দুল সিং-এর অতিথি হয়। শার্দুল তাকে নিয়ে যায় নিজের বন্ধুর বাড়ী আলাপ করিয়ে দিতে। সেখানে তার নিমন্ত্রণ হয় ডিনারে। বুফে ডিনার। যে যার প্লেট হাতে করে টেবল পরিক্রমা করতে করতে যার যা রুচি তুলে নেয়। প্লেট ভরে গেলে কোথাও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বা চক্কর দিতে দিতে পেট ভরাতে হয়। খবরদার, বসতে পারবে না। ত্রিসীমানায় চেয়ারও নেই যে বসবে। এ হলো দাঁড়ানো ভোজ।

জয়দেব অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে অভ্যস্ত নয়। কোথাও বসতে পারে কি না খুঁজতে খুঁজতে বাইরের বারান্দায় গিয়ে হাজির হলো। দেখল অন্ধকারে আরেক জন বসে খাচ্ছে। মেয়েটি তার অবস্থা অনুমান করে বলল, "আসুন, বসুন। ধরা যদি পড়ি তো এক সঙ্গে পড়া যাবে। আমি বলব, ইনি বসেছিলেন দেখে আমি বসেছি। আপনি বলবেন, ইনি বসেছিলেন দেখে আমি বসলুম। আপনি কি বাঙালী?"

মেয়েটিও তাই। বাঙালী না হলে এমন ক্লেশকাতর কে হবে! পরিচয় দেওয়া নেওয়া হলে জয়দেব আবিষ্কার করল মেয়েটি আর কেউ নয়, ফুল। তার প্রথমা প্রিয়া। ফুল, যার সঙ্গে বিয়ের ফুল ফুটল না। সে অনেক কথা।

সমীরণ কিছু কিছু জানে। সেই ফুল এখন বিধবা হয়ে পশ্চিমের একটি কলেজে অধ্যাপনা করছে। ছেলেমেয়ে হয়েছিল, জীবিত নেই। সেও এখন নিঃসঙ্গ।

কী সুন্দর হয়েছে তাকে দেখতে! পরিপূর্ণ গড়ন। পূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদল। বয়স চল্লিশ হবে। বয়সেরও একটা মহিমা আছে। এ মহিমা আঠারো বছর বয়সে ছিল না। জয়দেব অন্ধকার বারান্দা থেকে আলোয় নিয়ে এলো তাকে। তার প্লেট আবার ভরে দিল। এবার মিষ্টিতে। আহা, তার জীবন যদি ভরে দিতে পারত আবার! এবার মাধুরীতে!

সেই দিনই লোকচক্ষের আড়ালে প্রস্তাব করল তার কাছে, "ফুল, তুমিও একাকী, আমিও একাকী। এসো, এ নিঃসঙ্গতা ভঙ্গ করি।"

"তার মানে কী? বিয়ে?" ফুল চমকে উঠল।

"হাঁ। বিয়ে। না করে যে ভুল করেছি করে সে ভুল সংশোধন করব।"

"ছি! তা কি হয়! তোমাকে বিশ্বাস রক্ষা করতে হবে না স্মৃতির কাছে! আমাকে অজিতের কাছে? ইচ্ছা করলে আমরা বিয়ে করতে পারতুম যখন ওরা ছিল না। এখন ওরা নেই বলে কি আমরা বিয়ে করতে পারি!"

সমীরণের মুখে কাহিনীটা শুনে কুমকুম বলল, "এখন বুঝতে পারছি ওঁর কী হয়েছে। কেন হয়েছে। কিন্তু ফুলটি কে? চেনো নাকি?"

"চিনতুম। গরিবের মেয়ে। অরক্ষণীয়া। বাপ পণ দিতে পারে না। জয়দেব বিনা পণে বিয়ে করতে রাজী। কিন্তু ওর বাবা নারাজ হলেন। ছেলে ভালো পাস করে জলপানি পেয়েছে, বিলেত যাবে, ফিরে এলে হবে সোনার খনি। বাংলাদেশের দিক্‌পাল ছেলের বিয়ে দেবেন তিনি শুধুমাত্র সুন্দর মুখ দেখে? বিনা পণে বিয়ে করতে হয়, সমীরণ রয়েছে, ও তো ওই সব করে বেড়ায়, রোগীর সেবা, বন্যাপীড়িতের সাহায্য, আরো কত কী।"

কুমকুম হেসে বলল, "তা তুমি করলে পারতে। কেমন সুন্দরী বৌ পেতে।"

"তার বেলা দেখা গেল ওর বাপ জহুরী বটে। রূপের কদর বোঝেন। অমন সুন্দর মেয়ের বিয়ে উনি যার তার সঙ্গে দেবেন না। হলোই বা অরক্ষণীয়া। জয়দেব বিলেত চলে গেলে ওর বিয়ে হয়ে গেল লখনউ প্রবাসী এক ডাক্তারের সঙ্গে। দোজবর।"

"তোমার জন্যে সত্যি দুঃখ হয়। কিন্তু কী করবে, বলো! তোমার কপালে লেখা ছিল আমার সঙ্গে বিয়ে, যেমন জয়দেবের কপালে লেখা ছিল স্মৃতির সঙ্গে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে জয়দেব আর ফুল কী করবে?"

"কী আর করতে পারে! মাঝখানে যেসব ঘটনা ঘটে গেছে সেসব কি এত সহজে মুছে ফেলা যায়? ফুল আর বিয়ে করবে বলে মনে হয় না। জয়দেব করলেও করতে পারে। অন্য কোনো মেয়েকে।"

"তা হলে সেই পরামর্শ দাও ওঁকে। আর দেরি করে ফল কী হবে? দিন দিন বিয়ের অযোগ্য হয়ে উঠছেন না?"

সমীরণ বলল, "অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হলে ওর বিয়ে হয়ে যেত অনেক দিন আগে। আমার মনে হয় ও ফুলের জন্যেই অপেক্ষা করছে। করতে থাকবে, যদি বেঁচে থাকে।"

কুমকুম পরামর্শ দিল, "তুমি বরং ফুলকে একখানা চিঠি লেখো। কেউ যদি ওঁকে বাঁচাতে পারে তো সে তোমার ওই ফুল।"

সমীরণ রাত জেগে লিখল একখানা চিঠি। স্ত্রীকে পড়তে দিল, বন্ধুকে দিল না। দেখা যাক ফুল তার কী উত্তর দেয়। যদি কোনো আশা না থাকে তা হলে জয়দেবের অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। কী ব্যবস্থা তা পরে ভাবা যাবে।

ফুল উত্তর দিল। দীর্ঘ উত্তর। তাতে তার জীবনের সব কথা ছিল। বিধবা হয়ে সে কত কষ্টে পড়াশুনা করেছে, পড়াশুনা করে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে। তার চাকরি তার কাছে এত মূল্যবান যে বিয়ের জন্যে সে তা ছাড়বে না। চাকরিও করবে ঘর সংসারও করবে, এমন যদি হতো তা হলে হয়তো বিয়ে করবে কি না ভেবে দেখত। কিন্তু জয়দেবের মতো বড়লোক স্ত্রীর কর্মস্থানে অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকতেন না। কীই বা কাজ আছে যা তিনি করতে পারতেন!

আর একটা কথাও সে 'পুনশ্চ' দিয়ে লিখেছিল। জয়দেব হয়তো ছেলেমেয়ে চাইবেন। সে কিন্তু আর মা হতে চায় না।

চিঠিখানা কুমকুমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সমীরণ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। জীবন কেন এত জটিল! যা হওয়া উচিত কেন তা হয় না! হলে কত ভালো হতো! তবু হবে না।

কুমকুমও গম্ভীর হয়ে গেল চিঠিখানা পড়ে! মাথা নেড়ে বলল, "কোনো আশা নেই। তুমি অন্য চেষ্টা দেখ।"

সমীরণ বন্ধুকে জানতে দিল না ফুল কী লিখেছে। এমনি কথায় কথায় বলল, "জয়, তোমার বৌদিদির মতে তোমার আবার বিয়ে করা উচিত।"

জয়দেব আগ্রহের সঙ্গে সুধালো, "কাকে? কাকে?"

"যাকে তোমার ভালো লাগে। মেয়ে দেখতে চাও তো দেখাতে পারি। এই আগ্রা শহরেই বহু বাঙালী পরিবার আছেন। বিবাহযোগ্যা কন্যাও অনেক। বয়ঃস্থা পাত্রীও বড় কম নেই। চল না, বিনা নোটিসে বাড়ী বাড়ী কল করা যাবে। প্রবাসী বাঙালীর এত বড় সুহৃদ আর নেই, এই বলে আমি তোমার পরিচয় দেব। তার পরে তোমার ডি. লিট. ইত্যাদির উল্লেখ করব।"

জয়দেব দু'হাত তুলে নমস্কার করে বলল, "না, ভাই। জীবনে আর ও পাট নয়। বিয়ের আগে ওসব ঢের হয়েছে। আমাকে যেতে দাও।"

সমীরণ বুঝতে পারল জয়দেব সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে। যেমন কাজকর্মের চেষ্টা তেমনি বিবাহের চেষ্টা! ওর দিক থেকে উদ্যম নেই, উদ্‌যোগ নেই। বন্ধুরা যদি তৎপর হয়ে কিছু করতে পারে করুক। ওর মনের মতো হলে ও সায় দেবে, না হলে দেবে না। তিলে তিলে মরবে।

"অদ্ভুত লোক।" মন্তব্য করল কুমকুম।

"কিন্তু আমি ভাবছি কী করে ও বাঁচবে!" সমীরণ মুখ ভার করে রইল।

"ভগবান জানেন। তুমি আমি কী করতে পারি!"

"এখনো একটি পদক্ষেপ বাকী আছে। সেইটি নেওয়া যাক।"

"সেটি কী?"

"ফুলের চিঠিখানা ওকে পড়ে শোনানো।"

কুমকুম বলল, "তার আগে একবার ওঁর হার্ট পরীক্ষা করা দরকার। কে জানে, যদি হার্ট ফেল করে মারা যান!"

সমীরণ ভয়ে ভয়ে চিঠিখানা পকেটে পুরে জয়দেবের হোটেলে চলল। সবটা ওকে পড়ে শোনাতে হবে না। যেটুকু ও সইতে পারবে সেইটুকুই শোনাবে।

জয়দেব শেক্‌স্‌পীয়ার থেকে আবৃত্তি করছিল। "টু বি অর নট টু বি।" হ্যামলেটের সেই প্রসিদ্ধ স্বগতোক্তি। সমীরণকে দেখে বলল, "তার পর, হোরেশিও! কী সমাচার? তোমার ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা বড় কেক কিনেছি আজ।"

সমীরণ তাকে আস্তে আস্তে প্রস্তুত করে নিল। তারপরে চিঠিখানা খুলে পড়ল। ভয় করেছিল জয়দেব আঘাত পেয়ে মুষড়ে পড়বে, হয়তো মূর্ছা যাবে। কিন্তু যা দেখল তা অবিশ্বাস্য। খপ করে চিঠিখানা ছিনিয়ে নিয়ে জয়দেব বুকে ধরল। তার চোখে আনন্দের অশ্রু। মুখ দিয়ে কথা সরে না।

"তা হলে, হ্যামলেট। কী করবে?"

"ফুল যা করতে বলবে তাই করব। সব ছেড়ে দিয়ে ওর কাছে থাকতে বলে, থাকব। ওকে ছাড়তে হবে না কিছু।"

"তা হলে তুমি বাঁচবে তো?"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়। ফুল যদি বাঁচায় নিশ্চয় বাঁচব।"

"কিন্তু মনে রেখো," সমীরণ তাকে সতর্ক করে দিল, "ও চাকরি ছাড়বে না। লখনউতে ওর নিজের জায়গায় থাকবে। তুমি পারবে লখনউতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে? ওখানকার সমাজে হাস্যাস্পদ হতে? সেবার ঘরজামাই হয়েছিলে, এবার ঘরস্বামী হতে?"

জয়দেব গদগদ স্বরে বলল, "পারব, পারব। সব কিছু পারব। ফুল রাজী হলে আমিও রাজী। এতদিন লুকিয়ে রেখেছ। বলোনি কেন?"

"কিন্তু, জয়, পরে যেন অনুতাপ করতে না হয়। ও তো স্পষ্ট বলে দিয়েছে, তুমি হয়তো ছেলেমেয়ে চাইবে, ও কিন্তু মা হবে না আর।"

"না হলেও আমার নালিশ করবার কিছু থাকবে না। সকলের কি ছেলে-মেয়ে হয়! কত মেয়ে বন্ধ্যা! কত পুরুষ বন্ধ্য!"

সমীরণ ভেবেচিন্তে বলল, "বেশ, তা হলে তাই হোক। এখন তুমি সোজা লখনউ চলে যাও। ফুলের সঙ্গে মোকাবিলা করো। চিঠিপত্রে পাকাপাকি হতে পারে না।"

"তুমি যাবে আমার সঙ্গে?"

"কেন? দরকার আছে?"

"গেলে ভালো হতো।"

সব কথা শুনে কুমকুম বলল, "আশ্চর্য লোক। এমন স্ত্রৈণ আমি দেখিনি। তুমি যদি ওঁর সঙ্গে যাও তুমিও পত্নীব্রত হবে। আমার কিন্তু কী মনে হয়, জানো? ফুল তোমাদের দু'জনকেই 'ফুল' করবে। পাঁজি দেখে যেয়ো, যাতে এপ্রিল ফুল হতে না হয়।"

চলল দুই বন্ধু লখনউ। সেই প্রথম যৌবনের মতো উৎসাহ নিয়ে।

ফুলকে চিঠি লিখে তার অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। সে তাদের অভ্যর্থনা করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল। সেখানে ফুলের বোনেরা থাকে। একজনের বিয়ে হয়নি এখনো। আরেক জন বিরহিণী, স্বামী বিদেশে।

আপ্যায়নের পালা শেষ হলে যখন কাজের কথার সময় এলো ফুল ওদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল চিড়িয়াখানা দেখাতে। লখনউর চিড়িয়াখানার চারদিকে বেড়া নেই। অতি চমৎকার নৈসর্গিক পরিবেশ। বেড়ানোর পক্ষে আদর্শ স্থান।

সমীরণই কথাটা পাড়ল। বলল, "ফুল তোমার তো মনে আছে পঁচিশ বছর আগে কী হয়েছিল। দোষটা জয়দেবের ছিল না। অবশ্য পিতার অবাধ্য হতে পারত। কিন্তু তা হলে ওর বিলেত যাওয়া হতো না।"

"সে সব যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন কী করতে হবে, তাই বলো।"

"তুমি যা বলবে। ও তোমার উপরে সমস্ত ছেড়ে দিয়েছে।"

ফুল ফিক করে হেসে বলল, "ওঃ! তাই নাকি!" তারপরে সকৌতুকে বলল, "আমি যা বলব তাই হবে?"

জয়দেব অস্ফুট স্বরে বলল, "তাই হবে।"

ফুলের উজ্জ্বল চোখ টর্চের মতো পড়ল জয়দেবের মুখে। সে চাউনি তার মর্ম ভেদ করল। ফুল বলল হাসতে হাসতে তামাশা করে, "আমি বলি তুমি আমার বোন গুল-কে বিয়ে করো। দেখলে তো আমার চেয়েও সুন্দরী। এম. এ. পাস করে বসে আছে। কাউকে পছন্দ হচ্ছে না। তোমাকে হবে, জানি।"

সমীরণ লক্ষ্য করল জয়দেব একদম ঘাবড়ে গেল। পড়ে যেত, যদি না সমীরণ তাকে ধরে ফেলত। তিন জনেই বসল একটা নিরিবিলি কোণ দেখে।

ফুল বলল, "সমীরণদা, তুমিই বলো, যার ছোট বোন আটাশ বছর বয়সেও অনূঢ়া সে যদি এমন একটি অসাধারণ সুপাত্র পায় তা হলে বোনের বিয়ে দেবে, না নিজের সুখ খুঁজবে ?"

সমীরণ বলল, "কিন্তু এই যদি তোমার মনে ছিল, ফুল, তা হলে আমাদের কেন আগে সে কথা জানালে না ?"

"জানালে কী হতো ? তোমরা আসতে না ?"

জয়দেব এর উত্তর দেবে ভেবে সমীরণ নিরুত্তর রইল। কিন্তু সেও নির্বাক। কী ভাবছে সেই জানে। বোধ হয় সেক্‌স্‌পীয়ারের হ্যামলেটের মতো "টু বি অর নট টু বি ?"

ফুল স্তব্ধতা ভঙ্গ করল। বলল, "তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, জয়। আমি যে তোমার সেবা করতে পারব সে আশা দুরাশা। আমাকে খেটে খেতে হয়, আমার অত সময় কোথায় ! আমি তো আমার চাকরিটি ছাড়ব না। কী পাবে তুমি আমার কাছ থেকে ? আর একটা কথা তো চিঠিতেই খুলে বলেছি। মুখে নাই বা বললুম।"

জয়দেব তখনো নির্বাক। মনে হলো সে ফুলের সঙ্গে একমত। সমীরণ তার বন্ধুর জন্যে রীতিমতো লজ্জিত বোধ করছিল। বিয়ে পাগলা হয়তো ফুলের বদলে গুল-কেই বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাবে। ফুলের পক্ষে কত বড় অপমান ! এক জীবনে বার বার দু'বার ! ফুল কি প্রথম বারের অপমান ভুলতে পেরেছে।

ফুল যেন হুল ফুটিয়ে দিল। "জয়, তুমি ক'বার ঘরজামাই হবে ! আমাকে বিয়ে করলে ও ছাড়া তোমার গতি নেই। আমি তোমার কলকাতার বাড়ীতে গৃহিণীপনা করতে যাচ্ছিনে। তোমাকেই আসতে হবে আমার লখনউর বাড়ীতে আমার সঙ্গী হতে। তার চেয়ে গুল-কে বিয়ে করে নিয়ে যাও। ও তোমার কোনো দুঃখ রাখবে না। তোমার ঘরসংসার দেখবে। তোমার ছেলেমেয়ের মা হবে। তোমার সেবা করবে।"

এইবার জয়দেবের মুখ ফুটল। সে সমীরণকে সম্বোধন করে বলল, "তুমিই বুঝিয়ে বোলো ফুলকে। আমি বললে কি বিশ্বাস হবে ওর ! আমি চাই স্মৃতির ধন ভোগ না করতে। তার মানে সম্পূর্ণ নির্ধন হতে। ভিখারী শিবকে বিয়ে করতে চাইবে কোন উমা। গুল কখনো রাজী হবে না। ফুল যদি রাজী হয়। হবে কি ?"

ফুল তার ডান হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে বলল, "ঈশ্বর সাক্ষী। সমীরণদা সাক্ষী। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমি ছাড়া তোমার—"

"কেউ নেই, ফুল, কিছু নেই।" জয়দেব ভেঙে পড়ল।

সমীরণ তাদের আশীর্বাদ করে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেল।

অন্নদাশঙ্কর রায়

পাশা

অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত

'এই, যাবি ?' অতসীর গায়ে ঠেলা মারল মৃদুলা।

বইয়ের থেকে মুখ তুলে অতসী হাঁ হয়ে রইল। বললে, 'কোথায় ?'

'সিনেমা।'

'সিনেমায় ? এখন ?'

'কেন, নাইট শোতে যায় না কেউ ?'

'যায় হয়তো। কিন্তু হোস্টেলের মেয়েরা নয়।'

'কেন, হোস্টেলের মেয়েরা কি রাত জাগতে অপটু ? তারা কি খুকি ?'

'না, একশোবার নয়! কিন্তু তাদের দায়িত্বজ্ঞান আছে, আছে শালীনতার চেতনা—' থমথমে মুখ করল অতসী।

'হোস্টেলের কি-একটা বাজে আইন লঙ্ঘন করতে চাচ্ছি বলেই শালীনতার অভাব হল ?'

'বাজে আইন মানে ?'

'তাছাড়া আবার কি। রাত সাড়ে আটটার মধ্যে সুড়সুড় করে বাড়ি ফিরে আসা চাই, নটাতে গেট বন্ধ, এ-বর্বর আইনের কোনও মানে হয় ?'

'যখন হোস্টেলে নাম লিখিয়েছিলি, তখন এ-আইন ন্যায্য আইন, মেনে চলবি ষোলো আনা, এ-স্বীকার করেছিলি। করিস নি ?'

'একবার যা স্বীকার করা যায়, তা আর পরে খণ্ডন করা যায় না ?'

'না।' আরও গম্ভীর হল অতসী।

'তবে সেদিন যে অরুণা বৃষ্টিতে আটকে গেল, সারা রাত কে-না-কে-এক দিদির বাড়ি বলে বাইরে কাটাল—পরদিন সকালে এসে হাজির—'

'সেটা তো দুর্ঘটনা, বৃষ্টি—'

'কিন্তু শুধু তো দুর্ঘটনা নয় অঘটনাও তো আছে। কল্যাণী তো কত রাত্রি ফেরেই না হোস্টেলে। শুনতে পাই যাদবপুরে কোন এক ভদ্রলোকের—'

'থাম। শোনা কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।' অতসী ধমকে উঠল।

'কিন্তু কোনও কোনও রাত্রে যে হোস্টেলের বাইরে থাকে, বেড়াতে বেরিয়ে আর ফেরে না, এ তো আর শোনা কথা নয়। এ দেখা কথা। তুই দেখিস নি?'

'দেখলেই সমর্থন করতে হবে?' চোখ তেরছা করল অতসী। 'কিন্তু মেট্রন কী বলে?'

'কিছু বলে না। বলে হোস্টেলের মধ্যে কিছু না হলেই হল। বলে, আর যা কিছু কর, দেখো, গোল পাকিও না।' বলতে গিয়ে হেসে ফেলল মৃদুলা।

'কিন্তু প্রণতির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছিল মনে নেই?'

'সে প্রণতি মুখে-মুখে তর্ক করেছিল বলে। রাত্রে স্টে-এওয়ে করবার জন্যে নয়।'

'বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ফেরে না, বুঝি,তার যা হক একটা প্রজিবল কৈফিয়তও তৈরী করা যায়। কিন্তু ফিরে এসে বেশি রাতে আবার বেরোয় কে? ফিরবি যখন, তখন তো মাঝ রাত, খুলে দেবে কে দরজা?'

'দারোয়ানকে বলা আছে। দেওয়া আছে বকশিশ। সেই খুলে দেবে 'কিন্তু', অতসীর চেয়ারের পিঠটা ধরল মৃদুলা: 'কিন্তু আমি ফিরব না।'

'ফিরবি না মানে? রাত্রে সিনেমার হলে শুয়ে কাটাবি?'

'সিনেমায় যাব না।'

'সিনেমায় যাবি না? সে কি?' চেয়ারটা নড়ে উঠল শব্দ করে।

'ঘড়ি দেখেছিস? সিনেমায় যাবার সময় কোথায়? সরকারী আজেবাজে ছবিগুলিও এখন শেষ হয়ে গেছে।'

'তবে তুই যাবি কোথায়?'

'আন্দাজ কর।'

'আন্দাজ করব? ছাত্রী-মেয়ে রাতে হস্টেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে গেট খুলে সেটা ভাবাই তো কঠিন। শুনি না! যাবি কোথায়?'

চোখের পাতা নাচাল মৃদুলা। 'হোটেলে।'

'তার মানে? চাকরি নিয়েছিস সেখানে? ভোজনশেষে ভুক্ত লোকদের অবশিষ্ট হবার চাকরি?'

'চাকরি নিতে নয়, চাকরি দিতে যাচ্ছি। প্রধানতম চাকরি।'

'সে আবার কি।'

'তার মানে প্রগাঢ়তম। যাচ্ছি রণেনের হোটেলে।'

'ও তোকে বলেছে যেতে?'

'ও আবার বলবে!'

'তবে?'

'যাচ্ছি নিজের জোরে, নিজের গরজে।' চেয়ার থেকে দু পা সরে গেল মৃদুলা। 'আর ওকে বোঝাতে যে আমার গরজেই ওর গরজ।'

'হোটেলে আর-সকলে জেগে নেই? দেখবে না?'

'দেখুক। বয়ে গেল।'

'বয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, আমি তো আর কারু কাছে যাচ্ছি না, আমি যাচ্ছি রণেনের ঘরে। তার একলার এক ঘরে।'

'তোর লজ্জা করছে না বলতে?' চেয়ারটা ঘুরিয়ে মুখোমুখি হয়ে বসল অতসী।

'না আর করছে না। যা সত্য, তাই নগ্ন। আমার গায়ে যদি আগুন লাগে আর আমি যদি সব আবরণের আবর্জনা ছুঁড়ে ফেলে দিই, তা হলে তুই বলবি তোর লজ্জা করে না নির্লজ্জ হতে? বলবি? চিকিৎসা করাতে এসে লজ্জা ঢাকবার কোনও মানে হয় না।'

'চিকিৎসা?'

'হ্যাঁ, অনেক টোটকা-টুটকা করেছি, অনেক ইঙ্গিত-ইশারা, হোমিওপ্যাথিক ছোট্ট গ্লবিউল থেকে শুরু করে এলোপ্যাথিক ঝাঁঝালো মিকশ্চার পর্যন্ত, কোনও সুরাহা হয় নি। এবার সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরিকে নিয়ে যাব সঙ্গে করে।'

'কে সে?'

'শেষ চেষ্টা দেখতে হবে। সকলেই দেখে। যতই ক্লেশ হক মরীয়া হয়ে সবচেয়ে বড়, ক্রুত ডাক্তার ডাকে। আমিও মরীয়া, আমিও শেষ চেষ্টা দেখব।'

'কিন্তু ডাক্তারটা কে?'

'সেই ডাক্তার আর বেঁচে নেই।'

'বেঁচে নেই?' হাঁ হয়ে গেল অতসী।

'না ভস্ম হয়ে গিয়েছে। পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী—'

অতসী চেয়ারটা ফিরিয়ে নিল আগের কোণে। বললে, 'ভস্মে ঘি ঢালতে চলেছিস।'

মোটেই না। ভস্মের মধ্য থেকে খুঁচিয়ে স্ফুলিঙ্গ বার করতে চলেছি। আর, এককণা আগুন পেলেই দাবাগ্নি। অলসকে নিয়ে আসব বিলাসে—

'বিলাসকে?' ঘাড় বেঁকাল অতসী।

'নিয়ে আসব উল্লাসে। দেখছিস না আমার সাজগোজ?'

'তুই এমনি করে নিক্ষেপ করবি নিজেকে?'

'সুন্দর বলেছিস কিন্তু।' অতসীর কাঁধের উপর হাত রাখল মৃদুলা। 'নিক্ষেপ করব। লাফের আগে দেখব না তাকিয়ে। ঝাঁপিয়ে পড়ব অন্ধকারে।'

'এতটুকু ধৈর্য নেই?'

'তুই কি বুঝবি। তুই তো পতঙ্গ হয়ে দেখিসনি বহ্নি। সংক্ষেপ করতে চাই, তাই আমি নিক্ষেপে প্রস্তুত।'

'রণেন জানে, যাবি?'

'জানতে দিইনি ঘুণাক্ষরে। ওকে এক-মুহূর্ত সতর্ক হবার সময় দেব না। ধ্বসের মত নেমে পড়ব। অন্ধ সাইক্লোন হয়ে ধাঁধিয়ে দেব ওর অনুভবের শক্তি—'

'যদি গিয়ে দেখি ও ফেরে নি, দরজা বাইরে থেকে তালা দেওয়া, অপেক্ষা করব।'

'তোকে না যেতে ও বারণ করে দিয়েছে?'

'তখন ঝিরঝিরে হাওয়া ছিলাম।' একটু নড়ল-চড়ল মৃদুলা। ঝড়কে কে বারণ করে? বুক পেতে বরণ করবে। যা অবারণ তাই বরণীয়? আর যদি গিয়ে দেখি, ঘরে আছে?

'নক করবি?'

দুদ্দাড় শব্দ করে দরজা খোলাব।

'যদি না খোলে?'

'লঙ্কায় কী আগুন লেগেছে জানি না, কিন্তু আমি লেজের আগুনে জ্বলছি, আমার উপশম কই? দরজায় মাথা কুটব, কাঁদব, মিনতি করব। কেন খুলবে না? রুগ্নের জন্য, বিপন্নের জন্য এতটুকু দয়া হবে না তার?'

'বেশ যদি খোলে!'

'তক্ষুনি ঢুকে পড়ে দরজায় খিল চাপিয়ে দেব। হাত বাড়িয়ে দেব সুইচ অফ করে। তাকে জড়িয়ে ধরব, বলব, এ-রাত তোমার ঘরে ভোর করতে এসেছি—'

'ব্যস, আর কোন কথা নেই ?'

'কী হবে অনর্থক প্রলাপে ? অন্ধকারই কথা কইবে। উত্তুঙ্গের সঙ্গে গভীরের সম্ভাষণ।'

'ছি ছি ছি ছি। এই কি ভদ্রতা শালীনতা ?'

'আহা-হা, রাখ তোর টিপ্পনী। ভদ্র প্রেম, বৈধ প্রেম, শুদ্ধ প্রেম এমন কিছু আছে নাকি সংসারে ? ভদ্র প্রেম না সোনার পাথরবাটি। বৈধ প্রেম না কাঁঠালের আমসত্ত্ব। আর শুদ্ধ প্রেম, কি বলব, অশ্বডিম্ব। প্রেম প্রেম। প্রেমের কোনও বিশেষ্য-বিশেষণ নেই।'

'কিন্তু ধর, যদি তোকে গোড়াতেই তাড়িয়ে দেয়।'

'তারই জন্যে তো তোকে সঙ্গে নিতে চাইছি।'

'আমাকে ?'

'নইলে তোর সঙ্গে এত বকবক করছি কেন ?'

'আমি লঙ্কারও নেই লেজেও নেই—এর মধ্যে আমি কোথায় ?'

'তুই আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবি। ও তোকে দেখে বুঝবে, আমি হঠকারী নই, হিতৈষী বন্ধুদের সমর্থনেই আমার আসা। আমার দাবি।'

'বেশ, বলছিস যা হক।'

'হ্যাঁ, আরেকটি মেয়ে আমার সঙ্গে আছে, প্রথমটা ওর চোখে বেশ সরল দেখাবে। আমার মতলব সম্বন্ধে মোটেই হুঁশিয়ার হতে পারবে না। তারপর ঘরে ঢুকে ব্যগ্র হাতে যখন খিল চাপাব—'

'তখন আমার কাজ ফুরিয়েছে, আমি ফিরে আসব একা-একা।'

'বন্ধুর জন্যে কষ্ট একটু না-হয় করলিই বা ! আর কষ্ট না ছাই ! এই তো দু-তিন মিনিটের পথ—দারোয়ান গেট খুলে দেবে বলা আছে।'

'আমি তো ফিরে এলাম, কিন্তু তোকে, প্রথমে না হক, সব শেষ হবার শেষে, যদি তাড়িয়ে দেয় মাঝরাতে ?'

একটুও ভয় পেল না মৃদুলা। বললে, 'তখন তো ফাঁসির দড়ি পরে নিয়েছি গলায়, তাড়িয়ে দিলে নিজেকেও বেরিয়ে পড়তে হবে সঙ্গে সঙ্গে।'

'হঠকারিতার একটা সীমা আছে।'

'হ্যা আছে। আত্মসমর্পণই তার সীমা। সর্বশ্রেষ্ঠ যে ধনী, সর্বোত্তম যে বীর, কী সে দিতে পারে শেষ পর্যন্ত? ওই, ওই আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণই সেরা ধন, সেরা শক্তি। তাই এবার আমি দিয়ে দেব উজাড় করে।' আবার দু পা হাঁটল মৃদুলা: 'যা অলঙ্ঘ্য অনিবার্য, তাকে নইলে পাই কি করে বল?'

'কেলেঙ্কারি করবি তুই। ও নিশ্চয়ই পুলিশ ডাকবে।'

'ডাকবে?' চেয়ারের পিঠ ধরে থামল মৃদুলা: 'সত্যি? তাই ডাকুক। সত্যি-সত্যি একটা কেলেঙ্কারি হক। লোক-জানাজানি হক। উঠুক খবরের কাগজে। দরকার হয়তো দাঁড়াই গিয়ে আদালতে।'

'আর তুই ভাবছিস আমি যাব তোর সঙ্গী হয়ে, তোর ঘটকালি করতে?'

'না গেলি। নাই বা দূতী হলি। আমি একাই যাব। তুই ক্ষুদ্র, তুই লঘু, তোর অল্পে তুষ্টি, তুই বুঝবি কি করে এই অধ্যবসায়ের সুখ? তুই তো এক বিধি-নিষেধের পুঁটলি, কি করে জানবি তুই এই সর্বস্বপণ পূর্ণাহুতির আস্বাদ? ভাণ্ডার লুঠ হয়ে যাবার স্ফূর্তি? নিঃস্বতার ঔজ্জ্বল্য?'

আলো নিবিয়ে দিল অতসী।

আশ্চর্য, অন্ধকারেই বেরিয়ে গেল মৃদুলা।

'হৃদয়ে প্রেমের সমুদ্র নিয়ে জাগব অথচ স্তব্ধ থাকব, উত্তাল হব অথচ উদ্বেল হব না, এ পারব না সইতে। আর চড়াই-উতরাই চলছে না, এবার স্থির লক্ষ্যে সেই পূর্ণতায়, সেই পরাকাষ্ঠায় গিয়ে পৌছুব।'

'থামব না, ছাড়ব না, ফিরব না কিছুতেই। ঢিমে-তেতালা ঢোঁড়া সাপ হব না, ফণাতোলা ছোবল-মারা কেউটে হব। দংশন না হলে গরল নেই। সজীব সংযোগ না হলে সিদ্ধি নেই।'

'খবরদার, যাস নি মৃদুলা।'

'তুই তো বারণ করবিই। তুই আমার শত্রু।'

মফঃস্বলী কলেজ, ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল মৃদুলা।

মাকে বললে, 'রণেনদাকে বলো না আমাকে একটু সাহায্য করবে। চারদিকে অন্ধকার দেখছি।'

মায়ের গ্রামসুবাদে কোন এক দাদার ছেলে রণেন। গেল বছর বেরিয়ে গেছে ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে। হাতে একটা চাকরি এসে পড়তেই লুফে নিয়েছে চটপট।

'দেখিয়ে দিতে পারি মাঝে মাঝে। কিন্তু পিসিমা, ও একা নয়।' রণেন আবদারের সুরে বললে, 'অন্তত আরেকজন ওর সঙ্গে পড়ুয়া চাই।'

একা হবার সাহস নেই। ভীরু, ঠুনকো। যেন একাধিক হলেই ভিড়, আর ভিড় হলেই আলগোছ হবার সুবিধে।

এক পাড়ার মেয়ে, অতসীকে জোটাল মৃদুলা।

অতসী বললে, 'গোড়াতে শখ করে নিয়েছি বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাখতে পারব, এমন মনে হচ্ছে না।'

'গোড়াতেই শেষের কথা বলতে যাওয়া কোনও কাজের কথা নয়। একদিন মরব বলে এখুনি কান্না জুড়ে দিই আর কি।'

কিন্তু যা ভেবেছিল, অনার্স ছেড়ে দিল অতসী। বললে, 'পায়ের ঢেঁকি কি চড়ে ওঠে?'

'তুমিও ছেড়ে দেবে নাকি?' মৃদুলাকে জিগগেস করল রণেন।

'পরীক্ষা ছাড়তে পারি, কিন্তু পড়া ছাড়ব না।'

'তার মানে?'

'তার মানে যার বুদ্ধি আছে, সে বুঝুক।'

'যার বুদ্ধি নেই?'

'সে শুধু পড়াক।' হাসল মৃদুলা।

বই বন্ধ করল রণেন। বললে, 'আজ এই পর্যন্ত।' তবু মৃদুলা ওঠে না। 'সে কি? বাড়ি যাও এবার।'

'বলেছি তো, পরীক্ষা ছাড়লেও পড়া ছাড়ব না। তার মানে বোকাও বোঝে। তার মানে আপনাকে ছাড়ব না।'

'আজকে তো ছাড়।' চেয়ারে দুদ্দাড় শব্দ করে উঠে পড়ল রণেন।

আরেকদিন, পড়াচ্ছে, রণেন লক্ষ্য করল মৃদুলার পড়াতে কান নেই। গালে হাত দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে।

'ও কি, শুনছ না?' রণেন ধমকে উঠল।

'না। দেখছি।'

'কী দেখছ?'

'আপনার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শব্দগুলো। যেন তারা ফুটছে আকাশে। সত্যি আপনি কী সুন্দর—কথা সুন্দর?'

বই বন্ধ করল রণেন।

'এবার কী দেখছ?

"শুধু আকাশ।"

দুদ্দাড় শব্দে আবার উঠে পড়ল রণেন। বললে, 'ফাঁকা আকাশে কিছু হবে না, শুকনো মাটি চাই, নিরেট মজবুত মাটি।'

কি বুঝল কে জানে, মৃদুলা পরদিন কাঁদতে বসল।

প্রথমে টের পায় নি, শেষে ফোঁপানির শব্দে চোখ তুলল রণেন। 'এর মানে? কান্না কিসের?'

সানাই আর বাজায় না, শুধু ধানাই-পানাই করে।

শেষে বললে অনেক কষ্টে, 'আমার পড়তে ভালো লাগে না।'

'খুব ভালো কথা। পড়ো না।' বই বন্ধ করল রণেন।

আশ্চর্য, কথার পিঠে একবারও জিজ্ঞেস করলে না, কী ভালো লাগে! মৃদুলা ভাবল, লোকটা কি আকাট?

বরং বললে উল্টো কথা: 'তবে আর বসে আছ কেন?'

'না, উঠব না।' ভীরুতাকে সংক্রামক হতে দেবে না মৃদুলা। দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'কথাটা শেষ করে যাব।'

'হায় হায় কথার কি শেষ হয়?' একটু কি হাসল রণেন?

'তবু বলতে পারার শেষ হয়?'

বলো।

'আমি—আমি—' ঢোক গিলল মৃদুলা, তাকাল উপরে-নিচে। এর চেয়ে বোধহয় বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া সহজ। বললে, 'আমি ভালবাসি।'

'অপূর্ব কথা।' এবার কেন কে জানে জিগগেস করে ফেলল রণেন: 'কাকে?'

'তোমাকে।'

'আমাকে? না, তোমার নিজেকে?'

'তোমাকে?'

'বেশ তো বাস না।' যেন কোন ঝঞ্ঝাটে রাজি নয় এমনি নিস্পৃহভাবে বললে রণেন। 'আপত্তি কি। মনে মনে বাসো। সে বাসায় কোন দিন বাসি নেই।'

রণেনের পুরনো কথা আবৃত্তি করল মৃদুলা : 'ফাঁকা আকাশে আমি বিশ্বাসী নই, আমি শুকনো কঠিন মাটি চাই।'

'তার মানে ?'

'তোমাকে চাই।'

'আমাকে ?' আঙুলটা বুকে না রেখে পেটে রাখল রণেন : 'শেষকালে না উল্টা বুঝিলি রাম হয়! চড়বার জন্যে ঘোড়া চেয়েছিল, বইবার জন্য ঘোড়া পেল।'

'বেশ, বইবই সারা জীবন। কিন্তু ঘোড়া যদি আমাকে চায় তবে সে কাঁধে না উঠে নিজেই আমাকে পিঠে তুলে নেবে।'

'তার মানে শুধু তোমার একার চাওয়াতেই হচ্ছে না।' রণেন তাকাল স্থির চোখে।

'না, আমার একার চাওয়াতেই হবে। কেননা তুমি আমাকে চাও এও যে আমারই চাওয়া।'

'তবে, হরে-দরে, আমারও একটা চাওয়া আছে ?'

'আছে।'

'তবে এই আমি চাই যে তুমি আর এসো না।' দরজার দিকে মুখ করল রণেন।

কিন্তু এই উপেক্ষার অর্থ কী ? ব্রহ্মচর্য না অপৌরুষ ? না কি নিষ্ক্রিয় নির্ব্যূঢ় মূর্খতা!

যেচে প্রেম হয় না, নেচেও হয় না হয় তো, কিন্তু নিয়ত প্রযত্নে কী না হয় ? মাটির কলসী রাখতে-রাখতে পাথর পর্যন্ত ক্ষয়ে যায়।

'এ কি, তুমি আবার এসেছ কেন ?' ঘরের মধ্যে মৃদুলাকে দেখে বিরক্ত হল রণেন।

'পড়তে আসি নি। যেটুকু পড়িয়েছ তাতেই পুড়িয়েছ যথেষ্ট।' সাহসে ঝলমল করতে করতে চেয়ারে বসল মৃদুলা। 'তোমাকে একটু দেখতে এসেছি। যাকে ভালবাসা যায় তাকে একটু দেখাও কি দোষের ?'

'ভালবাসা কি দূর থেকে হয় না ? দেখতে চাও তো রাস্তা থেকেও তো দেখা যায়। এত কাছে এসে উপর-পড়া হবার দরকার কি !'

'রণেন, আমার প্রেম অতীন্দ্রিয় নয়, রতীন্দ্রিয়। তুমি কেন আমাকে চাইবে না ? আমি কি এতই বাজে, এতই কুচ্ছিত ?'

'কে তা বলছে!' ঢোক গিলল রণেন: 'কিন্তু আমার ভালবাসা ঐশ্বরিক।'

'ঈশ্বর ফিশ্বর মানি না।'

'ঈশ্বর না মানলেও ঐশ্বরিক প্রেম মানা যায়।'

'বাজে কথা। আমি জানি তুমি ওসব মানো না। তুমি সাফল্য চাও, সংসার চাও, সন্তান চাও। আমি—আমিই সব দিতে পারব তোমাকে।'

'কিন্তু আপাতত শান্তি চাই।'

'তুমি যদি আমাকে ফিরিয়ে দাও আমি মরে যাব।'

'মরেই যদি যাবে, এ দেহায়তন ভোগ করবে কি করে? মন্মথের মন মন্থন করবে কি করে? যাও পরীক্ষার বেশি দেরি নেই।'

মরলও না ফিরলও না মৃদুলা। চিঠি ছাড়তে লাগল। উত্তর দিল রণেন। কিন্তু সে উত্তর আর কিছুই না, পুঞ্জীকৃত ঔদাসীন্য। পিণ্ডীকৃত হিতকথা।

হামাগুড়ি দিয়ে পালোনো যাবে না, দু পায়ে ছুটতে হবে। রণেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এল কলকাতা। ঠিক করল শেষ পরীক্ষা, এম-এটা দিয়ে ফেলি।

হাতে রেস্ত কিছু ছিল, সস্তায় না গিয়ে হোটেলে এসে উঠল, একটা একক ঘরে।

কি আশ্চর্য, এখানেও পিছু নিয়েছে মৃদুলা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে, ধরতে পারে না কিছুতেই। রণেন পালিয়ে-পালিয়ে বেড়ায়, পিছলে-পিছলে সরে পড়ে।

টেলিফোন বেজে উঠল হোটেলের। রণেনবাবুকে চাই।

'কে?'

'আমি মৃদুলা। চিনতে পার?'

'পৃথুলা হলে চিনতাম। আরেকটু যদি বিস্তৃত হও।'

'আমি তোমার ছাত্রী গো—'

'ও! চিনেছি। কি ব্যাপার?'

'আমি কিছু বলতে চাই তোমাকে।'

'বল।'

'ফোনে সে সব কথা হবার নয়। একবার যেতে পারি হোটেলে?'

'ফোনে যে কথা বলা যায় না তেমন কোনও কথা নেই তোমার সঙ্গে।' রিসিভার রেখে দিল রণেন।

আছে। সেটা মৃদুলা নিজে বললে নিজেকে শুনিয়ে।

সটান সেদিন হোটেলে গিয়ে হাজির। পূর্ণ বাক্যের শেষে শান্ত একটা দাঁড়ি হয়ে নয়, ভাঙা বাক্যের মাঝখানে উদ্ধত একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে।

চারপাশ মোলায়েম দেখাবার জন্যে রণেন প্রশ্ন করল: 'কি, কোন বই-টই চাই? খাতা-পত্র?'

'না, ওসব কিছু চাই না। আমি ছাত্রী নই,' মুখে একটি প্রশস্ত হাসি মেলে ধরল মৃদুলা: 'আমি দাত্রী।'

মুখচোখ গম্ভীর করল রণেন। বললে, 'শোন, কে কী ভাববে সেটা শোভন হবে না। যা সমীচীন নয়, ছন্দোময় নয় তা সুন্দরও নয়। রাত হবার আগেই গা-ঢাকা দাও।'

তবু সেদিন শুনেছিল, গা-ঢাকা দিয়েছিল মৃদুলা।

আজ আর শুনবে না।

কেন, কেন এত উপেক্ষা, ঔদাসীন্য, এত প্রত্যাহার? শুধু ছন্দই সুন্দর? উচ্ছৃঙ্খলতা সুন্দর নয়? মেঘই মনোহর? ঝড় মনোহর নয়?

কেন, কেন রণেন জাগবে না? উঠে দাঁড়াবে না? এক স্তূপ বসনের মত বুকের মধ্যে কেন নেবে না আঁকড়ে? ও যেন একটা খেলা পেয়েছে। কিছুতেই বক্র হবে না, বিকৃত হবে না, নিষ্কলঙ্কিত থাকবে, এই এক কৌতুককর খেলা। হঠপূর্বক হটানো। ডাক্তার অস্ত্র করছে করুক, চেঁচাব না, এই এক বাহাদুরি। নিজের নির্দয়তায় নিজের কাঠিন্যে এ এক রকমের মুগ্ধতা। মুগ্ধকে মত্ত করতে হবে, মুক্ত করতে হবে'।

সমস্ত ত্রুটি মৃদুলার নিজের। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ত্রুটি নয়, আঙ্গিকের ত্রুটি।

পায়ের নিচের মাটিতে দেবে না সে আর ঘাস গজাতে। আঁকড়ে ধরবে সময়ের ঝুঁটি। লজ্জা যদি শক্তি, নির্লজ্জতাও শক্তি। আবরণ যদি শক্তি, উন্মোচনও শক্তি।

কী রহস্য, কেন তপ্ত হবে না, ভ্রান্ত হবে না, স্খলিত হবে না?

শুধু জানিয়ে সুখ নেই, জাগিয়ে সুখ।

ঘর খোলা। ভিতরে রণেন আছে?

আছে।

আর কিছু প্রশ্ন করবার নেই। স্বতঃসিদ্ধের মত ঢুকে পড়ল মৃদুলা। দরজায় খিল চাপাল। যেন আততায়ী তাড়া করছে ছুরি হাতে তেমনি ভয়ার্ত চেহারা।

'একি, এত রাত্রে? এই ভাবে?' ছাইয়ের মত মুখে বললো রণেন।

'এই ভাবে না হলে কিছু হবে না। আর ইনিয়ে-বিনিয়ে নয়, আমি এবার ছিনিয়ে নিতে এসেছি। গায়ের জোরে জিততে এসেছি এবার। গায়ের জোরে—যৌবনের জোয়ারে—'

'কিন্তু না, এ হয় না।' চারদিকে শূন্যচোখে তাকাতে লাগল রণেন।

'আমি বলছি, হয়।'

'হয়? কিন্তু আমি, আমি কী করব, আমি কী করতে পারি?' মহাজনের কাছে খাতকের মত দুর্বল অসহায় রণেন।

'তোমার যা ইচ্ছে তাই কর। বন্যতম, ভদ্রতম, যা তোমার খুশি আমাকে ধর মার কাট পিষে ফেল, পুলিসে ধরিয়ে দাও—নয়তো ঘুম পাড়াও, বুকে করে রাখ। একটা কিছু কর আমাকে নিয়ে।'

এক ঢেউ সমুদ্র যেন গণ্ডুষে নিঃশেষ হতে এসেছে।

উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল রণেন। কাশতে লাগল। এ কী কাশি! কাশি হল কবে? এ কি, যেন থামতে চায় না—

টেবিলের তলা থেকে একটা বাটি তুলে নিয়ে নিজের মুখের কাছে ধরল রণেন। টাটকা রক্ত উঠল খানিকটা।

'একি, রক্ত?' এক পা পিছিয়ে গেল মৃদুলা। 'কী হয়েছে তোমার?' সমুদ্র কি পুকুর হয়ে গেল মুহূর্তে?

'আমার টি-বি হয়েছে।' নেতিয়ে পড়ল রণেন।

'আ-হা-হা, কি ভয়ানক, শুয়ে পড় শুয়ে পড়।' আকুল হয়ে উঠলো মৃদুলা: 'তোমাকে তো তাহলে খুব ডিস্টার্ব করলাম। ছি-ছি!'

পুকুরটুকুনও কি বুজে গেল আস্তে-আস্তে?

'তুমি বিশ্রাম কর, সকালে ডাক্তার ডেক—কে দেখছে? আমি বলি কি, কলেজ-টলেজ ছেড়ে দিয়ে বাইরে কোথাও চেঞ্জে যদি যাও দিন কতক—'

আস্তে-আস্তে বার হয়ে গেল মৃদুলা।

হস্টেলে ফিরে এসে নিজের বিছানায় নিঃস্বপ্নের মত পড়ল হুড়মুড় করে।

অতসী হকচকিয়ে উঠল। প্রশ্ন করল: কি রে, চলে এলি?

চলে এসেছে তো বটেই, এটা আবার প্রশ্ন কি! প্রশ্নটা এবার চোখা করল অতসী: 'কি রে, পেয়ে এলি?

উত্তর দেয় না।

'কি রে, সর্বস্বান্ত হয়ে এলি ?'

'মোটেই না। পড়তে-পড়তে সামলে এলাম।' হাঁপধরা লোক যেন হাওয়ায় চলে এসেছে এমনি স্ফূর্তি এখন মৃদুলার: 'হারাতে-হারাতে জিতে এলাম সর্বস্ব। লোকটার টি-বি। অত কাব্য করে বলবার কি হয়েছে ? যক্ষ্মা।'

'তাই। তাই ওই ঢঙ, ওই বীরত্বের ছদ্মবেশ। দাঁত নেই বলে মাংস ছাড়া। তাই ঐশ্বরিক প্রেম, বেদান্তের বুকনি। কাঁধে মোহমুদ্গার নিয়ে ব্রহ্মচারী সাজা। কিছুতেই আমি টলি না নড়ি না, আমি অনতিক্রম্য—এই অহঙ্কারের ঝিলিক দেওয়া।'

'বেঁচে গিয়েছি। খতম হই নি, ফতুর হই নি। আস্তসমস্ত আছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁকে না মানলেও তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন।'

কদিন পরে অতসী বললে, 'জানিস আমার বিয়ে।'

'মাইরি ?' খুশিভরা চোখে জিগগেস করল মৃদুলা: 'বাগানো না লাগানো ?'

'আমরা কি বাগাতে পারি ? আমাদের ভাগ্যই লাগিয়ে দেয়।'

'কাকে করছিস ?'

'আবার ব্যাকরণ ভুল করলি। করছি না রে, হচ্ছে।'

'কার সঙ্গে ?

'তোর রণেনের সঙ্গে।'

'সে কি ? সর্বনাশ! ওর তো টি-বি—'

'না। ওটা ওর নড়া দাঁতের রক্ত।'

'নড়া দাঁত ?'

'হ্যাঁ, প্রেম পরখ করবার কষ্টি।' বললে অতসী, 'একটা সত্যকে যাচাই করবার রক্তাক্ত মিথ্যে।'

অ-নামিকা

জরাসন্ধ

হরীশ দত্ত বরাবরই একটু বেলায় উঠে থাকেন। সকাল বেলাকার দু-চারটে টাটকা রুচিকর খাবারের সঙ্গে চা-পান শেষ করবার আগেই মেয়ের ইস্কুলের বাস এসে পড়ে। তার চেহারাখানা উনি কখনো চোখে দেখেন নি, শুধু বাঁশি শুনেছেন। মাঝে মাঝে যখন সে সুর কর্ণ-পটহ ভেদ করবার উপক্রম করে, তখন মেয়েকে ডেকে দেন। সেদিনও ঠিক সেই অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কয়েকবার চেঁচিয়েও মেয়ের কোন সাড়া পেলেন না। তার বদলে দেখা দিলেন স্ত্রী।

হরীশ বললেন, খুকু কোথায় গেল? বাস এসে দাঁড়িয়ে আছে।

—তিনি যাবেন না, গম্ভীরভাবে উত্তর করলেন মানদা।

—কেন? কী হল আবার?

—কী হল তা আমি কেমন করে জানবো? রাজরাণীর মেজাজ দাসী-বাঁদীরা কবে বুঝে থাকে?

অর্থাৎ, অবস্থা কিঞ্চিৎ জটিল। হাতে একটা অসহায় ভঙ্গী করে চটিটা পায়ে গলিয়ে মেয়ের ঘরের দিকে চললেন হরীশবাবু। দরজায় দাঁড়িয়ে আর একবার ডাকলেন, জবাব পেলেন না।

মেয়ে ক্লাশ টেন-এর ছাত্রী, বয়স ষোলো-সতেরো, শাড়ীও ধরেছে কিছুদিন থেকে, কিন্তু চলা-ফেরায় কথার সুরে মাথার দোলায় 'খুকু' ভাবটা এখনো কাটে নি। পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল জানালার ধার ঘেঁসে। হরীশ এগিয়ে গিয়ে উৎকণ্ঠার সুরে বললেন, ইস্কুলে গেলি নে, অসুখ-টসুখ করেনি তো?

—না।

—দিদিমণিরা বকেছে?

—না।

—তবে কী? পড়া তৈরি হয় নি?

—ও ইস্কুলে আর পড়বো না আমি।—কণ্ঠে কিঞ্চিৎ রুদ্ধ অশ্রুর আভাস। হরীশ আর প্রশ্ন করলেন না। কাছে গিয়ে হাতখানা পিঠের উপর রাখতেই অশ্রুধারা আর বাধা মানল না।

দু'চোখে আঁচল চাপা দিয়ে খুকু যা জানাল তার মর্ম এই—ইস্কুলে একটি নতুন ঝি এসেছে, তার নাম ক্ষেমী। যখন-তখন মেয়েগুলো বিনা কাজে তাকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকে, আর সে-ও সাড়া না দিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসে। 'আমাকে দেখলেই'—কথা শেষ না করেই বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল খুকু।

হরীশ আর কথা বললেন না। এর পেছনে যে একটি করুণ ইতিহাস আছে, সেটা তাঁর অজানা নয়। কিন্তু প্রতিকারের পথ তাঁর হাতের বাইরে।

অন্য দশজন মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের মত হরীশ দত্ত সেকেলেও নন, একেলেও নন। বলা যেতে পারে, সেই দলে, যারা মেয়েদের নামকরণে তরুবালা, বিধুমুখী, নন্দরানীর স্তর পার হয়ে, শোভা, মায়া, সুলেখা, কমলার কোঠায় বিচরণ করছে। তাঁর এই একমাত্র কন্যাটির জন্যে ঐরকম একটা নামই তিনি মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর উপরে কারো কথা চলে না। গৃহিণীর পূজ্যপাদ গুরুদেব। মেয়ের জন্মের পর কী একটা দুঃস্বপ্ন দেখে মানদা গুরুকে স্মরণ করেছিলেন। তিনি এসে শিশুর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই আশ্বাস দিলেন, আর কোনো ভয় নেই মা, স্বয়ং ক্ষেমঙ্করী তোমার ঘরে এসেছেন। গুরুর ইচ্ছায় ঐ পবিত্র নামটিই যখন বহাল রইল, হরীশের মুখ গম্ভীর হলেও, যার নাম তার মুখে ছড়িয়ে পড়ল দন্তহীন নির্মল হাসি। বড় হয়ে একদিন সে হাসি যে অশ্রু হয়ে দাঁড়াবে, তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারে নি।

কন্যার নারব মর্মপীড়ার উৎস ঐ নামটি হরীশ কোনোদিন উচ্চারণ করেন নি। তাঁর কাছে ও চিরদিন 'খুকু'ই রয়ে গেছে। অন্য সকলের মুখে ক্ষেমঙ্করী ক্রমশ 'ক্ষেমী'তে রূপান্তর লাভ করল এবং স্কুলে ও পাড়ার বন্ধুমহলে ঠাট্টা-কৌতুকের খোরাক যোগাতে লাগল। চরম সংকট এল সেইদিন, যেদিন কোথা থেকে ঠিক ঐ নামে একটি ঝি আমদানি করলেন ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ, এবং মেয়েরা

কারণে অকারণে সময়ে অসময়ে যখন-তখন তাকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল।

ফিরে এসে আবার সেই খবরের কাগজে বৃথা মনঃসংযোগ করবার চেষ্টা করছিলেন হরীশ, এমন সময়ে গৃহিণীর পুনঃপ্রবেশ। বিনা ভূমিকায় বললেন, মান ভাঙাতে পারলে?

—ওর যখন ইচ্ছা নেই, নাই বা গেল একদিন।

—কিন্তু না-যাবার কারণটা শুনলে তো?

হরীশ জবাব দিলেন না, হঠাৎ কোনো একটা বিশেষ খবরে অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে উঠলেন। তারপরেই এল সেই মোক্ষম অস্ত্র, বয়ঃস্থা মেয়ের মাতারা সুযোগ পেলেই যা নিরীহ এবং নিষ্ক্রিয় স্বামীদের উদ্দেশে নিক্ষেপ করে থাকেন···মেয়ে তো ধিঙ্গি হয়ে উঠলেন, গলা থেকে নামাতে হবে না? না, খালি আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুললেই চলবে?

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। হরীশ যে এদিকটায় একেবারে নজর দেন নি তা নয়। এবার আর একটু সক্রিয় হয়ে উঠলেন। কয়েকটা সম্বন্ধ উপস্থিত ছিল। তারই একটাকে পাকাপাকি করবার জন্যে লেখালেখি শুরু করলেন। ছেলেটি ডিগ্রিধারী, কোনো একটা শাঁসালো সরকারী চাকরিতে ঢুকব-ঢুকব করছে। বাপও উচুমহলের চাকরে ছিলেন; পেনশন নিয়ে মস্ত বড় বাড়ি ফেঁদে বসেছেন নিউ-আলিপুরে। সচরাচর এসব মহলে আর একটু বেশী বয়সের, পাশ-করা, নাচিয়ে গাইয়ে মেয়েরই চাহিদা। কিন্তু এক্ষেত্রে পাত্রের মা একটু অন্য ধরনের। তার ফলে অতি-আধুনিক বাথরুম, ড্রইংরুম, প্যান্ট্রি, ল্যাণ্ডিং ইত্যাদির সঙ্গে বাড়িতে একখানা একেবারে সেকেলে ঠাকুরঘরও স্থান পেয়েছিল, এবং গৃহিনী এমন একটি বধূ খুঁজছিলেন যাকে সেখানেও বেমানান দেখাবে না, অন্তত শিখিয়ে পড়িয়ে গড়ে নেওয়া চলবে। হরীশের ঐটুকুই ভরসা। তা ছাড়া মেয়ে দেখতে সুশ্রী, এবং নাচ না হলেও গানবাজনায় মোটামুটি দখল আছে।

কনে দেখতে এলেন স্বয়ং কর্তা। অতি মিহি শান্তিপুরী ধুতির উপর গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি। কিন্তু এসব ঝঞ্ঝাটে ঠিক অভ্যস্ত নন, কখন ছেড়ে ফেলে শার্ট-ট্রাউজার আশ্রয় করে বাঁচবেন—এমনি একটা ভাব নিয়ে অতি

সন্তর্পণে হরীশের ফরাশে এসে বসলেন। কনের ডাক পড়ল। তাকে পা৷
বসিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, রবীন্দ্রনাথের কোন গানটা তোমার সব চে
ভাল লাগে, বল তো ?

ক্ষেমঙ্করী একটুখানি ভেবে বলল, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আ৷
একলা চল রে'…

—'চমৎকার !' বলে উঠলেম ভাবী শ্বশুর, আমারও ভারী প্রিয় ঐ গানটি
মাঝে মাঝে শোনাতে পারবে তো ?

ঘাড় নেড়ে জানাল, পারবে।

—ব্যাডমিন্টন খেলতে পার নিশ্চয়ই ?

—একটু একটু পারি।

—'ব্যস, তা হলেই হল।' হরীশের দিকে ফিরে বললেন, একটা টেনিস-ল৷
করেছি বাড়িটায়। টেনিসের ঝামেলা অনেক ; দু-একটা গেম ব্যাড্‌মিণ্টন অন্ত৷
না খেলতে পারলে ভাত হজম হয় না। সে দিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়াগেল।

আরো দু-একটা নিতান্ত ঘরোয়া অন্তরঙ্গ কথাবার্তার পর কর্তা বললেন
তোমার নামটা তো শোনা হল না মা-মণি ? কী বলে ডাকবো ?

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল ক্ষেমঙ্করীর। বাবার মুখের দিকে তাকা'ল
তিনি চেয়ে আছেন অন্য দিকে। তারপর কোনো রকমে ঢোক গিলে ব৷
ফেলল, ক্ষেমঙ্করী।

নিজের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ যেন আঁতকে উঠলেন ভদ্রলোক। চোখে ফু৷
উঠল কেমন একটা আতঙ্কের ছায়া। শুষ্ক কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন, আচ্ছ
এবার তুমি যেতে পার।

ভদ্রলোক লোক ভাল। 'চিঠিতে খবর দেবো'—বলে অপ্রিয় উত্তরট
এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন না। অনেক পীড়াপীড়ির পর একটি সন্দেশের এ৷
দশমাংশ কোনোরকমে মুখে তুলে কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, সবই তো ছিল ভাল
কিন্তু ঐ নামটা—বাকীটুকু শেষ না করেই থেমে গেলেন। হরীশ বোঝাতে
চেষ্টা করলেন, বিয়ের পরে মেয়ের নামের শেষ-অংশটা তো বদলে যাবেই, সেই
সঙ্গে প্রথমাংশও বদলে নেওয়া যেতে পারে।

—তা পারে। কিন্তু কী জানেন, নাম তো শুধু নাম নয়, ওটা পরিচয়
বলতে পারেন, শিক্ষা-সংস্কৃতির মাপকাঠি।—বলে, একটু থেমে মৃদু হাসির সঙ্গে
যোগ করলেন, বিবাহটা যদ্দূর সম্ভব সমান স্তরে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

রাত্রে খাবার সময় আগাগোড়া গম্ভীর হয়ে রইলেন হরীশ দত্ত। মানদা বললেন, পছন্দ করে নি, ভালোই হয়েছে। মিন্সের রকম-সকম যেন কেমন-কেমন। কনে দেখতে এসেছিস, তা এত গল্প কিসের? আদিখ্যেতা। মরুক গে, এবার তুমি সেই বনগাঁর সম্বন্ধটা দেখো। চিঠি লিখে দাও, মেয়ে দেখে যাক। ওদের আগ্রহ আছে।

এ সম্বন্ধটাও ভাল। শিক্ষিত পরিবার। ছেলে এবং বাপ দু'জনেই প্রফেসর। একজন দর্শন, আরেকজন সংস্কৃত। এ ক্ষেত্রেও বাপ এলেন কনে দেখতে। তার দু'দিন আগে থেকে হরীশ আর 'খুকু'-তে মিলে কী সব পরামর্শ হল, মানদা কিছু জানতে পারলেন না।

অধ্যাপক বরকর্তা দীর্ঘ সময় ধরে পাত্রীর কররেখা পরীক্ষা করলেন। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন চোখ, মুখ, নাক, কান, চুলের গোছা এবং পায়ের পাতা। বসিয়ে, হাঁটিয়ে, দাঁড় করিয়ে, নানাভাবে পরখ করবার পর প্রশ্ন করলেন, তোমার নামটা কী বল তো মা।

ক্ষেমঙ্করী মৃদুকণ্ঠে বলল, সবিতা দত্ত।

অধ্যাপকের কপাল কুঞ্চিত হল। হরীশের দিকে ফিরে বললেন, স্ত্রীলোকের নাম সবিতা! নামটা কে রেখেছে জানতে পারি?

—'আজ্ঞে,' বলে থেমে গেলেন হরীশ। ভয়ে ভয়ে তাকালেন পেছনে ভেজানো দরজার দিকে, কল্পনায় দেখলেন দুটি রোষকষায়িত চক্ষু। যে-রকম বাজখাঁই আওয়াজ ভদ্রলোকের, এতক্ষণ নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে যথাস্থানে। একেই বলে অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। স্ত্রীর অজ্ঞাতে, গোপনে গুরুদত্ত নামটাকে একটু আধুনিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাতেও যে আবার নতুন সমস্যা দেখা দেবে, কে ভেবেছিল?

উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন অধ্যাপক, আপনার দোষ নেই। পুত্রকন্যার নামকরণে লিঙ্গপ্রকরণ অগ্রাহ্য করাই এ যুগের ফ্যাশান। তাই আমরা ছেলের নাম রাখি শান্তি, আর মেয়ের নাম দিই সবিতা।

হরীশ মৃদু প্রতিবাদের সুরে বললেন, কিন্তু 'সবিতা' কথাটি আকারান্ত। তা ছাড়া—

বাধা দিয়ে শ্লেষ মিশিয়ে বললেন অধ্যাপক, আকারান্ত শব্দ হলেই যদি স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তাহলে 'পিতা'-ও স্ত্রীলিঙ্গ। স্বয়ং 'বিধাতা'-ও ঐ দলে পড়বেন। আপনার বোধহয় জানা নেই, মূল শব্দটি হচ্ছে সবিতৃ, যার অর্থ সূর্য। সহস্র-

লোচন মহাতেজোময় ভাস্কর—তাকেও আজ স্ত্রীলোকের আসনে নেমে আসতে হল। হায় কলিকাল!

বলে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

জলযোগের অকৃপণ আয়োজন। ব্যাকরণ-নিষ্ঠার অভাবহেতু বিরাগ যতই হোক, ভোজ্য দ্রব্যের প্রতি অনুরাগের অভাব দেখা গেল না। পাত্রী অপছন্দ করলেও, তার পিতাকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন, আধুনিক নামকরণ সম্বন্ধে শীঘ্রই একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করবেন।

এই ঘটনার পর স্বাভাবিক ভাবেই বর-সন্ধান কিছুদিন বন্ধ রইল। কিন্তু সে ঐ কিছুদিন মাত্র। উঠতে বসতে গৃহিণীর বাক্যবাণ হরীশকে আবার প্রজাপতি অফিসে নিয়ে ফেলল। ভাগ্যক্রমে উপযুক্ত পাত্রও জুটে গেল আর একটি সিভিল-ইনজিনিয়ারিং পাশ করে ট্রেনিং-এ আছে কোন ফার্মে। বাপ ডাক্তার মা লেখিকা। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে কনে দেখতে এলেন। একথা-সেকথার প আবার সেই নাম জিজ্ঞাসা। পূর্ব-বন্দোবস্ত মতো উত্তরটা এবার কনে দিল না দিলেন তার বাবা। বললেন, ডাকনাম একটা আছে, পোশাকী নাম ইচ্ছে করেই রাখি নি।

কেন বলুন তো? জানতে চাইলেন লেখিকা।

হরীশ বললেন, ভেবে দেখলাম, মেয়েদের পক্ষে বিয়েটা শুধু গোত্রান্তর নয় জন্মান্তর। নতুন ঘরে গিয়ে মানুষটাই যখন নতুন হয়ে যাবে, তখন সঙ্গে করে একটা পুরনো নাম টেনে নিয়ে গিয়ে কী লাভ? মেয়ে যদি আপনার মনে লাগে মনোমত নামও একটা আপনারাই দিয়ে নেবেন।

লেখিকা মিষ্টি-সুরে হেসে উঠলেন। গলাটা যদ্দুর সম্ভব মিহি করে বললেন সুন্দর বলেছেন কিন্তু। বিয়েটা জন্মান্তর নয়, নামান্তর। চমৎকার একটা literary flavour, মানে সাহিত্যের গন্ধ, আছে আপনার কথায়। বেশ, তা হবে; নাম আমরাই রাখবো।

—'আমরা' আর বলছ কেন? বললেন ডাক্তার স্বামী, ওটা তোমার এলাকা, তুমিই রেখো একটা দেখে-শুনে।

স্ত্রী খুশী হলেন। কথাবার্তা হয়ে গেল।

ক্ষেমঙ্করীর বিয়ে হয়ে গেছে। নাম-সমস্যা এখনো মেটে নি; কনে-পক্ষের কাঁধ থেকে নেমে গিয়ে ভর করেছে বর-পক্ষের ঘাড়ে। নিজের সৃজনী-শক্তির উপর নির্ভর না করে লেখিকা শ্বশ্রূ ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে গিয়ে ঘাঁটতে শুরু করেছেন কালিদাস থেকে আরম্ভ করে অতি-আধুনিক লেখকদের গাদা গাদা উপন্যাস। কত নতুন নতুন নাম—লিপিকা, রুচিরা, প্রহেলিকা, কুহেলিকা, দুন্দুভি, সুস্মিতা, শর্মিষ্ঠা, অরুন্ধতী, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ, বল্লরী, বাসবী, নির্বিন্ধ্যা, বেতসী, সংঘমিত্রা······মনে লাগছে না কোনটাই। ধরনা দিয়েছেন মেয়ে-ইস্কুল এবং মহিলা-কলেজের দরজায়, তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন রাজশেখরের চলন্তিকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার। পছন্দমতো নাম পাওয়া যায় নি।

ডাক্তারের ফিরতে রাত হয়। সেদিন এগারোটায় খাবার টেবিলে এসে দেখলেন স্ত্রী অনুপস্থিত, পরিবেশন করছে পুত্রবধূ। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা কোথায়?

—পড়বার ঘরে।

—এত রাত্রে আবার কী পড়ছেন?

বধূর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বলল, পড়ছেন না।

—তবে?

উত্তর না পেয়ে হেসে উঠলেন শ্বশুর, ও. নাম খুঁজছেন বুঝি?

ঠিক সেই সময়ে দেখা দিলেন গৃহিণী, কী হল? এত হাসি কিসের?

—হ্যাঁ, শোনো, আজকে একটি রুগী দেখে এলাম। নামটি ভারি চমৎকার—কানন-কুন্তলা। আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

—তা আর হবে না! তোমার পছন্দ তো! তাব চেয়ে 'কপালকুণ্ডলা, রাখলে তো আরো ভালো হয়।

—তা, যাই বল, বঙ্কিম চাটুজ্যের নামগুলো কিন্তু বেশ। কুন্দনন্দিনী, তিলোত্তমা, সূর্যমুখী, শৈবলিনী, ললিত-লবঙ্গলতা। শুধু ঝঙ্কার নয়, বেশ খানিকটা ওজন আছে শব্দগুলোর। আজকাল যারা লিখছেন, তাদের এই ওজন কোথায়? সব হালকা। শুধু রঙ আর ঢঙ। বস্তু বলে কিছু নেই।

হয়তো তাই, একটু শ্লেষের সঙ্গে বললেন গৃহিণী, তবে একথাও ঠিক, যা-কিছু একালের তাকে সস্তা আর হালকা বলে উড়িয়ে দেওয়াও একরকমের সেকেলে ঢঙ। বৌমা তুমি শুতে যাও। সেই জন্যেই আমার লেখা দেখলেই তোমার নাক কুঁচকে ওঠে।

—আহা! এর মধ্যে তোমার আমার কথা আবার এল কোত্থেকে?

উত্তাপ বাড়তে লাগল। ক্ষেমঙ্করী ততক্ষণে বিছানায় গিয়ে ঝুপ করে শুয়ে পড়েছে! পাশের ব্যক্তিটি তখন কপট নিদ্রায় নিশ্চল। সুতরাং সে-ও যথারীতি পেছন ফিরে নিদ্রার ভান করে পড়ে রইল। মিনিট পাঁচেক পরে সমীরই হার মানল। স্ত্রীর কাঁধের পাশটা ধরে এদিকে ফেরাবার চেষ্টা করে বলল, এই, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

—ছাড়ো, ঘুম পেয়েছে।

—বেশ, আমারো তা হলে ঘুম পেয়েছে, বলে সেও পেছন ফিরে পাশবালিশ আশ্রয় করল! মিনিট কয়েক কেটে গেল নিঃশব্দে। আবার হার হল সমীরের, এদিকে ফিরে বলল—এই শুনছ? আরে, শোনোই না…।

পাশ ফিরল ক্ষেমঙ্করী। স্বামীর বুকের মধ্যে সরে এসে নিবিড় বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে বলল, কী দস্যিরে বাবা। বলো, কী বলছিলে।

নাম তার আছে কি নেই, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই পাশের মানুষটির। শুধু একটা 'এই' কিংবা 'শুনছ'।

বধূর নাম-সমস্যা উপলক্ষ করে শ্বশুর-শাশুড়ীর উত্তেজিত স্বর তখনো জানালা দিয়ে ভেসে আসছিল। ক্ষেমঙ্করীর হঠাৎ মনে হল, বিশ্বসংসারে সকলের কাছেই তার নামের প্রয়োজন, নামের মধ্য দিয়েই তার পরিচয়। একটিমাত্র স্থান, যেখানে সে শুয়ে আছে সেখানে সে নামাতীত। এই একটিমাত্র মানুষের কাছে সে 'অনাম', 'অনির্বচনীয়'।

দীপেন্দ্র

একটি রাত্রি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিংশ শতাব্দীর এই অবিশ্বাস, সংশয় ও হতাশার যুগে একটি পতিত অভিশপ্ত আত্মার উদ্ধারের কাহিনী বলতে যাচ্ছি শুনলে অনেকের নাসা কুঞ্চিত, অনেকের চোখ সকৌতুক বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠবে জানি।

কিন্তু সত্যই সুব্রতের জীবনে এমনি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে।

এযুগে আমরা সবাই অন্নবিত্তর অভিশপ্ত, পতিত। আমাদের বিবর্ণ জীবনে মৃত্যুর হিমস্পর্শ লেগেছে। আমাদের আকাশ শূন্য হয়ে গেছে, পৃথিবী যান্ত্রিক প্রাত্যহিকতায় কঠিন।

এই মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কি তপস্যা আমরা করতে পারি? তপস্যায় বিশ্বাসও আমরা হারিয়েছি। শুধু একদিন সুব্রতের মত দৈবের অযাচিত অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহে অন্ধকার বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে বিদ্যুৎ-ছটায়, এইটুকুই আমাদের আশা।

কলকাতার উপর সেদিন শীতের সন্ধ্যায় গাঢ় কুয়াসা নেমেছে।

কুয়াসা নয়—তার ছলনা। ধোঁয়া ধূলির ষড়যন্ত্র। কিন্তু তার জন্যেও বুঝি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। রূঢ় বাস্তবতাকে মুছে দিয়ে সে কুয়াসা রহস্যের ইঙ্গিত এনেছে ক্লান্ত নগরের চোখে। দিনের গ্লানির কথা দিয়েছে ভুলিয়ে। সে কুয়াসার ছোঁয়ায়, মনে হয়, সমস্ত রুক্ষতার আড়ালে নগরের যে অপরূপ হৃদয় আমাদের কাছে গোপন থাকে তাই যেন অস্পষ্ট অন্ধকারে অকস্মাৎ নিজেকে প্রকাশ করেছে।

এই কুয়াসা আমাদের মনের ওপরও নামে বুঝি; প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনার শৃঙ্খল থেকে আমরা পাই মুক্তি। মনে হয় দিনের পৃথিবী এই মায়ালোকে আর

আমাদের অনুসরণ করতে পারেনি। অস্তিত্বের আর কোন পৃষ্ঠায় আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি।

খানিকক্ষণের জন্য এবার নিজেদের ভুলতে পারব যেন। ভোলাই বা কেন, সেই হয়ত সত্যকার জানা। দিনের আলোয় নিজেদের সত্তার স্পষ্ট অথচ সীমাবদ্ধ যে অর্থ আমরা পেয়েছি তাই অসম্পূর্ণ। রাত্রি সে অর্থকে প্রসারিত করে দিয়েছে।

সুব্রতের অন্ততঃ তাই মনে হয়। এই কুয়াসাচ্ছন্ন নগরের পথে নিরুদ্দেশ্য ভাবে ঘুরে বেড়াতে তার ভাল লাগে। জীবনের কাহিনী যেখানে স্পষ্টভাবে লেখা সেইদিনের পাতাগুলি মুড়ে সে যেন আর কোন অস্তিত্বের আভাস পায় এই অন্ধকারে।

যেন কোথায় আছে অনাবিষ্কৃত ব্যাখ্যা জীবনের। পৃথিবী যখন অন্ধকারে নিজের সীমা লঙ্ঘন করে তারালোক পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় সেই অপরূপ অবসরে সে-ব্যাখ্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সে-ইঙ্গিত সমস্ত মন দিয়ে গ্রহণ করবার শক্তি বুঝি তার নেই। তবু সে অনুভব করতে ভালবাসে নিজের এই অপ্রত্যাশিত বিস্তৃতি, চারিধারের রহস্য-সঙ্কেতের মাঝে।

সুব্রতকে সামান্য একটু পরিচিত করবার চেষ্টা করা যাক। বাইরের পরিচয় নয় ভেতরের—নিজেকে সুব্রত যেমন জানে।

সুব্রত যেখানে এসে পৌচেছে, সেখানে অস্তমান যৌবনের আলো এখনো আছে; কিন্তু নেই উজ্জ্বলতা। দেহের নয় মনের যৌবনই এসেছে তার ম্লান হয়ে। সে ক্লান্ত—আত্মার দুঃসহ ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। আশা, আদর্শ, প্রেরণার ভগ্নস্তূপের মধ্যে সে বাস করছে। প্রতিদিনের সূর্য্যোদয়কে সাগ্রহে অভিনন্দিত করবার উৎসাহ আর তার নেই।

এমনভাবে জীবনের ভগ্নস্তূপের মধ্যেই নির্ব্বিকারভাবে আরো অনেকে বাস করে। কোন অসন্তোষ, কোন অভাবের বেদনা তাদের থাকে না। যৌবন যে ব্যর্থ স্বপ্ন ও ভগ্ন-আশার জঞ্জাল তার যাত্রাপথে ফেলে চলে যায় তাই নিয়ে জোড়াতাড়ি দিয়ে তারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে পরিতৃপ্ত ভাবে। তারা নিজেদের পরিচয়ও জানে না।

কিন্তু সুব্রত তেমন নয়। সে জানে যে সৃষ্টি তার কাছে বিবর্ণ হয়ে এসেছে মনে আর তার রঙ নেই বলে। তার মন ধূসর হতাশায় আচ্ছন্ন। অনেক

ভাবাবেগ, অনেক অনুভূতির প্রত্যন্ত প্রদেশ ঘুরে এসেও সে কিছু পায়নি সঞ্চয় করে রাখবার মত। সমস্ত জীবনকে ছন্দোবদ্ধ ভাবে বেঁধে রাখা যায় এমন কোন বিশ্বাসের সম্বল তার নেই।

মনের এই নীরব নিরবচ্ছিন্ন উষরতার মধ্যে হাঁপিয়ে উঠতে হয় একদিন।

রাত্রির এই কুয়াসা-স্নিগ্ধ সান্ত্বনার জন্যে তখন বেরুতে হয় পথে। হোক তা কুয়াসার ছলনা মাত্র।

সুব্রত এরিমধ্যে অনেকখানি ঘুরেছে উদ্দেশ্যহীনভাবে। কলকাতার রাস্তাগুলি এক একটি আলাদা জগৎ—তাদের নিজস্ব বিভিন্ন রূপ আছে—বুঝি পৃথক আত্মাও আছে। দিনের আলোর প্রয়োজনের শাসনে তারা এক হয়ে থাকে, তারপর রাত্রির সম্মোহনে নিজেদের তারা উন্মুক্ত করে দেয়। তখনই পাওয়া যায় তাদের সত্যকার পরিচয়।

হঠাৎ দেখতে পাওয়া যায় দীর্ঘ একটি থারা প্রাচীর সমেত বাড়ী কোন রাস্তাকে অদ্ভুত একটি ব্যঞ্জনা দিয়েছে। দিনের বেলা যে গাছ চোখেও পড়েনি রাত্রে হঠাৎ সে-ই কোন পথের কর্ম্মস্থল অধিকার করে তার অপরূপ রহস্য করছে উদ্‌ঘাটিত।

বাড়ীগুলির রেখা ও আলো-ছায়ার বিচিত্র বিন্যাসে এক একটি রাস্তার রূপ ও অর্থ গিয়েছে বদলে।

নির্জ্জন কয়েকটা রাস্তা ঘুরে সুব্রত তখন বুঝি চৌরঙ্গির কাছাকাছি এসে পড়েছে। এ রাস্তাটিও নির্জ্জন। নগরের বর্ণাঢ্য উচ্ছ্বসিত স্রোত আর খানিক দূরেই যে ফেনায়িত হয়ে উঠেছে জনতায়, আলোয়, কলরবে, এখান থেকে তা বোঝা কঠিন শান্ত গাঢ় ছায়াচ্ছন্ন পথ দুধারের বড় বড় ঝাঁকরা গাছের রহস্য-স্পর্শ নিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে যেন অপরূপ কোন মধুর কাহিনী-লোকে।

সুব্রতকে সে পথ নিত্যকার বিবর্ণ ক্লান্ত পৃথিবী থেকে সত্যই জীবনের আর এক পৃষ্ঠায় নিয়ে গেল।

অনেক দূরে দূরে এক একটি আলোর স্তম্ভ। সে আলোর সঙ্গে যেন অন্ধকারের কোন বিরোধ নেই। সে আলো কিছুকে অতি স্পষ্ট করে তুলতে চায় না, সে অন্ধকার কিছুকে একেবারে ঢেকে রাখে না। আলো অন্ধকার মিলে একটি তরল অপরূপ অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেছে।

সুব্রত খানিক এগিয়েই থমকে দাঁড়াল। কে যেন পথেরধারে দাঁড়িয়ে। অস্পষ্টতা যেখানে গাছের ছায়ায় গাঢ় হয়ে উঠেছে সেখানে কে যেন তাকে থামতে ইসারা করলে।

আবছায়া নারীমূর্ত্তি—যেন এই পথেরই আত্মা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

জানি পাঠক আর আমার সঙ্গে এগুতে নারাজ।

কলকাতার রাস্তায় যেখানে খুসী একটি সঙ্কেতময়ী অপরিচিত মেয়েকে গল্পের প্রয়োজনে হাজির করার অপরাধ তাঁরা ক্ষমা করতে প্রস্তুত নন।

তবু সত্যের খাতিরে আমার এগিয়ে যেতেই হবে। তাছাড়া মেয়েটি অপরিচিত নয়।

সুব্রতও তা বুঝতে পারলে মেয়েটি আলোর কাছে এগিয়ে আসার পর।

"তুমি!"

মেয়েটির মুখ ভাল করে এখনো দেখা না যাক, তার শরীরের হিল্লোলটি বোঝা গেল এ কথায়। "আমি-ই! আমায় এখানে দেখবার আশা নিশ্চয়ই করনি।"

"করা কি স্বাভাবিক!"

"না, কিন্তু আমায় এখানে কেন, কোথাও দেখবার আশা তুমি করনি। দেখতে চাওনি।"

সুব্রত নীরব।

মেয়েটি বল্লে—"তা জানতাম!"

তারা দুজনে এবার চলতে সুরু করেছে।

মেয়েটি আবার বল্লে—"বিশ্বাস করতে পার, আমিও তোমার জন্যে ওৎ পেতে ছিলাম না ওই নির্জ্জন রাস্তায়।"

"বিশ্বাস না করতে পারলেই খুসী হতাম যে!"

"তা হতে পারে। তোমার অহঙ্কারের সীমা নেই!"

"সে অহঙ্কারকে তুমিই যে প্রশ্রয় দিচ্ছ মীরা!"

"প্রশ্রয়ের অপেক্ষা তুমি রাখ না।"

"আমার ওপর বড় বেশী অবিচার করছ নাকি?"

মীরা একটু শুষ্ক হাসি হাসল।

"এতদিন বাদে দেখা হওয়ার পর আমাদের আলাপটা ঠিক সঙ্গত হচ্ছে না বোধ হয়।"

"দেখা হওয়াটাই যে অসঙ্গত। সুতরাং সেটার উপর জোর নাই দিলে। আর এইখানেই আমায় বিদায় নিতে হচ্ছে।"

কথা বলতে বলতে তারা অনেক দূরে এসে পড়েছে—পথের নির্জ্জনতা এবার শেষ হয়েছে। চারিধারে উজ্জ্বল আলো আর জনতা।

সুব্রত হঠাৎ বাঁ হাতটা বাড়িয়ে মীরার হাতটা ধরে ফেল্লে। হেসে বল্লে,—"তা হয়না মীরা। এমন আরম্ভের আচমকা এমন শেষ হওয়ার কথা কোন বইয়ে লেখে না।"

মীরা এবার না হেসে বুঝি পারলে না।

জিজ্ঞাসা করলে—"কোথায় ?"

"কোন রেস্তরাঁয়।"

"না"।

"তবে চল ময়দানে!"

মীরা কোন উত্তর দিলেনা। বড় রাস্তায় পড়বার পর একটা ট্যাক্সি খানিক আগে থাকতেই শ্বাপদের মত তাদের পিছু নিয়েছে। সুব্রতের ইসারায় কাছে এসে দাঁড়াল।

ট্যাক্সির ভেতর বসে সুব্রত বুঝি আমাদের একটু অবাক করে দিলে। তাকে এতক্ষণ অত্যন্ত সংযত বলেই মনে হয়েছে।

তার বাঁ হাতটা মীরার পিঠের পেছন দিয়ে লুকিয়ে কখন এগিয়ে গেছে। হঠাৎ মীরা একটা আকর্ষণ অনুভব করলে।

"মীরা ক্ষমা করো, তোমায় আজ অপরূপ দেখাচ্ছে!"

মীরা কিছু না বলে ধীরে ধীরে সুব্রতের হাতটা সরিয়ে একটু সরে বসল।

সুব্রত নিঃশব্দে খানিকক্ষণ রইল বসে, তার পর বল্লে, "এবার আমি কৈফিয়ৎ দেবার জন্য প্রস্তুত!"

"কৈফিয়ৎ নেবার জন্যে আমি আসিনি—" অত্যন্ত গম্ভীর স্বর—একটু তিক্ত।

সুব্রত হাসল; কিন্তু তার হাসির রঙ বদলে গেছে।—"তা জানি মীরা, কিন্তু গরজ আমার নিজেরই!"

মীরার এবারকার জবাবটা যেন সুব্রতের মুখের উপর চাবুকের মত লাগল। মীরা কঠিন স্বরে বল্লে, "কিসের জন্যে! একটু ভণিতা না করলে হঠাৎ অভিনয়ের পালা সুরু হওয়া বেমানান হয় বলে ত! তুমি ওটুকু উহ্য রেখেই সুরু করতে পার!"

বিবর্ণ মুখে সুব্রত অনেকক্ষণ বুঝি চুপ করে বসে রইল। মীরাও কথাটা বলবার পর মুখ ফিরিয়ে বসেছে।

ট্যাক্সি চৌরঙ্গিতে এসে পড়েছে এরি মধ্যে। দ্রুত তাদের মুখের ওপর দিয়ে রাস্তার আলো ছায়া সরে যাচ্ছে। মুখের ভাব কারুর কিছু বুঝবার যো নেই। তারা যেন পাশাপাশি থেকেও বহুদূরে সরে গেছে পরস্পরের কাছ থেকে। দুস্তর এই ব্যবধান। তাদের দুধার দিয়ে পথ বয়ে যাচ্ছে নদীর মত; মাঝখান দিয়ে সময়ের স্রোত। সে স্রোত তাদের জীবনে কি নূতন কোন উপলব্ধি এনে দিলে। বলা যাচ্ছে না এখনও।

অনেকক্ষণ বাদে সুব্রত বল্লে,—"ময়দানে যাবার দরকার নেই, মীরা, চল তোমায় পৌছে দিয়ে আসি।" তারপর একটু হাসবার চেষ্টা করে বল্লে,—"কোথায় তুমি যাচ্ছিলে, কবে তুমি এলে, তাইত জিজ্ঞাসা করা হয়নি এতক্ষণ!"

"তার কোন দরকার ছিল না।" এখনও স্বরে একটু ঝাঁঝ আছে।

সুব্রত সে কথা যে শুনতে পায়নি; জিজ্ঞাসা করলে আবার,—"কোথায় তখন যাচ্ছিলে?"

"কোথাও না!"

"তার মানে!"

"কাল সবে কলকাতায় এসেছি পিসিমাদের বাড়ী। তাঁদের সঙ্গেই বায়স্কোপে গিছলাম। ভাল লাগলো না বলে মাঝখানে উঠে বেরিয়ে পড়েছিলাম।"

"আশ্চর্য্য! তাঁরা কি ভাবছেন!"

"ভালো কিছু ভাবছেন না বোধ হয়!"

"না তা বলছিনা, খুব হয়ত উদ্বিগ্ন হয়েছেন।"

"তোমার সঙ্গে আছি জানলে বোধ হয় হতেন না!"

ব্যথিত স্বরে সুব্রত বল্লে—"আমায় আঘাত দিতে তুমি অবশ্য পার মীরা।"

"তাই নাকি!"

ব্যঙ্গের স্বর উপেক্ষা করে সুব্রত বল্লে,—"তুমি আমার পরিচয় বোধ হয় ঠিকই জেনেছ মীরা! এক যায়গায় ধরা পড়তেই হয়। তবু এখন আমার মনে হচ্ছে আমার আরেকটা পরিচয় আছে, আর সেইটাই আসল সেটা এখনও আবিষ্কার করবার সময় আছে।"

"বুঝতে পারলাম না।"

"দাঁড়াও বোঝাচ্ছি! কিন্তু আগে ট্যাক্সি কোথায় যাবে বল! তোমার পিসিমার বাড়ী না বায়স্কোপে?"

মীরা খানিক চুপ করে থেকে বল্লে—"ময়দানেই যাব।"

"না রাত হচ্ছে! তোমায় না দেখতে পেয়ে ওঁরা নিশ্চয় খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সিনেমায় না হয় তোমাদের বাড়ীতে চল।"

মীরার কোন উত্তর পাওয়া গেলনা।

"কি ভাবছ?" জিজ্ঞাসা করলে সুব্রত।

"ভাবছি, তোমার এমন একটা সুযোগ নষ্ট হ'ল।"

"নষ্ট হয়নি ত!"

"হেঁয়ালিটা আমার কাছে দুর্ব্বোধ।"

"হেঁয়ালি নয় মীরা! তুমি হয়ত শুন্‌লে হাসবে! কিন্তু তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া নয়, এ আমার ফিরে যাবার চেষ্টা!"

"না হেসে পারলাম না। অত রঙ দিয়ে কথা বলা তোমায় মানায় না!"

"সব রঙ উজাড় করেও প্রকাশ করা যায় না এমন কথাও বলার দিন জীবনে আসে। হয়ত আমার এসেছে।"

"অবহেলা সহ্য হয়েছিল উপহাসটা হচ্ছে না।"

"উপহাস নয় মীরা। আমার নিজেরেই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না, কিন্তু তোমাকে সত্য করে, ফিরে পাওয়ার জন্যই ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।" সুব্রতের গলার স্বর সত্যি ভারি হয়ে এসেছে আবেগে।

মীরা ম্লান একটু হাসল—"কিন্তু এক ঘণ্টা আগে আমিত তোমার মনের সুদূর কোন কোণেও ছিলাম না!"

"না, ছিলেনা। কিন্তু এখন আছ এবং সেই থাকার কাছে সমস্ত অতীত মিথ্যা হয়ে গেছে জেনো।"

"এসব সেই নির্জ্জন রাস্তা আর হঠাৎ সাক্ষাতের যাদু নয় ত!"

"তাই যদি হয় ক্ষতি কি! সে যাদু সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত কালকে ছুঁয়ে দিক্।"

"বড্ড চড়া রঙ তোমার কথায়!"

"মনের রঙ আরো যে চড়া!"......

সে রাতে সুব্রত ও মীরার কাছে ওই খানেই আমরা বিদায় নেব। এবং তারপরের সকালে একেবারে উঠব গিয়ে সুব্রতের ঘরে।

ঘরটা অত্যন্ত প্রশস্ত। এধার ওধার কয়েকবার পায়চারী করলে প্রাতর্ভ্রমণের কাজ সারা হয়। এত বড় ঘরকে কিছুতেই যেন আপনার করে নেওয়া যায় না। এ ঘরে বড় বেশী ফাঁক থেকে যায়। অন্তরঙ্গ নয় এঘর, যেন উদাসীন।

সুব্রতের এই ঔদাসীন্য এতদিন বাজেনি। কিছুই তার বাজেনি। তার মন ছিল নিঃসাড়। প্রাণের উৎসই তার বুঝি গিয়েছিল শুকিয়ে। আর নিজের এই নিয়তিকে সে স্বীকার করে নিয়েছিল। এমনি করে তাকে টেনে চলতে হবে দিনের পর দিন অস্তিত্বের শ্রান্ত ধারা। সে ধারা আর উঠবে না আবর্তে ফেনিল হয়ে, প্রপাত হয়ে পড়বেনা ঝাঁপিয়ে অনিশ্চিত কোন ভবিষ্যতে, আর আসবেনা তার স্রোতে বন্যাবেগ। শুধু মন্থর ভাবে মনের ধূসরতায় সে যাবে ভেসে।

পৃথিবীর সাথে তার পরিচয় পর্দার আড়াল থেকে অস্পষ্টভাবে, কোথাও উলঙ্গ সাক্ষাৎ হবেনা আর কোন সত্যের আর কোন সত্তার সঙ্গে। আত্মার গহনতায় অসীম তার হতাশা।

কিন্তু হটাৎ কি আলো এল অন্ধকার বিদীর্ণ করে। মনের অন্ধকার সাগর উঠেছে দুলে। অন্ধকার ঢেউ ভেঙ্গে পড়ছে ফেনায়িত দীপ্তিতে।

শুধু একটি মানুষের আকস্মিক আবির্ভাবে তার জীবনে এল এই অপরূপ জোয়ার! কোষ-মুক্ত তরবারের মত তার চেতনা উঠলো ঝিলিক দিয়ে!

কোন ঘটনা যায় মনের উপর দিয়ে উদাসীন ভাবে চলে' আর কোন ঘটনা আসে চারিদিকে বিদ্যুৎস্পন্দন তুলে' অকল্পিত সম্ভাবনার। কাল রাতের ঘটনা যেন তাই। সাক্ষাৎ নয়, দুটি সত্তার সে বুঝি সঙ্ঘর্ষ। অন্ধকার আকাশের মৃত তারকাপিণ্ডও উঠেছে বহ্নি-দীপ্ত হয়ে সে সঙ্ঘর্ষে।

শুধু প্রেম বলে ত ব্যাখ্যা করা যায় না সত্তার এই সঙ্ঘাতকে, তার চেয়ে বেশী কিছু। বুঝি তার চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে মীরাকে সে এতদিন অনায়াসে ভুলেই ছিল।

"তোমার মনের কোন সুদুর কোণেও আমি ছিলাম না।"

মিথ্যা সে ত বলেনি। বহুজনেব ভীড়ে অতীতের স্মৃতিতে সে ছিল মিশে। তারপর একি আবির্ভাব! সত্যিই অতীত স্মৃতির সেই সব

কৈশোরাতিক্রান্তা উদ্ধত চঞ্চল প্রকৃতির মেয়েটির সঙ্গে এ-মীরাকে কিছুতেই মেলান যায় না। সে মীরা তখনও নারী হয়ে উঠেনি। তাকে অবহেলা করবার ইচ্ছা হয়নি সুব্রতের, জয় করবার উৎসাহও নয়, আলগোছে পথের পরিচয় হিসাবে সে তাকে সম্ভাষণ করেছে অর্দ্ধ উদাসীন ভাবে, তারপর গিয়েছে ভুলে। মীরা তখন সঙ্গী হিসাবে উপভোগ্য। নারীত্বের আভাস তার ভেতর যে-টুকু ছিল তাতে মন স্নিগ্ধ করে রাখে কিন্তু অতিমাত্রায় সচেতন হতে বাধ্য করেনা। ছেলেমানুষ হিসাবে তার উপর খানিকটা মুরুব্বীয়ানার ভাব থাকে অথচ একরকম সুন্দরী মেয়ে হিসাবে তার সঙ্গ ভালোই লাগে। কিন্তু ভালো লাগবার জন্যে মীরা নিজে থেকে সেদিন বিশেষ চেষ্টা করেছে বলে মনে হয়না।

যা ধারালো তরবারি হয়ে উঠবে সে ইস্পাতের পরিচয় তখনই বুঝি প্রকাশ পেয়েছিল।

পাতলা একটি মেয়ে, দেহ দীর্ঘ হয়ে উঠেছে উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ফোয়ারার মত প্রথম যৌবনের প্রেরণায়, পায়নি এখনো সৌষ্ঠবের পূর্ণতা। তীক্ষ্ণতা তার চোখে, তীক্ষ্ণতা তার মুখের কথায়। ঘা না দিয়ে কথা কয়না, বিশেষ করে সুব্রতকে আহত করবার চেষ্টায় তার একটা যেন বিশেষ আনন্দ আছে।

ভালোই লাগত অদ্ভুত তার এই বিরুদ্ধতা।

মীরার বাবা তখন মীর্জ্জাপুরে থাকেন।

শীতের শেষ, দুপুরে হাওয়ায় বেশ তাপ আছে। তারা চলেছে "টাণ্ডা ফল্‌সে" পিকনিক করতে। পরিকল্পনাটা মীরার দিদি ও জামাইবাবুর। তাঁরা কয়েক দিনের জন্যে তখন সেখানে বেড়াতে এসেছেন।

তখন সুব্রত বিন্ধ্যাচলে থাকে, স্বাস্থ্যের জন্য নয়, কাজের অছিলায়। সেও একবার কাজে লাগার চেষ্টা করছে। বিন্ধ্যাচলে সে একটা স্যানাটোরিয়াম গড়বার কল্পনা করছে। সেই সূত্রেই মীরার বাবার সঙ্গে আলাপ। মীরার বাবা তখন মীর্জ্জাপুরের সরকারী ডাক্তার। আলাপ থেকে গভীর ঘনিষ্ঠতা হতে দেরী হয়নি। সুব্রতের সে বিষয়ে সহজাত পটুত্ব ছিল।

কিন্তু মীরা সেদিন তার দৃষ্টির সীমার মধ্যে ছিল, লক্ষ্যের বিষয় নয়। চোখ দিয়ে সে দেখেছে মীরাকে, মন দিয়ে টের পায়নি। তাকে লক্ষ্য করল ভাল করে বুঝি পিকনিকের দিন। মনোযোগ দেবার সেদিন নানা দিক দিয়ে সুবিধে হয়েছিল—সময়টা এবং স্থানটা অনুকূল, হাতের কাছে আর কেউ নেই। দল

বেঁধে সবাই এদিক ওদিক শয্যে পড়েছে। কেমন করে মীরাই শুধু দলছাড়া হয়ে পড়েছিল কে জানে।

পিক্‌নিক্‌ নামেই। টাঙ্গায় করে ষোড়শোপচারে রান্নার উপকরণ এসেছে। এসেছে ঠাকুর চাকর দাসী। দিদি ও জামাইবাবু গেছেন যেখান থেকে সহরে জল সরবরাহ হয় সেই টাণ্ড্রার বিশাল বাঁধান হ্রদ দেখতে। মীরার বাবা ও মা কাছাকাছি এক সাধুর সন্ধান পেয়ে দুর্ব্বলতা আর চেপে রাখতে পারেননি। সুব্রত খানিকক্ষণ একলা পড়েছিল। তারপর মীরা এসে যোগ দিয়েছে।

সব কথা সুব্রত এখন মনে করতে পারে না। শুধু এইটুকু মনে আছে সমস্ত ঘটনার পেছনে পটভূমিকা ছিল টাণ্ড্রা ফল্‌সের প্রাকৃতিক দৃশ্য শুধু নয় তার অবিরাম নিরবচ্ছিন্ন গর্জ্জন। গম্ভীর বিরামহীন শব্দ কেমন করে যেন সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়, প্রভাব বিস্তার করে সমস্ত মনের ওপরে।

ফল্‌সের ধারে পাকা কয়েকটা ঘর আছে যাত্রীদের বিশ্রাম করবার জন্যে। তারই দোতলার বারান্দায় একটা ইজিচেয়ার মালীকে দিয়ে পাতিয়ে সুব্রত ছিল বসে। হঠাৎ কাছে একটা ক্ষীণ স্বর শুনে সুব্রত চমকে উঠেছিল। মীরা এসে দাঁড়িয়েছে আলিসার কাছে।

হেসে সুব্রত বলেছিল—"ঝগড়া ছাড়া এখানে আর কিছু, শোনা যাবেনা মীরা! তুমি অনায়াসে কোমর বেঁধে লাগতে পার।"

তার নিজের স্বর নিজের কানেই অত্যন্ত ক্ষীণ শুনিয়েছিল। প্রপাতের আওয়াজ আর সমস্ত শব্দ ঢেকে দিয়েছে। মীরাও পায়নি শুনতে ভালো করে; কাছে সরে এসে গলা বাড়িয়ে বলেছিল—"ঝগড়ার কথা কি বলছেন?"

"শুনতে যখন পাওনি তখন আর দরকার নেই।"—তারপর ইজিচেয়ার থেকে উঠে পরে বলেছিল—"তুমি বস এইটায়, আমি আরেকটা আনাচ্ছি।"

"থাক আমি বসব না। আপনার সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ! এ জিনিষটা খুব আপনার দুরন্ত।"

"তোমাদের যেটা প্রাপ্য সেটা ত দিতে হবে।"

"আমাদের প্রাপ্য শুধু ওইটুকুই……"

সুব্রত একটু বিস্মিত হয়েছিল বই কি! মীরার কাছে যেন একথা আশা করেনি। এবার ইচ্ছে করেই বলেছিল—"তোমাদের—তোমাদের প্রাপ্য সসাগরা পৃথিবী কিন্তু আমরা এ যুগের অক্ষম দুর্ব্বল পুরুষ, কতটুকু আর দিতে পারি। সৌজন্য দিয়ে তাই আমাদের দৈন্য ঢাকি।"

মীরা হেসে এবার চেয়ারটায় বসে বলেছিল—"আপনি ঘুমোবার আগে বোধ হয় এসব কথা রোজ তৈরী করে রাখেন—না ?"

"না, একটা বই কিনেছি ; 'মেয়েদের চমৎকৃত করবার একশ একটি জবাব'—সেইটে মুখস্থ করি। কিছুদিন বাদে হয়ত পুরাণ কথা দুবার বলে ধরা পড়ে যাব।"

এবার দুজনেই হেসে উঠেছিল। মালী তখন আর একটি চেয়ার এনে দিয়েছে। সুব্রত সেটায় না বসে বলেছিল,—"এখনো চেঁচিয়ে কথা বলা ক্ষুর দিয়ে কুটনো কোটার মত, ভাল কথার ধার থাকেনা। আপত্তি না থাকে ত চল একটু বেরিয়ে পড়ি।"

"আপত্তি ত আপনারই আছে মনে হচ্ছিল।"

"তখন ছিল, ভালো ভালো কথাগুলোর শ্রোতা পাইনি বলে।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মীরা বলেছিল—"কোন দিকে যাবেন ?"

"সাধুজির আশ্রমে অদৃষ্টটা যাচাই করে আসি চল, তোমার বাবা মা গেছেন।"

"না চলুন এমনি এদিক ওদিক ঘুরে আসি।"

খানিকক্ষণ একসঙ্গে যেতে যেতে দুজনেরই কথা থেমে গিয়েছিল বুঝি প্রপাতের অশ্রান্ত গর্জ্জনের অলক্ষিত প্রভাবে। নিরবচ্ছিন্ন এই শব্দ-নির্ঝরের বুঝি একটা নেশা আছে, ধীরে ধীরে সমস্ত মন অভিভূত হয়ে যায়। কিন্তু সেদিন এমন কিছু উল্লেখ করবার মত ঘটেনি। অন্ততঃ সুব্রতের দিক থেকে নয়। হয়ত জলের একটি ধারা ডিঙোতে গিয়ে সুব্রত মীরার হাত ধরেছে, হয়ত দুধারের পাথরের স্তূপের মাঝখান দিয়ে যেতে দুজনের ছোঁয়াছুয়ি হয়ে গেছে। কিন্তু সে স্পর্শ সুব্রতের মনে সঞ্চিত হয়ে নেই। সুব্রত সেদিন মীরাকে সামান্য একটু আবিষ্কার করেছিল মাত্র, উৎসাহিত হয়নি।

পিক্‌নিকের পরেও অনেকদিন সুব্রত বিন্ধ্যাচলে ছিল। মীরার প্রতি হয়ত আগের চেয়ে সে বেশী একটু মনোযোগ দিয়েছে, হয়ত কোনদিন অভিনয় করেছে একটু বেশী। কিন্তু তার ভেতর সত্যকার ব্যাকুলতা কিছু ছিলনা। বিন্ধ্যাচলের স্যানাটোরিয়ামের কল্পনার মতই একদিন তার মন থেকে সব মুছে গেছে। মীরার মনে সে সব দিন যে সযত্নে সঞ্চিত থাকতে পারে একথা সে ভাবেনি। আর একবার পাটনায় কিছুদিন আগে মীরার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, মীরার সঙ্গে ঠিক্ নয়; তার পরিবারের সঙ্গে। তাকে পৃথক করে

দেখবার কথা সেদিনও তার মনে হয়নি। মীরার ব্যবহারে হয়ত সে সেদিন ভেবে দেখবার মত কিছু পেত যদি না তার মন থাকত আত্মনিমগ্ন। কিন্তু তার আত্মার ক্লান্তির তখনই সূচনা হয়েছে।

মীরার পরিবর্ত্তন সে লক্ষ্য করেছে একান্ত নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার ভাবে। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণ পার হয়ে মীরা নারীত্বের পরিপূর্ণতার একটি মহিমা লাভ করেছে। তবু সুব্রতের কাছে তা ছিল নিরর্থক। মীরা সেদিন বুঝি সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করে একটু ধরা দিয়েছিল। আভাস দিয়েছিল তার হৃদয়ের উদ্বেলতার। কিন্তু সুব্রত সচেতন হবার প্রয়োজন বোধ করেনি। সে বিশ্বাসই করেনি। অনুরাগ আকর্ষণের সাধারণ দৈনন্দিন অভিনয় হিসাবে সমস্ত ব্যাপারটাকে গ্রহণ করেছে, মিথ্যা, একটু দুর্বলতার ভান করতেও তার বাধেনি। এই ভানই তার জীবনের মূল পর্যন্ত্য শুকিয়ে দিয়েছে সে জানে, তবু উপায় ত নেই। ভান করাই এসব ক্ষেত্রে রীতি। তুমিও অভিনয়ে যোগ দেবে এইটুকুই সবাই আশা করে। সুবিধা তার অনেক। সময় কাটে বেশ। বিদায়ের বেলা কিছু দাগ থাকেনা মনে; চেনা পাওনা বোঝা পড়ার কোন কোন হিসাব-নিকাশও নয়। মন যাদের মরে গেছে তাদের পক্ষে এর চেয়ে সুবিধার আর কি হতে পারে। এ অভিনয়ে অভ্যস্ত বলেই তার ক্লান্ত মন মীরার সংস্পর্শে কোন সাড়া দেয়নি।

তারপর এই সাক্ষাত! সুব্রত এতক্ষণে স্পষ্ট করে গতরাত্রের কথা ভাবতে সাহস করে। মীরা তার কাছে শুধু নূতন করে উদ্‌ঘাটিত হয়নি তাকেও করেছে উন্মোচন, তার নিজের রহস্যকে। শুধু কি নগরের রাত্রির মোহ আর সাক্ষাতের এই আকস্মিকতা তার মনকে বিহ্বল করে তুলেছে এমন করে! তার ভয় হয় সাবানের বুদ্‌বুদের মত এখনি সমস্ত রহস্য যদি যায় মিলিয়ে, রাত্রির সুর দিনের আলোয় যদি যায় কেটে, যদি রাত্রির সেই রহস্যময় মেয়েটিকে আর না খুঁজে পায় মীরার মধ্যে!

অনেক স্থূল সংস্পর্শ ত হয়েছে তার জীবনে, সে আর তা চায়না, তার মন অবসন্ন এই সমস্ত সংস্পর্শেরই ভারে আর গ্লানিতে, জীবনে তা কিছুই আনে না, শুধু রেখে যায় ক্লান্তির ভার। বিদ্যুৎগর্ভ মেঘে মেঘে সাক্ষাত সে নয়, আকাশ স্পন্দিত হয়ে উঠেনা সে সাক্ষাতের উন্মাদনায়—বিদ্যুতের চেয়ে তীব্র, তার চেয়েও সূক্ষ্ম আনন্দের প্রবাহ বয়ে যায়না সত্তা থেকে সত্তায়।

কাল কি এই সাক্ষাৎই হয়েছিল? না তারই মনের ভুল?

কিন্তু সাহস হয় না তার এ ভুল যাচাই করতে। তার চেয়ে এইখানেই পড়ুক যবনিকা এ' অধ্যায়ের ওপর, এই রাত্রির রহস্যকে কাজ নেই দিনের আলোয় টেনে এনে। জড়ত্বের কুয়াসা ক্ষণিকের জন্য তার মন থেকে গিয়েছে কেটে। এইটুকুই যথেষ্ট আর তার লোভ করবার প্রয়োজন নেই।

নাই বা হল আর মীরার সঙ্গে দেখা। জীবনে সব কাহিনী সম্পূর্ণ হয় না। সম্পূর্ণ করতেই হবে এমন কোন কথা নেই! একটি রাত থাকুক তাদের জীবনে অসম্পূর্ণতায় অপরূপ হয়ে।

একটি অপরূপ রাত, যাতে তার পতিত আত্মা গম্ভীর জড়ত্ব থেকে জেগে উঠেছে, তার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাক।

দীপ তার জীবনে হয়ত জ্বলবে, কিন্তু একটি থাক তারকা, সুদূর দিগন্তে আয়ত্তের অতীত হয়ে।

রাত্রির এই রহস্য-পরিচয় সে প্রাত্যহিক জীবনের মাঝে টেনে এনে ধূলিমলিন করবে না।

সবে এখন সকাল হয়েছে। মানুষের দুর্বলতারও অন্ত নেই জানি, তবু সুব্রতের এই সঙ্কল্পটুকু জেনেই আমরা বিদায় নিলাম।

গুহায় নিহিত

প্রবোধ কুমার সান্যাল

ঘর ওই মাত্র তিনটি। রান্না-ভাঁড়ার অবশ্য আলাদা,—আর দক্ষিণে একফালি বারান্দা,—কিন্তু কলকাতা শহরে এই ফ্ল্যাট্‌টির মাসিক প্রণামী চল্লিশ টাকা।

তিন-চারটি প্রাণীর হাত পা ছড়িয়ে থাকার পক্ষে এমন একটি ফ্ল্যাট্‌ সামান্য কথা নয়! অবশ্য অতিথি-অভ্যাগত এসে পড়বার সম্ভাবনা হ'লে একটু সমস্যা দেখা দেয় বৈ কি।

তা হোক—বসবার ঘরের দেয়ালে পেরেক ঠুকতে ঠুকতে প্রতিমা বলে, দেবী দিদি একলা আসছেন, কোন ঝঞ্ঝাট তাঁর নেই। বসবার ঘরে থাকলেই বা—?

প্রিয়কুমার বললে, সিঁড়ি দিয়ে লোক যাতায়াত করবে না? তেতলার লোক যাওয়া-আসার সময় তোমার দেবী-দিদির দিকে কেউ যদি উঁকিঝুঁকি মারে?

প্রতিমা মুখ ফিরিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়। বড়-বড় টানা চোখ, কপালে রেখা নেই, মুখে সংশয়ের চিহ্ন নেই। বলে, সে কি, তাই কেউ করে বুঝি?

করে না?—প্রিয়কুমার বলে, ফ্ল্যাট্‌ওলা বাড়ীতে থাকার কৌতুক তোমার চোখে এখনো পড়েনি। সাধে কি আর বলি, গেঁয়ো ভূতের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে!

আচ্ছা—আচ্ছা, আমি না হয় গেঁয়ো ভূত, আর তুমি কলকাতার ছেলে, হয়েছে ত? এখন তা হ'লে কি করবে তাই বলো!—প্রতিমা আবার ছবি টাঙানোর পেরেক ঠুকতে থাকে। অতিথি এসে পৌঁছবার আগে ঘরখানা সাজিয়ে তুলতে না পারলে আর চলছে না।

প্রিয়কুমার বলে, ভীষণ সমস্যা! কি করা যায় বলো দেখি এখন?—এই বলে সে মুখ টিপে হাসে।

স্বামীর মুখ-চাওয়া-স্ত্রী নিজের কল্পনায় কোনো প্রতিবিধান করতে না পেরে শেষকালে বলে, বলো না, কি করব ?

ওরে খোকা, এই ছাখো—ব'লে প্রিয়কুমার স্ত্রীর কাছে স'রে গিয়ে বলে, এই যে সিঁড়ির ধারের জানলাটা, এটায় পর্দা একটা ঝুলিয়ে দিয়ো, আর এই দরজাতেও একটা—বুঝলে ? সেই যে আমি ফুলকাটা রঙীন খদ্দরের থান এনেছিলুম—?

এক মুখ হেসে প্রতিমা এইবার স্বামীর দিকে তাকায়। এত সহজে সমস্যার যে সমাধান হয় আগে কে জানতো ! বলে, ঠিক বলেছ, আমার মনেই ছিল না। কিন্তু আমি যে সেলাই জানি নে ? কে করবে ? কী চমৎকার ফুলকাটা পর্দা করেছে ও-বাড়ীর হররমা ! আমাকে যদি কেউ শিখিয়ে দিত !

প্রিয়কুমার বলে, তুমি একটি আস্ত শিমুল ফুল ! কত লোকের বউ কত রকম জানে ! তুমি কী জানো ? জানো কেবল—

মুখের কথাটা প্রিয়কুমারের মুখেই থেকে যায়। দু' জনেই হাসিমুখে তাকায় দুজনের দিকে। চারটি চোখের মধ্যে দুইটিতে চতুর বুদ্ধির দীপ্তি, আর দুইটি চাহনিতে নদীয়া জেলার কোন্ এক অখ্যাত গ্রামের একটি প্রাচীন সরোবরের স্নিগ্ধ ছায়া। প্রতিমা হাসিমুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে পিঠের দিককার আঁচলটা কাঁধের উপর টেনে নেয়।

—আরে, সরো সরো, পেরেক পুঁতে পুঁতে ঘরখানাকে ভরিয়ে তুললে। কী হবে অত ছবি টাঙিয়ে ? দেওয়ালে আর মশা-মাছি বসবার জায়গা নেই ! তোমার দেবীদিদি এমন কী মহারাণী ভিক্টোরিয়া আসছেন যার জন্যে এত সাজসজ্জা ?

তুমি চুপ করো—প্রতিমা গ্রীবা দুলিয়ে বলে, ওরা কত লেখাপড়া জানা মেয়ে, কত ইংরিজি বই পড়ে ! ঘরের চেহারা দেখলে কি মনে করবে বলো ত ?

প্রিয়কুমার বলে, ওঃ অমন ঢের-ঢের গ্রাজুয়েট মেয়ে কলকাতায় গড়াগড়ি যায় ! তোমার মতন লক্ষ্মীর ঘরে তাঁর মতন থুবড়ি মেয়ে জায়গা পাবেন, এটা তাঁর ভাগ্যি।

তা বৈ কি। এসে দেখবে ঘর দোর আগোছালো ; বলবে, অশিক্ষিত মেয়ে আমি ! কী মনে করবে বলো ত ?

ইঃ—কি মনে করবেন, শুনি? লেখাপড়াতে তুমিই কোন্ কম? তুমিও ত ছোটবেলায় পড়েছিলে শিশুশিক্ষা?

স্বামীর গম্ভীর রসিকতা প্রতিমা বুঝতে পারে না। মুখ ফিরিয়ে বলে, কিন্তু তুমি যে বলো শিশুশিক্ষা পড়লেও মানুষ মুখ্যু থাকে? দেবীদিদি যে ইংরিজিও জানেন।

প্রিয়কুমার বলে, ছোঃ, ইংরিজি! ইংরিজির শিশুশিক্ষাই লোকে পড়ে, তা জানো? তোমার দেবীদিদি যদি বিদ্বান্ হন তবে তুমি আর তিনি একই—নাও, হয়েছে, টুল থেকে এবার নামো। ওই ত, বেশ ছবি মানিয়েছে! তোমার দেবীদিদি এমন ঘরে ঢুকলে আর বেরোতেই চাইবেন না দেখো।

স্বামীর কথায় প্রতিমার মন খুশী হয়ে যায়। বলে, থাকলে ত ভালোই, কতদিন দেখিনি। ও-বছরে একবারটি এসেছিল, সেই যে তুমি গাড়ীতে তুলে দিয়ে এলে? সেই যে গো ফটো তুললাম আমরা, মনে নেই? বড্ড ভুলে যাও তুমি, বাপু! সেই যে তোমাকে তিনি একটা পশমের গেঞ্জি বুনে দিয়ে গেলেন?

প্রিয়কুমার বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু একটু মনে পড়ছে। তোমার দেবী দিদি দেখতে ঠিক কেমন, বলো ত? মানে, ঠিক মনে পড়ছে না আমার। আমাদের বনমালীর মতন গায়ের রংটা হবে বোধ হয়, না?

ওমা—প্রতিমা চোখ কপালে তুলে শিউরে ওঠে.—তোমার তাহলে একটুও মনে নেই! একেবারে ধবধবে রং, নাক-চোখ কি সুন্দোর, কেমন গড়ন পেটন, কেমন চুল—

প্রিয়কুমার একমনে গভীরভাবে চিন্তা ক'রে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ,—তাইত। তা বয়স হোলো বৈ কি, যতদূর মনে পড়ে বোধ হয় বছর পঞ্চাশের কাছাকাছি,—না কি বলো?

অ্যাঁ?

অন্ততঃ পঁয়তাল্লিশ?

সহসা একঘর হেসে উঠে প্রতিমা তাড়াতাড়ি মুখে আঁচল চাপা দেয়, এবং তেমনিভাবে হাসতে হাসতে স্বামীর গায়ের উপর গড়িয়ে প'ড়ে বলে, পঁয়তাল্লিশ! তাঁর যে এখনো পঁচিশ হয়নি গো।

ও একই।—প্রিয়কুমার বলে, দাঁড়াও দরজাটা ভেজিয়ে দেই, তারপর দুজনেই হাসবো খুব ক'রে।

চট ক'রে প্রতিমা সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়। রুষ্টকণ্ঠে বলে, না, থাক্ দরজা খোলা, তোমার চালাকি আমি জানি। এই সকাল বেলায় তোমার—ছিঃ কী হচ্ছে?

বাইরে খুড়িমার গলার আওয়াজ পেয়ে দুজনেই সতর্ক হয়ে স'রে দাঁড়ায়। তারপর দরজার কাছে এসে প্রিয়কুমার নিজেই বলে, পিসতুতো বোনের ননদ, তার জন্যে আবার এত! আমি বাপু তোমাদের অতিথিসৎকারের মধ্যে নেই, আমার অনেক কাজ। বসবার ঘরটা না হয় ছেড়েই দিলুম, কিন্তু বন্ধুবান্ধব এলে বসাবো কোথায়?

মাথায় ঘোমটা টেনে চাপা গলায় প্রতিমা বলে, একটু কষ্ট করো, লক্ষ্মীটি—

ক'দিন তিনি থাকবেন শুনি?

তিনদিন গো—

আমাকে দিয়ে যেন ফাই-ফরমাস খাটিয়ো না। মেয়েছেলের ফরমাস খাটাও ঝকমারি।

খুড়িমা বারান্দার ধার থেকে এগিয়ে এসে বলেন, তা আসছে, ভালোই ত? কবে আসবে গা, বৌমা?

প্রতিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খুড়িমার পাশে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বলে, আজই বিকেলে।

আয়োজনের আর কোনো ত্রুটি রইলো না। অতিথির কাছে স্বামীর পরিচয় আর ঐশ্বর্যকে উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরার জন্য সারাদিন প্রতিমার পরিশ্রমের আর অন্ত নেই। বনমালীর সাহায্যে সমস্ত ফ্ল্যাট্‌টা জল দিয়ে ধুয়ে-মুছে সে তকতকে ক'রে তুললো। শোবার ঘর তিনখানার আসবাব সজ্জাগুলি ঝেড়ে-মুছে চেহারা ফিরিয়ে দিল। দর্জির বাড়ী থেকে দরজা ও জানলার পর্দা তৈরি হয়ে এলো। এদিকে ধবধবে চাদর উঠলো বিছানায়, ঝালর-দেওয়া বালিশ, নেট-এর মশারি,—টেব্‌লে চীনামাটির ফুলদানি, প্রিয়কুমারের প্রিয় কয়েকখানি বই, টিপাইয়ের উপরে ঘষাকাঁচের ডুম-বসানো টেব্‌ল্‌-ল্যাম্প,—ওদিকে একটি শেল্‌ফে সুগন্ধি তেল, ভালো সাবান, দাঁতের মাজন, মাথার নতুন ফিতা ও কাঁটা, দেয়ালে ঝোলানো বড় একখানা সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো আয়না, তার পাশে শাড়ী ঝুলিয়ে রাখার একটি আলনা। মহিলা অতিথির অভ্যর্থনা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কোথাও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য নেই। স্বামীর রুচি আর

সংশিক্ষার সুখ্যাতি হবে এই আনন্দ-গৌরবে সারাদিন প্রতিমার বুকের ভিতরটা টলমল করতে লাগলো। তা'র মতন স্বামী-ভাগ্য ক'জনের?

ভালো শাড়ী আর জামা প'রে, বেলা চারটে নাগাৎ সবেমাত্র সে পায়ে আলতা প'রে উঠে দাঁড়িয়েছে এমন সময় নীচের দরজায় মোটরের হর্ন শোনা গেল।

প্রিয়কুমারের বহু আপত্তি থাকলেও স্ত্রীর অনুরোধে তাকে যেতে হয়েছিল স্টেশনে। মোটরের আওয়াজ শুনে প্রতিমা বারান্দায় হাসিমুখে এসে দাঁড়ালো। খুড়িমা বেরিয়ে এলেন। বনমালী জিনিসপত্র ব'য়ে আনার জন্য নীচে নেমে গেল।

অতিথির মতো অতিথিই বটে। মুখে অপরিসীম গাম্ভীর্য, কিন্তু তবু হাসিমুখ। পরনে দামী শাড়ী, কিন্তু তার চাকচিক্য নেই, যেমন-তেমন ক'রে জড়ানো। হাতে কয়েকটি ফিনফিনে চুড়ির সঙ্গে একটি ছোট সোনার হাত-ঘড়ি, গলায় চিকচিকে হার, পায়ে বাদামী রঙের ফিতা বাঁধা একজোড়া স্লিপার। দীর্ঘ উন্নত দেহ, শঙ্খের মতো সে দেহ মসৃণ, সুন্দর।

প্রতিমার চিবুক নেড়ে আদর ক'রে দেবীরাণী খুড়িমার পায়ের ধূলো নিলো। প্রতিমা বললে, এবারে কিন্তু তিন দিনের বেশী থাকতে হবে তোমাকে, দেবীদিদি।

বক্‌শিস্?—ব'লে দেবীরাণী হাসিমুখে ফিরে চাইলেন।—বক্‌শিস্ না পেলে অতিথির চল্‌বে কেন?

প্রতিমার হয়ে প্রিয়কুমার উত্তর দিল, তা বক্‌শিস্ দেবো বৈকি। আমাদের অকুণ্ঠ সেবা, হৃদয়ের ঐকান্তিক—মানে যাকে বলে—

আপনি কে, মশাই? চিনিনে ত?

খুড়িমা হাসছেন। প্রতিমা মুখে আঁচল চাপা দিল। প্রিয়কুমার বললে, বেশ লোক যা হোক, স্টেশন থেকে আনলুম মাথায় ক'রে, তার জন্য একটু কৃতজ্ঞতাও নেই। উল্টে বাড়ী বয়ে এসে বাড়ীওয়ালাকে বলেন, আপনি কে মশাই! ঘোর কলিযুগ!

দেবীরাণীর হাত ধ'রে প্রতিমা তা'কে ঘরে নিয়ে এলো। প্রিয়কুমার ভিতরে এসে বললে, বিশিষ্ট অতিথির জন্য আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে সারাদিন ঘর সাজিয়েছি। দয়া ক'রে সেদিকে একটু প্রসন্ন দৃষ্টি দেওয়া হোক।

প্রতিমা বললে, ওমা, তুমি আবার কখন কি কর্‌লে?

করিনি? কেন আবার স্বামীর অবাধ্য হওয়া?

কখন্ আমি আবার অবাধ্য হলাম গো তোমার?

হওনি?—কৃত্রিম রোষ প্রকাশ ক'রে প্রিয়কুমার বললে, অতিথির সামনে আমাকে অপমান?

প্রতিমা অবাক হয়ে বললে, আচ্ছা দেবীদিদি, এতে অপমান হোলো কোথায়?

দেবীরাণী তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, মানী লোক কিনা ওঁরা, তাই ওরা পদে পদে মান খোয়ায়! তুমি তাই রাগ ক'রো না।

প্রিয়কুমার বললে, আপনার এ কথার মানে?

মানে এই যে, সারাদিন আমি ট্রেনে এসেছি, এখন বিবাদ বাধালে আপনাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হবে।

প্রতিমা হেসে লুটিয়ে পড়লো।

দেবীরাণী পুনরায় বললে, যান, চা আনুন, ব'সে ব'সে কোঁদল করবেন না। —না, না, তুমি থাকো ভাই, ওঁকে একটু খাটিয়ে নিই। ফাই-ফরমাস করলে উনি বিশেষ দুঃখিত হবেন না।

নিতান্ত অতিথি ব'লেই,—এ রকম তাচ্ছিল্য স'য়ে রইলুম।—ব'লে প্রিয়কুমার হাসিমুখে বাইরে চলে গেল। খুড়িমা এসে অবশ্য তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন, বনমালীর হাতে তিনি চা ও জলখাবার পাঠালেন। মিনিট দুই পরেই প্রিয়কুমার আবার ফিরে এসে বসলো।

দেবীরাণী হাসিমুখে বললে, স্ত্রীকে একটু ভালো-টালো বাসেন? না, কেবল কথার চাতুরীতে গ্রামের মেয়েকে ভুলিয়ে রাখেন?

প্রশ্নটিতে একটু অস্বস্তি আছে বৈ কি। প্রতিমা উঠে পালাবার চেষ্টা করলো। প্রিয়কুমার বললে, পাপ মুখে বলতে নেই। আমাদের ভালোবাসা কি আর অন্য লোকে বুঝবে?

এসেই যে-শাসন দেখলুম তা'তে বিশ্বাস করা একটু কঠিন।—ব'লে দেবীরাণী বক্রদৃষ্টি ফিরিয়ে হাসলো।

প্রিয়কুমার বললে, মেয়েমানুষের দৃষ্টি বেশি দূর পৌঁছয় না।

দেবীরাণী বললে, তাই নাকি? কথাটা শুনলেও মন ঠাণ্ডা হয়। কই, আমার দিকে মুখ তুলে কথা বলুন ত?

প্রিয়কুমার কিন্তু মাথা তুললো না। মুখ নামিয়েই তামাসা করে বললে, স্ত্রী ছাড়া আর কোন মেয়ের দিকে আমি মুখ ফেরাইনে। এইটি আমার তপস্যা।

দেবীরাণী খুশীমুখে বললে, ওরে বাবা, এত? খুব যে তোষামোদ করতে শিখেছেন? গত বছরের চেয়ে একটু উন্নতি হয়েছে দেখছি। চক্ষু সার্থক হোলো।

বেশ ত, থাকুন না কিছুদিন, আরো দেখতে পাবেন।

রক্ষে করুন, আমার বাজার-হাট করা হয়ে গেলেই এখান থেকে পালাবো।

কোথা পালাবেন?—প্রিয়কুমার মুখ তুললো।

কেন, লক্ষ্ণৌতে? যেখানে চাকরি করি?

প্রতিমা বললে, চাকরি করেই তুমি চিরদিন কাটাবে, দেবীদিদি?

কি আর করি ভাই, বলো?

বিয়ে করবে না বুঝি?

দেবীরাণী শিউরে উঠে বললে, সর্বনাশ, বিয়ে? একটা পুরুষ মানুষ চিরকাল জ্বালাবে, আর তাই সহ্য করব?

ঘরসুদ্ধ সবাই হেসে উঠলো।

প্রতিমা বললে, তুমি বড়লোকের মেয়ে, চাকরি করে তোমার কী হবে?

বিয়ে করেই বা কি স্বর্গলাভ?

প্রিয়কুমার সেখান থেকে হঠাৎ উঠে বেরিয়ে গেল। প্রতিমা সরল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো দেবীরাণীর প্রতি। স্ত্রীলোকের বিবাহের দিকে মন নেই! বিয়ে না হলে তাদের স্বর্গলাভ হয় না, তারা স্বামী ছাড়া আর কোনো পরিচয়ে নাকি সংসারে বেঁচে থাকতে পারে, এসব কথা তার কল্পনায় নেই! সুতরাং সর্ব্বপ্রথম যে-কথাটা তার মনে এলো সেইটিই সে প্রকাশ করলো। আসলে, কিন্তু স্বামী ছাড়া মেয়েমানুষকে দেখবে কে, দেবীদিদি?

এতদিন কে দেখলো রে?—ব'লে দেবীরাণী একঝলক মলিন হাসি হাসলো।

প্রতিমা বললে, কিন্তু যখন বয়স হবে? বুড়ো হবে?

বেশ ত, তোরাই ত আছিস। ব'লে দেবীরাণী খুব হেসে উঠলো। কথাটা ওঘর থেকে প্রিয়কুমার কান পেতে শুনলো। তা'র মনের একূল থেকে ওকূল অবধি একটা তরঙ্গ আলোড়িত হয়ে উঠলো।

দেবীরাণীর কেমন একটা চাঞ্চল্য দেখা যায়—সেটা অনেকটা যেন অস্বাভাবিক। তিনখানা ঘর জুড়ে যখন-তখন তা'র অহেতুক পদচারণা

লক্ষ্য ক'রে প্রতিমা তা'কে কি যেন একটা প্রশ্ন ক'রে বসেছিল, কিন্তু একটুখানি হাসি ছাড়া আর কোনো বিশেষ সদুত্তর পায়নি। ভাঁড়ার ঘর-খানায় ঢুকে প্রত্যেকটি সামগ্রী লক্ষ্য করা, অনাবশ্যকভাবে রান্নাঘরের ভিতরটা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে একটা অকারণ মন্তব্য করা, গৃহসজ্জার খুঁটিনাটি আলোচনা করে নিজের মতামতটা জানানো, হঠাৎ বাথরুমটায় ঢুকে নিঃশব্দে কতকক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা—এই রকম বিভিন্ন প্রকার খেয়াল লক্ষ্য ক'রে প্রতিমা অনেক সময়ে হেসেই অস্থির। এক সময়ে আড়ালে গিয়ে স্বামীকে সে প্রশ্ন করে, হ্যাঁগো, দেবীদিদির মনটা এমন উড়ু-উড়ু কেন, বলো ত?

প্রিয়কুমার বলে, তোমার দেবীদিদিকে জিজ্ঞেস করলেই পারো!

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা প্রতিমার আর হয়ে উঠে না। লেখাপড়া জানা মেয়ে ওরা, ওদের মনের ভাব জানতে গিয়ে কি সে শেষকালে নির্বুদ্ধির পরিচয় দেবে?

খুড়িমা এম সময়ে দেবীদিদিকে ধরলেন। বললেন, হাঁ গা, রাণু? তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলুম, মা।

দেবীরাণী খুশী হয়ে বললে, কি বলুন?

তোমাকে বাজার হাট করতে কলকাতায় আসতে হোলো? লক্ষ্ণৌ শহরে কিছু পাওয়া যায় না বুঝি?

দেবীরাণী বললে, সবাই কি সেখানে সব পায়, খুড়িমা? তাই ত এতদূরে ছুটে এলুম।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত বৈ কি—খুড়িমা চুপ ক'রে গেলেন। কিন্তু তাঁর সন্দিগ্ধ প্রশ্ন আর অব্যক্ত মনোভাবটি লক্ষ্য ক'রে দেবীরাণী যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। একটু পরে খুড়িমা আবার কথা পাড়লেন। বললেন, বিয়ের পরে আমরা জানলুম, তোমাদের সঙ্গে বৌমাদের আত্মীয়তা আছে! কিন্তু তুমি নাকি আগে কলেজে পড়তে প্রিয়কুমারের সঙ্গে?

দেবীরাণী একটু চমকে উঠলো। কিন্তু ভাব গোপন ক'রে বললে, সেটা আমার ঠিক মনে পড়ে না। তবে বছর মিলিয়ে দেখতে পাওয়া যায়, প্রিয়কুমারবাবু পড়তেন সেই সময়টায়।

তোমার মনে নেই?

একটু আধটু অস্পষ্ট মনে পড়ে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী ছিল কিনা—

খুড়িমা তাঁর মন্তব্য জানালেন। বললেন, আমি ঠিক ভালো বুঝিনে মা—ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়া, অনেক রকম কথা ওঠে কিনা—

দেবীরাণী বললে, তা ঠিক বলেছেন আপনি। অনেকের জীবন ভেঙেচুরেও তচনচ হয়ে যায় শুনেছি!—এই ব'লে সেখান থেকে সে সরে গেল। প্রতিমা তা'র পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। সরল, নির্বোধ ও গ্রাম্য তা'র দুটি চোখ।

সমস্ত ফ্ল্যাট্‌টার মধ্যে মানুষের মনোবিকলনের একটা সূক্ষ্ম নাটকীয় ঘাত-সংঘাত চলছে, উপরে সেটা প্রত্যক্ষ নয়। ঘটনায় তা'র কোনো প্রকাশ নেই, বাক্যরতায় সেটা আন্দোলিত হয়—কিন্তু চলাফেরায়, চাহনিতে, ভ্রূকুঞ্চনে, ঈষৎ হাস্যে—সেটা প্রকট। প্রতিমার সাধ্য নেই সেটাকে স্পর্শ করে, খুড়িমার সাধ্য নেই সেটাকে আবিষ্কার করেন। এ নাটক সকলের জন্য নয়।

দেবীরাণী এসে দাঁড়ালো এ ঘরে। প্রিয়কুমার তখন একখানা বই মুখে দিয়ে ব'সে রয়েছে। মুখ না তুলেই সে বললে, তোমার দেবীদিদির কোনো অযত্ন হয় না যেন, দেখো।

তুমি নয়, আপনি! দেবীরাণী পিছন থেকে হেসে উঠলো।

সলজ্জ বিস্ময়ে প্রিয়কুমার বললে, বুঝতে পারিনি আপনি এসে দাঁড়িয়েছেন।

দেবীরাণী বললে, কিন্তু যত্ন করলেও যদি আমি খুশী না হই?

তাহলে বলুন কিসে আপনি খুশী হবেন?

যদি বলি, হে বলিরাজা, তুমি স্বর্গ আর মর্ত্যের অধীশ্বর—মস্ত বড় দাতা তুমি। কিন্তু স্বর্গ আর মর্ত্যলোক আমাকে দান করুন—পারবেন?

প্রিয়কুমার বললে, আপনি অন্তর্যামী নারায়ণ হ'লে পাতালে যেতে পারতুম বৈ কি।

দেবীরাণী বললে, না, পারতেন না। কোনো যুগেই পুরুষ মেয়েদের জন্য সর্বস্বান্ত হয়নি। মেয়েদের প্রাণ নিয়ে তা'রা জীবন-মরণ খেলায় মেতেছে। হেরেছে, কিংবা জিতেছে, এইমাত্র। —শেষের কথাটায় তা'র গলা একটু ধ'রে এলো।

প্রিয়কুমার নতমুখে চুপ ক'রে রইলো, আর কোনো জবাব দিল না।

দেবীরাণী বললে, আপনার খুড়িমার প্রশ্নবাণে আমি জর্জরিত। তিনি বলেন, লক্ষ্ণৌ থেকে এতদূরে এসে বাজার-হাট করা? সেখানে কি কিছুই পাওয়া যায় না?

প্রিয়কুমার বললে, আপনি কি জবাব দিলেন ?

ঈষৎ উষ্ণকণ্ঠে দেবীরাণী বললে, সেকথা শুনবার কি কোনো দরকার আছে আপনার ? আপনি কি মনে করেন, আপনার খুড়িমার কাছে কথার চাতুরী খেলতেই আপনার এখানে এসেছি ?

এই বলে সে স'রে গেল। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রিয়কুমার রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আড়ষ্ট হয়ে ব'সে রইলো। ঘরের বাতাসটা যেন থমথম করছে। কে যেন একটা মস্ত কান্নার গলা টিপে ধরেছে।

এমন সময় প্রতিমা এসে দাঁড়ালো দেবীরাণীর কাছে। মুখ ফিরিয়ে দেবীরাণী বললে, এসেছিস ? অতিথিকে কোথাও যেন একলা ফেলে রাখিসনে, তা'কে ভূতে পায়, জানিস ত ?

প্রতিমা খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। দেবীরাণী সস্নেহে তা'র গলা ধ'রে বললে, হাঁ রে ভাই, সত্যি ! আচ্ছা প্রতিমা, একটা কথা ঠিক ক'রে বলতে পারিস ?

কি বলো ত ?

মরুভূমির ওপর যদি বুকের রক্ত গড়িয়ে পড়ে, তবে কি সে-মরুভূমি উর্বর হয় ?

কথাটা যাকে উদ্দেশ ক'রে বলা, সে তখনো বইখানা সামনে ধ'রে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রয়েছে। প্রতিমা জবাব দিল, আমি ত ভাই বলতে পারিনে !

দেবীরাণী বললে, পারিসনে, কেমন ? বেশ। আচ্ছা, বলতে পারিস, ত্রেতাযুগে কোনো ছলনাময়ী রাজা রামচন্দ্রের মন ভোলাতে চেষ্টা করেছিল ? বোধহয় করেনি, কি বলিস ?

সরলভাবে প্রতিমা বললে, আমি ভাই ছোটদের রামায়ণ প'ড়েছিলুম, তা'তে এসব ছিল না।

দেবীরাণী সহসা অন্য জানলাটার কাছে স'রে গেল। তারপর বললে, তোদের এদিকটা বড্ড ফাঁকা। এত ফাঁকায় তোরা থাকিস, মন হু হু করেনা ? কোথাও গাছপালা নেই, কেবল প্রকাণ্ড একটা শূন্য !—তা'র গলাটা যেন শান্ত হয়ে এলো।

প্রিয়কুমার আস্তে আস্তে উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সেইদিকে একবার লক্ষ্য ক'রে দেবীরাণী বললে, আমার এক একবার কি মনে হয় জানিস,

প্রতিমা! মানুষের জীবন হোলো ঈশ্বরের মস্ত একটা জিজ্ঞাসা,—আমরা কেবল তারই উত্তর হাতড়ে-হাতড়ে বেড়াই। সে উত্তর খুঁজে পাবোনা কোনোদিন।

সমস্ত শুনে প্রতিমা বললে, তুমি এবার চান্ করবে চলো, দেবীদিদি।

প্রস্তাবটা শুনে সহসা অহেতুক ব্যস্ততা সহকারে দেবীদিদি ব'লে উঠলো; তাই চল্। খেয়ে দেয়েই আমাকে একবার বেরুতে হবে। কি জানিস ভাই, ঘরের মধ্যে আমার মন কিছুতেই টিঁকতে চায়না।

অনুযোগের সঙ্গে প্রতিমা বললে, কি করে টিঁকবে? ঘরকন্নার স্বাদ যে তুমি পাওনি?

পিছন ফিরে হাসিমুখে দেবীদিদি প্রতিমার গাল দুটি নেড়ে দিয়ে বললে, বোকা মেয়ে! ঘরকন্নার আবার স্বাদ কি রে? প্রাণটাই যদি খুঁজে না পাই, দেহটির দাম কতটুকু?—এই বলে সে স্নান করতে চ'লে গেল।

সেদিন কোনোমতে দুটি আহারাদি সেরে দেবীরাণী বেরিয়ে পড়লো। যখন সে ফিরলো তখনও সন্ধ্যা হয়নি। তার পিছনে পিছনে একটি ছোকরা এসে জিনিসপত্র সমেত একটা চাঙারি রেখে চ'লে গেল। দেবীরাণী গিয়েছিল মার্কেটে। চাঙারিতে এক গোছা রজনীগন্ধার সঙ্গে দুটি অন্যান্য ফুলের তোড়া। কতগুলি মরশুমী সুস্বাদু ফল, একখানি অপরাজিতা রংয়ের শাড়ী, এবং নানাবিধ প্রসাধন সামগ্রী। দেবীরাণী নিজের হাতেই সেগুলি ঘরে তুলে নিয়ে এলো।

চাঙারিটি দেখেই প্রতিমা গিয়ে ঘরে লুকিয়েছিল। দেবীরাণী হাসিমুখে ঘরে ঢুকে প্রতিমার হাত ধ'রে টেনে আনলো। প্রতিমা রাগ ক'রে বললে, বছর-বছর এসে তুমি এমনি করে বেহিসেবী খরচ ক'রে যাবে, এবার আমি আর শুনবোনা, দেবীদিদি!

দেবীরাণী বললে, তোকে না সাজালেই আমার চলবেনা রে।

কেন, শুনি?

আচ্ছা শোনাবো একদিন। এই ব'লে দেবীরাণী তা'কে প্রিয়কুমারের পড়ার ঘরে টেনে নিয়ে এলো। পুনরায় বললে, যদি বলি অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত তোকে শোনাবো,—তোর ঘুম পাবে না?

প্রতিমা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, দেবীদিদি?

কেন রে?

তোমার কথা কোনোদিন আমি বুঝতে পারিনি।

তা'হলে নিশ্চয় আমি একটা পাগল!...ব'লেই দেবীরাণী হেসে উঠলো। কিন্তু সে-হাসিতে এবার প্রতিমা যোগ দিতে পারলোনা।

দেবীরাণী প্রতিমার সুন্দর ও সুকুমার দেহখানিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জামা ও কাপড় পরিয়ে দিল। চোখের পাতায় কাজলের মোহ এঁকে দিল, তা'র খোঁপায় দিল ফুল, পায়ে দিল আলতা। তারপর বললে, পারবিনা ভোলাতে?

প্রতিমা হেসে বললে, কা'কে?

দেবীরাণী বললে, স্বামীকে নয়, পুরুষকে।

ওমা, সে কি?

হ্যাঁ রে। স্বামী ত ভুলতে বাধ্য—কিন্তু স্বামীর মধ্যে যে পুরুষের বাস, তা'কে ভোলানো বড় কঠিন, প্রতিমা। কিছু দিয়েই তা'কে ভোলানো যায় না—মেয়ে মানুষের সমস্ত জীবনের তপস্যাটাও তাদের কাছে কিছু নয়! তারা নির্দয়, হৃদয়হীন,—তা'রা হিমালয়! যদি ভোলাতে পারিস, বুঝবো আমার এই সাজানো সার্থক। এই ব'লে সে গলাটা একবার ঝেড়ে নিল।

প্রতিমা বললে, একথা কেন বলছ, দেবীদিদি? উনি ত তেমন মানুষ নন্ যে, আমাকে অনাদর করবেন? অনেক পুণ্যের জোরে আমি ওঁকে পেয়েছি!

দেবীরাণী পিছন দিকে দাঁড়িয়ে প্রতিমার আল্‌গা খোঁপাটা ঠিক ক'রে দিচ্ছিল। কিন্তু প্রতিমার কথায় ক্ষুধার্ত্ত শ্বাপদের মতো তা'র চোখ দুটো পলকের জন্য জ্বলে উঠলো, সেটা আর দেখা গেল না। কেবল শান্ত কণ্ঠে বললে, নিশ্চয়, সে একশো বার। তোর মতন পুণ্যবতী ক'জন আছে ভাই?

প্রতিমা স্বস্তিবোধ ক'রে নীরব হয়ে গেল। কিন্তু তারপর, সাজসজ্জার শেষে, দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার ঠিক পথেই প্রিয়কুমার এসে হাজির। স্ত্রীর দিকে চেয়ে সে বললে, একি? ইন্দ্রসভায় আজ নাচের ফরমাস আছে নাকি?

প্রতিমা হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে গেল ভাঁড়ারের দিকে। দেবীরাণী পাশ কাটিয়ে দাঁড়ালো প্রায় প্রিয়কুমারের মুখোমুখি। কৈফিয়ৎ স্বরূপ

প্রিয়কুমার বললে, কলেজ থেকে বেরিয়ে আজ যেতে হয়েছিল এক চায়ের পার্টিতে। জানি, অতিথির আজ কিছু অনাদর ঘটে গেছে।

পাথরের পুতুলের মতো দেবীরাণী দরজাটার গায়ের উপর নতমুখে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মৃদুকণ্ঠে ধ'লে বললো, কেবল আজ ত নয়—চিরদিন!

কথাটার সঙ্গে একটা চাবুকের আঘাত ছিল, কিন্তু প্রিয়কুমার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না। একরাশ বই টেবিলের ওপর রেখে মুখ ফিরিয়ে সে শুধু বললে, আপনার কি কালই যাওয়া স্থির?

না।

আর কতদিন থাকবেন?

যতদিন খুশী।

প্রিয়কুমারের গলার কাছে আতঙ্কের মতো কি যেন একটা ঠেলে উঠলো কিন্তু সেটাকে চেপে হাসিমুখে সে বললে, কিন্তু বাসনার চিহ্ন প্রতিমার সর্বাঙ্গে এঁকে-এঁকেই কি এখানে দিন কাটাবেন!

দেবীরাণী চুপ ক'রে রইলো।

প্রিয়কুমার পুনরায় বললে, পুরুষকে যন্ত্রণা দেবার নির্ভুল পথ এটা নয়!

দেবীরাণী মুখ তুললো। সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখা গেল না, তা'র তীব্র চোখ দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল কি না। সে কেবল অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে বললে, তবে নির্ভুল পথ কোনটা? কেমন ক'রে যন্ত্রণা দিলে তোমার বুক ভেঙে দেওয়া যায়—ব'লে দিতে পারো?—এই ব'লে সে ছুটে সেখান থেকে চলে গেল। ঝরঝরিয়ে তা'র চোখে জল এসেছিল।

নিজের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে প্রিয়কুমার পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সেদিন সে মাথার কাছে টেবিল-ল্যাম্পটা রেখে বিছানায় শুয়ে একখানা মোটা ইংরেজি বই মুখের কাছে নিয়ে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। রাত তখন অনেক। ওঘরে প্রতিমা আর দেবীরাণী নিদ্রিত। তার পাশের ঘরে খুড়িমা। এ ঘরে আলোটা জ্বলছে, দরজাটা খোলাই রয়েছে।

পড়তে পড়তে কখন যে তার দুই চোখে ঘুম এসেছে, কখন ঘড়ির কাঁটাগুলি ঘুরে ঘুরে শেষ রাত্রির দিকে এসে পৌঁছেচে, প্রিয়কুমারের কিছুমাত্র চেতনা ছিল না। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার পেরিয়ে জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছে, রাতজাগা পাখী কোথায় হায়রান হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে, কখন নিঃসাড় অন্ধকার জগৎ তা'র

চক্রপথের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে প্রভাতের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল, তাও এই ক্ষুদ্র পরিবারটির অজ্ঞাত ছিল।

সহসা আচমকা এক সময়ে প্রিয়কুমারের ঘুম ভেঙে গেল। কখন সে ঘুমিয়েছিল, কেন তা'র ঘুম ভাঙলো, ঠিক বুঝতে পারা গেল না। কিন্তু উৎকর্ণ অধ্যাপকের বিশ্লেষণী বুদ্ধি একথা অনুভব করলো, তার আচমকা ঘুমভাঙার একটা সঙ্গত কারণ আছে বৈ কি। ঘরের খোলা দরজা, উজ্জ্বল আলো, ব্রাকেটের ওপর টিকটিকে ঘড়ি, দেয়ালের ছবি, কাপড়ের আলনা—সবগুলো যেন চক্রান্ত ক'রে মুখ বুজে গোপন কথাটা চেপে রয়েছে। মনে হচ্ছে একটা অস্পষ্ট সংবাদ তার অচেতন ঘুমের মধ্যে নিঃশব্দসঞ্চারে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেটার অশরীরী আত্মাটা এখনো তার এই পড়ার ঘরে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, ঘড়িতে রাত সাড়ে চারটা বাজে। এতক্ষণ ধ'রে সে ঘুমিয়েছে? এত তা'র ঘুম?

সহসা বাইরে খুড়িমার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল,—ওখানে কে গা দাঁড়িয়ে? বৌমা নাকি?

পলকের জন্য মৃত্যুর মতো একটা তুহিন স্তব্ধতা। তারপর শোনা গেল, না খুড়িমা, আমি।

কে, রাণু?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

খুড়িমা বললেন, এত রাত থাকতে উঠেছ কেন, রাণু?

তাঁর কণ্ঠে কেমন একটা সংশয়ের আভাস পেয়ে দেবীরাণী একটু থতিয়ে জবাব দিল, ঘুমটা ভেঙে গেল রাত থাকতেই। আজ ভোরের গাড়ীতে যাবার তাড়া আছে কিনা—

এটা একটা আকস্মিক কৈফিয়ৎ, প্রিয়কুমারের কানে বাজতে লাগলো। দেবীরাণী চ'লে যাওয়া স্থির ক'রে ফেললো একটি নিমেষের মধ্যেই। সে এত অস্থির, এতই অতৃপ্ত!

খুড়িমা বললেন, ওমা, প্রিয়কুমারের ঘরে আলো জ্বলছে কেন? ও কি এখনো ঘুমোয়নি? বৌমা, শুনছ? ও বৌমা—?

প্রতিমা ধড়মড় ক'রে জেগে উঠলো। উঠে সাড়া দিল, কেন খুড়িমা?

তোমার এত ঘুম কেন, বৌমা? সমস্ত রাত ধরে প্রিয়র ঘরে আলো জ্বলছে, দরজাটা খোলা—তুমি একটিবার খবর নিতে পারোনি কেন? এত রাতে

রাণু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে বারান্দায়, তা'রও একটা খোঁজখবর রাখা তোমার উচিত ছিল, বৌমা?—খুড়িমা বিরক্ত, উত্তপ্ত ও সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিলেন।

প্রতিমা বাইরে এসে বললে, দেবীদিদি, এখানে দাঁড়িয়ে যে?

দেবীরাণী অসাড় ও চেতনাহীন হয়ে জ্যোৎস্নালোকের দিকে নিমেষ-নিহত চক্ষে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিমার প্রশ্নে সে স্বপ্নাতুর দৃষ্টি ফিরিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, তোমার বাড়ীতে এক জায়গায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা, কিংবা রাতজাগার স্বাধীনতা নেই—একথা জানতুম না, প্রতিমা।

তা'র গলার আওয়াজে প্রতিমা একটু লজ্জিত হয়ে সরে' দাঁড়ালো। বললে, না দিদি, তুমি ঘুমোওনি কিনা তাই বলছি। —আসছি ভাই ওঘর থেকে।

প্রতিমা এলো স্বামীর ঘরে। বিছানার কাছে এসে সে প্রিয়কুমারের পা ঠেলে ডাকলো, কিন্তু একবার ঘুমোলে প্রিয়কুমারের নাকি আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সে একেবারে বেহুঁস, তা'র নাক ডাকছে। পাছে শেষরাতে জাগালে প্রিয়কুমার বিরক্ত হয়, সেজন্য প্রতিমা আর তা'কে ডাকলো না। কিন্তু নিজের হাতখানা সরিয়ে নিয়ে প্রতিমা দেখলো, তা'র হাতে জলের দাগ। নদীয়ার কোন্ এক ক্ষুদ্র গ্রামের সরল মেয়ে সে, সে নির্বোধ—জলের দাগের কারণটাকে সে তলিয়ে বুঝলো না। আলোটা নিবিয়ে, দরজাটা ভেজিয়ে সে বেরিয়ে এলো। তা'র মনে কোন সন্দেহের ছোঁয়া লাগেনি।

খুড়িমা বললেন, তুমি আর ঘুমিয়োনা, বৌমা। রাণু যাবে ভোরের গাড়ীতে—তা'র জিনিসপত্র গোছগাছ ক'রে দাও। বনমালীকে ডেকে উনুনে আগুন দিতে বলো।

শরৎকালের রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। প্রিয়কুমার ঘুম থেকে উঠলো। শুনলো দেবীরাণী এখনই চ'লে যাবে। সে মুখ হাত ধুয়ে প্রস্তুত হলো। বনমালী গাড়ী ডেকে আনলো।

দেবীরাণী গাড়ীতে ওঠবার আগে প্রতিমাকে আদর করলো, তারপর প্রিয়কুমারের দিকে ফিরে বললে, শুনেছি মরবার পরে মানুষ কোথায় গিয়ে যেন নিজের একটা কৈফিয়ৎ দেয়। আমিও কৈফিয়ৎ দিয়ে বলতে পারবো, সমস্ত জীবন ধ'রে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়েছি বটে, কিন্তু নিরপরাধকে কখনো প্রতারণা করিনি!

প্রিয়কুমার হাসিমুখে বললে, কিন্তু নিরপরাধকে অনিচ্ছায় যারা চিরদিন ধ'রে ঠকাবে, তাদের কি উদ্ধার নেই ?

প্রভাতের আলোর মত দেবীরাণী হেসে উঠলো। বললে, বেশ ত, আপনি আর আমি একসঙ্গে গিয়ে যদি মহাকালের বিচার সভায় দাঁড়াতে পারি, তখন এর মীমাংসা হবে।

অদূরে দাঁড়িয়ে খুড়িমা বললেন, তোমার গাড়ীর সময় হলো, রাণু। এসো মা, এসো—সুমতি হোক—দুর্গা—দুর্গা—

দেবীরাণী গাড়ীতে উঠে বসলো। গাড়ী ছেড়ে দিল। সেইদিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রিয়কুমার মনে মনে বললে, সেখানেও এর মীমাংসা হবে না, রাণু!

প্রবোধকুমার সান্যাল

ছোট গোকুলপুরের যাত্রী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গাড়ীটা ঘণ্টাখানেক লেট করেছে।

ঠিক সময়ে পৌছলেও অবশ্য প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়, স্টেশনের তেলের বাতিগুলি তার আগেই জ্বালানো হয়। প্ল্যাটফর্মে অল্প কয়েকজন মাত্র যাত্রী গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছিল, শঙ্কিত ও স্তব্ধভাবে। আরও গভীর রাত্রের ট্রেনের জন্যও এ স্টেশনে সাধারণত আরও অনেক বেশী যাত্রী জড়ো হতে দেখা যায়। আজ একদল সিপাই প্ল্যাটফর্মে যাত্রীর অভাব পূর্ণ করেছে।

গাড়ী দাঁড়ায় মিনিট দেড়েক। এই সময়টুকুর ব্যস্ততা এবং কলরবও আজ স্টেশনে ঝিমানো মনে হয়, তারপর গাড়ী ছেড়ে যাবার দু-চার মিনিটের মধ্যেই অদ্ভুতভাবে স্টেশন এলাকা যাত্রী-শূন্য হয়ে ছমছমিয়ে আসে। গাড়ী থেকে যারা নেমেছে তারা কোন দিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি গেটে টিকিট দিয়ে পথে নেমে যায়—এত লোকে যে টিকিট কাটে এবং সদর গেটে টিকিট দাখিল করে স্টেশন ছাড়ে এও এক অসাধারণ ব্যাপার ঘটে। চারিদিকে একনজর তাকালেই টের পাওয়া যায় যে, বাড়ীর টান আজ সকলের হঠাৎ বেড়ে যায়নি, স্টেশন এলাকা ছেড়ে তফাৎ হবার তাগিদেই যাত্রীদের এত তাড়া।

পথে নেমেও কেউ দাঁড়ায় না। স্টেশনের লাগাও তে-রাস্তার মোড়, দু-তিনটি দোকানে মাত্র আলো জ্বলছে, বাকিগুলি বন্ধ। চায়ের দোকানের আলোটা সবচেয়ে উজ্জ্বল, সাধারণত এসময় দোকানটা লোকে প্রায় ভরা থাকে, আজ একরকম শূন্য পড়ে আছে। প্রকাণ্ড বাঁধানো বটগাছের তলায় দুজন চাষী কিছু তরিতরকারি সাজিয়ে বসে আছে, কিন্তু ঢেঁড়স-বেগুনের দরটা জিজ্ঞাসা করার কৌতুহলও যেন আজ কারো নেই।

স্টেশনের বাতির মতই মিটমিট করে দিবাকরের চোখ। সে এদিক ওদিক তাকায়। চোখের পলকে পলকে তার জানা চেনা স্টেশনটি যে ভাবে যাত্রী-শূন্য হয়ে যেতে থাকে সেটা যেন ম্যাজিকের মত ঠেকে তার কাছে। একদল সশস্ত্র

সিপাই-এর দখলে স্টেশনের চেহারা যে অভিনব হয়েছে এটা তার খাপছাড়া লাগে না। এ দৃশ্য দেখা অভ্যাস অছে। কাল এখানে যে ব্যাপার ঘটে গেছে তার বিবরণও সে গাড়ীতে শুনেছে। এরকম দৃশ্যই সে প্রত্যাশা করছিল।

দেখলি ব্যাপার ?

বাচ্চাটাকে বুকে চেপে আন্না চাপা গলায় বলে, দেখব আবার কি ? হাঙ্গামা হয়েছে, পাহারা বসেছে, না ত কি থেটার হবে ? হাবার মত দাঁড়িয়ে থেকো নি, যাই চলো।

বিড়ি-সিগারেট টানতে টানতে ক-জন বাবুমত লোক একান্ত বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যাত্রীদের লক্ষ্য করছিল, নাম ধামও জিজ্ঞাসা করছিল দু-একজনকে। স্টেশন যাত্রীশূন্য হয়ে আসায় এতক্ষণে দিবাকরদের দিকে তাদের নজর পড়ে। মাঝবয়সী বেঁটে লোকটি মুখ বাঁকিয়ে বলে, চাষাভুষো বাজে লোক, যেতে দাও।

তার খদ্দর পরা ছোকরা বয়সী সঙ্গীটি পান রাঙা মুখে আরও দুটো পান পুরে চিবুতে চিবুতে আন্নার দিকে চেয়ে থাকে, আচমকা প্যাচ্ করে পিক ফেলে হাত উঁচিয়ে আঙুল ঠেরে দিবাকরকে কাছে ডাকে, এই! শোন!

দিবাকর অবশ্য দেখেও ছাখে না, শুনেও শোনে না। পুঁটুলিটা বগলে চেপে দড়ি বাঁধা হাঁড়িটা হাতে ঝুলিয়ে আন্নাকে সঙ্গে নিয়ে গুটি গুটি এগোতে থাকে।

ওরা জন তিনেক তখন সামনে এসে দাঁড়ায়।

টিকিট আছে ?

আছে।

শার্টের বুক পকেট থেকে দিবাকর দু-খানা টিকিট বার করে দেখায়।

কোথা যাবে ?

আজ্ঞে ছোট বকুলপুর যাব।

শুনে তারা যেন একটু চমকে যায়। পানখোর ছোকরা আবার প্যাচ করে খানিকটা পিক ফেলে। গতকালের হাঙ্গামায় প্ল্যাটফর্মের লাল কাঁকরে খানিক রক্তপাত ঘটেছিল, ছোঁড়া যেন পানের পিক দিয়েই তার জের টেনে প্ল্যাটফর্মটা রাঙা করে দিতে চায়। দিবাকরও পান ভালবাসে, রাস্তায় পুরো চার পয়সার তৈরী পান কিনেছে। কাগজের ঠোঙাটা বার করে সেও একটা পান মুখে পুরে দেয়। লোকগুলির এত কাছে দাঁড়ানোর জন্যই বোধ হয় পানটা তার একটু তিতো লাগে। ওদের মাথার পিছনে দূরে কারখানাটার উঁচুতে টাঙানো নিঃসঙ্গ

আলোটা তার চোখে পড়ছিল, অন্ধকার আকাশে যেন বিনা অবলম্বনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ওই কারখানার ধর্মঘট নিয়ে কাল স্টেশনের হাঙ্গামা। তিনজন নেতাকে ধরে ট্রেনে চালান দেবার সময় কয়েক শ' মজুর তাদের ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। তখন গুলি চলে, রক্তপাত ঘটে। গাড়ীতে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনার পর থেকে দিবাকরের আধা-চাষী আধা-মজুর প্রাণটা বড়ই বিগড়ে আছে।

বেঁটে লোকটি জিজ্ঞাসা করে, রাত করে ছোটবকুলপুর যাবে ? সেখানকার খবর জানো সব ?

দিবাকর নির্লিপ্তভাবে বলে, খবর জেনেই এয়েছি বাবু। আত্মীয়-কুটুম আছে সেথা, খপর নিতে এয়েছি তারা বেঁচে আছে না স্বাধীন হয়েছে।

বেঁটে লোকটি বলে, ও বাবা তোমার দেখি চটাং চটাং কথা !

না বাবু, গরীব মানুষ কথা কোথা পাব ?

তে-মাথার পাশে দুটি খোলা গরুর গাড়ী মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, কাছে মাটিতে শুয়ে জাবর কাটছে একজোড়া শীর্ণ ও শান্ত বলদ। স্টেশনের সামনে সাধারণত দু-তিনটি ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকে, ঘোড়া যত প্রাচীন, গাড়ীগুলি ততোধিক। বেগার খাটার ভয়ে গরীব গাড়োয়ানেরা আজ গাড়ীই বার করেনি। গাড়ী চেপে শ্বশুরবাড়ী যাবার মত বড়লোক দিবাকর কোনদিন ছিল না, আজ কিন্তু সে ঘোড়ার গাড়ী চেপেই যেত—আন্নার রূপার গয়না বাঁধা দিয়ে এই উদ্দেশ্যেই সে টাকা যোগাড় করে এনেছে। ছোটবকুলপুর পৌছতে রাত হবে এটা জেনেই তারা রওনা দিয়েছে, তবে রাত করে মেয়েছেলে আর শিশু নিয়ে তিন মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে ঘোড়ার গাড়ীর আশাটা ছিল।

এখন ভরসা গরুর গাড়ী।

গাড়োয়ান কই হে ! দিবাকর ডাকে।

দুই গাড়ীর দু-জন মালিকেরই আবির্ভাব ঘটে। আবছা আলোয় মনে হয় একজন যেন পুরানো বটগাছটা এবং অন্য জন দোকান ঘরের বেড়া ভেদ করে কাছে এসে দাঁড়াল।

তাদের তাড়া নেই, গরুর গাড়ীতে কম্পিটিশনও নেই। ধীরেসুস্থে তারা জানতে চায় দিবাকরেরা কোথায় যাবে।

ছোটবকুলপুর।

শুনে তারা দুজনেই ঘাড় নাড়ে। ওরে বাবা, রাত্রিবেলা ছোটবকুলপুর কে যাবে! সেখানে সৈন্যপুলিশ গ্রাম ঘিরে আছে, রীতিমত লড়াই চলছে।

চারজনেই তারা সম্মুখে পথটার দিকে তাকায়। ছোটবকুলপুরের এ রাস্তা কিছু দূর গিয়ে বাঁক নিয়েছে, কিন্তু সে পর্য্যন্ত এখন নজর চলে না—মনে হয় বিপজ্জনক অন্ধকারেই বুঝি পথটা হারিয়ে গেছে। বাঁ হাতে কোলের বাচ্চাকে সামলে ডান হাতে আন্না দিবাকরকে এক পা পিছু ঠেলে দেয়, নিজে এগিয়ে দায়িত্ব নেয়।

ওখান-তক্ নাই বা গেলে বাবা? যদ্দূর যেতে চাও নিয়ে চলো, বাকি রাস্তা মোরা হেঁটে যাব। ভাড়া ঠিকমত পাবে।

রাম বলে, রাতের বেলা কে অত হাঙ্গামা করে, না কি বল ঘোষের পো?

ওমা, তোমরা পুরুষ হয়ে ডরাচ্ছ! আন্না মিষ্টি সুরে বলে, বাচ্চা কোলে মেয়েছেলে যাব, তোমরা পুরুষ হয়ে ডরাচ্ছ!

রাম চুপ করে থাকে। তার বয়স বেশি, সাহস কম! গগন ঘোষ বলে, কমলতলা-তক যেতে পারি।

তাই হোক। কমলতলার সীমা পেরিয়েও যদি নামিয়ে দেয় তবু প্রায় আধমাইল হাঁটতে হবে। পুরো দেড়ক্রোশ হাঁটার চেয়ে সে অনেক ভাল। একটা গাড়ীতে বলদ জুড়লে আন্না উঠে বসে, এ কসরৎ তার অভ্যাস আছে। গগনের গাড়ীটা নড়বড়ে, ক্রমাগত লেজ মলে তাড়া না দিলে শীর্ণ বুড়ো বলদ এক পা এগোতে চায় না। আন্না আগ্রহের সঙ্গে ছোটবকুলপুরের খবর জিজ্ঞাসা করে, তবে গাঁয়ে ঘরে পৌছবার আগে বাপ-ভায়ের কুশল জানার আশা সে করে না। গ্রামের সাধারণ অবস্থার ঘনিষ্ঠতর বিবরণ, অনেক নতুন খবর গগনের কাছে জানা যায়। দূর থেকে তারা শুনেছিল যে ছোটবকুলপুরের অবস্থা অতি শোচনীয়, প্রচণ্ড আঘাতে গাঁয়ের গেরস্থ জীবন তছনছ চুরমার হয়ে গেছে। গগনের কাছে শোনা যায়, ব্যাপার ঠিক তা নয়। গোড়ায় গাঁয়ের মধ্যে খুব খানিকটা অত্যাচার হয়েছিল, কিন্তু তারপর গাঁয়ের লোক আঁটসাঁট বেঁধে এমন জেঁকে বসেছে যে চৌধুরী বা ঘোষেদের কোন লোক অন্তত দু-ডজন রাইফেল ছাড়া গাঁয়ের ভেতর ঢুকতেই সাহস পায় না।

একবার মুখ খুললে গগনকে থামানো দায়। গরুর লেজ মলে মলে মুখে গরু-তাড়ানোর অদ্ভুত আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে সে চারিদিকের অবস্থা বর্ণনা

করে যায়, তার মতে কলিযুগ সত্যই এবার শেষ হতে চলেছে। সমস্ত লক্ষণ থেকে তাই মনে হয়। নইলে রাজায় প্রজায় এমন যুদ্ধ বাধে?

মোরা কলির পাপী লোক, এ লড়ায়ে মোরা মরব। মোদের ছেলেপুলেরা সত্যযুগ করবে!

অন্ধকার নিস্তব্ধ পথে বেশ সোরগোল তুলেই গাড়ী চলে। রাস্তার ধারের কোন কোন ঘরের বেদখল দাওয়া থেকে মাঝে মাঝে টর্চের আলো এসে পড়ে গাড়ীতে, গুরুগম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন আসে: কে যায়? কোথা যাবে?

গগন জবাব দেয়: ইস্টেশনের ট্রেইনের মেয়েছেলে। কমলতলি যাবে।

গাড়ী গাছপালা বাড়ীঘরের আড়ালে যাওয়া পর্য্যন্ত টর্চের আলো আন্নার গায়ে সাঁটা থাকে, ট্রেনের প্যাসেঞ্জার নিরীহ নির্দ্দোষ মেয়েছেলেই যে যাচ্ছে গাড়ীটাতে সেটা যেন যতক্ষণ সম্ভব প্রত্যক্ষ করা চাই।

এ অঞ্চলে ঘন বসতি, গায়ে গায়ে লাগানো বড় বড় গ্রাম। তবু এখন সন্ধ্যারাত্রেই রাস্তায় প্রায় লোক চলাচল নেই। গেঁয়ো লোকের পথ চলাও খাপছাড়া রহস্যময় হয়ে উঠেছে। এই পথ ধরেই গ্রাম থেকে গ্রামান্তের লোকে পাড়ি দেয়, আজ যেন চারিদিকে সকলেরই দীর্ঘ পথ হাঁটার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। রাস্তার পাশ থেকে আচমকা হয় তো একজন রাস্তায় উঠে আসে, জোরে জোরে পা ফেলে খানিকটা এগোতে না এগোতেই আবার রাস্তার ধারের অন্ধকারেই মিশিয়ে যায়। মাত্র দুটি লোকের এরকম টুকটাক খুচখাচ খুচরো চলাফেরার প্রয়োজন নির্জ্জনতা ও স্তব্ধতাকে আরও বেশি অস্বাভাবিক করে তোলে।

কমলতলায় মস্ত ছাউনি পড়েছে। চোখ তুলে সেদিক চেয়ে গগন মাথা চুলকায়।

যাব নাকি এগিয়ে ছোটবকুলপুর-তক্?—গগন অনুমতি চাওয়ার সুরে বলে, দিবাকরেরাই যেন তাকে যেতে বারণ করেছে!—চলো যাই মেয়া, তোমায় নিয়ে যাই। মাঝ রাস্তায় কেমন করে নামিয়ে দি বলো, আঁ?

আন্না খুশি হয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে, ভগবান মুখপোড়া একচোখা কানা, নইলে তোমার নতুন গাড়ী হত বাবা, জোয়ান বলদ হত!

ছোটবকুলপুরের প্রান্ত ছুঁতে ছুঁতে একবারে তিন-তিনটে টর্চের আলো গরুর গাড়ীতে এসে পড়ে। কিছু হাঁকডাক শোনা যায়। বেশ বোঝা যায় গাঁয়ে ঢুকবার মুখে বাম্না পাহারা দিতে গেড়ে বসেছে বিদ্রোহী গ্রামটিকে বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে, অসময়ে গগনের গরুর গাড়ীর আবির্ভাবে তাদের মধ্যে খানিকটা সানন্দ উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। গাড়ীতে শুধু দুটি বলদ, একটি গাড়োয়ান, একজন পুরুষ ও একটি মেয়েমানুষ এবং একটি বাচ্চা—সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নেই।

দেখতে দেখতে সাত-আটজন গাড়ীটা ঘিরে ফেলে। টুপিটা ঠিক করে বসাতে বসাতে মাঝ বয়সী মোটা লোকটি, সে-ই বোধ হয় বেসরকারী দলপতি, গম্ভীর গলায় বলে, কোথা থেকে আসছ?

গগন বলে, ইস্টিশনের টেরেনগাড়ীর প্যাসিঞ্জার আজ্ঞা।

শাট্ আপ! তোকে কে জিজ্ঞেস করেছে? তোমার নাম?

মোর নাম দিবাকর দাস।

বাপের নাম? কোথায় থাক? কি কর, এদিকে এসেছ কেন?

বাপের নাম মনোহর দাস। তেনা স্বগগে গেছেন—তিপ্পান্নর মন্বন্তরে। রোগ ব্যারাম কিছু নয়, উপোস দিয়ে মিত্যু। হাওড়ায় থাকি, ঘনশ্যাম-বেটেনট কারখানায় মজুর খাটি। ইদিকে হাঙ্গামা শুনলাম, বৌ কাঁদতে লাগল যে তার বাপ ভাই মরেছে না বেঁচে রয়েছে। তা ভাবলাম কি যে কারখানার ধরমঘট দু-দশ দিনে মেটার নয়, যা দিনকাল। বৌকে নিয়ে দেখে আসি শ্বশুরবাড়ী ব্যাপার কি।

সবিনয়ে স্পষ্ট সরল ভাষায় দিবাকর তাদের আগমনের কারণ ও বিবরণ দাখিল করে। কাঁদাকাটা করে না বলে, ভয়ে দিশেহারা হয়ে পায়ের তলায় আছড়ে আছড়ে পড়ে না বলে বোধ হয় তার ব্যাখ্যা এদের পছন্দ হয় না।

পুঁটলিতে কি আছে? বোমা বন্দুক?

আজ্ঞে কাঁথা কাপড়।

তুমি যে সত্যি দিবাকর দাস, মজুর খাটো; শ্বশুরবাড়ী আসছ, কোন বদ মতলব নেই, তার প্রমাণ দিতে পার?

কী প্রমাণ দেব বলেন? সাক্ষী প্রমাণ তো সাথে আনিনি!

ষোল-সতের বছরের স্বেচ্ছাসেবক ফরসা ছেলেটি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, দীর্ঘ থলথলে চেহারার প্রৌঢ়বয়সী লোকটির ধমকে বিষম খেয়ে থেমে যায়, কাসতে কাসতে বেদম হয়ে পড়ে।

আন্না বলে, গাঁয়ের চাষা পাড়ার দশটা লোক ডেকে পাঠাও না বাবুরা, মোকে দু-চারজন চিনবেই, গাঁয়ের মেয়া আমি।

সে তো চিনবে, না চিনলেও চিনবে। যাদের সঙ্গে যোগসাজস তাঁদের যদি না চিনবে তো কাদের চিনবে?

আন্না দিবাকরের কানে কানে বলে, গাঁয়ের লোক ডাকতে ডরাচ্ছে, জানো?

দীর্ঘ থলথলে লোকটি আঙুল উঁচিয়ে বলে, এই কানে কানে কী কথা হচ্ছে? চুপিচুপি সলাপরামর্শ চলবে না, খবরদার!

গাঁয়ে যাওয়া কি বারণ বাবু? একশো চুয়াল্লিশ রটিয়েছো? দিবাকর প্রশ্ন করে।

কদমছাটা চুল লম্বাটে মাথা পাঞ্জাবি গায়ে বয়াটে চেহারার ছোঁড়াটা বলে, বারণ কেন, বারণ নেই। তোমরা কে, কি মতলবে এসেছ জানা গেলেই যেতে দেওয়া হবে।

ওসব যাতে জানা যায় তার একটা বিহিত কর বাবুরা?

চোপ, তামাসা হচ্ছে, না?

ধমকানির চোটে দিবাকরেরা চুপ হয়ে যায়, বাচ্চাটা ককিয়ে কেঁদে উঠে প্রতিবাদ জানায়। ওদের দিকে পিছন ফিরে বসে ছেলেকে শান্ত করতে করতে আন্না তাদের মন্তব্য ও পরামর্শ শোনে। আচমকা গরুর গাড়ী চেপে হাজির হয়ে তারা যে গুরুতর ও জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে মানুষগুলি রীতিমত বিব্রত ও বেশ খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সঙ্গের জিনিস বেশভূষা চেহারা দেখে আর কথাবার্ত্তা শুনে সত্যি সত্যি টের পাবার জো নেই যে এরা সত্যি-কারের নিরীহ সাধারণ গোবেচারী চাষামজুর মাগভাতার ছাড়া অন্য কিছু নয়, কিন্তু সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে দারুণ সন্দেহের কারণ। যে তাণ্ডব চলেছে ছোটবকুলপুরে ক'দিন ধরে, তাতে সত্যিকারের কোন ভীরু মুখ্য ছোটলোক মাগছেলে সঙ্গে নিয়ে সাধ করে কখনো তার মধ্যে আসতে চায়? তাও আবার হাঙ্গামার খবর জানবার পরে! বাজে লোকের এ সাহস হবে কোত্থেকে? তার চেয়েও বড় কথা, সন্দেহের কথা, চারিদিকে এত রাইফেল বন্দুকের সমারোহ দেখেও ওরা মোটে ভড়কে যায়নি, দিব্যি নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব।

একজন নীচু গলায় বলে, নিশ্চয় কোন ডেঞ্জারাস লোক ছদ্মবেশে এসেছে।

আর একজন বলে, সার্চ করা যাক না?

দীর্ঘ থলথলে লোকটি হুকুম দেয়, এই! জিনিসপত্র নিয়ে নামো।

তার মুখের কথা খসতে না খসতে দুজনে দিবাকরকে ধরে টেনে নামিয়ে দেয়। উৎসাহ অথবা উত্তেজনার আতিশয্যে একজনের হাত থেকে পড়ে গিয়ে মুখবাঁধা মাটির হাঁড়িটা ভেঙে যায়, ছড়িয়ে পড়ে আধ হাঁড়ি জল আর তাতে কিলবিল করে গোটা ছয়েক শিং মাছ!

দিবাকর গোসা করে বলে, দিলে তো বাবুরা, গরীবের পথ্যির দফা মেরে দিলে তো? রুগী বৌটা এখন খাবে কি!

বলি ওহে দিবাকর দাস, একজন গম্ভীর মুখে বলে, কারখানায় খেটে খাও বললে না? কুলি মজুরের বৌরা কবে থেকে শিং মাছের ঝোল খাচ্ছে হে? পাঁচ-ছ টাকা শিং মাছের সের।

শিঙিমাছ খাওয়া মোদের বারণ আছে নাকি বাবু?

এ ফোড়নের অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে সে গর্জ্জন করে ওঠে, শাট্ আপ্, বেয়াদপ!

পোঁটলাটা খুলে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়, তাতে একটা অঘটন ঘটে যায়। আন্নার বাচ্চাটা রাস্তায় দু-একবার পায়খানা করেছে, নোংরা ন্যাকড়া দলা পাকিয়ে আন্না পুঁটুলির মধ্যে রেখেছিল। ঘাঁটতে যাওয়ায় অনুসন্ধানীর হাতে ময়লা লেগে যায়। গন্ধে ও স্পর্শে রাগ চড়ে যাওয়ায় বেহিসাবীর মত পুঁটলিটাতে সে বল শুট করার মত লাথি মেরে বসে। ফলে কাদার মত তরল পদার্থ খানিকটা তার পায়েও লাগে, ছিটকে বন্দুকের গায়েও একটু আধটু লেগে যায়।

গাড়ীতে বিছানো বিচালি তুলে, ছেঁড়া বস্তাটার ভাঁজ খুলে খোঁজার পর গগন আর দিবাকরের গা খোঁজা হয়। দিবাকরের শার্টের পকেট থেকে বার হয় পানের মোড়কটা।

বাঃ, সাজা পান! দে তো একটা।

তিনটি পান অবশিষ্ট ছিল, তিনজনের মুখে যায়। পান চিবোতে চিবোতে একজন লণ্ঠনের আলোয় পান মোড়া ছাপান কাগজটার দিকে এক নজর তাকিয়েই যেন বৈদ্যুতিক শক্ খেয়ে চমকে ওঠে। কাগজটা ভাল করে মেলে ধরে সে বিস্ফারিত চোখে বড় হরফের হেডলাইনটার দিকে চেয়ে থাকে।—"ছোট বকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি।"

নিগূঢ় আবিষ্কারের উত্তেজনায় কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, পাওয়া গেছে! ইস্তাহার পাওয়া গেছে!

ইস্তাহার? তাই বটে। বিপজ্জনক ইস্তাহার! যদিও দুমড়ে মুচড়ে চুন আর পানের রসে মাখামাখি হয়ে গেছে তবু চেষ্টা করে আগাগোড়া পড়া যায়। পড়তে পড়তে চোখও কপালে উঠে যায়।

তবু তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। আর শূন্যে হাতড়াতে হবে না, মনগড়া সন্দেহ সংশয়ে জর্জ্জরিত হতে হবে না, একেবারে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে লাভের মুঠোয়। এবার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবে।

এ ইস্তাহার পেলে কোথা?

প্রশ্নটার যেন স্বাদ আছে এমনিভাবে আরামে জিভে জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করা হয়।

ইস্তাহাব? ইস্তাহারের তো কিছু জানি না! চার পয়সার পান, কিনলাম, পানওয়ালা ও কাগজটাতে জড়িয়ে দিল।

পানওলা জড়িয়ে দিল না তুমি ভেবে চিন্তে পান কিনে ইস্তাহারটাতে জড়িয়ে নিলে?

কেন? তা কেন করতে যাব?

আর ঢং কোরো না এবার আসল নাম বল দিকি।

দিবাকর আর আন্না পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মলিনা

লীলা মজুমদার

প্রেমের ব্যাপাব বলতে গেলে একটা কেন পাঁচটা বলতে হয়, নইলে আমার আত্মীয়স্বজনদের ওপর অবিচার করা হবে। ওদের ও-রকম সাদামাটা চেহারা দেখে অনেকেই ভুল বোঝে। আর সত্যি কথাই বলব; সাদামাটা সকলে নয়ও, মার পিসতুত ভাইয়ের মেয়ে মলিনা তো নয়ই। তবে প্রেমের ব্যাপারে কোন উপকরণ লাগে না, এও সত্যি।

বহু গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করেছি যে, প্রেমের ব্যাপারে, বুদ্ধি বা বিবেচনা বা বিচার বা উদ্দেশ্যের কথা তো ছেড়েই দেওয়া যাক্, এমন কি রূপ বা গুণ বা অর্থ বা পরমার্থ কোন কিছুরই স্থান থাকে না। এই কারণেই যদিও বাইবেলে স্পষ্ট অক্ষরে লিখিত আছে যে, স্বর্গবাজ্যে বিয়ে হয়ও না, বিয়ে দেওয়াও হয় না, তথাপি বিলাতী শাস্ত্রে এই কথা বলে যে, বিবাহ-ব্যাপাব স্বর্গে সংঘটিত হয়। প্রেম বা বিবাহ যদি কপালে থাকে তো হয়ে গেল। অনেকটা লটারি জেতার মত। নইলে বাপ-মা মাসি-খুড়ি হাজাব ষড়যন্ত্র করুন না কেন, ফলে লবডঙ্কা।

আমাদেব মলিনা একেবারে নিখুঁত সুন্দরী না হলেও কেমন পাকিয়ে পাকিয়ে চুল বেঁধে, ভুরুব এদিক-ওদিক থেকে ছুচারটে রেঁায়া উপড়ে দিব্যি ধনুকের মত বানিয়ে নিয়ে, গালে মোলায়েম একটা প্রলেপ লাগিয়ে, ঠোঁটে কমলালেবু রঙ ঘষে, কপালে একটি লম্বাটে গড়নের সবুজ টিপ দিয়ে, চোখের কোণায় সুর্মার আঁচর টেনে, কনুই-হাতা বেঁটে একটা ঘোর সবুজ ব্যাঙ্গালোরী জামা, আর পাড় শূন্য ঘোর লাল সিফনের শাড়ি, আর সবুজ মখমলের খড়ম প্যাটার্নের স্যাণ্ডাল পরে, হাতে একটা লাল গোল ব্যাগ ঝুলিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে এসে যখন কাছে দাঁড়াত, তখন শুনেছি, শুধু যুবকদের কেন, আধ-বুড়োদেরও নাকি বুক টিপ-টিপ করত।

এ সব জিনিসের কাছে সাদাসিধা কাঁচা রূপ কখনো দাঁড়াতে পারে না। তার উপর লোক-মুখে শোনা যেত যে মলিনার বাবা জামাইকে নাকি কমসে-কম

পনেরো-কুড়ি হাজার টাকা যৌতুক দেবেন। ঝাঁকে-ঝাঁকে পাত্র এসে জুটত, তাদের মধ্যে সবাই একেবারে অযোগ্যও নয়। কিন্তু মলিনা সেই যে নাক উঁচু করে মাথা ঘুরিয়ে বসত, তাকে আর কিছুতেই নড়ানো যেত না। মা-খুড়িরা রেগে টং। 'তোর ঐ পেয়ারের বন্ধু জুলুই তোর কাল হল; তুমি খিষ্টান মানুষ বাপু, হিন্দু বিয়ের তুমি কি বুঝবে শুনি? তা অমন সোনার টুকরো ছেলে সুনন্দর সম্বন্ধে কি বলে সে, যে এক কথায় না করে বসলি?'

মলিনা গাল ফুলিয়ে বললে, "সে বলে এমন খেয়ালী নাম যাদের তাদের চরিত্রে দুর্বলতা থাকে। বলে, উত্তেজিত হলেই যারা তোতলামি করে, তাদের উপর নির্ভর করা যায় না। ও হলে এ সম্বন্ধ ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করত।"

পিসিমা তাই শুনে দারুণ চটে গেলেন: 'তা তো বটেই! অমন ঘোড়া-মুখো মেয়ের এমন সম্বন্ধ জুটলে তবে সে না! কেমন পাস করা ডাক্তার, বিলেত থেকে খেতাব এনেছে, বলি, তুই নিজেই বা কি এমন ডানাকটা পরীটি বল্ তো? খবরদার ঐ জুলুর সঙ্গে মিশবি না বলে দিলাম। আর পুরুষমানুষের চরিত্র একটু দুর্বল হবে না তো কার চরিত্র হবে?'

কথাটা সুনন্দের কানে পৌঁছতে খুব দেরি হল না, কারণ পাড়ার সকলেই বহুদিন ধরে আশা করেছিল যে, রমেশবাবুর বুজুম-ফ্রেণ্ড অনিমেষ চৌধুরীর ছেলের বিয়ে হবে, পাড়াসুদ্ধ সকলে এবাড়ি-ওবাড়ি নিয়ে অন্তত চার দিন বে-আইনীভাবে দারুণ ভোজ খাবে। সুনন্দ শুনে উত্তেজিত হয়ে শার্টের গলার বোতমটা টেনে ছিঁড়েই ফেলল: 'খু-খুব ভা-ভাল! মন্দ জিনিসের যারা আদর করে, তাদের চেয়েও স্-স্-স্টুপিড হল যারা ভা-ভাল জিনিস চেনে না। ব্-বড় ব্-ব্ বেঁচে গেছি।'

জুলু মলিনার ক্ষুব্ধ চিত্তে সান্ত্বনা দিতে ছুটে এল। 'খবরদার অমন কাজও করবি না। জানিস ঐ লোকটা কাল তোর ও—কথা সোনার পরও আমাদের ব্যাডমিণ্টন ক্লাবে বসে এয়া বড়া একটা ডবল ডিমের মামলেট খেল। আর পাঁচুকে ডেকে বলল, খাসা হয়েছে, তোফা হয়েছে, এর পরের বার এর সঙ্গে কুচি-কুচি টমাটো আর ধনে পাতা দিস্ যদি, তবে মধুর সঙ্গে এর কোন তফাত থাকবে না! একবার রোমে—'। ঐ পর্যন্ত শুনে ছুটে চলে এলাম ভাই! ভগবান তোকে এ কী পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন! ইশ্, তোর মা-খুড়িমারা কী রে! ওখানে সারি-সারি আচারের বোতল সাজিয়েছেন! আহা ওখানে

দিব্যি একটি সন্তানে হলদে গোলাপ তুলে দেওয়া যেত; তুই তার নিচে বসে বই-টই পড়তিস, আর তোর মাথায় টুপ টাপ করে হলদে গোলাপের পাপড়ি ঝরে পড়ত।'

প্রথমটা খুব খানিক চেষ্টা চরিত্র করে শেষে আমরা প্রায় হালই ছেড়ে দিয়েছিলাম। জুলুর মা-র বাড়িতে বড়দিনের পার্টিতে যদি বা সুনন্দকে একটি গাঢ় নীলপানা সুট পরিয়ে লাল টাই লাগিয়ে ধরে-বেঁধে নিয়ে যাওয়া গেল, সে সেখানে গিয়েই বলে বসল, 'বুঝলেন মাসিমা, বিলেতের লোকেরা যে ঠাণ্ডা জলে স্নান করে ও সব বাজে কথা। গরমের সময় ঠাণ্ডা জলে আর শীতের সময় দারুণ গরম জলে স্নান করতে হয়। গায়ে মাথায়-টাথায় খুব খানিকটা ভীষণ গরম জল বড় একটা মগ দিয়ে হুস হুস করে ঢালবেন। তারপর খড়খড়ে একটা তোয়ালে নিয়ে হেঁইও-হেঁইও করে তাড়াতাড়ি গা মুছে ফেলবেন, তখন গা দিয়ে ধোঁয়া বেরোবে। তারপর গরম কোট পেন্টালুন পরে এখানে এসে হাজির হবেন। সেই আলুর ভিতর চিংড়িমাছ পুরে বানিয়েছেন আশা করি।'

জুলু শিউরে উঠে মলিনার কানে কানে বললে, 'সাবধান মলিনা, তোর আত্মা শেষটা চিপকে মরে না যায়, তোর আদর্শগুলো পিষে গুঁড়ো না হয়ে যায়!'

মলিনাও চোখ বুজে বলল, 'নেভার, নেভার।'

বাস্তবিকই আরাম তো আমরা সকলেই ভালবাসি, কিন্তু সুনন্দটা যেন ইচ্ছা করে, একেবারে প্রকাশ্যে আরও বেশি ভোগাসক্ত হয়ে পড়তে লাগল। মলিনাদের বাড়ি গিয়ে বলে এল, 'আরে কাকাবাবু! ওরকম কফি খাবেন না। কফি হবে হট অ্যাজ হেল্, ডার্ক অ্যাজ দি ডেভিল অ্যাণ্ড সুইট অ্যাজ সিন্!' কী দরকার ছিল? ওরকম করলে কি আর কারও বিয়ে হয়? আমরা এক রকম হাল ছেড়ে দিয়ে যে যার নিজের কাজে লেগে গেলাম।

অনিমেষবাবুর সঙ্গে রমেশবাবুর কি শলাপরামর্শ চলত জানি না, কিন্তু সুনন্দর মা বউ খুঁজতে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। আর যেমনই হোক, ঐ রমেশ ঠাকুরপোর অহঙ্কারী মেয়ের মত যেন না হয়। না, না, একেবারে হিন্দু প্যাটার্নের হলে কখনই চলবে না, ওর চোখে যে বিলেতের ঘোর লেগে রয়েছে। দেখছ না, বাছার খাওয়াটা-শোওয়াটা ঠিক তেমন-তেমন না হলে কেমন মনে ধরে না। আবার একেবারে ঠাণ্ডা মেয়ে হলেও চলবে না, দরকার হলে যেন

বেশ দু কথা শুনিয়ে দিতে পারে, ইংরেজীতে হলেই ভাল, তবে বাংলাতেও চলবে এখন। আর দেখ, ঐ মলিনার চেয়ে কিন্তু ভাল দেখতে হওয়া চাই!

শুনেছি ঐ রকমটি পাওয়াও গিয়েছিল মেলা। আমাদের দেশে ধান ... টাকা পয়সা না থাকতে পারে, কিন্তু মেয়ে সব রকমেরই আছে। সুনন্দর ... হাত-বাক্স তো ছবিতে ছবিতে ঠাসা হয়ে গেল। 'এ কি করেছ মা? এ সবে তো চলবে না। এদের যে সব বড্ড পোষা বেড়াল বাচ্চার মত চেহারা। বেশ একটু চটুল-নয়না হবে, একটু বঙ্কিম গড়নের—'। সুনন্দর মা ওর হাত থেকে তাড়াতাড়ি ছবিগুলো কেড়ে নিয়ে বললেন, 'ছি, ওসব কি অসভ্য কথা! তুই যা তো এখান থেকে। কোথায় যে অত শিখিস বুঝতে পারি না। তোর বাবা তো কখনও বলেন না।'

কিন্তু আসলে এ সকলের অন্তরালে গোপনে-গোপনে বিয়ের জাল বোনা হয়ে যাচ্ছিল, কারও বাবার সাধ্য নেই তাকে ছিন্ন করে।

মলিনার মা রাগ করে বললেন, 'তবে কি আপিসে আদালতে চাকরি করবি? না কি সন্ন্যাস নিয়ে মা-ঠাকরুন হবি, মন্তর-তন্তর দিবি? আমাকে স্পষ্ট কথাই বল। গয়না গড়ানো, কাপড় কেনা, বরের আংটি রেডি, ঘড়ি কেনা, বোতাম তৈরী, আমি আর এর বেশি কী করতে পারি? আমার একমাত্র মেয়ে বিয়ে করবে না, আমি বরণ করব বলে লাল পাড় গরদ পর্যন্ত কিনে রেখেছি। মেয়ে খায় না দায় না, রাঁধে না বাড়ে না, কাব্যি পড়ে, কী সব হিজিবিজি লেখে, তার মানে পর্যন্ত হয় না, না পদ্য না গদ্য, কিচ্ছু কোনও দিন বলি নি, সব মুখ বুজে সয়ে গেছি, এবার আর পারি না, এই রইল সব, ভাঁড়ারের চাবি, আলমারির চাবি, ধোপার হিসেব-খাতা, রেশনকার্ড, আমি শয্যা নিলাম, হয় বাড়িতে রোশনচৌকী বসলে উঠব, নয়তো যেদিন পা আগে করে—' দারুণ কান্না পাওয়াতে আর বলা হল না, চাবি-টাবি মলিনার সামনে ফেলে দিয়ে দুম-দুম করে সত্যি সত্যি ঘরে গিয়ে শয্যা নিলেন।

মলিনার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তাই তো। এখন কী করা যায়? জুলুর সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। তাই মলিনা অসময়ে জুলুদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে বেলা তিনটের সময় তোলা উনুনে জুলু মাছের কচুরি ভাজছে। আর চেয়ারের উপর ছাই রঙের গরম পেণ্টালুনে আর হাতকাটা শার্টের উপর ছাই রঙের পুলোভার পরে দিব্যি সুন্দর পা গুটিয়ে বসে সুনন্দ কচুরি ভাজার তদারক করছে: 'উঃ-হুঁ-হুঁ, বড্ড নুন দিয়েছ, লাগাও একটু

…নিগার আর চিনি আর কিসমিস বাটা। এই, কিসমিস বাটা আছে তো,
…র মলিনা যে; এস-এস এখানে বোস, উনুনের ধোঁয়াতে শেষটা তোমার
…র্বাদ শুকিয়ে-টুকিয়ে যাবে না তো?

মলিনার চারদিক তখন সবুজ হয়ে গেছে। বিস্ফারিত লোচনে রুদ্ধকণ্ঠে …কে বলল, 'ওঃ, তোমার মনে এই ছিল। বিশ্বাসঘাতক! তুমি ভেবেছ … মাকে কবি বানিয়ে, মাছের কচুরি খাইয়ে দিব্যি সুন্দর আমার বর ভাগিয়ে …বে? দেখি তো তোমার সাধ্য কত!' মলিনার দুই চোখ দিয়ে অশনিবর্ষণ …তে লাগল, গালের প্রলেপ ভেদ করে রক্তিম আভা দেখা দিল, রুদ্ধনিঃশ্বাসে কপালের পাশের চুলগুলি কম্পিত হতে থাকল। বুকের ভেতর থেকে ছোট একটা লালখাতা বের করে উনুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, 'এই রইল তোমার আদর্শের খাতা, ঠগ, প্রবঞ্চক, দুষ্টু, পাজী!' চোখ ফেটে জল এল, মলিনা সুনন্দর দিকে না চেয়ে ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুনন্দও তড়াক করে চেয়ার থেকে নেমে সিঁড়ির মাথায় তাকে ধরে ফেলে বলল, 'আরে দুর-দুর! তাও যদি কচুরিতে নুন বেশি না দিত।' তারপর তার ভিজে গালের ঠিক মাঝখানটাতে ছোট্ট একা চুমু খেয়ে বলল, 'আরে তুমি পাগল হলে নাকি, এই যে আংটিটা কিনে রেখেছি না, এটা যে জুলুর আঙুলে ঢুকবেই না। আঃ কী মুশকিল, নাও আমার রুমালটা দিয়েই চোখটা মুছে ফেল তো দেখি, লক্ষ্মীটি।'

আর বাকি রইল কী? রোশনচৌকী, লুচি, পাঁঠা, সুনন্দর নিজের ডিরেকশনে দস্তুরমতো ধনেপাতা দিয়ে রাঁধা। লাল দই আর রসকদম্ব। সত্যিই বিবাহ ব্যাপার স্বর্গে সংঘটিত হয়। এই ছাঁচি পান দুখানি মুখে দিয়ে বলুক তো সবাই তাই কিনা?

লীলা মজুমদার

দ্বন্দ্ব

আশাপূর্ণা দেবী

বাড়ি দেখে কমলার খুশির আর অন্ত নেই।

অশক্ত দুর্বল শরীর নিয়েও ছেলেমানুষের মত ছুটোছুটি করতে সুরু করে দেয়। 'দেখ, দেখ কি চমৎকার চারিদিকে সিঁড়ি, দূর থেকে ঠিক যেন একটা রথের মত দেখতে লাগে। বারান্দার চালাটা কি নিচু গো? হাতে ছোঁওয়া যাচ্ছে যে—'

'আচ্ছা ইঁদারা আর কুয়োতে তফাৎ কি বলো তো? আমি বলেছি 'ইঁদারা' আর তোমার নতুন দাইটা হেসে মরে যাচ্ছে। আহা চিরকাল যদি এখানে থাকতে পেতাম···'

মনোজও হাসে ওর ছেলেমানুষিতে, বলে—'একমাস থাকলেই হয়তো কলকাতার জন্যে মন কেমন করবে। তখন অতিষ্ঠ করে তুলবে আমায়।'

'দেখো নিশ্চয় আমি মন টেঁকিয়ে থাকব—কলকাতার জন্যে আবার মন কেমন! ভারি তো কলকাতা। একটা বাড়িতে একশো জন লোক···হাঁফ্ ফেলবার জায়গা নেই।'

'বেশ, খুব হাঁফ্ ফেলো এখানে। কিন্তু বেশী দৌরাত্মি করে হাঁফিয়ে পড়ো না যেন লক্ষ্মীটি! এই এখ্খুনিই তুমি যা আরম্ভ করেছ।'

'বারে, তুমিই তো বলেছিলে এসব দেশে পা দিতে না দিতে গায়ে জোর হয়—তাই হচ্ছে।'

আবার ছুটে আসে, হেসে হেসে বলে—'যাই ভাগ্যিস টাইফয়েডে ভুগলাম, তাই না এত মজা হল? কি বল, হ্যাঁগো, তাই না?'

'হ্যাঁ গো তাই'—মনোজ ওকে একটু আদর করে নেয়—'তোমার মজা, আর আমার সাজা এই আর কি। উঃ, তুমি তো ভুগলে টাইফয়েডে, আর আমি? আমার ভোগান্তি তোমার চেয়েও বেশী হয়েছে—কম ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে?'

'ভয় হ'ত আমি মরে যাবো—না? কিন্তু মরলেই বা ক্ষতি কি ছিল?'

'ছিঃ! ওসব কথা বলতে নেই কমু, এসো, দেখিয়ে দাও কি ভাবে তোমার ঘরসংসার গুছিয়ে দেব। একটুও খাটতে পাবে না কিন্তু। ওই দাইটাকে দিয়ে সব করিয়ে নেবে, আর আমি তো একটি পুরাতন ভৃত্য আছিই। তোমার সব ফরমাস চালাবে এই ভৃত্যটির ওপর বুঝলে?'

'আহা কি কথার ছিরি, ওই জন্যে দু'মাস ছুটি নেওয়া হয়েছে বুঝি?'

'না তো কি?'

'তবে এই নাও নতুন চাকরির প্রথম পাঠ—আমার খোকাটিকে একটু খাওয়ানোর দরকাব—স্টোভটা জ্বালতে হবে।'

মনোজ স্টোভ জ্বালতে বসে।

কমলার কথার বিরাম নেই· ·বসলো এসে মনোজের কাছে, বললে—'আচ্ছা সেই স্টোভ জ্বেলেই তো আমাদের একটু চা খেলে হয় না?'

'চা? দু'বার চা খায় না দুষ্টু মেয়ে। বরং তোমায় একটু গ্ল্যাক্সো করে দিই—'

'দায় পড়েছে আমার গ্ল্যাক্সো খেতে'—অভিমানে মুখ ভার করে কমলা বরের কোলের উপর শুয়ে পড়ে—'এখানেও বুঝি তুমি আমায় রুগী বানিয়ে রাখবে? ছাখো কি রকম সেবে গেছি আমি, ইচ্ছে করলেই এখন রান্না করে খাওয়াতে·পারি তোমায়—'

'অত সুখে কাজ নেই আমার কমলরাণী, খেয়ে উপকার করলেই বেঁচে যাই।'

'আচ্ছা দেখা যাবে। এর পর যখন খিদে খিদে করে অস্থির করবো—তখন বকবে হয়তো।'

'বকবোই তো, বকব না? মারা উচিত তোমায়, ওই দাইটা দেখতে পাচ্ছে আর তুমি এরকম অসভ্যের মতন কোলে শুয়ে আছো? ওঠো ওঠো—'

কমলা আরো নিবিড় করে নেয় নিজেকে।

'ভাববে আবার কি? ভাববে এই কলকাতার সভ্যতা।'

'সভ্যতার নমুনাটা বেশ দেখাচ্ছো বটে। যাক্ গে—ধারণাটা ভালো করেই এগোক'—বলে মনোজ হেঁট হয়ে কমলার ছোট্ট কপালটির ওপর মুখ রাখে।

উঃ! এই কমলাকে হারাতে বসেছিল সে। দীর্ঘ একচল্লিশ দিন যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে, অবশেষে জয় হ'ল প্রেমের। হাড় ক'খানা যখন ফিরে পেয়েছে, আবার তা'তে আনবে নতুন রক্তের জোয়ার, ভরে দেবে সজীব

প্রাণশক্তি। স্বাস্থ্যে লাবণ্যে টল্ টল্ কমলাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে অফুরন্ত ঐশ্বর্যের মত।

কমলাও আদরে আবদারে হয়েছে খুকীর মত, বেঁচে উঠে যেন মনোজকে কৃতার্থ করে দিয়েছে। তার উপর সংসারের সমস্ত বাধা বন্ধন থেকে দূরে এসে শুধু স্বামীটি সন্তানটি নিয়ে সংসার করার সুখ কি কম?

এত সুখ রাখবে কোথায় কমলা?

যদি না মুখর আনন্দে ঝলমল করবে—বালিকার মত হয়ে উঠবে অস্থির চপল!

যে বাড়ি নিয়ে আনন্দের সীমা নেই কমলার, কি বা অপূর্ব বাড়ি সেখানা?

মোটে দু'খানি ঘর। আর বাইরে ভিতরে দুদিকে খাপ্‌রার চাল দেওয়া নিচু নিচু বারান্দা। শান বাঁধানো উঠোনের মাঝখানে দিব্যি খোলা 'কুয়োতলা'। কিন্তু খোলা হলেই বা ক্ষতি কি? আব্রুর প্রয়োজনও খুব নেই, কারণ বেশ কিছু দূরের মধ্যে এমন কোনো বাড়ি নেই, যাতে অপরের কৌতূহলের খোরাক হতে পারে কমলার স্বচ্ছন্দ জীবনলীলা।

প্রকাণ্ড একটা রুক্ষ মাঠ পার হয়ে যে ছোট গোছের সাঁওতালি বস্তিটা আছে, বলতে গেলে তারাই ভরসা, সেখান থেকেই একটা দাই জোগাড় করে এনেছে মনোজ।

খোকা ঘুম থেকে উঠে পড়েছে—মনোজ ব্যস্ত হয়ে পেয়ালায় গরম জল রেখে চামচ দিয়ে নাড়াচাড়া করে বিদেশের আমদানী দুগ্ধচূর্ণ,—মার কাছে শিশুর দাবী দাওয়া কিছু নেই, আগেও ছিল না—এখন তো থাকবেই না।

—'কেমন জব্দ? নিজে থেকে নিয়েছ চাকরি·· এখন আর রাগ করতে পাবে না—খাওয়াও খোকনকে, আমি মজা দেখি বসে বসে।'

বসে বসে দেখবো বললেও বসে থাকতে পারে না, নেমে যায় উঠানে যেখানে কুয়োতলায় দাই কাপড় জামাগুলো কাচ্ছে।

—'দাই, ও দাই, কুয়ো থেকে জল তোল না দেখি'—

মনোজ কমলার কাণ্ড দেখে হাসবে না রাগ করবে ভেবে পাচ্ছে না, তবু ঈষৎ শাসনের সুরে ঘরের ভিতর থেকে ডাকে— 'আচ্ছা কমলা কি হচ্ছে? দাইটা যে পাগল ভাববে তোমায়।'

—'ভাবুক গে। তুমি যে দাই কি ভাববে তাই ভেবে ভেবে পাগল হচ্ছো যাচ্ছো?'

—দাই, এই দাই, তোর নাম কিরে? ……'ঝুমরি'? ও মা ঝুমরি আবার নাম কিরে?……

খোকনটা ভারি দামাল! হাঁটতে শেখেনি তবু হাঁটা চাই, বড় বড় চোখ আর মুখ, অথচ ছোট্ট ছোট্ট পা-ওয়ালা মানুষটাকে টলতে টলতে উঁচু রোয়াকের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াতে দেখলে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠে না? কমলার মোটা সোটা ছেলেটিকে কোলে করা বারণ অত কি মনে থাকে? কোলে করে ঘরে আনতেই মনোজ চমকে উঠে, ছেলে কেড়ে নিয়ে বকতে সুরু করে দেয়,…'ছি ছি তোমাকে কি করে সামলাই বলতো কমলা? তুমি যে খোকনের চেয়েও দামাল হয়ে উঠছো? কি বলে ওকে কোলে তুলে নিয়ে এলে এতটা?'

—'আর ও পড়ে গেলে ভাল বুঝি?'

—'হ্যাঁ খুব ভালো, কেমন চমৎকার বুদ্ধি! ধরে রেখে আমায় ডাকতে পারতে।'

'বাঃ, আমি বুঝি আর কোন দিন সেরে উঠব না? দেখ দিকিন, কি রকম মোটা হয়ে উঠেছি? এই তো আগেকার ব্লাউসগুলো গায়ে আঁটছে না—দেখ না, দেখ—'

বলে ফরসা নিটোল হাতখানি এনে স্বামীর হাতের উপর তুলে ধরে।

অস্বীকার করবার উপায় নেই। স্বাস্থ্যের লাবণ্যে উজ্জল সুপুষ্ট বাহুটিই স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

মনোজ এবার মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে। অসুখের সময় কেটে-ফেলা খাটো পাতলা চুলগুলি আগের মতই ঘন হয়ে এসেছে, পুরন্ত গালের পাশে দুলছে কোঁকড়ানো চারটি ঝুরো চুল।

এ যেন নতুন কমলা। বিধাতার সৃষ্ট নয়, মনোজের নিজের সৃষ্টি

খোকন বোধ করি বাবার মুগ্ধদৃষ্টিটা একমাত্র মা'র মুখের উপরই নিবদ্ধ থাকা পছন্দ করছিল না। দু'হাতে বাবার মুখটা টানাটানি সুরু করে দেয়।

—বাব্বা বাব্বা বাব্বা…

ছেলেকে বুকের উপর চেপে ধরে আদরে ভরে দেয় মনোজ। —হ্যাঁগো বাব্বা বাব্বা আমার নাকটা খাদ্যবস্তু নয় বুঝলে মশাই! ওই তোর মা'র নাকটা খেয়ে নে—খুব টিকলো, খুব মিষ্টি।'

—'হ্যাঁ, তুমি খেয়ে দেখেছ যে? রাগ ধরে। এখন থেকেই ছেলেকে কুশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। একেই তো আমার চেয়ে তোমাকে বেশী ভালোবাসে।'

মনোজ দুষ্টুমির হাসি হেসে বলে—'আর তুমি, কাকে বেশী ভালোবাসো?'

—'আমি? সক্কলের চেয়ে ভালোবাসি—ওই গুঁফো গয়লাটাকে, ভোরবেলায় যে এসে 'বহুজী, দুধ' শব্দে পেটের পিলে চমকে দেয়।'

—'হায় ভগবান! আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কিনা গুঁফো গয়লা! কপালে এও ছিল।'

সন্ধ্যাবেলা জ্যোৎস্নায় ধোয়া উঠোনে বেঞ্চি পেতে বসে থাকে দুজনে। খোকন ঘুমিয়ে থাকে ঘরে। আবোল তাবোল অর্থহীন বকুনী কমলার···খোকন বড় হয়ে কি হবে···ডাক্তার? ব্যারিষ্টার? আই. সি. এস? কমলার ইচ্ছে খোকন দেশনেতা হয়···ফুলের মালা আর প্রশংসাভারে বিনম্র মানুষটি মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবে···আস্তে আস্তে ঘুচে যাবে ওর লজ্জার আড়াল, মুছে যাবে বিনয়ের আবরণ, জ্বলন্ত আগুনের মত উত্তপ্ত ভাষা অসংখ্য জনতাকে জাগিয়ে তুলবে—মাতিয়ে তুলবে···সাধারণ জনতার সঙ্গে মিশে কমলা দেখবে ছেলের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত মুখ···শুনতে শুনতে রোমাঞ্চ হবে ওর গায়ে··· চোখে আসবে অশ্রু।···পাশের লোক ভাববে সেন্টিমেণ্ট···ভাববে···বক্তৃতার অগ্নিস্রোতে লোহা গলতে সুরু করেছে···জানবে না কমলা কে! জানবে না ওই আশ্চর্য মানুষটি একদিন কমলার কোলে বসে 'আয় আয়' দিয়ে দিয়ে চাঁদ ডেকেছিল···আজও ঘরে ফিরে কোলের কাছে বসে বলবে—'খিদে পেয়েছে মা, বকে বকে গলা শুকিয়ে গেছে।'

মনোজ ধৈর্য ধরে' শোনে কমলার পাগলামি; কথা শেষ হলে হেসে উঠে বলে—'রক্ষা করো আমার এত সাধের খোকনকে বিলিয়ে দিতে চাই না আমি, আমাদের জিনিষ আমাদের থাক বাবা।'

—'তবে? তোমার কি ইচ্ছে?'

'আমার ইচ্ছে? বেশ মোটাসোটা ভুঁড়িওলা একটি ব্যবসাদার, পাটের নয়তো তিসির গুদোম আছে। পেল্লাই বাড়ি, অগাধ টাকা ব্যাঙ্কে'—

—'যাও!' কমলা রেগে মুখ ফিরিয়ে বসে।

—'ব্যাঙ্কে টাকা থাকাটা তা'হলে খারাপ? এই ধরো যদি আমারই ব্যাঙ্কে অগাধ টাকা থাকতো তা খুব খারাপ লাগতো তোমার? বছরে দু'বার করে

আসতাম চেঞ্জে, নিজেরই বাড়ি করে' রাখতাম ভালো ভালো জায়গায়, তিসির গোলাটা সহ্য করে নিতে পারতে না ?'

—'তোমার যত সব আজগুবি। দেশনেতা হলে বুঝি আর টাকা থাকতে নেই ?'

—'হ্যাঁ, দেশের লোকের মাথায় হাত বুলোতে পারলে 'আছে'—কিন্তু আমার মতে তার চেয়ে পাটের গুদামই ভালো। আমার ভাবী বৌমার দিকটাও তো ভাবতে হবে আমায় ? ছেলে তৈরি করে তোলা নিজেদের জন্যে নয় কমু; সেই ভবিষ্যৎ অধিকারিনীর জন্যে।'

কথাটা কমলার পছন্দ নয়। খোকন একান্ত তার নিজস্ব। ওর কোনো ভাগীদার কখনো থাকবে এ কমলার অসহ্য।···তাই চাপা দিয়ে দেয় খোকনের ভবিষ্যৎ চিন্তা···বর্তমানের সুখস্রোতে ভাসিয়ে দেয় নিজেকে।

সকাল বেলা মনোজ বেরিয়েছে—বেলা এগারোটা বাজে······এখনো দেখা নেই, বেজায় চটে যাচ্ছে কমলা। আজকাল ও এবেলাটা রান্না করছে' 'ইক্‌মিক্ কুকার'কে ছুটি দেওয়া হয়েছে, কাজেই এতক্ষণ হাঁড়ি আগলে থাকতে ভালো লাগছে না। তেমনি কী দুষ্টুমি করছে খোকনটা ?···কেন যে সেই ভোর থেকে কান্না জুড়ে দিয়েছে ওই জানে···একফোঁটা দুধ খায়নি, অতীব প্রিয় 'বিকু' বা বিস্কুটের টুকরোটুকু পর্যন্ত মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, খায়নি।

মনোজ এলে বাঁচে কমলা।

আরো খানিক পরে মনোজ এলো। রোদে রাঙা মুখ, কেমন যেন আমলে পড়ছে। কমলা অত লক্ষ্য করেনি···আসতে না আসতেই বকে ওঠে······'বেশ লোক তুমি !···কখন বেরিয়েছ আর এই এত বেলায় আসা ? আমার বুঝি ভাল লাগে ? খোকনটা আবার জ্বালাতন করছে।'

গায়ের পাঞ্জাবীটা খুলে হাওয়ায় মেলে বসে পড়ে, খোকনকে কোলে টেনে নেয় মনোজ, বলে—'ভারি মা হয়েছেন, ছেলে সামলাতে পারেন না ! আয় রে খোকন, আমরা বাপ বেটায় যুক্তি করে তোর মাকে জব্দ করি।···এই, এই আবার নাক কামড়াবার চেষ্টা ? আচ্ছা এত জিনিষ খেতে শিখেছিস, তবু নাসিকা-ভক্ষণটি ছাড়তে পারছিস না ? কী অসভ্যরে ?'

—'হয়েছে ছেলের সোহাগ রাখো'—কমলা তোয়ালেখানা ছুঁড়ে দেয় স্বামীর গায়ে—'যাও চান করো গে—এত বেলা করলে কেন শুনি।'

—'এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, মানে এখানকার ডাক্তার, বাড়িটা বেশী দূরে নয় এখান থেকে, এতদিন দেখিনি এই আশ্চর্য। চমৎকার লোক, যদিও বেহারী, তবে বাঙলাও মন্দ বলেন না, তোমার সঙ্গে ভাব করিয়ে দেব বলে একদিন নেমন্তন্ন করে এসেছি।,

—'হিন্দুস্থানীর সঙ্গে আবার ভাব!'

কমলা মুখ উল্টোয়।

—'আরে বাপু ডাক্তার মানুষের সঙ্গে ভাব একটু করাই ভালো—বিদেশে হঠাৎ যদি কিছু দরকার পড়ে—'

'—থাক্, আর ডাক্তারকে দরকার পড়ে কাজ নেই, এই দেড় মাসের ওপর হয়ে গেল আসা হয়েছে আর ক'দিনই বা থাকতে পাবো? খুব জোর দিন পনেরো যোল। এর মধ্যে আর ঝামেলা বাড়িয়ে কাজ কি?'

মনোজ একটু মনোক্ষুণ্ণ হয়, ভদ্রলোককে সে বার বার বলেছে আসতে। বলে —'ভদ্রলোকের সঙ্গে দু'একটা কথা বলা বা এক পেয়ালা চা করে দেওয়ার মধ্যে ঝামেলার কি আছে?'

—'তা কি বলছি? আমার কাছ থেকে তোমাকে খানিকক্ষণ কেড়ে নেবে তো? অনর্থক দুজনের মাঝখানে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি। আর ক'দিনই বা! কলকাতায় ফিরে গেলেই ত হয়ে গেল? সব সুখ ফুরোবে।'

—'ছি কমলা, অমন কথা মুখে আনতে নেই। সুখ জিনিসটা কি বাইরের ঘটনা? তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করবার ক্ষমতাই বা কার আছে?··· কিন্তু দেখ, খোকনের শরীরটা তেমন ভালো নেই বোধ হয়, গা-টা যেন গরম গরম লাগছে···ঘুমিয়েও পড়লো।'

স্নান করে এসে খেতে বসলো বটে কিন্তু খেতে ভালো করে সেও পারলো না।···শরীর মন দুই তেমন সুবিধে নেই। খোকনটার জ্বর হ'ল? এই এতদিন এসেছে, একদিনের জন্য কিছু হয়নি, বরং জল হাওয়ার গুণে দিন দিন বেড়ে উঠছিল, রীতিমত ওজনে ভারী হয়ে গিয়েছিল ইদানীং।

মনটা মনোজের একটু মেয়েলী।

এই চিন্তাটা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না···আজকেই হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, আর আজই জ্বর হ'ল খোকনের? হয় তো বেড়ে উঠবে অসুখ··· মারাত্মক কিছু হবে না তো? ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে তো?

কমলার মুখ থেকেই বা হঠাৎ অমন অশুভ কথাটা বেরোল কেন? হে ভগবান! ছোট প্রাণের ছোট সুখটুকু কেড়ে নিও না যেন।···

'তুমি যে কিছুই খেলে না?'···কমলা দুধের বাটিটা পাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বলে—'পিত্তি পড়ে গেছে বোধ হয়—দেখ ভাত ভালো না লাগে দুধটুকু খাও শুধু।'

—'দুধও খাবো না, মোটে ইচ্ছে করছে না। শোনো, উনুনে আগুন আছে?'

—'কেন?'

—'একটু নুনজল করে দাও তো, কয়েকটা 'কুল্লি' করি, গলাটায় কেমন ব্যথা করে উঠলো।'

সন্ধ্যাবেলা আজও দুজনে উঠোনের বেঞ্চিতে বসেছিল, কিন্তু মুখরতা যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। খোকনের জ্বর আর নিঃঝুম ভাবটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর। অত অল্প জ্বরে অত নির্জীব হয়ে পড়েছে কেন ছেলে? কাঁদছে তাও যেন দুর্বলভাবে, দুর্দান্ত দস্যি ছেলের দুষ্টুমিতে অস্থির হয়ে উঠতে হয়, কিন্তু এ ছেলে এক মুহূর্ত শান্ত হয়ে থাকলেও তো ভালো লাগে না।···কেমন যেন একটা অশরীরী আতঙ্ক প্রেতের মত ছায়া ফেলেছে মনের কাণায় কাণায়···তাড়াবার চেষ্টা করলেও যেতে চাইছে না! বাচ্চা ছেলে, অসুখ বিসুখ তো করবেই··· একবারও অসুখে না ভুগে ছেলে মানুষ করা যায়?—এ যে মনোজের অন্যায় আব্দার—তা ছাড়া সামান্য একটু জ্বরে এত দুশ্চিন্তার কি আছে? জোর করে মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে মনোজ।

কিন্তু দুশ্চিন্তাও তো ইচ্ছে করে করছে না সে—এমনি বসে থাকতে থাকতে সেই আতঙ্কের ছায়া মন থেকে সংক্রামিত হচ্ছে—পারিপার্শ্বিকতায়—ছড়িয়ে পড়ছে গাছেপাতায় সামনে পিছনে—ম্লান জ্যোৎস্নায়-ছাওয়া বিষণ্ণ প্রাঙ্গণে—

দরমার ঘের-দেওয়া 'কুয়োতলার' ঘন অন্ধকার কোণটায়—দীর্ঘছায়া ফেলে কে যেন বসে আছে, কোথায় তার হিম শীতল নিশ্বাস আসন্ন শীতের শিহরণের সঙ্গে নিঃশ্বসিত হয়ে উঠছে সর্বাঙ্গে।

মনোজ ভাবে—হয় তো ফিরে যাবার দিন নিকটবর্তী হয়ে আসছে বলেই এই অজ্ঞাত বিরহ। মনের মধ্যে আনাগোনা করছে একটা বিচ্ছেদের সুর—গুটিয়ে নিতে হবে 'তল্পি তল্পা'—ভেঙে ফেলতে হবে সাজানো সংসার—করতে হবে যাত্রার আয়োজন।

যেতে হবে—যেতে হবে—পড়ে থাকবে এই ঘরদুয়ার বারান্দা তাদের অনেক সুখের স্মৃতি বুকে নিয়ে। দেয়ালের গায়ে অসংখ্য জায়গায় খোকনের ছোট্ট হাতের ছাপ, তেলকালি আলতা সিঁদুর ভিজে উঠোনের কাদায়। 'পরের বাড়ি' বলে হিতোপদেশে সামলাতে পারা যায় নি তা'কে।

মলিন জ্যোৎস্নার চাদর বিছানো মুক প্রাঙ্গণ রহস্যময় আকাশের পানে মৌন দৃষ্টি মেলে নিঃশব্দে পড়ে থাকবে। মুখর হয়ে উঠবে না তাদের দুজনার প্রেমগুঞ্জনে, কমলার কলহাস্যে।

যাবার সময়—এই অনেকদিনের স্মৃতিমণ্ডিত বেঞ্চিখানা তুলে রেখে যেতে হবে ঘরে। তারপর ধীরে ধীরে এই বাড়ির চেহারা যাবে বদলে। বারান্দায়, ঘরের মেঝেয় পড়বে পুরু ধূলার আস্তরণ, জানালা দরজার কপাট আটকে যাবে অব্যবহারে। যেমন দেখেছিল দেড়মাস আগে এসে।

হঠাৎ কমলা ওর একখানা হাত চেপে ধরে ব্যাকুল ভাবে বলে ওঠে—'ঘরে চলো ভয় করছে।' ভয় তো মনোজেরও করছিল কিন্তু ব্যক্ত করে না সে-কথা ভীরু কমলার কাছে। সস্নেহে বলে—'চলো যাই, কিন্তু ভয় কিসের?'

—'কি জানি কেমন, গা ছম্ ছম্ করছে—খোকন একলা রয়েছে।

অথচ কমলাই ঘর ছেড়ে বাইরে এসে বসেছিল মনোজের আপত্তি সত্ত্বেও, ছেলেকে একলা রাখতে হলে আগলাবার কৌশল সে জানে। বালিশের তলায় চাবি রেখে দিলে ছেলেকে কারুর ছোঁবার জো আছে নাকি? শিশুর যারা অনিষ্ট করতে চায় তারা সব করতে পারে, পারে না শুধু লোহা ছুঁতে। এ তথ্য শিখেছে সে ঠাকুরমার কাছে। তবু ওর গা ছম্ ছম্ করছে।

মনোজ উঠে দাঁড়িয়ে একটা আলস্য ভেঙে বলে—'চলো যাই—আর ঠাণ্ডা লাগাবো না, গলার ব্যথাটা তো বেশ বেড়ে উঠেছে দেখছি, শরীরটাও ভাল ঠেকছে না, আমারও না জ্বর হয়।'

—'আর কি, খুব করে ভয় দেখাও আমায় দুজনে মিলে!'

—'ভয় আর কি—অসুখ হয় না মানুষের? যাক গে, আমার জন্যে ভাবনার কিছু নেই, লোহার শরীর টসকাবে না। দেখি—খোকনের যদি সকালে জ্বরটা না ছাড়ে একবার সেই ডাক্তারটিকে ডেকে আনবো।'

কিন্তু ডেকে আনবার সামর্থ্য সকালে আর রইল না মনোজের। জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকলো···খোকন আর খোকনের বাবা। বেচারা কমলা. কি করেছে সে—শুধু একটু বার্লি করে খাওয়ানো ছাড়া? ডাক্তারের বাড়ি সে চেনে না। চিনলেও এই দুটি অর্ধঅচেতন রোগীকে ফেলে রেখে কোথায় যাবে? কে বসবে রোগীর বিছানায়? কলকাতার বাড়ির সেই অবান্তব মানুষগুলোও যেন রীতিমত দামী হয়ে উঠছে কমলার মনের কাছে।

শেষ পর্য্যন্ত সাঁওতালি মেয়েটা। বুড়ি দাই কাজ করে গেছে—আর দয়াপরবশ হয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে মেয়েকে। মায়ের সঙ্গে আগে এক দিন এসেছিল.. খোঁপায় ফুল গোঁজা, গোছা-ভর্ত্তি কাঁচের চুড়ি হাতে, ছিটের ব্লাউজ আর রঙিন শাড়িপরা এই উদ্ধত যুবতী মেয়েটাকে দেখে সেদিন হাড় জ্বলে গিয়েছিল কমলার। আরো গিয়েছিল তার কথা শুনে—পরিপাটি বাঙলা কথা।··· এবাড়ির পূর্বতন বাসিন্দাদের কোনো এক প্রেমিক যুবকের সঙ্গে তার অবৈধ সম্বন্ধের ইতিহাস ইশারায় ব্যক্ত করে হেসে কুটি কুটি একেবারে। এমন খাসা বাঙলা শিখেছে সে তার সেই প্রণয়ীর কাছে।···কমলা চটে গিয়ে আড়ালে দাইকে বলে দিয়েছিল 'মেয়েকে আর এনো না দাই, বাবু এসব পছন্দ করেন না।'

কিন্তু আজ যখন দাই প্রস্তাব করলো, তা'কে আগলাবার জন্যে মেয়েকে দেবে—'না' করবার ক্ষমতা থাকল না কমলার।

মাথায় ফুল গোঁজা, কাঁচের চুড়ি-পরা এই প্রগলভ মেয়েটাই যেন মস্ত ভরসা মনে হ'ল।' মনোজ সকাল থেকে ভাবছে ডাক্তারের কথা, কোনো প্রকারে খবর দেওয়া যায় কি না··· কিন্তু দেবে কে? সকাল থেকে অনেক বার চেষ্টা করেছে ওঠবার জন্যে কিন্তু ক্রমশঃই সমস্ত শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছে। ডিপথিরিয়া কেস্। নিজেই অনুভব করেছে সে, একই দুর্দান্ত রোগ গ্রাস করতে

এসেছে তাদের দুজনকে। কিন্তু আশ্চর্য! এত বড় মানুষটার এ কী ছেলেমানুষী রোগ? শেষকালে কি না খোকনের সঙ্গে মনোজের সুদ্ধ ডিপথিরিয়া! লোহার মত শরীর···অটুট স্বাস্থ্য···ভেঙে পড়লো এই ঘণ্টাকয়েকের আক্রমণে?

খোকন? ছোট্ট খোকন কতটুকু যুঝতে পারবে সে মৃত্যুর সঙ্গে? বিনা চিকিৎসার সঙ্গে? ···ডাক্তার···ওষুধ···ইনজেকসান-সিরাম···নানা চিন্তা ভীড় করছে ওর দুর্বল মস্তিষ্কে···কিন্তু বুজে আসছে গলা, কণ্ঠনালী চেপে ধরে কে যেন শ্বাসরোধ করে ফেলতে চায়! তবু জোর করে ঠেকিয়ে রাখতে চায় চৈতন্যের অবলুপ্তি···কে আনবে ডাক্তার, কে বাঁচাবে খোকনকে?··· কমলাকে কে দেখবে তার নিজের মৃত্যু হ'লে? প্রতিবেশীর কোলাহল সইবে না বলে কেন বাসা করেছিল লোকালয়ের বাইরে? কমলার কি হবে?— খোকনের কি হবে?

বিকেলের দিকে ডাক্তার ভদ্রলোক নিজেই এলেন নিমন্ত্রণ রাখতে। লম্বা-চওড়া প্রকাণ্ড মানুষটি, হাসিখুশি মুখে খাদির টুপিটি মাথা থেকে খুলে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে আটকে রেখে টুংটাং করে সাইকেলের বেল বাজাচ্ছেন··· ভিতরের লোকের লক্ষ্য আকর্ষণের আশায়। হঠাৎ সাঁওতালি মেয়েটা বাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাপারটা জানালো।

ভদ্রলোক প্রথমটা স্তব্ধ হয়ে গেলেন—তারপরই জেগে উঠলো ভিতরকার চিকিৎসক।—দুটি রোগীকেই পরীক্ষা করে দেখলেন নানাভাবে—নাঃ, সন্দেহের কিছু নেই। ডিপথিরিয়া কেস—কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রের এলাকার মধ্যে আছে কি এখনো?—আর কোথায় বা সেই অমোঘ ঔষধ? যুদ্ধের আগুনে বড় বড় সহর থেকে যে সব জিনিস বাষ্প হ'য়ে উড়ে গেছে—সে দুষ্প্রাপ্য জিনিষ কোথায় মিলবে এই অখ্যাত গ্রামে? সংগ্রহ করবার চেষ্টাই বা করবে কে?

হায় ঈশ্বর, এমন বিপজ্জনক অবস্থাতেও মানুষ পড়ে?

কিন্তু সত্যিই সুস্থ হাত পা থাকতে—দুটো মানুষকে মরতে দেখা যায় না বসে বসে! করতেই হবে কিছু—কোনো আশা না থাকলেও অসম্ভবের আশায় ছুটোছুটি করতে হবে, নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ছাড়া যা হয় কিছু করা।

'আপনি কিছুক্ষণ একলা থাকতে পারবেন?'

'আপনি চলে যাবেন?'—কমলা যেন শিউরে ওঠে। ডাক্তার আসার পরে ডাক্তারের হতাশ মুখ দেখে সে রোগের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে—তবু ডাক্তার আছেন। অনেকটা বুকের বল। একটা কিছু উপায় হবেই—চাঙ্গা হয়ে উঠবে খোকন আর মনোজ, হয়তো একটু পরেই ক্ষীণ কণ্ঠে আদেশ করবে—'ডাক্তারবাবুকে একটু চা করে দাও না।'—খোকন তার মোমের মত ছোট্ট হাত পা নেড়ে খুদে খুদে দাঁতে হাসবে আর ডাকবে, 'মাম্ মা মাঃ।'

কিন্তু কই? এ যে ক্রমেই নীল হয়ে আসছে।—এ কী সন্ধ্যার ছায়া? না তার ভয়ার্ত মনের ভ্রম? দেবদূতের মত—ডাক্তারের হঠাৎ আবির্ভাবে যে বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল, সে-বিশ্বাসের মূল ক্রমশঃই শিথিল হয়ে আসছে কেন?—তাই ব্যাকুল কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠলো—'আপনি চলে যাবেন না ডাক্তারবাবু।'

'সিরামের খোঁজ করতে হবে যে···অবশ্য পাওয়া যাবে কিনা বলা শক্ত।'

'ডাক্তারবাবু! ওরা···দুজনেই···?' কমলার উদ্যত কান্নাকে প্রায় ধমকের চোটেই বন্ধ করে দেন ডাক্তার,—'চুপ করুন, থামুন, অস্থির হবার সময় নয় এটা। মনকে তো কঠিন করতেই হবে, টেলিগ্রাম করবার দরকার আছে। যদি বলেন—'

টেলিগ্রাম?···টেলিগ্রাম তো করতেই হবে! কী আশ্চর্য্য! এতক্ষণ মনেই পড়েনি একথা! মনোজের মা-বাপ ভাই-বোন কোথায় তারা সব? তাদের কাছ থেকে যে একলা কমলা নিয়ে এসেছে তাকে, সে কি অনধিকারচর্চা নয়?···এরপর জবাবদিহি দেবে কি?—হ্যাঁ হ্যাঁ করে দিন···এই যে ঠিকানা আর টাকা···অনেক ধন্যবাদ আপনাকে—'

'ধন্যবাদের সময় আসেনি এখনো, সাবধানে থাকবেন, লক্ষ্য রাখবেন উভয়ের উপর'—ডাক্তার সাইকেল নিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যান।

বিকেল গড়িয়ে নামলো সন্ধ্যা—তারপর ভয়াবহ রাত্রি—মাঝে মাঝে অসহায় শিশুর অস্ফুট কাতরোক্তি আর মনোজের অস্বচ্ছন্দ নিশ্বাস পতনের ভারী শব্দ ছাড়া টুঁ শব্দ নেই। বাচাল সাঁওতালী মেয়েটা পর্যন্ত স্তব্ধ গম্ভীর মুখে অবিরাম পাখা চালাচ্ছে।—কিন্তু কোথায় ডাক্তার? কে আনবে মৃতসঞ্জীবনী?

প্রায় নটার সময় আবার বেজে উঠলো সাইকেলের বেল্।

ডাক্তার এসেছেন।

'মাত্র একজনকে বাঁচানো যাবে'—বাঙলা ভাষা বটে তবে উচ্চারণের ভঙ্গীতে বেহারী 'টান' স্পষ্ট। কমলা কি শুনতে কিছু ভুল করেছে? কি বলছে ডাক্তার? ...'ওষুধ পাওয়া যায় নি?'...প্রশ্ন নয় একটা আর্তনাদ।

'পাওয়া গেছে, আবশ্যকের উপযুক্ত নয়। মাত্র একজনকে দেওয়া যাবে।'

ডাক্তার ইনজেক্‌শনের জোগাড় করতে থাকেন।...হয়তো প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটু সময় যেন কমলাকে বিবেচনা করবার সময় দিতে।

'আমার শেষ শক্তি পর্যন্ত ব্যয় করেছি'—

'তা'হলে কি হবে?'

শুধু এইটুকুই বলতে পারে কমলা।

'একজনের জন্যে শেষ চেষ্টা দেখতে হবে—বলুন কাকে দেব?'

এ আবার কি অসম্ভব প্রশ্ন? এর উত্তর দিতে হবে কমলাকে? যে-কমলা খাটো চুল দুলিয়ে হেসে খেলে গান গেয়ে বেড়ায়! মিনিটে মিনিটে মনোজের ওপর অভিমান করে?...এটা কি সত্যই একটা প্রশ্ন?...এটা কি বাংলা ভাষা?

'দেখুন, প্রত্যেক সেকেণ্ডে রোগীর অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে—মিথ্যে দেরী করে লাভ কি? মিষ্টার চৌধুরীকেই দেওয়া যাক?'

'আর খোকা?'

যেন মৃতের কণ্ঠ থেকে একটা অসাড় শব্দ বেরিয়ে এল।

'কিন্তু দুজনের মত যে নেই।'—ডাক্তার হতাশভাবে মাথা নাড়েন। 'একজনের আশা ছাড়তেই হবে।'

কমলা কি জড় পদার্থ? কথার উত্তর দিতে পারছে না কেন? আঙুলটি পর্যন্ত নাড়বার ক্ষমতা চলে গেছে যে।

ডাক্তার সিরিঞ্জ নিয়ে এগিয়ে যান মনোজের কাছে।...সাঁওতালি মেয়েটা তৎপর হয়ে উঠেছে।...কমলার কোলে খোকন...এতক্ষণ গোঙিয়ে গোঙিয়ে এইবার চুপ করে গেছে ...শুধু খোলা হাওয়া...বুক ভরা একটু নিশ্বাস নেবার জন্যে একটা মর্মন্তুদ আকৃতি।...কিছুক্ষণের মধ্যেই থেমে যাবে এই নিষ্ফল চেষ্টা।...থেমে যাবে শেষ স্পন্দনটুকু, মাতৃহৃদয়ের সমস্ত আকুলতা দিয়েও আটকাতে পারবে না কমলা। খোকন...খোকন...লুপ্ত হয়ে যাবে এই নাম—নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে এই ছোট্ট ফুলটি!

'ডাক্তারবাবু'—কমলা খোকনকে কোল থেকে নামিয়ে উন্মাদের মত ছুটে এসে ডাক্তারের হাত চেপে ধরলো।

কিন্তু মনোজ তো সম্পূর্ণ জ্ঞান হারায়নি! শুধু কথা কইবার ক্ষমতা নেই বলেই চুপ করে আছে।

'আঁপনি কি উন্মাদ হয়ে গেলেন মিসেস চৌধুরী, হাত ছাড়ুন, আমার কর্তব্য করতে দিন আমাকে।'

'আর খোকন? এই অসহায় শিশুটিকে বাঁচানো আপনার কর্তব্য নয় ডাক্তারবাবু?

'হায় ঈশ্বর! দেখতে পাচ্ছেন আমি নিরুপায়।'

'আমায় মেরে ফেলুন ডাক্তারবাবু, দয়া করুন আমায়।'

সিরিঞ্জটা নামিয়ে রেখে কমলার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ডাক্তার হতাশভঙ্গীতে চেয়ারের পিঠে নিজেকে এলিয়ে দেন।—হায় ভগবান! এ রকম অদ্ভুত অবস্থায় কোনো চিকিৎসককে কখনো পড়তে হয়েছে? কি প্রয়োজন ছিল ডাক্তারের আজই বেড়াতে আসার?'

'আপনি তাহলে শিশুটিকে বাঁচাতে চান?'

গম্ভীর প্রশ্ন কবেন ডাক্তার।

হঠাৎ সাঁওতালি মেয়েটা অবোধ্য ভাষায় তীব্র চীৎকার করে ওঠে। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার সে বুঝতে চেষ্টা করছিল এতক্ষণ। বাঙলা বলতে হয়তো পাবে সে, কিন্তু এখন উত্তেজিত আবেগে যা বললো সেটা সম্পূর্ণ দেশজ ভাষা।

ডাক্তার খাড়া হয়ে বসে কমলাকে উদ্দেশ করে বললেন—ও কি বলতে চাচ্ছে জানেন? বলছে···সন্তান হারালে আবার সন্তানের আশা আছে—কিন্তু স্বামী হারালে?—আর দেরী করতে পারছি না আমি, আপনি পাশের ঘরে চলে যান, ভগবানের উপর ভাগ্যকে ছেড়ে দিয়ে।'

'খোকনকে বাঁচান ডাক্তারবাবু।'

'আমি একজন পাগলের কথা শুনতে রাজী নই।' ডাক্তার দৃঢ় ভাবে প্রস্তুত করে নেন নিজেকে···'এক্ষেত্রে প্রাণের মুল্য বিচার করা ছাড়া উপায় নেই, মিষ্টার চৌধুরীকে আমি অনেক বেশী মূল্যবান মনে করছি।' মনোজের কাছে যেতেই সমস্ত শক্তি একত্রিত কবে মনোজ ডাক্তারের হাতটা সরিয়ে দিলে···খোকন—খোকনই ভোগ করুক পৃথিবীর আঁলো বাতাস—নূতন দিনের সূর্য।

ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে—ছোট্ট বাচ্চাটির কাছে হেঁট হয়ে বসলেন—'বেশ আপনাদের যা ইচ্ছা। অনেক লেট হয়ে গেছে, কাজ হবে কিনা কিছুই বলা যায় না। এখনো বিবেচনা করুন আপনি কাকে চান? আপনার হাজব্যাণ্ডকে না এই বাচ্চাকে?

কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো মেয়েকে কি দিতে হয়েছে এই অস্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তর? কাকে সে চায়—স্বামী না সন্তান? কে তার কাছে অধিকতর মূল্যবান?

'ভেবে দেখুন আপনার ভবিষ্যতের অসহায় অবস্থা! এই বাচ্চাটি রক্ষা করতে পারবে আপনাকে? হয়তো এও মারা যাবে, যুদ্ধ করবার ক্ষমতা এর মধ্যে কতটুকু?'

হায়! হায়! ক্ষমতা নেই বলেই না কমলার সমস্ত হৃদয় বিগলিত স্নেহে ওকে রক্ষা করতে চাইছে।

নিজের প্রয়োজনের মূল্যটাই সবচেয়ে বড়?

…'আপনি একেই দিন।'

কমলার স্বরটা এবার স্বাভাবিক শোনালো,…মনকে প্রস্তুত করে নিয়েছে হয় তো।

'বেশ। আমার বিবেকের বিরুদ্ধেই যেতে হচ্ছে আমাকে।'

এতটুকু একটু শিশু, ও তো ডাক্তারের কাছে একটা মাংসপিণ্ড বৈ আর কিছু নয়। ··প্রায় অধৈর্য হয়েই ডাক্তার চটপট দিয়ে ফেলেন ইনজেক্শান। সাঁওতালি মেয়েটা দুই চোখে তীব্র ঘৃণার আগুন জ্বেলে তাকিয়ে আছে সেই অসহায় মাংস-পিণ্ডটার পানে।

পাখার বাতাস করতেও আর মনে নেই ওর।

রাত্রে ডাক্তারকে থাকতেই হবে, ঘণ্টাখানেক পরে আবার একবার চালাতে হবে যমরাজের বিরুদ্ধে অভিযান। কিন্তু কে হার মানবে! মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে…ঘর থেকে বাইরে—উঠান থেকে বারান্দায়। 'খস্ খস্ হিস্ হিস্' সেই শব্দ ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে বাতাসে। সমস্ত শিরায় শিরায় জীবন্ত প্রাণী কয়টির চলমান রক্ত-স্রোতও ঠাণ্ডা হয়ে আসছে সেই শব্দে। দেয়ালের গায়ে দীর্ঘ ছায়া—মৃত্যুর দূত অপেক্ষা করছে সময়ের, সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে প্রভুর অনির্বাণ ক্ষুধার আহুতি।—রাত্রি কত দীর্ঘ! যুগযুগান্তর ধরে যেন এই রাত্রি নেমেছে পৃথিবীর বুকে—চেপে বসে আছে বিরাট পাহাড়ের মত। এ রাত্রির শেষ নেই।

কিন্তু কমলার কি সত্যই মাথা খারাপ হয়ে গেল?

দ্বিতীয়বার ইনজেকশনের জন্য প্রস্তুত ডাক্তারের হাত চেপে ধরেছে কেন আবার?

'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু আমায় ক্ষমা করুন, এঁকে দেখুন, বাঁচিয়ে দিন আমার স্বামীকে--আপনার পায়ে পড়ছি ডাক্তারবাবু, রক্ষা করুন আমার স্বামীকে, আমার স্বামীকে, ছেলে চাই না আমি—ওকে ভগবানের হাতে ছেড়ে দিন।'

'পাগলের প্রলাপ শোনবার জন্যে এখানে আসিনি।—এই এঁকে পাশের ঘরে নিয়ে যা।'

বিরক্ত হয়েই ডাক্তার সাঁওতালি মেয়েটাকে হুকুম করেন।

আশ্চর্য! কমলা আস্তে আস্তে উঠে ওর সঙ্গে পাশের ঘরে চলে গেল।

আশ্চর্য, সবটাই আশ্চর্য! সারা মন হাতড়ে খোকনের জন্যে আর একবিন্দু সহানুভূতি খুঁজে পাচ্ছে না সে। বাসিফুলের মত ওই বিবর্ণ মাংসপিণ্ডটুকুর জন্যে কি হারিয়ে ফেললো কমলা? কতখানি ঐশ্বর্য!—মনোজ ছাড়া কমলা কে? কী তার মূল্য? কোথায় তার সত্তা? সমাজের কাছে কি সংসারের সমস্ত পৃথিবীর কাছে কোন্ মুখ নিয়ে দাঁড়াবে মনোজকে হারিয়ে?—আর মনোজের মা বাপ ভাই বোন? তাদের কি বলবে? খোকন? সে তো কেবল মাত্র কমলার একান্তই, তার নিজের! আর মনোজ? মনোজ যে সকলের, সারা জগতের। কোন্ অধিকারে কমলা নষ্ট করতে বসেছে সেই সকলের সম্পত্তি?

কমলা কি করলো?—কমলা কি করবে?

কমলা কেন পাগল হয়ে যাচ্ছে না?—কেন হাটফেল করছে না?

দুরন্ত টাইফয়েড জ্বরে কমলা মরেনি কেন?—

সকালবেলা আর একবার মৃত সঞ্জীবনীর শেষ বিন্দুটুকু খোকনের দেহে সঞ্চারিত করে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার—বললেন—'একে সাবধানে রাখুন, শ্বাসপ্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখবেন ভাল করে। বেঁচে যাবে আপনার ছেলে। —আর ওঁর জন্য—চরম চেষ্টা দেখবো আমি, অপারেশন করে যদি কোন ফল পাওয়া যায়।—বাট্ ইট ইজ টু-লেট।'

যন্ত্রপাতি এবং আর একজন সাহায্যকারীর জন্য ডাক্তার আবার সাইকেলে চেপে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। রাত্রে গেলে কোন লাভ হ'ত না, কারণ কম্পাউণ্ডার 'সুখন' সাতটার সময় এসে ডিস্পেনসারি খোলে সাতমাইল রাস্তা ভেঙে। আরো 'দেহাতে' তার বাড়ি।

ধীরে ধীরে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে খোকনের, বিষে আচ্ছন্ন শরীর সজীব হয়ে উঠছে—হালকা হয়ে আসছে ভারী . ভারী চোখের পাতা নতুন সূর্যের আলো দেখবার আশায়।—ভাবীকালের মানব পৃথিবীর কাছে তার দাবী জানাচ্ছে।—

'ই-ইরে—মাইজী,—বাবু মুরগেই'—সাঁওতালি মেয়েটা বন্যজন্তুর মত বীভৎস চীৎকার করে ওঠে—

'মরগেই'? 'মরগেই' মানে কি? সত্যিই মরে গেল নাকি মনোজ?

হুড়মুড় করে ছুটে এসেছে কমলা মনোজের বিছানার পাশে—খোকনের মাথার বালিশ স্থানচ্যুত হয়ে গেল ওর পায়ের ধাক্কায়—ফুল লতা কাটা ভারী কাঁথাখানা কমলার কোল থেকে কোথায় ছিটকে পড়লো কে জানে।—

মনোজ মারা গেছে। চরম চেষ্টার আগেই চরমপত্র পেয়ে গেছে সে বিধাতার দরবারে।—এখন এই প্রাণহীন দেহটা নিয়ে কি করবে করুক কমলা। চৌকীর কোণে মাথা ঠুকে রক্তগঙ্গা হলেও কি এক ফোঁটা করুণা পাবে মনোজের? 'কী ছেলেমানুষী করেছো কমু' বলে একটা হাত বাড়িয়ে টেনে নেবে কাছে? —কমলার অবিশ্বাস্য দুর্ব্যবহারে যেন পাথর হয়ে গেছে মনোজ।

কিন্তু খোকনই বা পাথর হয়ে গেল কেন?—কমলাই শুধু পাথর হয়ে যাবে না?—বেড়াবে রক্ত-মাংসের বোঝা নিয়ে?

বাইরে থেকে বুঝে এসেছিলেন ডাক্তার কমলার তীব্র চীৎকারে, তবু যন্ত্র-চালিতের মত ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন,—বোধ করি নিশ্চিত বুঝে নিতে। —নাঃ, সন্দেহের কিছু নেই—শেষবারের মত পৃথিবীর অফুরন্ত বায়ুপ্রবাহের এক কণার জন্য কাড়াকাড়ি করতে করতে হেরে গিয়ে পরাজিত মনোজ চৌধুরী যেন বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে তার নিষ্ঠুর কৃপণতার দিকে।

কিন্তু কাঁথা চাপা দেওয়া ওটা কি পড়ে ?

'হা ঈশ্বর ! বাচ্চাটির এ অবস্থা কে করলো ?' ডাক্তার হেঁট হয়ে তুলে নিলেন ছেলেটিকে।—কিন্তু বেঁচে থাকা তো আর সম্ভব নয় ?—মুমূর্ষু শিশু অতক্ষণ ধরে মুখের উপর ভারী কাঁথাটার ভার সইবে কি করে ? এই সামান্য আবরণটুকুই তাকে বঞ্চিত করেছে সেই অফুরন্ত বায়ুপ্রবাহ থেকে। হেরে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে নেই—বিনীত আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে চোখ দু'টি বুজে আছে।

—আশাপূর্ণা দেবী—

কুসুমেষু

সুবোধ ঘোষ

এখানে নীহার আর ওখানে হেমা।

এখানে ব্যারাকপুরের ট্রাঙ্ক রোড আর ওখানে দার্জিলিং-এর কার্ট রোড।

এখানে সিঁড়িতে বিকানীরের পাথর আর বারান্দায় পদ্ম-কাটা ইঁটের বড় বড় থাম, ব্যারাকপুরের 'ভবধাম'। আর ওখানে বাতাসার মত পাতলা মায়বেলের ছোট ছোট টালি দিয়ে ছাওয়া আটকোণা বাংলো, দার্জিলিং-এর 'স্নিগ্ধা'।

এখানে ভবধামের অভিভাবিকা এক খুড়িমা দিনে চারবার লক্ষ্মী-নারায়ণের পুজা করেন। আর ওখানে স্নিগ্ধার অভিভাবক এক জেঠামণি দিনে দশবার পাঠ করেন আর্ট এণ্ড সায়েন্স অব এটিকেট।

এই ভবধামের ছেলে নীহারের সঙ্গে বিয়েও হয়ে গেল ঐ স্নিগ্ধার মেয়ে হেমার। এই বিয়ে হবারই ছিল। অনেকেই জানতো আর বলতোও, এই বিয়ে হবে। হওয়া উচিতও ছিল।

সুন্দর ছবি এঁকে এঁকে দিন কেটে যাচ্ছিল যে নীহারের, সেই নীহারই বিয়ে করলো হেমাকে, কলেজ ছাড়ার পর চার বছর ধবে শুধু এক সুন্দর ছবি হয়ে থেকে থেকেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছিল যে হেমা।

যা খুবই স্বাভাবিক, যা না হ'লে বরং খুবই খারাপ হতো, তাই হলো। কারণ, নীহার ভালবেসেছিল হেমাকে, আর হেমা ভালবেসেছিল নীহারকে।

ঘরভরা লোক, মাঝখানে গালিচা-পাতা ছোট একটি আসর। তার উপর বসেছিলেন বিয়ের রেজিস্ট্রার মিস্টার তালুকদার আর নীহার। পাশের ঘর থেকে এই উৎসবের ঘর, কতটুকুই বা ব্যবধান। কিন্তু এইটুকু পথও নিজের চেষ্টায় হেঁটে আসতে পারলো না হেমা। শেষ পর্যন্ত জেঠিমাই হেমার কাছে এগিয়ে যান, আর জেঠিমাই হেমাকে কোনরকমে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এসে গালিচাপাতা আসরের উপরে তুলে দিয়ে যান।

মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। বরং খুবই স্বাভাবিক। জেঠামণি জানেন, জেঠিমাও জানেন, এইরকমই করবে হেমা। দেখে খুশিই হয়েছেন জেঠামণি আর জেঠিমা। দার্জিলিং-এর কার্ট রোডের ধারে স্নিগ্ধা নামে এই অতি শান্ত এক বাংলো বাড়ীর ইচ্ছা রুচি আর রীতির স্নেহে গড়ে উঠেছে যে-হেমার পঁচিশ বছরের শীলশান্ত জীবন, সূক্ষ্ম এটিকেটে মর‍্যাল আর কালচারে লালিত জীবন, সে-মেয়ে তার জীবনের একটা ঘটনার সমুখে এগিয়ে যাবার সময়ও হঠাৎ ব্যস্ত হ'য়ে উঠবে কেমন ক'রে? ব্যস্ত হওয়াই যে একটা রূঢ়তা।

স্নিগ্ধার ভিতর ও বাহির দুইই বড় বেশি স্নিগ্ধ। এখানে খাবার জল তিনবার ডিস্টিল করা হয়, আর স্নানের জল একবার। চা খাবার আগে চা-এর টেম্পারেচার একবার পরীক্ষা ক'রে দেখাও এ-বাড়ির নিয়ম। সকালবেলা ঠিক ন'টার সময় উপনিষদ নিয়ে পড়তে বসেন জেঠামণি, আর ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ন'টা পনেরো মিনিটের সময় জেঠামণির দু'চোখ জলে ভরে ওঠে।

সুন্দর নিয়মে আর সুন্দর শিক্ষায় অত্যন্ত শান্ত হয়ে আছে স্নিগ্ধার মেয়ে হেমারও মুখের হাসি, চোখের চাহনি ও নিঃশ্বাসের ছন্দ। এখানে মুখের ভাষা যেমন মার্জিত, ভাষার ধ্বনিও তেমনি মৃদু। কোন শব্দ এখানে দাপাদাপি করে না; স্নিগ্ধা নামের এই ভবনের অনেক দিনের নিয়মে বাঁধা চিরমৃদুতার জীবনকে ভ্রূকুটি ও উচ্চহাসির উচ্ছ্বাস কখনো বিড়ম্বিত করে না। এই বাড়ির মনের কোন সাধ ইচ্ছা ও কল্পনা কখনো ব্যস্ততার রূঢ় হয়ে ওঠে না। ব্যস্ত হলেই মনের আগ্রহ ধরা পড়ে যায়, আর এইভাবে নিজেকে ধরা পড়িয়ে দিলে নিজের মধ্যে আর থাকে কি? যে মন ধরা পড়ে না, সেই মনই তো মন ভুলিয়ে দেয় সংসারে।

নিয়মের শাসনে নয়, নিয়মের স্নেহে সুন্দর হয়ে কার্ট রোডের পাশে যেমন ফুটে রয়েছে স্নিগ্ধা নামে এই সুন্দর বাংলো বাড়ি, তেমনি স্নিগ্ধার কোলে ফুটে রয়েছে হেমা। জেঠামণির বড় আদরের ভাইঝি হেমা। সুশিক্ষার গুণে যেমন এ-বাড়ির ভদ্রতা সৌজন্য আর শালীনতা, তেমনি হেমার মনের গভীরের সব ভাবনার লজ্জাও শান্ত হয়ে শুধু ফুটে থাকে। কথা মনে আসলেই কথা বলে ফেলা এখানে রীতি নয়। রাগ আর অভিমানও কখনো চিৎকার হয়ে বেজে ওঠে না। আগ্রহ আছে, আবেগ আছে, উদ্বেগ আছে স্নিগ্ধার জীবনে, কিন্তু যেন এক সুন্দর হিমের প্রলেপ দিয়ে সব-কিছুরই উত্তাপ শান্ত ক'রে দিয়েছে এক সুশিক্ষা।

শুধু শান্ত নয়, সুন্দরও। বিয়ের উৎসবের সন্ধ্যাদীপ জ্বলে উঠবার অনেক আগেই নিজেকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে তুলতে ভোলেনি হেমা। সব সময় নিজেকে সুন্দর করে রাখাই এ-বাড়ির নিয়ম, এ-বাড়ির শিক্ষা। বড় সুন্দর এই শিক্ষার বন্ধন, মাত্রা আছে কিন্তু গ্রন্থি নেই। আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রতি সন্ধ্যার আগে যেমন দু' ঘণ্টা ধ'রে প্রসাধনের সাধনা করে হেমা, আজও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। কম নয়, বেশিও নয়। আজ চার বছর ধ'রে জীবনের প্রতি সন্ধ্যার আগে ঠিক যেমন ক'রে তার সুগৌর দু'টি বাহুতে যতখানি গোলাপী পাউডার ছিটিয়েছে হেমা, আজও ঠিক ততখানিই ছিটিয়েছে। ব্যস্ত হওয়া, বিচলিত হওয়া আর মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া এ-বাড়ির নিয়ম নয়, হেমার মনের জগতেরও নিয়ম নয়।

দার্জিলিং-এ কার্ট রোডের ধারে স্নিগ্ধা নামে এই ভবনের এইরকমই একটি অতি শান্ত ও সুন্দর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'লো ব্যারাকপুরের ট্রাঙ্ক রোডের ধারের ভবধাম নামে এক বাড়ির ছেলে নীহারের, যে নীহার আজ চার বছর ধ'রে শুধু বিচলিত উদ্বিগ্ন আর ব্যস্ত হয়েছে। একেবারেই ব্যস্ত হ'তে পারে না, আর এগিয়ে যেতে পারে না যে মেয়ে, তারই কাছে এগিয়ে আসবার জন্য আজ চার বছর ধ'রে ব্যস্ততারই সাধনা ক'রে এসেছে নীহার। শিল্পী নীহার টাইগার হিলের সূর্যোদয়ের ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে আজ চার বছর ধ'রে শুধু হেমার ছবি এঁকে এসেছে।

শোনা যায়, বাঞ্ছিতার প্রেম লাভের জন্য আজকাল আর কেউ সত্যই তপস্যা করে না; কিন্তু নীহার যা করেছে, সেটা তপস্যার চেয়ে কম কোন ব্যাপার নয়। বছরের মধ্যে যে ছয়মাস দার্জিলিং-এ এসে থেকেছে নীহার, সেই ছয়মাসের একটি দিনও কার্ট রোডের ধারে স্নিগ্ধা নামে এই ভবনের অভিভাবক রিটায়ার্ড পি-এম-জি মিস্টার বসুরায়ের সঙ্গে আলাপ ক'রে যেতে ভোলেনি। কিসের জন্য আর কার জন্য সেটা নীহারের আসা-যাওয়ার, ব্যস্ততার আর আগ্রহের সাধনা, সেটা অনুমান করতে দেরিও হয়নি কারও। জেঠামণি আর জেঠিমা যতখানি বুঝেছিলেন, তার চেয়ে বেশি বুঝেছিল আর সবচেয়ে আগে বুঝেছিল স্বয়ং হেমা।

স্নিগ্ধা নামে এই বাড়ির বারান্দা আর সামনে অর্কিডের রঙীন বাহার, নীহারের জীবনের সকল আগ্রহের এক তীর্থনিকেতনেরই মত হয়ে উঠেছিল। জেঠামণির আর জেঠিমার দুই চেয়ারের মাঝখানে এক চেয়ারে হাসিভরা মুখ আর

শান্ত দু'টি চোখ নিয়ে বসে থাকতো হেমা। হেমারই মুখশোভার কাছে এসে প্রতিদিন যেন নীরবে অভ্যর্থনা জানিয়ে যেত নীহার।

বিস্মিত হ'য়েছে হেমা, ভালও লেগেছে হেমার। যেন ঠিক এইরকমই চেয়েছিল হেমা। স্নিগ্ধা নামে এই ভবনের জেঠামণি আর জেঠিমাও এইরকমই চেয়েছিলেন। ভালবাসার রীতি ঠিক এইরকমই শান্ত হওয়া উচিত। মেলা-মেশার নিয়মে এইরকমই সুরুচি থাকা ভাল। নীহারকে খুবই পছন্দ হয়েছিল জেঠামণির ও জেঠিমার।

খুবই স্বাভাবিক, নীহারকে ভাল লাগবে হেমার। হেমা তার জীবনের সব শোভা নিয়ে সুন্দর ও শান্ত হ'য়ে ফুটে থাকে, আর নীহার তার দু' চোখের পিপাসা নিয়ে ছুটে আসে প্রতিদিন। হেমার মনের গভীরে একটা শান্ত ও সুন্দর অহংকারই যেন ঝক ক'রে হেসে ওঠে। একদিন নয়, দু'দিন নয়, চার বছর ধ'রে যে-মানুষটি হেমাকেই জীবনের স্বপ্ন ক'রে রেখেছে, তার ভালবাসার নিষ্ঠা দেখে আশ্চর্য হতে হয় বৈকি। অথচ, হেমা একদিনের জন্য একটা সুন্দর কথাও নীহারকে বলেনি।

সুন্দর একটা কথা কেন, নীহারের লেখা একশতের উপরও চিঠির কোন একটারও উত্তর দেয়নি হেমা। জানে হেমা, উত্তর না দিলেও কিছু আসে যায় না। উত্তর দেবার দরকারও পড়ে না। উত্তর দিতে ইচ্ছাও করেনি বোধহয়। ইচ্ছা করলেও ওভাবে হাতটাকে বেহায়া ক'রে দিতে ভাল লাগে না হেমার।

টাইগার হিলের সূর্যোদয়ের চেয়েও বেশি সুন্দর মনে হয়েছে যে-মেয়ের মুখের ছবিকে, নীহারের চিঠির লেখাতে সেই ছবিই দেবী হয়ে উঠলো একদিন। —মনে হয় তুমি দেবতার মেয়ে এক দেবিকার মতই! কথাগুলি পড়তে আরও ভাল লাগে হেমার। নীহারের প্রেমের ভাষা পূজারীর মুখের ভাষার মত হ'য়ে উঠেছে। মুগ্ধ হয় হেমার মনের কল্পনা। এমন ক'রে ভালবাসতে পারে যে-মানুষ, সে-মানুষ সত্যই ভালবাসার মানুষ। তাই একদিন হঠাৎ ব্যারাকপুরের এক খুড়িমার চিঠি পড়ে আশ্চর্য হয়নি হেমা। বিন্দুমাত্রও আপত্তি মনের মধ্যে দেখা দেয়নি।

জেঠিমা তো হেমাকে কোনমতে হাঁটিয়ে নিয়ে এলেন কিন্তু আবার একটা সমস্যা দেখা দিল।

বিয়ের রেজিস্ট্রার মিস্টার তালুকদারের সামনে, ঘরভরা মেয়ে আর পুরুষের হাসিভরা মুখ আর খুশিভরা চোখের সম্মুখে, ফর্মের উপর সই করবার সময় কলম

ধরবার জন্য হাত তুলতে পারলো না হেমা। শেষে স্বয়ং জেঠিমাই এগিয়ে এসে হেমার হাতে কলম ধরিয়ে দিলেন, আর জেঠিমাই হেমার সেই কলমধরা হাত ধরে কোন রকমে ফর্মের উপর বুলিয়ে বুলিয়ে হেমার নামটা লিখিয়ে নিলেন।

এ আবার কিরকম কাণ্ড? হেমার মনের কোন প্রতিবাদের ইঙ্গিত? অনিচ্ছার আভাস?

মোটেই নয়। রেজিস্ট্রার হাসলেন, ঘরভরা মানুষ হেসে ফেললো। সকলে না হোক, অনেকেই জানতেন, এইরকম একটা কাণ্ড ক'রে বসবে হেমা। বড় বেশি শান্ত, বড় বেসি অচঞ্চল আর বড় বেশি লাজুক হেমা।

আবার অনেকেই জানে, বিশেষ ক'রে কার্ট রোডেরই সুমিতা, চিত্রা আর আইভি জানে, মোটেই লাজুক নয় হেমা। কিন্তু একটু কেমন-যেন হেমা। ওরা বোধ হয় জানে না যে, সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রাখা অহমিকাই হলো এটিকেট, ভাবা হাসি আর চোখের জল একটু অস্পষ্ট ক'রে রাখাই সব চেয়ে বড় স্টাইল। ওরা বিশ্বাসও করতে পারে না যে, যে-হেমা প্রাণ দিয়ে এটিকেট আর স্টাইলকে ভালবেসেছে, তার কাছে স্টাইল আর এটিকেটও প্রাণ হয়ে গিয়েছে।

হেমার হাত দুটো যেন নিজেরই শোভার ভারে সর্বক্ষণ ভারি হয়ে রয়েছে পৃথিবীর কারও অনুরোধের কাছে সাড়া দেয় না ওর হাত। বার্চ হিলের পার্কে বেড়াতে গিয়ে ভুলেও কোনদিন একটা ফুল তুলতে পারেনি হেমা। আরও আশ্চর্য, সুমিতা ফুল তুলে নিয়ে হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েছে, তবু সে ফুল হাতে তুলে নিতে পারেনি হেমা। কারণ হাতের পোজ ভাঙতে পারে না হেমা। নীল রঙের উলের জামপার দু' ভাঁজ করে বুকের উপর জড়িয়ে ধরে রেখেছে হেমার দুটি সুন্দর হাতের যে সুন্দর ভঙ্গী, অনেক ভেবেচিন্তে আর চেষ্টা করে গড়া ভঙ্গী, সেই ভঙ্গীটিকে বার্চ হিল পার্কের শোভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ এলোমেলো করে দিতে মন চায় না হেমার, পারেও না হেমা। ভুল বুঝবে সুমিতা, ভুল বুঝবে আইভি, বুঝুক কিন্তু ওদের একটা থামকা অনুরোধের জন্য নিজেকে ভেঙ্গে দিতে পারে না হেমা।

এরকম কাণ্ড ও যে করতে পারে সে তার বিয়ের দিনে ঐরকম একটা কাণ্ড যে করবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? একঘর লোকের চোখের সম্মুখে এতদিনের শান্ত পোজ ভঙ্গী আর নিয়মের যত্ন দিয়ে তৈরী হাতটাকে হঠাৎ বেহায়া ক'রে দিতে পারবে কেন হেমা?

মিস্টার তালুকদারের সম্মুখে আর ঘরভরা লোকের চোখের সামনে ব'সে ফর্মের উপর জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছার স্বীকৃতি নিজের হাতে এঁকে দেবার জন্য নিজের চেষ্টায় কলম হাতে তুলে নেওয়া হেমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সাহায্য করলেন জেঠিমা। জীবনের এতদিনের একটা শান্ত ও সুন্দর পোজ ভেঙ্গে দিতে পারে না হেমা। এইমাত্র ব্যাপার; এর চেয়ে বেশি কোন রহস্য এর মধ্যে নেই।

নানা সুরুচি সুশিক্ষা আর নিয়মে লালিত স্নিগ্ধা নামে এই বাংলো বাড়ির জীবনে এই সন্ধ্যাটাই আবার হঠাৎ একটা সমস্যা সৃষ্টি ক'রে বসলো, বিয়ের উৎসব শেষ হ'লো যখন, আর কালিম্পং-এর ছোট দাদুর বাড়ির রমা, হেনা আর লিলিও চলে গেল। ওরা থাকলে বোধহয় সমস্যাটা এত কঠিন হয়ে উঠতে পারতো না।

অভ্যাগতেরা সবাই বিদাই নিয়েছেন, সব কলরব শান্ত হয়ে গিয়েছে, রাতও হয়েছে, হিমেল কুয়াশা এসে ঘরে ঢুকেছে, আর নীহার ব'সে আছে একটি ঘরের নিভৃতে একা একা একটি সোফার উপর, সম্মুখে টেবিলের উপর এক জোড়া ফুলদানির দিকে তাকিয়ে। সমস্যা, সত্যই সমস্যা, এখন এই ঘরের ভিতরেই আসতে হবে হেমাকে।

যে জেঠিমা হেমাকে বিয়ের আসর-ঘরের ভিতরে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনিও দূরে স'রে রইলেন। বাসর-ঘরের দিকে হেমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে আসতে পারে না স্নিগ্ধা নামে এই ভবনের কোন গুরুজনের আগ্রহ। কারণ, এই কাজটা বড় বেশি বাস্তব ও স্পষ্ট একটা কাজ।

আর হেমা? হেমার পক্ষে তো একেবারেই অসম্ভব। বিয়ে হয়ে গিয়েছে বলেই হঠাৎ পা দুটোকে এত বেহায়া ক'রে তুলতে পারবে না হেমা। তাহ'লে যে হেমার এতদিনের যত্নে গড়া জীবনের সুন্দর ভঙ্গীই ভেঙ্গে যায়।

চুপ করে বসে থাকে হেমা। জেঠিমা'র দুধে গরদ শাড়ির ফুলকাটা আঁচল আর এখানে-ওখানে কোথাও দেখা যায় না। ঘরের ভিতরে গিয়ে বোধ হয় শ্রান্ত হয়ে হাঁপাচ্ছেন জেঠিমা। অনেক ব্যস্ত হয়েছেন, অনেক খেটেছেন, অনেক কথা বলেছেন, আজকের উৎসবকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু

আর না, এর চেয়ে বেশি আর কোন অসম্ভ্রমের কাছে এগিয়ে যেতে পারে না এই স্নিগ্ধার সুরুচিশীল আত্মা।

—এখনো ওখানে বসে আছিস কেন হেমি?

ধমকের মত একটা চিৎকারের মতই মাত্রাছাড়া আর ছন্নছাড়া এক সম্ভাষণের ধ্বনি হঠাৎ চমকে উঠলো শান্ত ও শ্রান্ত স্নিগ্ধার ঘরের বাতাসে। উৎসবশ্রান্ত স্নিগ্ধার এই রাতটার সমস্যাটাকে এতক্ষণ ধরে আর এক ঘরের জানালা দিয়ে লক্ষ্য করছিল আর সহ্য করছিল যাঁর দু' চোখের দৃষ্টি, তাঁরই গলার স্বর জেগে উঠেছে। কথা বলেছেন কালিম্পং-এর দাদু, জেঠিমারই ছোট কাকা, লেফটেন্যান্ট কর্ণেল দত্ত চৌধুরী, আই-এম-এস, তিব্বতী কুকুর কোলে নিয়ে যিনি মাঝে মাঝে স্নিগ্ধার শান্ত নিয়মের জীবনের মধ্যে অনিয়মের উৎপাত সৃষ্টি ক'রে চলে যান।

কালিম্পং-এর দাদু যে বাড়ি করেছেন, সে বাড়ির কোন নাম নেই। কিন্তু নাম দিলে নাম দেওয়া উচিত রূঢ়া, কারণ স্নিগ্ধার জীবন যে নিয়মে চলে, ঠিক তার বিপরীত নিয়মে চলে কালিম্পং-এর দাদুর বাড়ির জীবন। জেঠামণি ও জেঠিমা যেমন কালিম্পং-এর বাড়িকে দু'দিনের বেশী সহ্য করতে পারেন না, ছোট দাদু আর ছোট দিদাও তেমনি কার্ট রোডের পাশে বাতাসার মত পাতলা মারবেলের টুকরো দিয়ে গড়া স্নিগ্ধাকে দুদিনের বেশি সহ্য করতে পারেন না।

কালিম্পং-এর দাদুর বাড়ির খাবার টেবিলে যেন ভূমিকম্পের মত ব্যাপার চলে, ঝন ঝন ঠুং ঠং ডিস-চামচ-কাঁটার শব্দের আছাড়িপিছাড়ি। ছোট দাদুর মেয়েরা মেয়ে হয়েও যে-ভাবে শব্দ ক'রে আর বাইরের লোকের সামনেও মুর্গির হাড় চিবোয়, দেখে আতঙ্কিত হয় আর শিউরে ওঠে হেমার চোখ। পিয়ানোর বুকের উপরে কফির পেয়ালা রাখতে ছোট দাদুর হাতে একটুও বাধে না। যেমন তিব্বতী কুকুরের চীৎকারে তেমনি ছোট দাদু, ছোট দিদা, আর রমা সোমা ও লিলির উচ্চহাসির শব্দে কালিম্পং-এর বাড়ির বাতাস মত্ত হয়ে থাকে। শুনে কতবার চমকে উঠেছে হেমা, যা মনে আসে তাই বলে ফেলতে একটুও বাধে না সোমার মুখে। আর, রমার সাজসজ্জার রীতিটা তো একটা রীতিই নয়। একটা জর্জেটকে যেন কোনমতে এলোমেলো ক'রে গায়ে জড়িয়ে রাখে রমা; একবার বেড়িয়ে এলেই দেখা যায়, নতুন শাড়ির তিন জায়গায় ছিঁড়ে কিংবা ফেঁসে গিয়েছে। লিলি যে-সব গান ছোট দাদু আর ছোট দিদার সামনেই গলা খুলে

গাইতে থাকে, শুনে কান ফিরিয়ে নিয়েছে হেমা, চলে গিয়েছে অন্য ঘরে। দু'দিনের জন্য বেড়াতে গিয়ে কালিম্পং-এর বাড়ির অনিয়মকে সহ্য করতে পারেনি হেমাও।

কালিম্পং-এর বাড়ির অনিয়মের মানুষগুলিও এসেছিল সবাই, চলে গিয়েছেও সবাই, শুধু যাননি ছোট দাদু, কারণ তিনি আগামীকাল সকালে এক মানুষথেকো লেপার্ডের সন্ধানে নেমে যাবেন শিলিগুড়ির দিকে। তিব্বতী কুকুর আর রাইফেল নিয়ে ছোট দাদু যে ঘরের ভিতরে এখনো ঘুমিয়ে পড়েননি, বুঝতে পারে নি হেমা।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে, ভারি ভারি দুটি শক্ত চামড়ার চটির কর্কশ শব্দ তুলে ব্যস্তভাবে এগিয়ে এলেন ছোটদাদু লেফটেন্যান্ট, কুর্নেল দত্ত চৌধুরী আই-এম-এস।

আবার কথা বললেন ছোটদাদু, এবং এমনি চাপাস্বরে বললেন যে, সারা কার্ট রোডই যেন শুনতে পেয়ে চমকে উঠলো। চমকে উঠলো হেমা, একেবারে একটা উল্টো কথা বলে ধমকে দিচ্ছেন ছোটদাদু—কি রে, তুই এখনো এরকম বেহায়ার মত চুপ করে ব'সে করছিস কি?

শুনে চুপ করে থাকে হেমা। ছোট দাদুর কাছে এইরকমই কথা আশা করা যায়। স্নিগ্ধার জীবন যে নিয়মে আর যে রুচিতে ও যে শিক্ষায় সুন্দর হয়ে উঠেছে, ঠিক তার উল্টো নিয়মের মানুষ এইরকম কথাই তো বলবেন। ফোটা ফুল তার সকল রঙের মায়া মুছে ফেলে হঠাৎ বিশ্রী হয়ে যেতে পারছে না, কিন্তু ছোটদাদু জানেন না, কল্পনাও করতে পারবেন না, স্নিগ্ধার মেয়ে হেমার এটিকেট-লালিত প্রাণ যে সুন্দর ও শান্ত একটি গর্বে প্রসন্ন হয়ে আছে, সে গর্ব হঠাৎ ভেঙ্গে ফেলতে গেলে সে মেয়ের প্রাণটাই যে অসুন্দর হয়ে যায়। চার বছর ধরে যে মানুষ তার উপাসনা করেছে আর হেমার কাছেই এসেছে, আজ হঠাৎ হেমা তার কাছে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যাবে কেন? তাহ'লে হেমার জীবনের সেই মায়ার আবরণই যে হঠাৎ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, যে মায়ার আবরণের দিকে চার বছর ধ'রে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে এসেছে এক শিল্পী মানুষ, আর টাইগার হিলের সূর্যোদয়ের ছবি আঁকাও ছেড়ে দিয়েছে।

লজ্জা নয়, ঐ ঘরের নিভৃতে বসে যে মানুষ তার মন-প্রাণের সব চাঞ্চল্য নীরব ও ধীর প্রতীক্ষায় সহ্য করছে, তার কাছে যেতেই চায় হেমা। কিন্তু যাইয়ে দিতে হবে। হেমার অন্তরে এই সহজ ও সুন্দর একটা অহংকারকে কেউ বুঝতে

পারছে না, ভাবতে গিয়ে সংসারের উপর না হোক নিজের অদৃষ্টের উপর একটু অভিমান জাগে হেমার মনে, এবং হেমার ছোট ছোট মৃদু নিঃশ্বাসের মধ্যে বেদনাও ছড়ায়।

ছোট দাদুর মুখের দিকে তাকায় হেমা। আশ্চর্য হয় হেমা, কি অদ্ভুত স্নেহ-কোমল দৃষ্টি ফুটে রয়েছে ঐ প্রকাণ্ড শরীর ছোট দাদুর দুই চোখে।

ছোট দাদু বলেন—ভয় কিসের? লজ্জা কেন রে?

ছোট দাদুর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠেছে, দেখতে পায় হেমা। প্রার্থনা করার সময় জেঠামণির দু'চোখেও জল দেখা দেয়। সে দৃশ্য প্রায় প্রতিদিনই চমৎকার দেখায় জেঠামণির সেই জলভরা চোখ? কিন্তু কি সুন্দর কালিম্পংএর ছোটদাদুর চোখে এই একটুখানি যে জলের আভাস চিকচিক করছে!

হেমার কাঁধে হাত রেখে ডাক দেন ছোটদাদু—আয়, চল আমার সঙ্গে।

উঠে দাঁড়ায় হেমা। স্নিগ্ধার নিয়মের স্নেহে আর শিক্ষায় সুন্দর একটি জীবনের রঙীন ভঙ্গী শান্ত ও আশ্বস্ত হয়ে ছোটদাদুর পাশে পাশে চলতে থাকে।

—হেমা এসেছে নীহার। ছোটদাদুর সেই আস্তে বলা সেই কথা আর কণ্ঠস্বর শুনতে পায় সারা কার্ট রোডের স্তব্ধতা। ঘরের ভিতরে এক সোফার উপর হেমাকে বসিয়ে রেখে ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন তাঁর ভারি চটি আর ফ্লানেলের প্যাণ্টালুন নিয়ে প্রকাণ্ড শরীর ছোটদাদু। নিজের হাতেই ঘরের দরজার কপাট বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন।

রূপকথার দেশেরই মত, কুয়াশায় ঢাকা এক অবাস্তব রাজ্যের মধ্যে শুধু একটি আলোভরা নিভৃত জেগে রয়েছে, কার্ট রোডের পাশে এক ভবনের নিভৃত। নীহার ও হেমা, চার বছর ধরে যারা দুজন শুধু দুজনের কাছে পরম আপন হয়ে যাবার জন্য একটি দিনের প্রতীক্ষায় ছিল, তাদেরই প্রতীক্ষা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। যেখানে আসবার ছিল, সেখানেই আজ তারা এসে গিয়েছে। জীবনের এই প্রথম, হেমার সুন্দর মুখের শোভাকে চোখের অতি নিকটে দেখতে পেয়েছে নীহার। জীবনে এই প্রথম নীহারের সেই ভাসা-ভাসা বড়বড় স্বপ্নভরা সুন্দর আর সর্বদা মুগ্ধ চোখ দুটিকে চোখের বড় কাছে দেখতে পেয়েছে হেমা। টেবিলের উপর ঐ জোড়া ফুলদানির মতই ওদের জীবন আজ বড় কাছাকাছি আর পাশাপাশি ঠাঁই পেয়ে গিয়েছে। একটি জীবনের সুন্দর ক'রে সেজে থাকা

আর রঙীন হয়ে ফুটে থাকা এক ভঙ্গী এবং একটি জীবনের চার বছর ধ'রে ব্যস্ত হয়ে থাকা আর আশায় ও স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকা এক আগ্রহ। সংসার স্বীকার ক'রে নিয়েছে, আজ ওরাই দুজন হলো এই বাসরনিভৃতের বর আর বধূ।

সোফার উপর বসে আছে হেমা, সেই পরিপাটি মায়ামূর্তি। একটি ভুরুতে সেই ছোট একটি ঢেউ সামান্য উদ্ধত হয়ে রয়েছে। দুই ঠোঁটে সেই মৃদু হাসির একটি রেখা সেইভাবেই সুন্দর একটি ছন্দ ধরে রেখেছে। একটা হাত ঠিক সেই রকমই অলসভাবে কোলের উপর লতিয়ে দিয়েছে হেমা। হেমার ভঙ্গীমনোহর যে মূর্তি চার বছর ধরে মুগ্ধ করেছে নীহারকে, সেই মূর্তিই আজ নীহারের জীবনের কাছে সমর্পিত উপহারের মত বসে আছে।

এত সুস্থির আর এত পরিপাটি ক'রে সাজানো যার জীবনের ভঙ্গী, মনের ভাষাকেও মুখের এক অমুখর হাস্যভঙ্গীর ছায়ায় অস্পষ্ট ক'রে রাখা যার রীতি, এক শীলশান্ত নিয়মের স্নেহে লালিত হয়ে এসেছে যার প্রাণ, সেই হেমাই চমকে ওঠে তার মনের দিকে তাকিয়ে। যেন অস্থির একটা নিঃশ্বাস অলজ্জ পিপাসার মত দুরন্ত হয়ে তার শান্ত হৃৎপিণ্ডটাকে অশান্ত ক'রে দিতে চাইছে। চার বছর ধরে ভাল লেগেছিল যে মানুষকে, সে-মানুষকে এমন ক'রে ভাল লাগবে, কল্পনাও করতে পারেনি হেমা, এমন ভাবনা বরণ করার জন্য প্রস্তুতও ছিল না হেমা। মনে হয়, এই আলোকিত নিভৃত এই মুহূর্তে এক বিপুল অনুরোধ হয়ে বেজে উঠবে। লজ্জা? হ্যাঁ, এই লজ্জাকে ভয় করে হেমা, কিন্তু সহ্য করতে চায় না। জীবনের এতদিনের যত্নে গড়া সুন্দর ভঙ্গীর অন্তরালে অন্য একটা প্রাণ জেগে উঠে ছটফট করছে। এই নতুন হেমাকে দেখতে পাচ্ছে না কি নীহার, এমন ক'রে অপলক চোখ নিয়ে যে নীহার কাছে বসে তাকিয়ে আছে হেমারই মুখের দিকে।

হ্যাঁ, অপলক চোখ তুলে নীহার হেমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু দেখছিল বোধ হয় তার নিজের মনেরই ভিতর এক শীতল উদাস ও থমকে-থাকা ছায়ার দিকে। কল্পনাও করতে পারেনি নীহার, তার চার বছরের অস্থির মন আজ হঠাৎ এই নিভৃতের স্পর্শ পেয়ে এমন শান্ত হয়ে যাবে। নীহারেরই প্রেমের আহ্বানকে আজকের উৎসবের মধ্যে সবার চোখের সামনে স্বীকার করে নিয়েছে যে নারী, যার মুখ প্রথম দেখবার পর টাইগার হিলের সূর্যোদয়ের শোভা আর কোন দিন দেখতে যায়নি নীহার, সেই নারীই তার সেই পরিপাটি মায়া-

মূর্তি নিয়ে এত কাছে বসে রয়েছে এই নিভৃতের একটি অনুরোধ শুনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে; কিন্তু যেন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে নীহারেরই অন্তরাত্মা।

শুধু অনুভব করে নীহার, তার কাছে বসে আছে দেবতার মেয়ের মত এক দেবিকা। ধীর স্থির ও শান্ত এক মহিমা। পূজারীর মত সুন্দর কথার মন্ত্র দিয়ে যে মূর্তিকে চার বছর ধরে আরাধনা করে এসেছে নীহার, সেই মূর্তিকে তারই জীবনের এই নিভৃতের সঙ্গিনী বলে মনে করতে গিয়ে মনটাই যেন হঠাৎ ভীরু হয়ে গিয়েছে। নীহারের অপলক চোখ এক অসহায়তার বেদনায় যেন ধীরে ধীরে পাথরের চোখের মত সব চাঞ্চল্য হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তার নিঃশ্বাসের সব উত্তাপ যেন এক সমাধির গভীরে অন্তর্হিত হয়েছে। একটা হিমাক্ত বিদ্রূপ গ্রাস করে ফেলছে নীহারের ধমনীর সব শোণিতকণিকার আবেগ। হেমা, সেই হেমা যেন এক সাদা পাথরের অন্তরের অহংকার, সুন্দর এক ভঙ্গীর মধ্যে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। মানুষের বাসরঘরের প্রয়োজন ঐ দেহ স্পর্শ করতে সাহস করে না, শক্তিও পায় না।

নীহার ও হেমা, চার বছরের নিরন্তর এক মনের টানের উৎসব আজ সকল উদ্বেগ আর আকুলতার সমাপ্তির পর একটি পরিণামের কাছে এসে পৌঁছেচে। আশ্চর্যই বলতে হবে, কার্ট বোর্ডের পাশে স্নিগ্ধা নামে এই ভবনের একটি কক্ষের সুন্দর ক'রে সাজানো সেই নিভৃতও কি-যেন আর কেমন-যেন একটা সমস্যার বেদনা সহ্য করতে গিয়ে উদাস হয়ে গেল।

কথা বলে নীহার। অনেক কথা। আজ চার বছর ধরে প্রতি চিঠির প্রতি ছত্রে যে-সব কথা লিখেছে নীহার, সেই সব কথা। পৃথিবীর যে-কোন শোভার চেয়ে বেশি সুন্দর বলে মনে হয়েছে তোমাকেই, দেবতার মেয়ে এক দেবিকার মত মনে হয়েছে তোমাকে; ভোর বেলার আলোকের শিশিরের চেয়েও উজ্জ্বল। চৈত্রের পলাশের চেয়েও রঙীন, আর বর্ষার ঝরনার চেয়েও পরিপূর্ণ বলে মনে হয়েছে তোমাকে।

কোন কথা না বলে শুধু শুনতে থাকে হেমা। সত্যই যেন একটা নিখুঁত সাদা পাথরের কানের কাছে বৃথাই বেজে চলেছে নীহারের আরাধনার ভাষা। ধীর স্থির ও শান্ত হেমার সুন্দর ও পরিপাটি ভঙ্গীটাই যেন পাথরের মত কঠিন হয়ে রয়েছে, একটুও উতলা হয় না, বিস্মিত হয় না, বিচলিত হয় না।

যেন কতগুলি প্রলাপ বকে নিজেকে কোনরকমে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করছে নীহার; কিন্তু বুঝতে পারে, তার বুকের ভিতরে একটা শূন্যতার মধ্যে নীরব

এক হাহাকার ছুটোছুটি করছে। কোথায় ভুল হলো, কেন এমন হলো, বুঝতে পারে না নীহার। কি ভয়ংকর এক ব্যবধানের অভিশাপ লুকিয়েছিল এই নিভৃতেরই সান্নিধ্যের মধ্যে। কত দূরে সরে রয়েছে হেমা! কি নিষ্ঠুর এক কুণ্ঠায় নিথর হয়ে গিয়েছে নীহারের বুকের ভিতরের সব আকুলতার স্পন্দন।

চুপ করে নীহার। অনেকক্ষণ। তারপর বলে—কিছু মনে করোনা হেমা, আজ আর কোন নতুন কথা বলতে পারলাম না হেমা।

হেমা বলে—কেন?

উত্তর দিতে পারে না নীহার।

দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকায় হেমা। হ্যাঁ, কুয়াশায় ঢাকা রাত্রি অনেকক্ষণ হলো ভোর হয়ে গিয়েছে। সোফা থেকে উঠে ঘরের দরজা পার হয়ে চলে যায় হেমা।

আর এক ঘর থেকে বের হয়ে এসে বারান্দার উপর দাঁড়ালেন ভোরের প্রার্থনার খাতা নিয়ে জেঠামণি, আর সামনের লনের উপর এক ফুলের-টবের আড়াল থেকে ফুল হাতে নিয়ে জেঠিমা।

বারান্দা পার হয়ে অন্য ঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ার আগে একবার থমকে দাঁড়াতে হলো হেমাকে। ডাক দিয়েছেন কালিম্পং-এর ছোট দাদু।—এদিকে একবার আয় দেখি হেমি।

থমকে দাঁড়িয়েই থাকে হেমা। তারপর অবসন্নভাবে কাছের এক চেয়ারে শান্ত হয়ে বসে পড়ে। অগত্যা ছোট দাদু তাঁর তিব্বতী কুকুর কোলে নিয়ে খাব শক্ত চামড়ার চটির কর্কশ শব্দ বাজিয়ে হেমার কাছে এগিয়ে এলেন।—অ্যাঁ, এত গম্ভীর মুখ কেন রে? এ তো ভালো কথা নয়।

একটি ভুরুর উপর ছোট একটা ঢেউ সামান্য একটু উদ্ধত হয়ে ওঠে, দুই ঠোঁটের উপর মৃদুহাসির রেখায় সেই ছন্দ শিউরে ওঠে, অলসভাবে একটি হাত কোলের উপর লতিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে আর অতি শান্তস্বরে হেমা বলে—কে বললে গম্ভীর হয়েছি?

ব্যারাকপুরের ট্রাঙ্ক রোডের ধারে ভবধাম নামে পদ্মকাটা ইটের তৈরী এক ভবনের এক কক্ষের নিভৃতে খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ভিতরে ছড়িয়ে পড়লো একদিন। নীহার তার জীবনের চার বছর ধরে আরাধনা করা

আর স্বপ্নে-দেখা সেই মুখের দিকে তেমনি অপলক চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। কে জানে, হয়তো এই আশা ছিল নীহারের মনে, ব্যারাকপুরের আকাশের চাঁদের আলো আর নারকেলের ছায়ার স্পর্শ পেয়ে নীহার ফিরে পাবে তার জীবনের সেই নিঃশ্বাসের উত্তাপ, দার্জিলিং-এর কার্ট রোডের একটি রাত্রির হিমাক্ত কুয়াশার বিদ্রূপে যে নিঃশ্বাস শীতল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই আশাই আবার নিজের লজ্জায় থরথর কেঁপে উঠলো নীহারের বুকের ভিতর। চাঁদেরই আলো ছড়িয়ে পড়েছে হেমার মুখে, কিন্তু অতি শান্ত ধীর ও স্থির, এবং নিখুঁত সুন্দর ও পরিপাটি এক ভঙ্গীর উপর পড়ে সেই চাঁদের আলোও যেন হিম হয়ে গিয়েছে। অনেক সুশিক্ষা দিয়ে তৈরী অচঞ্চল এক ভঙ্গিমা। সুন্দর হয়ে সেজে থাকা আর রঙীন হয়ে ফুটে থাকা একটা প্রাণ। ব্যাকুল হতে পারে না, অস্থির হতে পারে না, ব্যস্ত হতে জানে না, মুহূর্তের ভুলেও নিজেকে একটুও এলোমেলো ও ছন্দছাড়া করতে পারে না হেমার এই শান্তমূর্তি।

আজও অনুভব করতে পারে না, উপলব্ধিও করতে পারে না, শুধু বিস্মিত হয় নীহার, কেন এমন হলো? দেবীর মতই বটে ঐ মেয়ে। চার বছরের আরাধনায় কার্ট রোডের এক ভবনের যে মেয়েকে নিজেই দেবী ক'রে দিয়েছে, তার কাছে নিজেকে আজ একটি ক্ষুদ্র ছায়া বলে মনে হয় কেন? তবে কি কোন ভুল হয়েছে? চার বছর ধরে কি শুধু আত্মহত্যার সাধনা করে এসেছে নীহার? মানুষকে মানুষের চেয়ে বেশি মনে ক'রে ভালবাসলে ভুল করা হবে, এ আবার কোন্ শাস্তির নিয়ম?

হেমা জানে না, বিশ্বাসও করে না, সে কোন ভুল করেছে তার মনে আর আচরণে। বিয়ের আগের চারিটি বছরের কত মুহূর্তে কতবার মনে হয়েছে হেমার, মানুষটি সত্যই দেবতারই মত ভালবাসতে জানে। আর আজও ব্যারাকপুরের ট্রাঙ্করোডের পাশে জ্যোৎস্নামাখা এক নিভৃতের মধ্যে নিঃশব্দে বসে থেকে, আর হাজার হাজার দুঃসহ মুহূর্ত সহ্য করতে গিয়ে আরও বেশি ক'রে ও মর্মে মর্মে বিশ্বাস করে হেমা, ঠিকই, দেবতারই মতো এই মানুষটির ভালবাসার রীতি।

কিন্তু হঠাৎ চমকে ওঠে হেমা। ঘরের ভিতর ছটফট ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে নীহার। দেবতা যেন তার দেবত্বকে সহ্য করতে পারছে না। যেন জীবনের এক দুঃসহ যন্ত্রণার বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে বিদ্রোহ করতে চাইছে নীহার। তুফান খুঁজছে দেবদারুর অন্তরের বাসনা। সত্যই, যেন এক মত্ত ঝড়ের নেশা গায়ে মাখবার

জন্য ঘরের ভিতর অস্থির হয়ে পায়চারি ক'রে বেড়ায় নীহার, মাঝে মাঝে খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। চুপ ক'রে দেখতে থাকে হেমা, দেখতে ভাল লাগে হেমার। আকাশচারী দেবতার মন বোধহয় হঠাৎ মাটির সৌরভের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠতে চাইছে।

চমকে উঠেছিল হেমা, তারপরেই দুর্বোধ্য এক বিস্ময়ের মধ্যে যেন সমাহিত হয়ে যায় হেমার জীবনের সব কৌতূহল। ঝড়ের মত নয়, যেন এক শ্রান্ত ও ক্লান্ত পাখির ভাঙা ডানার ঝাপটানির মত কতগুলি ক্ষীণ ও কাতর নিঃশ্বাস হেমাকে জড়িয়ে ধরেছে। হেমার মাথাটাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত যেন খেলা করছে অদ্ভুত একটা আকুলতা, পাগল যেমন ফুল নিয়ে খেলা করে। ভিজে গিয়েছে আবার জলেও গিয়েছে হেমার দুই ঠোঁটের হাসি শিউরানো রেখা। অনেক আশা নিয়ে সহ্য করে হেমা, কিন্তু কয়েকটি মুহূর্তের মোহ মাত্র, মিথ্যা ও বৃথা। তারপরেই যেন স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় দীর্ণ হয়ে যায় হেমার সব কৌতূহলের আত্মা। এই মানুষটির মত্ততার নিঃশ্বাস যেন এক ঘাসবনের ঝড়ের নিঃশ্বাস, বৃথা ও অকারণ এক উদ্দামতার অভিনয় মাত্র।

আস্তে আস্তে এক হাতের শুধু মৃদু একটি ঠেলা দিয়ে নীহারের হাত সরিয়ে দেয় হেমা। নীহার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে। কী নিষ্ঠুর আর কঠোর হেমার এই সুন্দর হাতের মৃদু একটি আপত্তির নির্দেশ! যেন নীহারের প্রাণের সব স্নায়ুতন্ত্র ও শোণিত চিরকালের মত চূর্ণ ক'রে দিচ্ছে ভয়ানক এক বিদ্রূপের বজ্র।

স্থির ও শান্ত, রঙীন হয়ে ফুটে থাকা হেমা তেমনি ধীর ও অবিকার ভঙ্গীমনোহর মূর্তি নিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে। নীহার বলে—আমার একটি অনুরোধ আছে হেমা।

হেমা—বল।

নীহার—আমাকে ভুল বুঝবে না।

হেমা—কে বললে ভুল বুঝেছি?

যেন সুন্দর এক ক্ষমার ভাষা; দেবতার মেয়ের মতই এক দেবিকার করুণার ভাষা। বিকার নেই, বেদনা নেই, অভিমান নেই রাগ নেই—সুস্থির ও অচঞ্চল এই রঙীন ভঙ্গীর করুণাও কী ভয়ানক হিমশীতল। হেমার দু'চোখের নিশ্চল তারা দুটোর দিকে চোখ পড়তেই যেন স্তব্ধ হয়ে যায় নীহারের সব প্রশ্ন আর

অনুরোধের প্রাণ। এইভাবেই কি চিরকাল শুধু ক্ষমা করবে আর করুণা করবে হেমা, আর নীহারের জীবন চিরকালের এক অপমানের ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে থাকবে ?

হেমাই কথা বলে আবার।—আমি কালই দার্জিলিং চলে যাব।

আর্তনাদ চাপতে চেষ্টা করতে গিয়ে নীহারের গলার স্বর কেঁপে ওঠে—কেন হেমা ?

হেমা—আশ্চর্য হচ্ছো কেন ?

নীহার—যেতে চাইছো যাও, কিন্তু আবার…।

হেমা—আবার আসবো বৈকি।

মিথ্যা বলেনি হেমা। সিন্দুর মেখে হেমা কার্টরোডের কুয়াশার কাছ থেকে আবার ব্যারাকপুরের নারকেলের ছায়ার কাছে এসেছে। আবার ফিরে গিয়েছে।

কালিম্পং-এর ছোট দাদুই একদিন চিৎকার করলেন—কি রে হেমি, তোর হাবভাব যেন ভাল মনে হচ্ছে না। এত গম্ভীর কেন ?

হেসে হেসে উত্তর দিতে চেষ্টা করলো হেমা, কিন্তু পারলো না। কালিম্পং-এর দাদুর দুই চোখের দৃষ্টি আর প্রশ্নের সম্মুখে হেমার জীবনের হাসি-ভরা ভঙ্গী এই প্রথম ভেঙ্গে গেল।

ছোট দাদু চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, আর রমা সোমা ও লিলি হেসে গড়িয়ে পড়তে থাকে। —দিব্যি তাজা চেহারার মানুষ তুই, শরীরে কোন বাজে ফ্যাট নেই, তবে কেন এতদিনের মধ্যেও…কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না কেনরে ?

ঘরভরা হাসির ঝড়ের মধ্যে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে হেমা, আর বুঝতে পারে, ছোট-দাদুর কথাগুলি তার চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে, সে জ্বালা সহ্য করাও যায় না।

আবার চিৎকার করে উপদেশ দেন ছোট-দাদু—ডোণ্ট প্রিভেণ্ট।

—মিথ্যে কথা ! চেঁচিয়ে ওঠে হেমা। যেন চেঁচিয়ে উঠেছে হেমার অন্তরাত্মা। সুন্দর হয়ে সেজে থাকা আর রঙীন হয়ে ফুটে থাকা মেয়ের চিরকালের সুন্দর ভঙ্গীর কঠিন সংযমকে এই প্রথম একটি আঘাতে শিউরে দিয়ে যেন এক রুদ্ধ

অপমানের বেদনা চেঁচিয়ে উঠেছে। এভাবে জীবনে এই প্রথম কথা বললো হেমা।

ঘরভরা হাসির সোর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। ছোট-দাদুও হেমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হন।

ধীরে ধীরে প্রখর একটা জিজ্ঞাসা যেন জেগে উঠতে থাকে প্রকাণ্ড-শরীর ছোট দাদুর সন্দেহ বিচলিত দুই চোখে। ছোট-দাদু বলেন—আমি নীহারকেই একবার জিজ্ঞাসা করতে চাই। বলিস তো ব্যারাকপুরে গিয়েই জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।

—না। যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে আর বিচলিত হয়ে একটা কান্না-চাপা স্বরে আপত্তি জানায় হেমা!

কালিম্পং-এর ছোট-দাদুর বাড়িতে আর একটা দিনও থাকতে পারলো না হেমা। ছোট-দাদু অনেক অনুরোধ করলেন—আর কটা দিন থেকে যা হেমি, গ্যাংটক রোডের দিকে একদিন বেড়িয়ে আয়, কমলালেবুর বনের হাওয়া খেয়ে আর রডোডেনড্রনের রং দেখে খুশি হবি।

কালিম্পং-এর বাড়িতে নয়, দার্জিলিং-এর কার্টরোডের বাড়িতেও নয়; কোথাও আর দুটো দিনও সহ্য করতে না পেরে ব্যারাকপুরের নারকেলের ছায়ার বাড়িতেই চলে এল হেমা। আর, দিনের পর দিন, জ্যোৎস্নার ও অন্ধকারের অনেক রাত্রির পর রাত্রি, পদ্মকাটা ইটের ভবধামের এক নিভৃতে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারে হেমা, হিমের দেশের কমলালেবুর বনের হাওয়া আর রডোডেনড্রনের রং-এর কাছ থেকে পথ ভুলে সে আজ এই নারকেলের ছায়ার দেশে এক গ্লোরিয়ারেখার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

আর নীহার। দেবতার মেয়ের মত দেবিকার ঐ মূর্তিকে নয়, নিজেরই এই শক্তিটার উপর ঘৃণা সহ্য করতে গিয়ে যেন আরও পাথর হয়ে গিয়েছে নীহার। নিভৃতে, চোখের সামনে, বুকের এত কাছে হেমা, তবু নীহার শুধু অলস উদাস ও ব্যথা-কুণ্ঠিত এক অদ্ভুত দৃষ্টি তুলে হেমাকে দেখছে, অতি দূরের আকাশের এক তারকার দিকে যেভাবে মানুষ তাকিয়ে থাকে।

আশ্চর্য হয়, আর বিরক্তও হয় হেমা, তবু কেন বার বার সেই একই কথা আজও ধ্বনিত হয় তার কানের কাছে—ভুল বুঝবে না হেমা।

কিন্তু বুঝবার আর কি বাকি আছে যে ভুল বুঝতে হবে? বেশ তো, একটি স্পষ্ট ও চরম প্রশ্নের কাছে স্পষ্ট উত্তর দিয়ে এই ভুল বুঝাবুঝির পালা চুকিয়ে দিলেই তো হয়।

মনের ভুলে নয়; ইচ্ছা করেই চিঠি লিখে ফেললো হেমা—আপনি একবার আসবেন ছোটদাদু। কল্পনা করতে পারে হেমা, ব্যারাকপুরের এই চিঠি পড়ে কালিম্পং-এর প্রকাণ্ড-শরীর ছোটদাদুর হাস্যচঞ্চল চোখ দুটো কেমন বিষণ্ণ, আর বিচলিত হয়ে উঠেছে।

সত্য-মিথ্যার হিসাব-নিকাশ করার জন্যই প্রস্তুত হয়েছে হেমা। যেন এক স্বপ্নের-ঘোরে হঠাৎ দুঃসাহসী হয়ে একটা সুস্পষ্ট প্রশ্ন আহ্বান ক'রে ফেলেছে হেমা! চিঠি পেয়ে গিয়েছেন ছোট-দাদু, ব্যারাকপুরের ভবধামের আত্মাকে এক কঠোর প্রশ্নের আঘাত থেকে রক্ষা করবার আর উপায় নেই।

ছোট-দাদু কবে আসবেন, কোন ঠিক নেই, কোন উত্তর দেন নি। কিন্তু আসবেন নিশ্চয়। হেমা যে মীমাংসা চেয়েছে, সেই মীমাংসাই পেয়ে যাবে হেমা। কয়েকটা দিন শুধু ধৈর্য ধরে পার ক'রে দেওয়া। তবে আবার এত ছটফট করে কেন হেমা?

ব্যারাকপুরের বাড়ির আনাচে-কানাচে নিজেকে আড়াল ক'রে রাখছে হেমা। যেন নিজেরই এক হঠাৎ নিষ্ঠুরতার চেহারা দেখে ভয়ে চমকে উঠেছে হেমার বুক। চার বার লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা সেরে নিয়ে খুড়িমা যখন খোঁজ করেন, আর বার বার ডাকাডাকি করেন, তখন শুধু হেমা একবার সামনে এসে দাঁড়ায়। খুড়িমা প্রশ্ন করেন—জ্বর-টর হয় নি তো বউমা?

—না। খুড়িমাকে আশ্বস্ত করে পরমুহূর্তে তেমনি ছটফট ক'রে পালিয়ে যায় হেমা। বোধহয় বুঝতেও পারে না হেমা, এরকম ছটফট করতে গিয়ে তার এতদিনের জীবনের সুন্দর ও শান্ত ভঙ্গীটাই যে বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু বেশিদিন নয়; একা ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বৈকালী বাতাসে চঞ্চল নারকেলের ছায়ার দিকে তাকাতে গিয়ে দেখতে পায় হেমা, তিব্বতী কুকুর কোলে নিয়ে ভবধামের গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকছেন কালিম্পং-এর ছোট-দাদু? দু'হাতে দু'চোখ ঢাকা দেয় হেমা, নিজেরই বুকের ভিতর থেকে যেন একটা ধিক্কার ছুটে বের হতে চায়, এ কি কাণ্ড করে বসে আছে হেমা! জীবনের এক নিভৃতে লুকিয়েছিল যে অপমান, সেই অপমানকে পৃথিবীর চোখের সামনে টেনে এনে কি লাভ হলো হেমার?

ব্যস্তভাবে ঘরে ঢোকে নীহার। সুসংবাদ জানিয়ে দিতে এসেছে নীহার—ছোট-দাদু এসেছেন।

হেমা—তাতে তোমার কি?

একথা বলতে চায়নি হেমা, কিন্তু বলে ফেলার পর হেমা নিজেই আশ্চর্য হয়ে নিজের উপরে রাগ করে। একথা বলেই বা কি লাভ হলো হেমার? কা'কে সাবধান ক'রে দিতে চাইছে হেমা?

বিস্মিত হয় নীহারও। মনে হয়, সত্যই বিচলিত হয়েছে হেমা। এতদিনের নির্বিকার শান্ত ও সুন্দর হাসিভরা ভঙ্গীকে হঠাৎ বিরক্ত ক'রে দিয়েছে কোন বেদনা কিংবা কোন অভিযোগ।

নীহার বলে—আমারই ভুল হয়েছে, এখানে একবার আসবার জন্য ছোট দাদুকে একটা চিঠি দেব বলে মনে ক'রেও ভুলে গিয়েছি। যাই হোক, নিজের থেকেই যখন এসে গিয়েছেন······।

হেমা—তাতে কি হয়েছে?

নীহার—তুমি ওঁকে বুঝিয়ে বলো, যেন কিছু মনে না করেন।

হেমা—আমিই বলবো, তুমি কিছু বলতে যেও না।

চলে যাচ্ছিল নীহার। হেমা ডাকে—আর একটা কথা।

নীহার—বল।

হেমা—তুমি ছোট-দাদুর সঙ্গে কোন কথাই বলতে যেও না।

নীহার—তার মানে?

হেমা—তুমি ছোট-দাদুর কাছেই যেও না।

নীহার—সে কি!

নীহারের বিস্ময় সহ্য করতে না পেরে দপ ক'রে জ্বলে ওঠে হেমার চোখ। এক অর্থহীন জীবনের এক অর্থহীন বিস্ময় হেমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছে এখনও। জানে না, কল্পনা করতে পারে না, ধারণা করবারও শক্তি নেই এই মানুষটির, যে ভয়ংকর মানুষী জিজ্ঞাসার আঘাত থেকে বাঁচবার পথ বলে দিচ্ছে হেমা, দেবতার মত এই মানুষটিকে।

কিন্তু হেমার দপ ক'রে জ্বলে ওঠা চোখই হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। অদ্ভুত এক বেদনায় মন্থর হয়ে ভাসতে থাকে চোখের দুটি তারা। কিন্তু কিসের জন্য, আর কার জন্য এই বেদনা? মনে হয় হেমার, নীহারের সামনে আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলে জলে ভেসে যাবে তার চোখ। —যাই প্রণাম করে আসি ছোট-দাদুকে। বলতে বলতেই চলে যায় হেমা।

আর নীহার তার এই নতুন বিস্ময়েরই আস্বাদে যেন মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই হেমা যে একেবারে অন্য রকমের হেমা। যেন ঘরোয়া প্রাণেরই

মত ঘরের এক দুঃখের উপর রাগ ক'রে বিচলিত হয়ে, উদাস হয়ে আর মুখ ভার ক'রে ছুটে চলে গেল হেমা। হেমা তার ঘরেরই আপনজনের জীবনকে কি যেন এক আঘাতের ছোঁয়া থেকে বাঁচাতে চায়, তাই তার এত উদ্বেগ। চলে গিয়েছে হেমা, কিন্তু যাবার আগে যেন তার জীবনের ঐ বড় বেশি শান্ত ও কঠিন ভঙ্গী হঠাৎ মুহূর্তের মত ছিন্ন ক'রে নীহারের চোখের উপরেই দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছে, আত্মা আছে হেমার, আর সেই আত্মা নীহারের জীবনের যে কোন দুঃখে দুঃখী হতে পারে, দেবতার মেয়ে দেবিকার মত শুধু করুণা করে না।

চঞ্চল হয়ে ওঠে নীহারে নিঃশ্বাস, উষ্ণ ও উন্মুখ এক স্পৃহার প্রাণ সব পিপাসা নিয়ে যেন জেগে উঠেছে সেই নিঃশ্বাসে। ভুল হয়েছে। অমন ক'রে হেমাকে চলে যেতে না দিলেই ভাল ছিল। বুকে জড়িয়ে ধরা উচিত ছিল হেমাকে। এই হেমাকে কত সহজে বুকে জড়িয়ে ধরা যায়? জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল হেমাকে, তুমি উদ্বিগ্ন হলে কেন? কেন এসেছেন ছোট-দাদু?

কেন এসেছেন ছোট দাদু? প্রশ্নটা মনে আসতেই হঠাৎ এক সংশয়ে চমকে ওঠে নীহারের মন। যেন এক ভয়ংকর হেঁয়ালির বুকের ভিতরটা এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে নীহার।

বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভবধামেব একটি কক্ষে ছোট-দাদুর চোখের সম্মুখে বসে থাকে হেমা। তিব্বতী কুকুর কোলে নিয়ে প্রকাণ্ড-শরীর ছোট-দাদু তাঁর দুই চোখে প্রখব এক জিজ্ঞাসা আর প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে থাকেন। কিন্তু হেমা যেন সারাক্ষণ সতর্ক হয়ে বসে আছে। কালিম্পং-এর দাদুকে চোখের সামনেই আটক ক'রে রাখতে চাইছে হেমা, যেন ঐ জিজ্ঞাসা ভবধামের এক অসহায় দেবত্বকে আক্রমণ করে আর অপমান করবার কোন সুযোগ না পায়।

চা খেয়ে বেড়াতে বের হয়ে গেলেন ছোট দাদু; হাঁপ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় হেমা। যেন ছোটদাদুকে সরিয়ে দেবার জন্যই হেমার হাসিভরা চোখের ভঙ্গী এতক্ষণ ধরে একটা অভিসন্ধির মত এখানে বসেছিল।

এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে হেমা। কিন্তু জীবনে এই প্রথম যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে হেমা। জীবনে কোনদিন এভাবে এমন দুরূহ দুঃসহ ও অদ্ভুত একটা চেষ্টা করতে হবে, ভবধাম নামে এক বাড়ির একটা মানুষকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্য, কোনদিন কল্পনাও করেনি হেমা।

কিন্তু তারপর?

তারপর, ছবিঘরের মত রঙীন ক'রে সাজানো এক ঘরের নিভৃতে চুপ ক'রে এক দেবত্বের শীতল নিঃশ্বাসের কাছে বসে থাকতে হবে। এই তো হেমার জীবনের পরিণাম।

হঠাৎ ঘরে ঢুকলো নীহার। হেমা একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে। মনে হয়, যেন একটা ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে চলে এসেছে নীহার। কিন্তু নীহারের হাতে টাটকা ফুলের গুচ্ছ। নীহারের মুখটাও যেন রঙীন হয়ে উঠেছে। দুই চোখ দীপ্ত ও চঞ্চল। কে জানে, আজ কি দেখতে পেয়ে আর কিসের আশ্বাসে প্রসন্ন হয়ে উঠেছে নীহারের বুকের বাতাস।

নারকেলের পাতার ঝালর ঝির ঝির করে, সেই সঙ্গে ঝির ঝির করে ঘরের ভিতরে ঝরে পড়ে সন্ধ্যার চাঁদের আলোকণা। নীহার ডাকে—হেমা।

ধীর স্থির ও শান্ত, সেই সুন্দর হয়ে ফুটে থাকা এক জীবনের ভঙ্গী। হেমা চুপ ক'রে বসে এই আহ্বানের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে।

পূজারীর নিষ্ঠার মত এক আগ্রহ ডাকছে সুন্দর সুশিক্ষা ও নিয়মের স্নেহে লালিত এক ভঙ্গীকে। এই নিভৃত যেন এক মন্দিরের নিভৃত। ধুলো নেই, আবর্জনা নেই। শব্দ এখানে নিরুদ্দাম, ভাষা এখানে মন্ত্রের মত, নিঃশ্বাস এখানে ধূপসুরভির মত।

রিক্ত উদাস ও শূন্য এক নীরবতার মধ্যেই একে একে ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে মুহূর্তগুলি। সুন্দর ও পরিপাটি এক পবিত্রতার অভিশাপে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে দুই পাথরের ফুল, নীহার ও হেমা।

নারকেলের পাতার ঝালর ঝির ঝির করে। নীহার ধীরে ধীরে হেমার আরও কাছে এগিয়ে আসে।—এখনি চলে যেও না হেমা!

চলে যায় না হেমা। আর, নীহার যেন তার প্রাণের শেষ সামর্থ্য উৎসর্গ ক'রে তার অন্তরের গভীর হতে এক সমাহিত নিঃশ্বাসকে উদ্ধার করার জন্য অপলক চোখে হেমার শান্ত পরিপাটি ও মৃদু হাসি নিয়ে ফুটে থাকা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু বৃথা।

ছলছল করে নীহারের কণ্ঠস্বর।—আর কিছুক্ষণ থাক হেমা।

থাকে হেমা, নারকেলের পাতার ঝালরের ফাঁকে ফাঁকে ঝির ঝির ক'রে ঝরে পড়া জ্যোৎস্নার ছোঁয়া বরণ করে নিয়ে বসে থাকে হেমা। মনের গভীরে শেষ আশার যে বিহ্বলতাটুকু এখনও ধুকপুক করছে, সেই আশা ও বিহ্বলতাকে এখনি বিদায় ক'রে দিতে চায় না হেমা।

কিন্তু বৃথা। আরও কিছুক্ষণের পর অনেকক্ষণ পার হয়ে যায়; দেখতে পায় হেমা, শুধু বিষণ্ণ ও বেদনাপন্ন এক অদ্ভুত দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছে নীহার। কি ভয়ানক হতাশ ও অসহায় দৃষ্টি। যেন হেমার জীবনে এত যত্নে গড়া সুন্দর ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আছে এক অভিশাপ।

আগুনের জ্বালার চেয়েও জ্বালাময় এক ঘৃণার জ্বালা জ্বলে ওঠে হেমার বুকের পাঁজরগুলিতে। ছিন্নভিন্ন হয়, চূর্ণ হয়, পুড়ে যায় হেমার সুন্দর হয়ে সেজে থাকা জীবনের ভঙ্গী আর দুই ভুরু ও দুই অধরের পোজ, যে ভঙ্গী ও যে পোজের শোভাকে দেবতার মেয়ে দেবিকার মুখের শোভা ব'লে বুঝেছিল চার বছর ধরে তাকিয়ে থাকা এক মানুষের দুটি চক্ষু।

--ছিঃ। শুধু একটি কথায় জ্বালা রেখে দিয়ে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায় হেমা।

কিন্তু হেমার সেই উতলা ছন্দছাড়া আর এলোমেলো মূর্তিটাই হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, দরজার কপাটে শাড়ির আঁচল আটকে গিয়েছে। হয়তো আর পিছনে না তাকিয়ে কপাটের বাধা থেকে এক টানে আঁচল ছাড়িয়ে আর ছেঁড়া আঁচল নিয়েই চলে যেত হেমা, কিন্তু যেতে পারলো না, কারণ অতি করুণ এক আর্তনাদের মত একটা শব্দ শুনে চমকে উঠেছে হেমা।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে; পিছন ফিরে তাকায়, তার পরেই উতলা বিস্ময়ের মত ফিরে এসে ঘরের ভিতর ঢোকে।

নারকেলের পাতার ঝালরের ফাঁক দিয়ে ঝির ঝির করে ঝরে পড়া জ্যোৎস্না নীহারের বড় বড় সুন্দর চোখের জলের উপর চিকচিক করছে।

—একি? চমকে ওঠে হেমার গলার স্বর। দেখতে পায় হেমা, ভেজা চোখ নিয়ে একেবারে শান্ত ও সুস্থির হয়ে বসে আছে নীহার। মনে হয়, যেন এক শিশুর চোখ, সংসারের সব সান্ত্বনা যেন ওকে ঠকিয়ে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

হেমার শাড়ির আঁচলটা গা থেকে খসে মেজের উপর লুটিয়ে পড়েছে। খোঁপার ছাঁদ ভেঙ্গে গিয়ে চুলের স্তবক এলিয়ে পড়েছে। নেকলেসের লকেটটাও যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আটকে গিয়েছে ব্লাউজের কাঁধের সঙ্গে। যেন এক বন্য বাতাসের ঝড়ে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে হেমার ছন্দে-বাঁধা জীবনের সাজ।

হ্যাঁ, অসহায় ও একলা এক শিশুর মতই যে মনে হয় ঐ মানুষটিকে। নীহারের মুখের দিকে তাকিয়ে হেমার দু'চোখেও যেন এক বন্য স্নেহ উতলা হয়ে উঠতে চায়। শিশুর কান্নার মত সেই অসহায় কান্নার তৃষ্ণাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কিএক লোভ যেন ঝড় হয়ে জেগে উঠেছে হেমার বুকের গভীরে।

ছুটে এসে নীহারের কাছে দাঁড়ায় হেমা। বদলে গিয়েছে হেমার মূর্তিটাই। যেন বাইরের জগতের যত সভ্য ও ভব্য আর সুরুচিকঠিন ভঙ্গীর শাসন চূর্ণ করা, সব সাজানো লজ্জার নিয়ম ছিন্ন করা, মাত্রাছাড়া একটা মত্ততা ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে নীহারের কাছে। হেমার হাত দু'টো যেন হেমার আলুথালু মূর্তিটার সব সাজের আর লাজের শাসন ছিঁড়ে ফেলবার জন্য ছটফটিয়ে ওঠে। বিহ্বল বুকের সব উত্তাপ আর কোমলতা মুক্ত করে দিয়ে বিপুল এক সান্ত্বনার উৎসব নীহারের চোখ আর মুখের উপর লুটিয়ে দিতে থাকে হেমা।

ঝির ঝির ক'রে জ্যোৎস্না ঝরে নারকেলের পাতার ঝালরের ফাঁকে ফাঁকে। আর একবার চমকে উঠলো হেমার উতলা মনের বিস্ময়। এ কি? দুরন্ত আগ্রহের দুই বাহু আর উত্তাপে বিহ্বল একটি নিঃশ্বাসের টানে হঠাৎ বিব্রত হয়েও পরক্ষণেই বুঝতে পারে, আর বুঝতে পেরে ধন্য হয়ে যায় হেমার মন, স্বামীর বুকেই বন্দী হয়ে গিয়েছে হেমার জীবন। এই নিভৃতের সব ভুলের অভিশাপই চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

ঘরের দরজা খোলা। দরজার পর্দা বাতাসে ফুর ফুর ক'রে উড়ছে। নারকেলের পাতার ঝালর থেকে চাঁদের আলো সরে গিয়েছে। রাত হয়েছে।

হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে যায় হেমার। ঘরের খোলা দরজার দিকে চোখ পড়তেই লজ্জা পেয়ে শিউরে ওঠে। ব্যস্তভাবে কোনমতে তাড়াতাড়ি চেহারাটাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই চমকে উঠলো হেমা যা ভয় করেছিল হেমা, তাই হয়েছে।

তিব্বতী কুকুর কোলে নিয়ে বারান্দার উপর এক চেয়ারে বসে আছেন ছোট দাদু।

--হেমি, কাছে আয় দেখি। ডাক দিলেন ছোট-দাদু।

ছোট-দাদুর কাছে এসে দাঁড়ায় হেমা। বড় বড় চোখ আরও বড় ক'রে আর হাসতে হাসতে ছোট-দাদু মুখ তুলে হেমার মুখের দিকে তাকাতেই হেমা ছোট-দাদুর মুখ চেপে ধরে।—পায়ে পড়ি তোমার, চিৎকার করে কোন কথা বলো না ছোট-দাদু।

চন্দ্রমল্লিকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

আকাশটা সুন্দর ছিল। ভারি সুন্দর আকাশ। মেঘ ছিল। বকের পাখার মতন শাদা ধবধবে দু খণ্ড মেঘ পশ্চিম দিকে চুপ করে শুয়ে ছিল। আর সারা আকাশ জুড়ে গভীর নীল প্রশান্তি। আর কিছু ছিল না। একটা পাখিও না। দূরগামী উদাসী কোনো চিলের ক্ষীণতম চিহ্নও কোথাও ছিল না। ছিল শুধু ঝকঝকে রৌদ্র। অফুরন্ত নীল আর বকের পাখার মতন দু টুকরো শাদা মেঘের এক আশ্চর্য সকালে তার কথা আমার মনে পড়ল। সবুজ ঘাসের বুকে বিরল শিশিরবিন্দু কখনো রূপালী কখনো সোনালী কখনো বেগুনী নীল দ্যুতি নিয়ে থেকে থেকে, জ্বলছিল। আর সেই ঘাসের শিশির ঘিরে হলদে প্রজাপতিরা দল বেঁধে নাচছিল।

এমন দিনে তাকে আমার মনে পড়ল।

না, মনে ছিল; বরং আকাশ যখন মেঘে মেঘে বিবর্ণ হয়ে ওঠে, রৌদ্রহীন দিনের প্রহর মন্থর হয়ে ওঠে, কি গভীর রাত্রে প্রবল বর্ষণের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় তখন তাকে আরো বেশি মনে পড়েছে। কিন্তু সেই মনে পড়ার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস কান্না ও বিষণ্ণতার এত বেশি যোগাযোগ থাকত যে তাকে দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা আমি জোর করে চেপে রাখতাম, মনকে শাসন করতাম। নিষ্ঠুর হয়ে একটি কান্নাভরা মুখকে ভুলে থেকেছি। কষ্ট হত সন্দেহ কি! কিন্তু আশা ছিল, নিশ্চয় একটি উজ্জ্বল দিন আসবে, একটি প্রসন্ন সকাল আসবে— সেদিন শাদা মেঘ পরিচ্ছন্ন রৌদ্র হলুদ প্রজাপতি ও ঝলমলে শিশির ছাড়া আর কিছু চোখের সামনে থাকবে না। অন্তত মন খারাপ হওয়ার জন্য আমি এই আকাশ, মেঘ, পৃথিবীর একটি তৃণ, কি একটি পতঙ্গকেও দায়ী করব না। তারপর যদি মন খারাপ হয়? বুকের ভিতর একটা ভয়ের মেঘ গুরগুর করছিল সন্দেহ কি। কিন্তু তা হলেও এমন দিনে, নীল চোয়ানো, রৌদ্ররাঙা, প্রজাপতি চঞ্চল সুন্দর দিনে তাকে কিছুটা উজ্জ্বল প্রফুল্ল স্বাভাবিক দেখতে পাব আশা ছিল।

নিজের দিক থেকে শোকের বিন্দুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ না পায় সেজন্য ভাল করে সাজগোজ করতে হল; গরদের পাঞ্জাবি শান্তিপুরী ধুতি চকচকে জুতো সোনার বোতাম—সবই পরলাম, সবই ধারণ করলাম, ঘড়ি আংটিটা পর্যন্ত।

আমি বেড়াতে এসেছি, তোমাকে দেখতে এলাম।

বন্ধুর জন্য শোক করতে, বন্ধুপত্নীকে সমবেদনা জানাতে বর্ষা পার করে শরতের এই নীল সোনাঝরা দিনে আমি আসব কেন! আমি চাইছি না তোমার বিষণ্ণতা, দীর্ঘশ্বাস, শোকম্লান গাঢ় ধূসর দৃষ্টি; যেন দেখা হওয়া মাত্র স্বচ্ছ হাসির আলোয় ওর চোখমুখ উদ্ভাসিত করে তুলতে পারব আমি। বিনু হাসবে।

'এতকাল আসনি কেন', বলবে না ও, বলবে, 'এসো, আশা করেছিলাম, তুমি আসবে।'

আমি চাইছিলাম না আমাদের মাঝখানে অপরেশ থাকবে।

যখন বাস চলতে সুরু করল তখন বুক দুরদুর করতে আরম্ভ করল। কি জানি, যদি বিনতা অভিযোগ করে।

যদি ও বিশ্বাস না করে; আমি বন্ধবীকে দেখতে আসিনি—এসেছি অপরেশের স্ত্রীকে দেখতে, বন্ধুপত্নীকে দেখতে? আমি কি তখন মুখ ফুটে বলতে পারব, তোমার অভিযোগ ঠিক হল না বিনু; যদি তাই হত তো এই দেখতে আমার উপযুক্ত দিনক্ষণ অনেক দিন পার হয়ে গেছে, তখন আকাশে অনেক মেঘ ছিল, ঝড়ো হাওয়া বইছিল, তোমাদের এই তল্লাটে আসার রাস্তাটা খারাপ ছিল, জলকাদার জন্য চুয়াত্তর নম্বর বাসটাও আর এগোতে পারেনি—বাকি পথটুকু হেঁটে আসতে হয়েছিল, জলকাদা লেগে জামাকাপড়ের যা অবস্থা হয়েছিল, দেখে তুমি আমায় চিনতে পারতে না, তোমাদের দোরগোড়ায় এসেও পরে ফিরে গেছি। কেননা শোক করতে ঝড়জলের মধ্যে পাগলের মতন অপরেশের বন্ধু ছুটে এসেছিল, সেদিন সেই দৃশ্য তুমি সহ্য করতে পারতে না। তুমি আমাকে সহ্য করতে পারবে না চিন্তা করে এত প্রতীক্ষা, এত দ্বিধাদ্বন্দ; অনেক মেঘ মাথার ওপর দিয়ে পার হয়ে গেছে; তারপর আজ—

বলতে ভুলে গেছি, সেজেগুজে বিনতাকে যেমন দেখতে চলেছি তেমনি ওর জন্য, চুলে পরুক কি টেবিলে রাখুক, দুটো লাল গোলাপ সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

এমন সুন্দর দিনে কেউ খালি হাতে বান্ধবীকে দেখতে যায়! গোলাপ সুখের প্রতীক, আনন্দের চিহ্ন। যদি ও বুঝতে পারে, আমি ওর সুখ কামনা করছি। শোকের অবসান দেখতে চাইছি। একটি চব্বিশ বছরের জীবন।

মাঠের কাছে বাস্-টা দাঁড়াল।

সেদিন এতটা আসতে পারেনি। জল ছিল। আজ শুকনো মাঠ। সবুজ ঘাস। শিশির শুকিয়ে গেছে যদিও। রোদটা চড়ে গেল না এইটুকু পথ আসতে আসতে। তা হলেও ঘাসের ডগায় আগুন রঙের ফড়িং চুপ করে বসে আছে। ছিল। আমার পায়ের শব্দে উড়ে গেল।

উঁচু বাদাম গাছ। দুটো গাছ পাশাপাশি। নীচে গোলমতন একটা দীঘি। কতকালের এই দীঘি, কতকালের ওই দুটো পাশাপাশি গাছ কে জানে! অপরেশও জানত না।

তবে ওই গাছ ও গাছের নীচে গোল আয়নার মতন জলাশয় দেখে সে জায়গাটা তার পছন্দ হয়েছিল এবং দীঘির পাড়ের পাঁচকাঠা জমি কিনে বাড়ি করেছিল এটা আমি জানতাম। আমিও যে ছিলাম যখন জমি কেনা হয়। ইটের দেওয়াল, টালির ছাদ। তা হলেও বাড়ি। সুন্দর বাড়ি। ওই বাড়ির ভিত পত্তন থেকে আরম্ভ করে বিনতাকে নিয়ে বন্ধুর গৃহ-প্রবেশের দিন পর্যন্ত আমি সঙ্গে ছিলাম।

ছিলাম না একদিন।

এসেছিলাম। রাস্তায় জলকাদা ছিল। জামাকাপড় নোংরা করে পাগলের বেশ নিয়ে ওবাড়ি ঢুকতে পারিনি। ফিরে গেছি। বিনতার কান্না দেখতে আমার ভয় করছিল।

কেননা, আমি যে কোনোদিনই ওর কান্না দেখিনি। আমাদের তিনজনের কলেজের চার বছরের জীবনে বিনতা কত কোটি বার হেসেছে তার হিসাব দিতে গেলে আজ বসে ভাবতে হয়। কমনরুমে, লাইব্রেরীতে, সিঁড়িতে, করিডোরে যতক্ষণ বিনতা আমার সঙ্গে থেকেছে মুক্তার মত শাদা ছোট সুন্দর দাঁত ছড়িয়ে হেসেছে, যতক্ষণ অপরেশের সঙ্গে রয়েছে অনর্গল ও হেসে গেছে; বা যতক্ষণ আমাদের দুজনের সঙ্গে থাকত ঠোঁট টিপে টিপে ও হাসত কেবল। কনকচাঁপার পাপড়ির মতন পাতলা ঠোঁট, ওপরদিকে ঈষৎ বাঁক খাওয়া; কাজেই যখন ও হাসত না তখনো মনে হয়েছে, ঠোঁট বেঁকিয়ে থুতনি কাঁপিয়ে মুক্তার মতন ঝকঝকে একপাটি দাঁত ছড়িয়ে ও হেসে ফেলল বুঝি। কারণে অকারণে।

বাদাম গাছের মাথার ওপর দিয়ে দমকা হাওয়া বয়ে গেল। লাল মতন দুটো শুকনো পাতা ঘুরতে ঘুরতে নীচে ঘাসের ওপর নেমে এল।

মাঠের রাস্তাটা লাল টালির বাড়ির সদর ছুঁয়ে বেঁকে পুবদিকে চলে গেছে। আমি সদরের সামনে দাঁড়ালাম। কড়া নাড়তে হল না। যেন জানলা দিয়ে আমায় দেখতে পেয়ে ও দরজা খুলে দিল। বিনতার মুখ দেখে আমার বুক হাল্কা হয়ে গেল। হাসছে।

'এসো।'

বারান্দায় উঠলাম। আমার পাশে এসে দাঁড়ালো ও। দুজন মাঠের দিকে তাকালাম। আরো দুটো শুকনো লালচে বাদাম পাতা হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে ঘুরতে ঘুরতে ঘাসের বুকে নেমে এল। আগুন রঙের ফড়িংগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দুটো কালো রঙের ফড়িং কোথা থেকে এসে জুটল। সবাই একসঙ্গে পাক খেয়ে ওড়াওড়ি করছে!

ততক্ষণে আমার দেওয়া লাল গোলাপের একটা ও চুলে গুঁজে নিয়েছে। আর একটা নাকের কাছে তুলে ধরে শুঁকছে। আমি তন্ময় হয়ে ওর বিশাল খোঁপাটা দেখছিলাম। গোলাপের জন্য খোঁপা সুন্দর লাগছিল বললে বিনতার চুলের ওপর অবিচার করা হত। ওর চুল আশ্চর্য কালো, আর অবিশ্বাস্যরকম দীর্ঘ, আর চুলের পরিমাণের দিক থেকেও অন্য কোনো মেয়ের মাথার সঙ্গে বুঝি তুলনাই চলত না। সেই কলেজের দিনে আমার ও অপরেশের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা হত।

'ভিতরে এসো।'

দুজন ঘরে ঢুকলাম। আরাম কেদারায় বসলাম। ও দাঁড়িয়ে রইল। যেন ইতস্তত করছিল কি করবে।

'দাঁড়াও এক সেকেণ্ড।' পাশের ঘরে ছুটে চলে গেল ও। পর্দাটা কাঁপছিল। পর্দা সরিয়ে কেউ ওপারে চলে গেলে তার গতির ব্যস্ততা পর্দার রঙিন ফুল লতাপাতার ওপর ছড়িয়ে পড়ে। ফুল-লতাপাতা আঁকা পর্দাটা তাই এমন দুলছিল কাঁপছিল। সেদিকে চোখ রেখে কেমন চমকে উঠলাম। তারপর ভুল ভাঙল। একবার মনে হয়েছিল ওই পর্দার কাপড় কিনতে অপরেশের সঙ্গে আমাকে এক দুপুরে কলেজ স্ট্রীটের দোকানে দোকানে হাঁটাহাটি করিতে হয়েছিল। না, ওটা ছিল জাফরান রঙের ওপর শাদা ফুল, শাদা লতা। এটা সবুজ। সবুজের ওপর গোলাপ ফুল, গোলাপ পাতা। সূক্ষ্ম কাঁটাগুলোও আমার

চোখে পড়ল। এই পর্দা খুব হালে কেনা হয়েছে। মনে হয় অপরেশ মারা যাবার পর যেন কেনা হয়েছে।

'চুপ করে বসে আছ?'

'না, কাগজটা দেখছিলাম।' ভাগ্যিস টেবিলে একটা কাগজ ছিল, আর তার ওপর হাত রেখে আমি চুপ করে ওদিকে তাকিয়ে ছিলাম। মৃদু হাসলাম।

'কি করছিলে?'

'একটু জল চাপিয়ে এলাম।' সামনের চেয়ারটায় বসল ও। অবশ্য ও বসবার আগেই, পর্দা সরিয়ে এ-ঘরে ঢোকামাত্র ওর চোখ দেখে টের পেলাম প্রসাধনের যেটুকু বাকি ছিল এখন তা সেরে এল। তখন মাথায় সন্তরচিত ভ্রমরকৃষ্ণ খোঁপা দেখেছিলাম শুধু, এখন দেখলাম কাজলপরা চোখ। কী নিপুণ হাতে না বিনতা চোখে কাজল বুলোয়! আগেও দেখতাম। অপরেশ ও আমার মধ্যে এই নিয়ে কত কথা হয়েছে। সেদিন আমরা তিনজন একই কলেজে পড়তাম। তাই এত আলোচনা ছিল ওকে নিয়ে।

'তোমার শাশুড়ী কোথায়?'

'কাশীবাসিনী হয়েছেন মা।'

'কবে গেলেন তিনি কাশী?' একটা ঢোঁক গিললাম, একটু অবাকও হলাম।

'এই তো সেদিন।' অল্প হাসল ও। 'সবে গেছেন। ওখানে থাকবেন কিনা, বেনারসের জলবায়ু তাঁর আদৌ সহ্য হবে কিনা এখনো বোঝা যাচ্ছে না।'

'পুত্রশোক বুড়িকে ঠেলে কাশী পাঠিয়ে দিয়েছে।' গলার নীচে কথাটা খেলা করে গেল, মুখ বুজে চুপ করে রইলাম। আমি তাই চাইছিলাম। আমি চাইছিলাম না অপরেশের কথা এখন উঠুক। এখানে উঠুক।

হাত দিয়ে ও খোঁপার গোলাপটা একবার ছুঁয়ে দেখল। আমার দুই চোখ প্রসন্ন হয়ে উঠল।

'তুমি কি আশা করেছিলে আজ আমি আসব।'

'হুঁ।' ঘাড় কাত করল ও। ঘাড়ের ফর্সা রগটা ধারালো হয়ে উঠল। তীব্র হয়ে উঠল এক সেকেণ্ডের জন্য। ওই সুন্দর গ্রীবাভঙ্গি অপরেশকে মুগ্ধ করত। একদিন আমার কানে কানে বলেছিল সে, 'ওই সুন্দর ঘাড় গলা ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।' বিয়ের আগের কথা। তারপর তো স্বামী-স্ত্রীর জীবন আরম্ভ হল দুজনের।

'কদিন থেকে আশা করছি।' বিনতা উঠে দাঁড়াল। ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল। আমি ওর চোখের রং দেখছিলাম খুঁটিয়ে। আশঙ্কা করছিলাম, কি

জানি কদিনের বদলে একটা বিশেষ দিনের কথা বলে বসে কিনা। সেরকম কিছু ঘটল না। হাল্কা নিশ্বাস ফেললাম। গুন্‌গুনিয়ে গান গাইছে ও। সরে গিয়ে আলমারী থেকে পেয়ালা পিরিচ টেনে টেনে বার করছে। তারপর সব নিয়ে টেবিলের কাছে চলে এল।

'ও, চায়ের আয়োজন করছ।' ক্ষীণ হাসলাম।

'জলটা ফুটেছে বোধ করি।' হাতের বাসনগুলো টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে ও পাশের ঘরে চলে গেল। এখন আর গোলাপ ও গোলাপ-কাঁটা আঁকা পর্দাটা তেমন করে কাঁপল না। এখন ওর গতি শ্লথ। অপরেশ আমার কানে কানে বলত, 'ও যখন ধীরে ধীরে চলে, আস্তে হাঁটে ভারি অসহায় মনে হয়, কেন এমন মনে হয়?' সেদিন বন্ধুর কথার উত্তর দিই নি। দেবার দরকার ছিল না। বিনতার গতি তীব্র ছিল। চিরকাল ছুটে চলার অভ্যাস। কচিৎ কখনো ক্লাস থেকে বেরোবার সময়, কি লাইব্রেরীর সিঁড়ি ভেঙ্গে যখন নীচে নামত খুব আস্তে হাটত ও। যেন হঠাৎ নিভে গেছে, ফুরিয়ে গেছে, মনে হত। অপরেশের সঙ্গে আমিও তা ভাবতাম। কাজেই অপরেশের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমি তার মনের অসহায় অবস্থাটাই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি সেদিন।

উজ্জ্বল রৌদ্রের দিনের মেয়ে, হাল্কা হাওয়া ছড়ানো দিনের মেয়ে; যেদিন প্রজাপতি চঞ্চল হয়, লতাপাতা কাঁপে, বোঁটার ফুল ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আকাশের আলো পান করে সেই অস্থির সুন্দর দিনেই বিনতাকে মানায়। এখন হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে অপরেশের কথাটা মনে পড়ল। কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেলাম। টেবিল থেকে খবরের কাগজটা তুলে সত্যি সেটা চোখের সামনে এবার ছড়িয়ে ধরলাম। তবে কি সেই ভয়ংকর দিনের কথাটা ভুলতে চেয়েছিল ও, চেপে গেল! না, সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তা কাটল, গুন্‌গুনিয়ে গান গাইছিল বিনতা, এখনো গাইছে—পাশের ঘর থেকে গানের সুর ভেসে আসছে। কান পেতে রইলাম।

চা খেতে খেতে আমরা সুন্দর একটা প্রসঙ্গে চলে এলাম। অবশ্য প্রসঙ্গটা উঠল এভাবে:

'রমেশকে তো দেখছি না, কোথায়?' প্রশ্ন করলাম। অপরেশের ছোট ভাই। 'কলেজে গেছে বুঝি?'

বিনতা মাথা নাড়ল।

'কলেজে আর পড়ছে না।'

'কেন?' প্রশ্নটা করে হঠাৎ থেমে গেলাম। উত্তরটা যে সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে এসে গেছে এবং তাতেই চুপ করে গেছি বুদ্ধিমতী বুঝতে পারল।

'ঠাকুরপো এখন চাকরি করছে।' আস্তে বলল ও।

অপরেশের অবর্তমানে আর এক জনের চাকরি না করলে যে এ-সংসার চলত না, বিনতা না বললেও আমার জানা ছিল। চুপ করে রইলাম।

'দাদার অফিসে ওকে নিয়ে নিয়েছে।' আবার বলল ও। দাঁতে দাঁতে চেপে এক দিকের দেওয়ালের গায়ে চোখ রাখলাম। অপরেশ প্রায় এসে গেছে আলোচনার মধ্যে। কথাটা ও না বললেও পারত। রোড-অ্যাক্সিডেন্টে একটা লোক মারা গেছে, তার অফিস মৃতের পুষ্যিবর্গের কথা চিন্তা করে তার ছোট ভাইকে চাকরি দেবে খুবই স্বাভাবিক।

'অবশ্য ওর মতন মাইনে তো আর ঠাকুরপোকে দেবে না, অনেক কম, কিন্তু তা হলেও—' বিনতা চুপ করল। আমার অন্যমনস্কতার দরুণ ও থেমে গেল। স্বস্তিবোধ করলাম। বলতে কি, আমি তখন গভীরভাবে চিন্তা করছিলাম বিনতাকে কি করে প্রসঙ্গটা থেকে অন্যত্র টেনে আনা যায়—সরিয়ে আনা যায়। দেখলাম, ও নিজে সরে আসতে পারল। চায়ের কাপগুলো সরিয়ে দিয়ে বিনতা নতুন করে হাসল।

'শাশুড়ী নেই—ঠাকুরপো সারাদিনের জন্য বেরিয়ে যায়—বাড়িতে একলা আমি কী করি বলো তো?'

আমার মুখেও নতুন হাসি ফুটল।

'পড়াশোনা?'

'ধ্যেৎ—বই দেখলে আমার গায়ে জ্বর আসে।'

'সেলাই!'

মাথা নাড়ল ও—

'বোকার মত কথা বলো না। কবে আমি ছুঁচ-সুতোর কারবার করেছি যে আজ হঠাৎ—' বিনতা খিলখিল করে হাসল।

ঘরের চারিদিকে তাকালাম। আশা করছিলাম সেতার এস্রাজ জাতীয় কিছু একটা দেখতে পাব, না কি ছবি আঁকছে, টেবিলটা দেখলাম; না কি কবিতা লেখার চর্চা হচ্ছে, তাই আবারও ওপাশের ছোট টেবিলটা খুঁটিয়ে দেখলাম। খাতা কলম বা রং-তুলির কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না।

হতাশ হয়ে অগত্যা ওর চোখে চোখ রাখলাম। এখন আর হাসছে না ও। কালো চোখ মেলে ও মনোযোগ দিয়ে আমাকে দেখছে।

'এসো—বাইরে এসো।' ও উঠে দাঁড়াল। আরামকেদারা ছেড়ে আমিও উঠলাম। ও আগে। আমি পিছনে। ডাইনে বারান্দা। দুজন বারান্দায় চলে এলাম। এ-বাড়ির ভিতরের উঠোন আমি আগেও দেখেছি। এখন নতুন করে দেখলাম। দেখে ওর চোখের দিকে তাকালাম।

'অবাক হচ্ছ!' আমার হাত ধরল বিনতা।

'নিশ্চয়।' গাঢ় নিশ্বাস ফেললাম। 'লাউ কুমড়ো বেগুন লঙ্কা কিছুই আর নেই এখন।' কেমন যেন রুদ্ধস্বরে বললাম। 'কেবল ফুল—এত ফুল!'

'এত ফুল।' আস্তে বলল ও। আমার হাত ছেড়ে দিল। 'সারাদিন ওই নিয়ে আছি।' সিঁড়ি ভেঙ্গে ও বাগানে নামল। আমিও। এখানে এসে এই প্রথম সোনালী ডোরাকাটা বেগুনি রঙের প্রজাপতি দেখলাম। বিনতার সূর্যমুখীর ঝাড়ের কাছে ওরা মহা উৎসাহে ঘোরাফেরা করছে। অগ্নিবর্ণ ফুলের পাশে সোনালী ডোরাকাটা বেগুনি পতঙ্গ! দৃশ্যটা চিরকাল মনে রাখার মতন।

'ওগুলো কি, লিলি না?' আর একদিকে ঘুরে দাঁড়ালাম।

বিনতা ঘাড় কাত করল।

'কী অসম্ভব পরিচ্ছন্ন—কী ভয়ংকর শাদা!' গুচ্ছ গুচ্ছ প্রস্ফুটিত লিলির দিকে মগ্ন চোখে তাকিয়ে রইলাম।

'অসম্ভব পরিশ্রম করতে হয়েছে এই বাগানের জন্য।' বিনতা বলছিল।

'তাই তো দেখছি।' ওর মুখের দিকে তাকালাম। 'ফুল তোমার এত প্রিয় আমার জানা ছিল না।'

কথা না বলে ও হাসল। আমার কথাটা ভাল লেগেছে, তাই নীরব থেকে ঠোঁটের একটা কোণা তুলে ও হাসল। টের পেয়ে আস্তে বিনতার হাত ধরলাম। হাঁটতে হাঁটতে দুজনে চন্দ্রমল্লিকার সারির কাছে এসে গেলাম। ঠিক তখনই ওর চুলের দিকে আমার নজর গেল। ফুলটা শুকিয়ে গেছে—রৌদ্রের তেজে খোঁপার গোলাপ মজে এইটুকুন হয়ে গেছে। এখন আর ফুল বলে চেনা যায় না। কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল। এত ফুলের সমারোহ যেখানে, এইটুকুন একটা গোলাপ বয়ে আনার আমার দরকার ছিল কি! হয়তো খোঁপায় গোঁজা ফুলটার কথা এতক্ষণে ভুলে গেছে ও। তাই। আমি

স্থির স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম দু পা এগিয়ে গিয়ে বোঁটাশুদ্ধ এতবড় একটা চন্দ্রমল্লিকা ছিঁড়ে ফেলল ও, আর সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে ফুলটা চুলের ভিতর গুঁজতে লাগল। অবশ্য ঘাড় ঘুরিয়ে ও আমায়ও দেখছিল তখন। অপাঙ্গে আমায় দেখতে দেখতে ভুরু বেঁকিয়ে নীরবে হাসছিল। কেমন লাগছে, ফুলটা মানিয়েছে কেমন—নিঃশব্দ হাসি ও ভ্রূভঙ্গির মধ্য দিয়ে এই প্রশ্নই করছিল ও বুঝতে কষ্ট হয়নি। খোঁপার শুকনো গোলাপটা টুপ করে কখন নীচে ঘাসের ওপর খসে পড়ল, ও জানল না, দেখল না। আমি দেখলাম। কিন্তু সেদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকিনি। বরং পরিপূর্ণ হেসে আমি ওর আশ্চর্য কালো চুল ও চন্দ্রচমল্লিকা দেখছিলাম। হাসির ভিতর দিয়ে খোঁপা ও ফুল—দুটোরই প্রশংসা করছিলাম। টের পেয়ে ও খুশি হল, আমার কাছে চলে এল। দুজনে পাশাশাশি হয়ে আবার হাঁটি।

হাঁটতে হাঁটতে আবার থমকে দাঁড়াই।

সবুজের বুকে ম্যাজেণ্টার ছড়াছড়ি! যেন এত রং এক সঙ্গে কোনোদিন দেখিনি, যেন চোখ জ্বালা করে উঠল। যেন রঙের ধমক সহ্য করতে না পেরে ঘাড় তুলে তাড়াতাড়ি ওর কালো ঠাণ্ডা চোখের দিকে তাকালাম।

'কি ফুল বলো তো?' মাটির দিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করল বিনতা।

'ঠিক মনে করতে পারছি না।' বললাম।

'এক সঙ্গে কতগুলো ফুটেছে!' বলল ও।

'তাই।'

'কত ছোট অথচ কী ভীষণ চড়া রং।'

'তাই।'

নুয়ে বোঁটাশুদ্ধ একটা ফুল আঙুলের মাথায় ও তুলে আনল।

'কিন্তু একটুক্ষণের আয়ু—এখনি শুকোতে আরম্ভ করবে।' লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলল ও। 'কটা বাজে তোমার ঘড়িতে?'

'বারোটা।'

'তবে আর কি—এই বেলা সব মজে যাবে, মিইয়ে যাবে।'

'কেন?'

'এর নাম ন'টা বারোটা—নাইন টুয়েল্‌ভ', আঙুলের মাথায় ফুলটা ও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। 'ন'টায় ফোটে—বারোটায় শেষ।'

'কত অল্প সময়ের আয়ু!' দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

'তাতে কি, যতক্ষণ বাঁচল সুন্দর হয়ে বাঁচল।'

আর কিছু বললাম না। উক্তিটা সত্য, তাই কিছু বলার ছিল না। কিন্তু আর একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল তখন। ঠিক এখানটায়, এই জায়গাটায় অপরেশ একবার মটর গাছ লাগিয়েছিল। অজস্র নীল ফুল ফুটেছিল। চোখ ধাঁধানো রং না, ঠাণ্ডা নীল আভায় জায়গাটা ভরে উঠেছিল। কিন্তু মটরফুলের পরমায়ু কতক্ষণ, কতদিন ছিল, মনে করতে পারছিলাম না।

'হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে গেলে?'

'না তো।' আমি ওর চোখ দেখলাম।

'মনে হয় কি খুব ভাবছ।' ছোট নিশ্বাস ফেলল ও।

'ন'টা বারোটা।' ছোট করে হাসলাম।

আর কিছু বলল না বিনতা। দুজন অপরাজিতা বেড়ার ধারে চলে এলাম। বাগানের শেষ। নাকি বাগানের সব ফুল সব রং দেখা শেষ হয়ে গেল বলে আমার এমন দুর্মতি হল। অথচ এক সেকেণ্ড আগেও ভাবতে পারি নি, এমন ভাবে আমি ওর কাছে ধরা পড়ে যাব। ধরা পড়ে গেলাম। তখন বারান্দায় উঠে এসেছি আমরা। স্থির চোখ মেলে, বাইরেটা দেখছি।

আমার হাত ধরল বিনতা।

'চুপ করে আছ?'

'তোমার সুন্দর বাগানের কথা ভাবছি।' গাঢ়স্বরে বললাম, 'আজ যদি অপরেশ এসে দেখত, উঠোনটা আর সে চিনতেই পারত না, তাই না?'

চুপ করে রইল ও। চমকে উঠলাম। চোখ ফেরাতে দেখলাম ওর কালো চোখের মণি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

মুখের ভিতরটা কেমন তেতো তেতো লাগছিল।

'তুমি কি আর বসবে?' আস্তে বলল ও।

'না, অনেকক্ষণ এসেছি, এইবেলা চলি।' কথাগুলি কেমন যেন মুখে জড়িয়ে আসছিল আমার। 'অনেক বেলা হল।'

'আবার কবে আসছ?' প্রশ্ন করল ও। দ্বিধাহীন প্রশ্ন।

'আবার'—আমতা আমতা করছিলাম: 'আবার কবে ঠিক—'

'না, আর এসো না।' চোখে আঁচল চাপা দিল ও। আর দাঁড়াল না। ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। খোঁপাটা আবার দেখলাম। সবটুকু গরিমা নিয়ে চন্দ্রমল্লিকা। সেখানে স্থির হয়ে আছে।

যে টাকা খরচ করে ওর বাবা এখানে ওর বিয়ে দিলেন, সে টাকায় কি আর শহরে ভাল পাত্র পাওয়া যেত না? ওর বাবার সব বাড়াবাড়ি—জমি, জমি, জমি! যারা চাকরি ক'রে খায় শহরে, তাঁরা যেন মানুষ নয়—তিনি নিজে যেন মানুষ নন্—তাই এত টাকা খরচ করে এই জঙ্গলের মধ্যে এই ঈশ্বরের-ভুলে যাওয়া জায়গায় বিয়ে দিতে হ'ল মেয়েব! মনে মনে রাগে গজরায় উৎপলা; এই জন্যই কি সে লেখাপড়া শিখেছিল, এই জন্যই কি জন্মাবধি ইলেকট্রিক আলো, কলের জল, এবং থিয়েটার-সিনেমা-ফ্যান্সীফেয়ারের মধ্যে মানুষ হ'ল?

নিতাই অবশ্য চাকরি করে বটে, রাঁচী না হাজারীবাগ না ঐদিকে কোথায়, তবে উৎপলার বাবা যে সে চাকরি দেখে মেয়েকে ওর হাতে দেননি, এটা ঠিক। সে সামান্য চাকরি, অস্থায়ী—কবে আছে কবে নেই—সেখানে উৎপলাকে নিয়ে গিয়ে বাসা কবতে সে কোনদিনই পারবে না। ঐ অজ পাড়াগাঁয়েই তাকে জীবন কাটাতে হবে চিরকাল। মূর্খ স্বামী, ততোধিক মূর্খ (হয়ত বা নিরক্ষর) তার আত্মীয় স্বজন, গরু বাছুর-কিষাণ-রাখাল এবং এক বন্দে সাড়ে তিন শ' বিঘে জমি, এর মধ্যেই জীবন কাটিয়ে একদিন হয়ত সেই জঙ্গলের মধ্যেই ইহলীলা শেষ করে বিদায় নিতে হবে। আশা নেই, আনন্দ নেই, ভবিষ্যৎ নেই—সব অন্ধকার। ভাবলেই ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে উৎপলার। কেন যে সে বিদ্রোহ করেনি, কেন যে সে আত্মহত্যা করবার ভয় দেখিয়ে এ বিয়েটা বন্ধ করেনি—নিজের সেই নির্বুদ্ধিতার কোন কারণই খুঁজে পায় না।

ওর বাবা অবশ্য তখন সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, 'এইত ষাট মাইল রাস্তা, একে কি আর দূর বলে? আমি চাই কি সপ্তাহে সপ্তাহে গিয়ে তোর খবর নিতে পারব—তুইও মনে করলেই আসতে পারবি। তা ছাড়া নিতাইয়ের বাবাকে

আমি জানি, লোক ওরা কেউ খারাপ নয়। কলকাতায় এক এঁদোপড়া বাড়িতে, না হয় বড়জোর তিনশ' টাকা মাইনের কেরানীর বৌ হতে পারতিস! তাতে কি সুখ পেতিস্? চিরজীবন একটা ঘানিকলে ঘুরতে হত, না অন্তরে না বাইরে, মুক্তি কোথাও থাকত না। তার চেয়ে এ ঢের ভাল হ'ল। চাকরি যেমনই করুক, মাইনে যতই পাক্—আজকালকার বাজারে টাকার দাম কি?'

কিন্তু এসব যে বাজে কথা তা উৎপলা জানে। শুনতেই ষাট মাইল। বাহান্ন মাইল ট্রেনে যেতেই ও লাইনে সাড়ে চার ঘণ্টা সময় লাগে—তাও ট্রেন দিনরাতে তিনখানি! কে বলবে এটা এ্যাটমের যুগ। আর বাকী সাত আট মাইল গরুর গাড়িতে—সে নাকি আরও সাড়ে চার ঘণ্টা। এত কষ্ট করে যে কেউ তার খবর নিতে যাবে না ফি হপ্তায়, তা সে বোঝে। আর সে-ও ঐ ঘর থেকে মন-করলেই যে আসতে পারবে—তাও জানা আছে।

অভিমানে উৎপলার দুই চোখ জ্বালা ক'রে জল ভরে আসে। সকলকার ওপরই যেন ওর অভিমান—বিশেষ করে বাবার ওপর। তিনি নাকি ওকে খুব ভালবাসেন। ছাই বাসেন—এই যদি ভালবাসার নমুনা হয় ত অমন ভালবাসার দরকার নেই। এইত বেলা দেড়টায় ট্রেনে চেপেছে এখনও পর্যন্ত পৌঁছল না। অথচ বাহান্ন মাইল মাত্র নাকি পথ! তারপর সেখানে যে কী অদৃষ্টে আছে কে জানে। এরা ত বলাবলি করছিল যে পাল্কী যদি পাওয়া যায় তবু অল্পে পৌঁছবে—নইলে গরুর গাড়িতে সাড়ে চার ঘণ্টা পাক্কা! সত্যি-সত্যিই গরুর গাড়ী চড়তে হবে নাকি? বিয়ের কনে যাবে গরুর গাড়ি চড়ে? ছি ছি। তার চেয়ে ঘেন্না আর কি আছে!

কিন্তু স্টেশনে নামতে দেখা গেল উৎপলার অদৃষ্টদেবতা তার চরম পরীক্ষা নেওয়ার জন্যই তৈরী হয়েছেন। পাল্কী এ অঞ্চলে মাত্র দু'খানা, তবু অন্য সময় তা সহজেই পাওয়া যায় কিন্তু আজই, বোধ হয় উৎপলার অদৃষ্ট-ক্রমেই, কাঁকুড়ে-বেগপুরের বাবুরা বিবাহ উপলক্ষে দু'খানা পাল্কীই আটকেছেন, তাঁরা গেছেন প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে, আজ আর ফেরবার সম্ভাবনা নেই।

সুতরাং—গো-গাড়ি!

ওদেরই বাড়ির গাড়ি নাকি দু'খানা এসেছে, আর বাকি কুটুম্বদের গাড়ি। বর-বধূ এবং বরযাত্রীদের নেবার জন্য পাঁচ-ছ'খানা গাড়ী প্রস্তুত। ওরই মধ্যে যেখানা সব চেয়ে বড় এবং নতুন সেইখানাতেই পুরু করে খড় বিছিয়ে এবং তার

ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলে মাঠে নেমে পড়লাম। রৌদ্রের দিকে তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল।

নবজন্ম

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অন্ধকার জীবনে দেখেনি উৎপলা, ভয়ে বুকের মধ্যে হিম হয়ে আসে। কোন্‌টা শূন্য মাঠ, কোন্‌টা গ্রাম আর কোন্‌টা জঙ্গল কিছুই বোঝবার উপায় নেই। শুধু চকচকে গুলো জোনাকি জ্বলছে ইতস্ততঃ, আগুনের ফুল্‌কী চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে যেন—সে আরও ভয়াবহ। সেদিকে চাইলে কোন সান্ত্বনা ত মেলেই না, বুক দুর দুর করে।

বর্ধমান জেলার গ্রাম, বাঢ়ের দিগন্তজোড়া মাঠ চারিদিকে। জঙ্গল বিশেষ নেই বটে—ধু-ধু-মাঠ, অবারিত, অনন্ত—কোথাও ডাঙ্গা, কোথাও বা চষা জমি, মধ্যে মধ্যে দু-একটা তাল কিম্বা খেজুরের কুঞ্জ—তবু এ যেন আর এক রকমের ভয়াবহতা। হু-হু-হু একটানা একটা ঝোড়ো হাওয়ার মত বাতাস বইছে মাঠের ওপর সর্বদা, সেই বাতাস গাড়ির ছইতে লেগে এবং কানের পর্দায় একটা বিশেষ ভাবে আঘাত করে সম্পূর্ণ অপরিচিত কী একটা শব্দের সৃষ্টি করছে। কেমন একটা অপার্থিব মনে হয় সমস্তটা—গা ছম ছম করে।...

এ যাত্রার কি আর শেষ হবে না? মনে মনে প্রশ্ন করে উৎপলা। পিঠটা চড় চড় করছে, ঠোকা খেয়ে খেয়ে মাথা টাটিয়ে উঠল—তবু গন্তব্যস্থলের কোন চিহ্ন পর্যন্ত মেলে না। সময়ের হিসাব নিশ্চিহ্ন হয়ে একাকার হয়ে গেছে। কখন চেপেছে, ক-ঘণ্টা কাটল এ গাড়িতে—তার কোন হিসেব নেই, ধারণাও নেই। গাড়োয়ান মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করছে মধ্যে মধ্যে, আগে এবং পিছে যে গাড়ি আসছে তা থেকে অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে মাত্র—মানুষের উপস্থিতির এইটুকু শুধু প্রমাণ ওর চার পাশে! স্বামী ত বোধ হয় বোবা; একটা সাড়া পর্যন্ত দেয়নি এখনও।...

হঠাৎ নিতাই-ই একবার বললে, অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে, আড়ষ্ট ও অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, 'ওধারে একটা বালিশ দেওয়া আছে বোধ হয়, তুমি শুয়ে পড়তে পারো এদিক দিয়ে পা ছড়িয়ে। তাতে ঝাঁকুনি কিছু কম লাগবে।'

তবু ভাল! বোবা নয় তা হ'লে একেবারে! কথা বলবার সময়ও কিন্তু সে উৎপলার দিকে মুখ ফেরাল না। কালরাত্রির ভয় বোধ হয়? এই কু-সংস্কারও এদের আছে!

তবে সে নিতাইয়ের প্রস্তাবটা গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গেই, মনে হয় যেন এইটেরই অপেক্ষা করছিল। স্বামীর পাশ দিয়ে নতুন জুতোসুদ্ধ পা-দুটো টান করে করে ছড়িয়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়ে। আঃ—এতে ঝাঁকানি লাগলেও অত কষ্ট হয় না। এটা ত মন্দ নয়—মনে মনে বলে উৎপলা। হাওয়াতে গরমও

তত লাগে না, আরামে ওর চোখ দুটো বুজে আসে। কাল ওদের কলকাতার বাড়িতে কী গরমই গেছে। আজ বেশ ঠাণ্ডা কিন্তু। বোধ হয় পাড়াগাঁয়ের দিকে একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডাই থাকে। কে জানে।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা উৎপলা কিছুই জানে না, হঠাৎ একসময় কার হাতের মৃদু ঠেলাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়।

ও, নিতাই ডাকছে। ওর গায়ে হাত দিয়ে নিঃশব্দে ঠেলছে।

উৎপলা ধড়মড় করে উঠে বসল। নিতাই খুব মৃদু কণ্ঠে ওর দিকে মুখ না ফিরিয়েই বললে, 'একটু সামলে বসো, বাড়ী এসে গেছে!'

তারপরই একটা প্রচণ্ড হৈ-চৈ, শাঁকের আওয়াজ, দেশি সানাই এবং য়্যাসিটিলিন গ্যাসের জোর আলো। তার ওপর সেই ক্লান্তিকর পুরোনো কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠান। এগুলো ছেলেবেলা থেকে অনেক দেখেছে উৎপলা—প্রায় সবই একরকম পরিচিত। দু-একটা আচার সামান্য একটু অন্য রকম। সেটা বোধহয় এঁদের নিজেদের বাড়ির নিয়ম-অনুযায়ী।

কিন্তু এই কি ওর শ্বশুর-বাড়ির লোক? এইখানে সারা জীবন কাটাতে হবে ওকে?

কালো কালো রোগা রোগা কতকগুলো পুরুষ, তাদের সকলকারই গায়ে জামা আছে বটে, হয়ত বা সিল্কের জামাও আছে কারুর কারুর, কিন্তু সবটা মিলিয়ে তারা আকৃতি প্রকৃতিতে একেবারে মাঠের চাষী, এদের নিজেদেরই কিষাণ কি বাথাল থেকে পৃথক করে বোঝা যায় না। আর মেয়েরা! এক গা করে গয়না আছে প্রায় সকলের গায়ে, অত না থাকলেই ভাল হ'ত বরং—কিন্তু যেমন সব কাপড়-জামা আর তেমনি তা পরবার ছিরি! বরণের সময় ওর শাশুড়ী একখানা সাবেক কালের (বোধ হয় তাঁরও দিদি-শাশুড়ীর আমলের) বেনারসী জড়িয়ে এসেছিলেন বটে, কিন্তু প্রাথমিক কাজগুলো সারা হয়ে যাওয়া মাত্র তিনি সেটা ছেড়ে একখানা হলুদ-মাখা আধ-ময়লা মিলের শাড়ি পরে সুস্থ হলেন। ছেলেগুলো সব দিগম্বর—এবং ধুলো কাদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার। এরাই নাকি অতঃপর তার আত্মীয় ও আত্মীয়া!

বাড়িটা অবশ্য মন্দ নয়। গ্রামে সব বাড়িই মাটির, শুধু এঁরা সম্প্রতি পাকা দোতালা বাড়ি করেছেন। বড় বড় খান-ছয়েক ঘর, বিরাট দালান

ওপর শতরঞ্জি পেতে বর-কনের জন্য ব্যবস্থা করা হ'ল। একজন বললেন, 'আজ ত কালরাত্রি, যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, বর কনেকে আলাদা বসালে হয় না? কিন্তু তখনই তার প্রতিবাদ এল, 'কনের সঙ্গে তাহলে যাবে কে? ঝি থাকলেও না হয় হ'ত। তার চেয়ে ওরাই একটু সাবধানে থাকবে'খন। বৌমা, তুমি মুখ-টুপ্ ঢেকে বসো গো বাছা, নিতাইও খুব সাবধান। আজ কালরাত্রি!'

সত্যি, বাবা একটা ঝি পর্যন্ত সঙ্গে দেননি। কী আশ্চর্য! আজন্ম-পরিচিত ঘর এবং পরিবেশ ছেড়ে সে এই একেবারে-অপরিচিত মানুষের মধ্যে অজানা দেশে আসছে—একা! এমন ভাগ্য কি কারুর হয়? বাবার যুক্তি হ'ল 'শহরের ঝি পাড়াগাঁয়ে গিয়ে কেবল নাক তুলবে। তাতে মেয়েরও মনে প্রথম ইম্প্রেশন্টা খারাপ হয়ে যাবে—আর তারাও অপমানিত বোধ করবে। এ নিয়ে বহু অশান্তি আমি হতে দেখেছি।'

তা বেশ করেছেন, কিন্তু কোলের ভাইটাকে ত সঙ্গে দিতে পারতেন! তার বেলা পরীক্ষার ছুতো করে তাকে আটকে রাখলেন। বন-দেশে গিয়ে যদি তার অসুখ করে? সে যে বেটাছেলে, তার ওপর মমতা যে বেশি। উৎপলা নাকি চার ভায়ের একমাত্র বোন, সেজন্য তার খুব আদর—এই কথাই চিরকাল শুনে আসছে সে। আদরের যা নমুনা, আহা!...

গরুর গাড়ির কাছে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠল উৎপলা। এর মধ্যে ঢুকবে কি করে? বসবে কোথায়? গাড়ির জানলা দরজা নেই, তিনদিক ঢাকা উপুড়-করা কী একটা ব্যাপার—এর নাম নাকি ছৈ? পা থাকে কোথায়? আর ঐ যমদূতের মত দুটো মোষ এই গাড়ি টেনে নিয়ে যাবে? ভাবলেই যে বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। একজন কে সস্নেহে ডাকলেন, 'এসো না বৌমা—এসো, এসো। ও, মোষ দেখে ভয় করছে বুঝি? কিচ্ছু ভয় নেই। ও মোষ খুব শান্ত। তা ছাড়া আমরা ত আছি।'

তা ত আছেন, কিন্তু এই হেলে-পড়া গাড়িতে উঠবে কি করে? পা দিতে গিয়ে পা পিছ্লে এল জুতো সুদ্ধ, মাথাটা ঠুকল ঠকাস্ করে। কে একটি ছেলে হেসে উঠল হি-হি করে, একজন তাকে ধমক দিলেন। আবারও পড়ে যাচ্ছিল, একটি ছেলের হাতটা ধরে ফেলে সামলে নিলে। রাখাল, যে গাড়ি এনেছিল সে বললে 'মাথাটা হেঁট করে গুড়ি মেরে ঢুকে বসো বৌমা, এ ত তোমাদের মটর গাড়ি নয়—এর চাল-চলন আলাদা!'

কোন মতে জবু-থবু হয়ে জন্তুর মত উঠে বসে উৎপলা, পিছু পিছু স্বামী এসে ঢোকেন। তারপর হঠাৎ গাড়ি তুলে মোষ জোতবার সময় সে আবার এক

কাণ্ড। এর জন্য উৎপলা প্রস্তুত ছিল না, হুমড়ি খেয়ে একেবারে নিতাইয়ের ঘাড়ে এসে পড়ল। ছি ছি! কী লজ্জা! তৃষ্ণায় ওর বুক পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছিল কিন্তু কাকে বলবে সে কথা, কেউ প্রশ্নও করল না। ট্রেনে আসতে আসতে তবু ওর বরের এক বন্ধু একটা লেমোনেড খাইয়েছিল, কিন্তু সে বরফ দেওয়া নয় বলে সবটা খেতে পারেনি। এখন তো বোধ হয় স্টেশনসুদ্ধ লোক ঝুঁকে পড়ে মজা দেখতে এসেছে, কিন্তু কারুর কি কথাটা মনে পড়ল না!

গাড়ী চলল মন্থর গতিতে। এত মন্থর যে কোন গাড়ির গতি হতে পাবে তা উৎপলা কল্পনাও করতে পারেনি। এর চেয়ে মানুষ ত ঢের জোরে চলেই—ভেড়া ছাগলও বোধ হয় চলে। আর তার ওপর কি ঝাঁকানি—মনে হয় যেন হাড়-গোড় সব চূর্ণ হয়ে যাবে এখনই। সঙ্গে যে মানুষটা আছে, সে যে কেমন তাও বোঝে না উৎপলা। কোন সাহায্য করা কি দু'টো সান্ত্বনার কথা বলা ত দূরে থাক—কাঠের মত আরষ্ট হয়ে একেবারে পিছনে ফিরে বসে আছে সে। ও নাকি দু'টো পাশ করেছে, শহরে চাকরি করে, কলকাতা শহরেও ছিল বছর-দুই; তবু মানুষ হতে পারেনি? সেকেলে নব-বধূদের লজ্জার যে সব কাহিনী শোনা যেত, তার চেয়েও বেশি লজ্জা যেন ওর। সব স্বামীরই স্ত্রী সম্বন্ধে কৌতূহল থাকে নানা রকমে সে কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করে, সুযোগ সুবিধা পেলেই আড়ে চায়—নিজের বিয়ে না হ'লেও এমনটা বিস্তর দেখেছে উৎপলা। কিন্তু এ কী কাল থেকে লজ্জায় মাথাই তুললে না একবারও।...এর চেয়ে একা যাওয়াও তার ভাল ছিল একখানা গাড়িতে। আর সারা জীবনই ত তাকে একা
যাওয়াও তাব ভাল ছিল একখানা গাড়িতে। আব সাবা জীবনই ত তাকে
একা কাটাতে হবে এর পর থেকে। ও-স্বামী আব যাই হোক—জীবনের সঙ্গী নয়। এই বন-দেশে তার বাবা তাকে যখন নিঃসঙ্গ নির্ব্বাসনই দিয়েছেন তখন সে একাই এখানে সারা জীবন কাটাবে। বাপের বাড়িতে ত যাবেই না, তাদের চিঠিও দেবে না।

দুঃখে ক্ষোভে, অভিমানে আবারও দুই চোখ ছাপিয়ে জল ঝরে পড়ে উৎপলার।

খানিকটা পরেই চারিদিক আঁধার করে সন্ধ্যা নেমে আসে। প্রথমে আকাশ ল হয়—তারপর একসময় ঝুপ্ করে অন্ধকার। এমন ভয়াবহ নিঃসীম নীরন্ধ্র

পাক।

ওপর নীচে—সেদিক দিয়ে মন্দ নয়। ওঁদের সাবেক বাড়িতেও নিয়ে যাওয়া হ'ল ওকে—মাটির ঘর বটে সব কিন্তু বেশ উঁচু উঁচু জানালা বসানো—শুকনো খটখটে পরিষ্কার। ওর দিদি-শাশুড়ী পাকা বাড়িতে আসেননি, লক্ষ্মীকে নিয়ে পুরোনো ভাঁড়ার ঘরেই রয়ে গেছেন। নাত-বৌকে কোলে বসিয়ে আদর করলেন, তারপর সঙ্গে করে ঠাকুর ঘরে নিয়ে গিয়ে লক্ষ্মীর সামনে প্রণাম করালেন। সব শেষে একটি সিঁদুরমাখা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের টাকা ওর হাতে দিয়ে বললেন, 'এইটে মাথায় ঠেকিয়ে নিজের ক্যাস-বাক্সয় রেখে দিগে যা, কখনও খরচ করবি না। যদি কখনও আবার নতুন করে লক্ষ্মী পাততে হয়, ত এই টাকা দিয়ে লক্ষ্মী পাতবি—নইলে তুই আবার তোর বৌকে এই টাকা দিয়ে যাবি। খবরদার মেয়েকে যেন কখনও দিস্‌নি—লক্ষ্মী পরের বাড়ি চলে যাবেন। মেয়েরা পরঘরি পান্তামারি, খাইয়ে, দাইয়ে মানুষ করো, এতগুনো টাকা দিয়ে শুধু পরের বাড়ি পাঠাবার জন্য!'

ঘর-বাড়ি যেমনই হোক—আসবাব-পত্রও খুব খাবাপ নয়, আলমারি দেরাজ, এমন কি দু-একখানা হাতল ভাঙা চেয়ারেরও মুখ দেখা গেল, কিন্তু বিছানার কি কোন বালাই নেই? যেমন সামান্য, তেমনি ময়লা চিটচিটে—এ-সম্বন্ধে এরা একেবারে উদাসীন। এটা যে বিয়ে-বাড়ি, এখন অন্তত একটু পরিষ্কার রাখা দরকার, এ-কথাটা একবারও মনে হয়নি ওদের। আশ্চর্য! এমন বিছানায় ওদের বাড়ির চাকরও শোয় না। এই রকমই একটা শয্যায় ওকে শুতে হবে নাকি? ভাবতেও যেন আতঙ্ক বোধ হয়।

আর আছেই বা কি, কোথাও ত জড়ো-করা কোন বিছানাও দেখা যায় না। খাট-বিছানা এরা চায়নি বলেই ওর বাবা দেননি—কিন্তু এর চাইতে চেয়ে নিলেই হত। তবু উৎপলার মনে তখনও আশা ছিল যে ওর শোবার সময় হয়ত একটা ফরসা চাদর পেতে দেবে। কিন্তু রাত যখন গভীর হ'ল তখন ওকে নিজে হাতে খাইয়ে ওর শাশুড়ী ওকে নিয়ে গেলেন তাঁর নিজের ঘরে—আজ নাকি শাশুড়ীর সঙ্গেই শুতে হয়—এবং যে বিছানাটা ও আসার পর্যন্ত পাতা দেখেছে—ছত্রিশটা দিগম্বর শিশু যার ওপর কাদা-মাখা গা ও পা নিয়ে নৃত্য করেছে সারাদিন (হয়ত বা ক-দিনই), মুড়ি থেকে আরম্ভ করে ছড়ায়নি এমন জিনিসই নেই, একাধিক শিশু যার ওপর কু-কর্ম করবার ফলে এখনও কোন কোন স্থান ভিজে, অম্লান-বদনে সেই বিছানার ওপরই ওকে বসিয়ে সস্নেহে বললেন, 'তুমি শুয়ে পড় বৌমা, আমার সব কাজ চুকিয়ে শুতে আসা ত, সময় হলে হয়। হয়ত সেই

ভোরবেলা এসে একবার নিয়ম সেরে যাব।······আমার যে আজ ঘুমোবার সময় মিলবে তা ত মনে হয় না।'

সে সময় উৎপলা একবার মরিয়া হয়ে উঠেছিল বৈকি!

সে কি চিৎকার করতে করতে ছুটে বেরিয়ে যাবে এ বাড়ি থেকে? ঐ মাঠ ধরে? কিন্তু পথ যে জানে না, তা ছাড়া এরা সংখ্যাতেও ঢের—ধরে ফেলবে, পাগল বলবে, মিছিমিছি সে এক কেলেঙ্কারি।···তবে কি শাশুড়ীর সামনেই তক্তপোষের নীচে থেকে বঁটিটা বের করে নিয়ে গলায় বসিয়ে দেবে? কিংবা শাশুড়ী চলে গেলে এই নতুন শাড়িটা গলায় বেঁধে ঝুলবে কড়িকাঠ থেকে?

কিন্তু কিছুই করা হয় না। সাহসে কুলায় না শেষ পর্যন্ত। জীবনের মায়া, সম্ভোগের মায়া বড় বেশি। তাছাড়া অল্প বয়স ওর, কৈশোর এবং যৌবন অনবরতই আশা ও আশ্বাস যোগায় মানুষের মনে। সত্যি সত্যি সাময়িকভাবে পাগল না হলে কেউ এ-বয়সে আত্মহত্যা করতে পারে না। উৎপলাও পারলে না। বরং দু'দিনের উত্তেজনা, উপবাস, রাত্রি জাগরণ, দৈহিক শ্রান্তি এক সময় ওর সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন, অবসন্ন করে ফেলে—ঘুমে চোখের পাতা বুজে আসে। সেই অতিশয় মলিন এবং দীন বিছানাতেই ঘুমোয় ও অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে।

একেবারে ওর জ্ঞান হয় ভোরবেলা, ননদের ডাকে। কখন যে শেষ রাত্রে শাশুড়ী এসে পাশে শুয়েছেন এবং মিনিট কতক বাদেই আবার উঠে গেছেন, কখন যে আরও দশ-বারোটি ছেলেমেয়ে আর মেয়েছেলে সেই সংকীর্ণ বিছানাতেই অবিশ্বাস্যভাবে স্থান সঙ্কুলান করে নিয়েছে, এমন কি ওর ননদের মেয়েটি ওর শাড়ির ওপরে কু-কর্ম করে আঁচলের অনেকখানিই ভিজিয়ে দিয়েছে—তা ও কিছুই জানে না, ননদের মুখে সকালে শুনলে মাত্র।

ওর এই ননদ রমাটিকেই এ সংসারে একমাত্র 'ওয়েশিস্' বলা যেতে পারে। অন্ততঃ উৎপলার তাই মনে হ'ল। রমা ওরই একবয়সী হবে, যদিও ইতিমধ্যে দুটি ছেলেমেয়ে হ'য়ে গেছে। ওর স্বামী শহরে চাকরি করে, তার ফলে ওর চাল-চলন, কথাবার্তা অনেকটা শহর-ঘেঁষা। আর কিছু না হোক, সে যে পরিষ্কার কাপড় পড়ে এবং এই গ্রাম ও জেলার বাহিরের জগতের খবর কিছু রাখে, এই জন্যই উৎপলা কৃতজ্ঞ।

রমা ওকে ডেকে বললে, 'চল বৌদি, আমরা ওধারের ঘাট থেকে কাপড়-চোপড় কেচে আসি। এখানে ত বাথরুম নেই, কুয়াতলায় চব্বিশটা বেটাছেলে জটলা করছে। আমাদের খিড়কীর পুকুরেও ভীড়, সেখানে কাপড় কাচতে তুমি পারবে না। তার চেয়ে এই বেলা চৌধুরীদের পুকুর থেকে কাজ সেরে আসি চলো।'

উৎপলা ঈষৎ ভীত কণ্ঠে বললে, 'সেখান থেকে ভিজে কাপড়ে আসতে হবে নাকি ?'

'না, না—কাপড় জামা আমি নিয়ে যাচ্ছি চলোনা—'

'কিন্তু সেখানে কাপড় ছাড়ব কোথায় ?' অসহায় ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে উৎপলা।

'ওরে পাগল, সেখানে ঢের জায়গা আছে। সে ঘাট খুব নির্জন আর তার পাড় এত উঁচু যে কোথাও থেকে কিছু দেখা যায় না।'

ওরা দু'জনে খিড়কীর পথ দিয়ে বেরিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে খানিকটা চলে একেবারে হঠাৎ যেন মাঠে পড়ল। আসলে ওদের বাড়িটা গ্রামের এক প্রান্তে। ওদের সীমানার পর থেকেই শুরু হয়েছে চাষের জমি—দিগন্ত-জোড়া সে মাঠ। মধ্যে মধ্যে সামান্য কিছু পতিত অনাবাদী জমি হয়ত আছে—সেখানে দু' একটা খেজুর কিংবা ছোট ছোট বনগাছের ঝোপ। আর আছে দু'টো একটা তালের কুঞ্জ—এ-ছাড়া আল দিয়ে ভাগ করা জমি। এটা শস্যের সময় নয়, সবে প্রথম লাঙল পড়েছে জমিতে কিন্তু সেই সীমাহীন বিস্তৃতিরও একটা শোভা আছে, সেদিকে চেয়ে উৎপলা বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

ওদের বাগানের যেখানটা দিয়ে ওরা বেরোল সেখানটা পাহাড়ের মত, জমিটা উঠে গিয়েছে উঁচুর দিকে। ওদেশে এমনি উঁচু-নীচু জমির অভাব নেই। শক্ত কাঁকুরে মাটি, উঁচু ঢিপিগুলোয় গাছ পালা কম। এমনি একটা টিলায় উঠে আবার নেমে ওধারে যাবার কথা ওদের, কিন্তু একবার ওপরে উঠে উৎপলার পা আর চলল না, সে অবাক হয়ে মাঠের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'কী হ'ল বৌদি ?' রমা প্রশ্ন করে।

'দেখছি ভাই। এত জমি ত কখনও দেখিনি। এত জমি খালি পড়ে থাকে তা ভাবতেও পারি না।'

'এ সবই তোমাদের জমি—এই এদিকে সোজা চলে গিয়েছে তিনশ বিঘে জমি একবন্দে—সব তোমাদের! এ ছাড়া কালনার দিকে আরও ষাট বিঘে

জমি আছে; আবার বাবা তাঁর মামার সম্পত্তি পেয়েছেন—সেই ওকড়শার দিকে —তাও চল্লিশ-পঞ্চাশ বিঘের কম নয়।'

বিঘা ঠিক কতটা উৎপলা জানত না। সে প্রশ্ন করলে 'খুব ধান হয়?'

'ধান?' রমা একটু হাসল, বললে, 'খুব কম হলেও বিঘে পিছু আট মণ বাধা। এখন আট টাকা করে ধানের দর—মানে মণ-পিছু।'

মনে মনে অঙ্কটা কষতে কষতে উৎপলা নেমে চলল। আগের দিন শেষ রাত্রে সামান্য ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখনও বাতাসে তার আর্দ্রতা। ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা মিষ্টি গন্ধ। চারিদিকে হু হু করে বাতাস বইছে, তাতে যেন একটা স্বপ্নের আবেশ মাখানো। তখনও সূর্য্য ওঠেনি, পূর্বাকাশ লাল হয়ে উঠেছে মাত্র। দূর চক্রবালের সে লালিমা এধারের নীলাভ অন্ধকারকে সম্পূর্ণ দূর করতে পারেনি, শুধু উঁচু তাল গাছের মাথাগুলোয় তার একটু ছোঁয়াচ লেগেছে! তারই মধ্য দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ উৎপলার মনটা একটা অজানা খুশিতে ভরে উঠল —কিসের এ আনন্দ বোঝানো কঠিন। জন্মাবধি ওদের কেরানীবাগানের সেই সংকীর্ণ গলির ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা অভ্যাস, বাতাসে চিরকাল ডাস্টবিনের পচা গন্ধই পেয়ে এসেছে—এ যেন একেবারে নতুন, বিস্ময়কর! চারিদিকের কল্কে গাছগুলো হলুদ রঙের ফুলে ভরা—তার সঙ্গে আরও কত অজানা ফুলের গন্ধ মিশে ওকে উন্মনা করে তুলছে। সত্যি সত্যিই ওর এদেশ ভাল লাগবে নাকি! শেষ অবধি বাবার কথাই ঠিক হবে?

রমা পাশ থেকে কুট করে প্রশ্ন করলে, 'কাল ত সমস্ত ক্ষণই নাক তুলছিলে, আজ কেমন লাগছে এখন?'

উৎপলা যেন চমকে উঠল, 'কি বললে আমি কাল নাক তুলছিলাম।'

'আমাদের চোখ আছে গো ঠাকরুণ! তোমার মনের ভাব ছিল যেন তোমাকে এই জঙ্গলের মধ্যে খুন করে ফেলবার জন্য আনা হয়েছে।'

মনে মনে লজ্জিত হলেও উৎপলা মুখে জোর দিয়ে বললে, 'তাত সত্যি কথাই; চিরদিন শহরে মানুষ হলুম, আজ হঠাৎ এই জঙ্গলে এলে ভয় করে না?'

'জঙ্গলটা কোথায় দেখছ? এসব মাঠ না থাকলে শহরে বসে খেতে কি? তোমাদের মত সুইচ টিপলে আলো আর কল টিপলে জল, এসব নেই বটে, কিন্তু তেমনি শহরে যে-আর কিছুই নেই! কী সুখে শহরে থাকে লোক তা বুঝিনা!'

কাল গাড়ি চালিয়ে আসতে ওদের রাখালও এই কথাই বলেছিল। তখন তার কথায় কান দেয়নি উৎপলা, কিন্তু এখন মনে পড়ে গেল। সে বলেছিল, 'বৌদি তোমাদের কলকাতার পায়ে নমস্কার। একবার গিয়েছিলুম চাকরি করতে, একটা ওষুধের কারখানাতে কাজও পেয়েছিলুম, কিন্তু দেড় মাস না যেতে যেতে পালিয়ে আসতে পথ পাই না। বলি, রক্ষা করো বাবা, রইল তোমার চাকরি। বললে বিশ্বাস যাবেন না বৌদি, দেড় মাসেই শরীর কালি, শুকিয়ে আধখানা হয়ে গিয়েছিল (শরীর তার আরও কালি হওয়া কী করে সম্ভব তা বোঝা গেল না—এম্‌নিতেই যথেষ্ট কালো)। না পাওয়া যায় খেতে কোন জিনিস—আর না পাওয়া যায় বাতাস। আমাদের এখানে যে-সব ফল গাছের তলায় পড়ে থাকলে কেউ ছোঁয় না—তাই কলকাতার লোক গাদা গাদা পয়সা দিয়ে কেনে। খাবার মধ্যে আপনারা জানো শুধু নেয়তক চা খেতে! আর কিছু জোটে?'

উৎপলার ধারণা ছিল ওরা শহরের লোক, যারা শহরের লোক নয় তাদের তাচ্ছিল্য করার জন্মগত অধিকার ওদের আছে। কিন্তু এখন এই সব উল্‌টে কথা শুনে চম্‌কে ওঠে সে। এদের স্পর্ধা ত কম নয়। এদের এমন কী আছে যে শহরকে অবহেলা করতে সাহস করে।

বেলে পুকুরের ঠাণ্ডা জলে গলা অবধি ডুবিয়ে বসে থাকতে মন্দ লাগে না উৎপলার—যদিও সাঁতার না জানার জন্য একটু ভয়-ভয়ই করে।

'এ কাদের ঘাট ভাই ঠাকুরঝি, লোকজন ত নেই?'

ঠাকুরঝি শব্দটা মুখে আটকায় তবু জোর করে বলে। অভ্যাস ত করতেই হবে, লজ্জা করে লাভ কি?

রমা উত্তর দেয়, 'এটা চৌধুরীদের পুকুর। ওদের আরও দু'তিনটে পুকুর আছে। তাছাড়া এখানে ত পুকুরের অভাব নেই—কত লোক আর একটা পুকুরে আসবে?'

স্নান সেরে ঘোমটা দিয়ে রমার পিছু পিছু বাড়ি ফিরে আসবার সময় উৎপলা ভাল করে বাড়িটা তাকিয়ে দেখলে। ভেতর-বাড়ি আর বার-বাড়ি মিলিয়ে দশটা মরাই—বিরাট বিরাট মরাই।

'এগুলো কি ভাই? খড় দিয়ে জড়ানো ঘরের মতো?'

'ধানের মরাই রে—তাও জানিস না? এতে ধান থাকে। এক একটাতে প্রায় সওয়া শ' মণ দেড়শ' মণ করে ধান আছে। এ-সব সরু ধান ঘরে খাবার

জমা রাখা হয়। দু-তিন বছরের পুরোনো ধান আছে—এখন যা খাচ্ছি সব পুরোনো ধানের চাল।'

'এত চাল খেতে লাগে?' চমকে না উঠে পারে না সে।

'তা লাগে বৈ কি। লোকজন চাকর-কিষেণ ত কম নেই। তা ছাড়া এদেশের লোক খায় বেশি। আর ক্রিয়া-কর্ম ত লেগেই আছে। তোমার বিয়েতেই ভাই এক এক বেলায় পঁয়ত্রিশ সের চাল লাগছে, শুধু বাড়ির লোকের জন্যই।'

আর তা চোখেও দেখে উৎপলা। ভাতের কোন মূল্যই নেই যেন। ওদের সেই ব্যাশানে সপ্তাহে মাথা পিছু এক সের পাঁচ ছটাক চাল বরাদ্দ, বলতে গেলে ভাত গুণে গুণে খেতে হয়। এ অপব্যয় দেখে উৎপলা শিউরে ওঠে। এত ভাত নষ্ট করে কি করে?

একবার রমা উল্কার মত কোন্ কাজের ফাঁকে এসে দাঁড়াতেই উৎপলা কথাটা বলে ফেলে। রমা হেসে উত্তর দেয় 'ওটাকে আমরা নষ্ট বলে ধরি না ভাই। অত হিসেব করে চাল খরচ করার দরকারও হয় না। এ ত তোমাদের র‍্যাশানের চাল নয়।...আমরা চাষী গেরস্থ—জমি সব খাসে চাষ করানো হয়—চালের অভাব আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। তা ছাড়া গরুরও অভাব নেই, ভাত ঠিক নষ্টও হয় না, গরুতেই খেয়ে নেয়।'

'ক-টা গরু ভাই তোমাদের?'

'আমাদের নয়—তোমাদের। ছ টা। হেলে গরু, যারা হাল বয়—দুটো হেলে মোষ। আর দুধ দেবার গরুও ছ-সাতটা হবে।'

'দুধ কত হয়?'

'দুধ এখন কমে গেছে—চব্বিশ পঁচিশ সেরের বেশি হয় না—নইলে এক সময় এক মণ অবধি দুধ হত। আগে মোষ ছিল একটা—তার দুধ থেকে শুধু ঘি হ'ত—সে দুধ কেউ খেত না।'

চারিদিকের প্রাচুর্যে যেন হাঁফ ধরে উৎপলার। ওর বৌভাত দুপুর থেকেই খাওয়ানো শুরু হ'ল। ভাত, ডাল, চচ্চড়ি, শুক্তো, মাছ আর দু'রকমের মিষ্টি—উপকরণের বাহুল্য নেই, লুচি খাওয়ানোর কথা কেউ কল্পনাও করে না, কিন্তু পরিমাণ দেখে চমকে উঠতে হয় বৈকি। লোক যে কত খেলে তার ইয়ত্তা নেই—গ্রামের মেয়েরা প্রায় প্রত্যেকেই ছাঁদা বেঁধে নিয়ে গেল দু-তিন জনের মত—মাছ এক একটা লোক কম করেও খেল আধ সের, আগের দিনের তিন মণ বোধে

এবং সমপরিমাণ পান্তুয়া, নিঃশেষে উড়ে গেল। চারটে নাগাদ রমা ওকে খবর দিয়ে গেল যে সাত মণ চাল তখনই রান্না হয়ে গিয়েছে—হয়ত আরও রাঁধতে হবে।

জীবনযাত্রার বহিরঙ্গে উপকরণের যে অভাব কাল এসে পর্যন্ত ওকে পীড়া দিচ্ছিল, আজ সত্যকার উপাদানের প্রাচুর্য দেখে সে অভাব-বোধের জন্যই ওর লজ্জা হতে লাগল। এত রান্না এবং পরিবেশনের জন্য হালুইকর আসেনি—আত্মীয় ও আত্মীয়ারাই কেউ কেউ লেগে গেছেন। ওর শাশুড়ীর কোলে তখনও কচি ছেলে কিন্তু তবুও তিনি যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন তা দেখলে বিস্ময় লাগে। দিদিশাশুড়ী, পিস্‌শাশুড়ী—কারুরই নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই।

'এত কি করে খাটেন ভাই ওঁরা?' বিস্মিত উৎপলা প্রশ্ন করে রমাকে।

রমা হেসে জবাব দেয় 'ওরা ত আর পরের সংসারে খাটছে না—নিজের সংসারে খাটবে এ আর আশ্চর্য কি? কাজটা যখন নিজের কাজ বলে ঠিক ধারণা হয় তখন আর খাটুনীটা গায়ে লাগে না। ভয় কি, তুমিও একদিন ঐ রকমই খাটবে।'

কথাটা উৎপলার বিশ্বাস হয় না। ওদের শহরের জীবনে দাসী-চাকর-রাঁধুনী-গাড়ি-ট্রাম-বাসের ঠাস্‌-বুনানী—সেখানে হাত পা কোন কাজেই লাগে না। কাজের কথায় ওদের ভয় করে!

কিন্তু মনটা ওর আবার বিরক্ত হয়ে ওঠে ফুল-শয্যার সময়ে।

স্বামী কেমন তা জানে না—স্বামী সম্বন্ধে শ্রদ্ধা গড়ে ওঠার অবকাশ পায়নি তখনও—বরং একটা অনুকম্পার ভাবই আছে। তবু ফুলশয্যা শব্দটি ঘিরে একটা স্বপ্ন প্রত্যেক বাঙালীর মেয়ের মনেই রচিত হয় কৈশোরের পূর্বাভাস থেকে। উৎপলারও তা ছিল। কিন্তু এই কি ফুলশয্যা?

ফুলের মধ্যে এল কাঠচাঁপার দু-ছড়া ছোট মালা—তাও গোড়ে নয়, একহালি, রমাই কোন রকমে গেঁথে দিলে। আর শয্যা? নতুন ত নয়ই, ফরসা বিছানার কথাও কারুর মাথায় এল না। সেই কদিনের অসংখ্য কুটুম্ব-অধ্যুষিত মলিন শয্যা এবং চিট্‌চিটে ময়লা বালিশই বর-বধূর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্রি অতিবাহিত করার ব্যবস্থা হল। কথাটা যে-কোন শহরের মেয়ে—তা সে যত গরীবই হোক—তার কাছে অবিশ্বাস্য। তবু শেষ মুহূর্তে নতমুখী বধূর কঠিন

দৃষ্টির দিকে চেয়েই রমার মনে পড়ে গেল, সে আর কিছুই হাতের কাছে না পেয়ে নিজের একখানা শাড়ী এনে ভাঁজ করে পেতে দিলে বালিশ ও বিছানার ওপর।...

নিরীহ পাড়াগাঁয়ের অল্প-শিক্ষিত স্বামী—তবু দুটো চারটে কথাবার্তার পর মনের ঔদাসীন্য ও অনুকম্পার ভাব যেন কেটে যায়। নিতাইয়ের সাধারণ বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা বরং ওর পরিচিত অনেকের চেয়েই বেশি! শান্ত বটে, কিন্তু নির্বোধ নয়! স্বামী হিসেবে ঠিক অবজ্ঞা করার মত নয়।

আরও কিছুক্ষণ পরে উৎপলা অবাক হয়ে দেখে নিতাইয়ের বাহুবন্ধনের মধ্যে গিয়েও ত ঘৃণা বা অবজ্ঞায় শিউরে উঠছে না, বরং যেন কেমন ভালই লাগছে। ওর আদরে যে শিহরণ—তা পুলকেরই, একসময়ে নিজের মনের কাছেও স্বীকার করতে হয় উৎপলার। সে-ও দু'টো-একটা কথা কয়। আড়ি-পাতার ব্যাপার ছিল প্রথম রাত্রে, শেষ রাত্রে আত্মীয়ারা শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ায় ওদের কথাবার্তা সহজেই এগিয়ে চলে। এই আলাপ ও রাত্রিজাগরণে ক্রমে একটা আসক্তির ছোঁয়াচ লাগে।

উৎপলার মনের বিষও এই অবসরে বেরিয়ে আসে একবার। নিতাই একটু চুপ করে থেকে উত্তর দেয়, 'দেখ স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরের মনের মত না হয়—ফুল আর শয্যার সমস্ত আড়ম্বরই ব্যর্থ হয় না কি? ভবিষ্যতে মনের মিল না হলে বরং সেই আড়ম্বরের স্মৃতিটা উপহাস করতে থাকে। তুমি আর আমি, যদি আমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি, তাহলে শয্যা নতুন হ'ল কি না হ'ল—ফুলের প্রাচুর্য রইল কি না রইল তাতে কী আসে যায়? বনবাসে সীতা দেবী তৃণ-শয্যাতে শুয়ে রামের বাহুকে উপাধান করে যে তৃপ্তি পেয়েছিলেন, পরবর্তী জীবনে রাজবাড়িতেও সে তৃপ্তি পাননি। তাই নয় কি? তুমি ত অনেক পড়াশুনা করেছ!'

নিতাই কলেজে পড়েছে দু-বছর এটা শোনা থাকলেও, ঠিক এ-ধরণের কথা ওর কাছ থেকে আশা করেনি উৎপলা। এখন স্নেহ এবং শ্রদ্ধায় ওর মন যেন উপচে উঠল। ও একটু গাঢ়-কণ্ঠে বললে, 'তুমি একবার উঠে বসবে?'

নিতাই বললে, 'কেন বলো ত?'

'বসো না লক্ষ্মীটি!'

নিতাই মাথা তুলতে উৎপলা ওর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'তুমি আমাকে মাপ করো—এত ছোট কথা নিয়ে মনে ক্ষোভ রাখাই অন্যায় হয়েছিল।'

ওকে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে নিতাই সস্নেহে বললে, 'তুমি একটু পাগল আছ দেখছি।...তবে একটা কথা বলে রাখি, তুমি যখন এ বাড়িতে ঘর করতে আসবে, মানে একটু পুরোনো হবে, তখন তোমার বিছানা-বালিশ নিজের মনের মত করে রেখো—কেউ কিছু বলবে না। এমন কি বাড়ির সবাইকার বিছানাই যদি পরিষ্কার রাখতে পার ত এরা কৃতজ্ঞই থাকবে। আসলে পেরে ওঠে না এরা, দেখছ ত মা-পিসীমার খাটুনি!'

নিতাইয়ের বুকে মাথা রেখে সুখে ও নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস ফেলে উৎপলা। আর কোন ভয় নেই ওর—স্বামীকে যে সে শ্রদ্ধা করতে পারবে এই জেনেই সে নিশ্চিন্ত!...

ভোর-বেলা সে সন্তর্পণে ঘরের দোর খুলে যখন বাইরে বেরিয়ে এল, তখনও উৎসব-বাড়ির কর্মক্লান্ত পরিজনরা কেউ ওঠেনি। ভাল করে ফর্সাও হয়নি তখন। সে নিঃশব্দে দালানের বিছানাগুলো বাঁচিয়ে ওপরের ছাদে উঠে গেল।

আঃ, কী শান্তি!

মাঠের সমুদ্র দিকচক্রবাল ছাড়িয়ে দূর থেকে দূরান্তরে কোথায় চলে গিয়েছে। পশ্চিম দিকের সুদূর আকাশে তখনও নক্ষত্র রয়েছে কিন্তু পূর্বদিকে যেন ওরই সুখ আর লজ্জায় আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। মিষ্টি ঝিরঝিরে ভোরাই হাওয়া ওর রাত্রি-জাগরণক্লিষ্ট তপ্ত কপোলে ঠাণ্ডা চন্দনের প্রলেপ লাগিয়ে দিলে। তবু ঘুম এল না তখনও; বরং বিস্ফারিত নেত্রে সে প্রকৃতির অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

মনে হল এই মিষ্টি বাতাসের মধ্য দিয়ে ওর স্নেহপরায়ণ বাবারই হাতের মঙ্গলস্পর্শ ভেসে আসছে, তাঁর আশীর্বাদ বহন করে আনছে এই ফুলের গন্ধ।

বাবাই ঠিক বুঝেছিলেন, তিনি ওর সত্যকার কল্যাণ চিন্তাই করেছিলেন। সে সুখী হবে এখানে—এই গৃহ, এই স্বামী, এই আত্মীয় আত্মীয়াদের শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে, আপন বলে গ্রহণ করতে আর ওর কোন দ্বিধা নেই। যে জীবন সে পিছনে ফেলে রেখে এল তার জন্যও কোনও ক্ষোভ নেই। ওর এই নতুন জীবনে ও সম্পূর্ণ সুখী।

মনে মনে সে বাবাকে প্রণাম জানালে।

আর প্রণাম জানালে পূর্বাকাশের দিকে চেয়ে অদৃশ্য ওর অদৃষ্ট-দেবতাকে—যিনি পরম মাধুর্যে ওব জীবনকে পরিপূর্ণ করে দিলেন।

—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

হরিণের রং

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পর পর দুটো দিন খুব খারাপ গেছে। কী যে হয়েছে, ও ভালো করে মনেও আনতে পারেনা। কখনো কার একটা হিমের মতো ঠাণ্ডা হাত হৃৎপিণ্ডের কাছে উঠে এসেছে—চেপে ধরতে চেয়েছে বজ্রমুঠিতে। কখনো বা চোখের সামনে নিবিড় কুয়াশার মতো ধোঁয়া এসে জমেছে। সে-ধোঁয়া পাথরের মতো ঘন হয়েছে ক্রমশ—শ্বাস টানতে পারেনি ভালো করে, অসহ্য যন্ত্রণার সঙ্গে মনে হয়েছে সাপের মতো কী যেন পাক দিয়ে দিয়ে ধরছে ওর গলায়। আবার কখনো বোধ হয়েছে যেন আশ্চর্য লঘু হয়ে গেছে ওর শরীর— পাখির একটা পালকের মতো হওয়ায় হাওয়ায় উজ্জ্বল রোদের মধ্য দিয়ে ভেসে চলেছে ও। ঠিক মেঘের মতো। অনেক—অনেক নীচে দীর্ঘ ঘাসে ছাওয়া সবুজ মাঠে অজস্র হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। একটা—দুটো—একশো—এক হাজার—

অসংখ্য হরিণের গায়ে সেই লক্ষ লক্ষ বিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে ওর মনও একটা বিন্দুর মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল। তারপর সেই বিন্দুটা চৈতন্যের একটা বৃত্তের রূপ নিল; এক টুকরো মন ক্রমে ক্রমে সজাগ হয়ে উঠল যন্ত্রণাভরা একটা শরীরে। মাথায় পাথরের ভার, হাত-পাগুলো অবশ, বুকের ভিতর থেকে-থেকে অসহ্য বেদনার উৎক্ষেপ!

ক্রাইসিস্ কেটেছে একটা। মেঘ নেমেছে মাটিতে। ফিরে এসেছে শরীর—সেই সঙ্গে এসেছে ফিডিং কাপ, এসেছে ওষুধের শিশি, এসেছে থার্মোমিটার, পান্নার রঙের একগুচ্ছ আঙুর—কমল-হীরের মতো আধভাঙা বেদানার দানা। ঘরের ওই যে কোণটায় আবছা অন্ধকারের ভেতর ছায়া-ছায়া দু' তিনজন ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছিল, তারা 'মথ্' হয়ে বাইরের রাত্রির আড়ালে মিলিয়ে গেছে; এখন ওখানে কাশ্মীরী টিপয়ের উপর সেই পুরানো পরিচিত রেডিয়োটা মৃদু গুঞ্জন করছে—জ্বলজ্বল করছে তার সবুজ 'ম্যাজিক আই'।

এই কি ভালো হল? এমনি করে ফিরে আসা? কত বড় মাঠ—সবুজের কী অন্তহীন তরঙ্গ। কত অসংখ্য হরিণ—তাদের গা থেকে লাল শাদা রঙগুলো যেন একরাশ বলের মতো ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল চারিদিকে। ওর সমস্ত মন যেন ওই বলগুলোর মধ্যে মিশে গিয়েছিল—হাত বাড়িয়ে সেটা ধরতে গিয়েও হারিয়ে যাচ্ছিল বার বার।

বেশ লাগছিল খেলাটা। তবু শরীরের ভেতরে ফিরে আসতে হল।

—আমায় একবার ধরবি নন্দা?

এই সকাল বেলাতেই নন্দা কয়েকটা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিচ্ছিল ঘরে। চমকে ফিরে তাকালো।

—একটু বারান্দায় নিয়ে চল নন্দা। ঘরে শুয়ে শুয়ে আর তো ভালো লাগছে না।

ও জানত, নন্দা কিছুতেই রাজী হবে না। আলতো ধমক দিয়ে বলবে, কী পাগলামী করছ বৌদি! ডাক্তার তোমাকে নড়তে পর্যন্ত বারণ করে দিয়েছে! —জেনেই ও বলেছিল কথাটা। বলেছিল দু দিন পরে নিজের কথা নিজের কানে শোনবার জন্যেই।

কিন্তু আশ্চর্য, আজ তো নন্দা রেগে উঠল না। ভারী নরম, প্রায় নিঃশব্দ গলায় বললে, কিন্তু তুমি তো উঠে যেতে পারবেনা বৌদি। ভারী কষ্ট হবে তোমার।

—কিছু কষ্ট হবে না।—ও হাসল। একবারের জন্যে মনে হল, একখানা আয়না সামনে পেলে দেখত নিজের হাসিটা আজও আগেব মতো আছে কিনা। যা দেখেই নাকি বিশেষ করে অনিল ওর প্রেমে পড়েছিল সে-হাসির এখনো একটুখানি জড়িয়ে আছে কিনা ওর ঠোঁটের কোণায়।

—একটু হাতটা ধর নন্দা, তা হলেই আমি ঠিক উঠে যেতে পারব। আজ ভালো আছি—সব অসুখ সেরে গেছে আমার। ও আবার হাসল। ইচ্ছে করল ছোট আয়নাটা চায় নন্দার কাছে, কিন্তু কেমন বাধো-বাধো ঠেকল।

নন্দা কাছে এগিয়ে এল। কোনো কথা বললে না, আস্তে আস্তে ধরে বাইরে নিয়ে এল। ঘর থেকে বারান্দার পথ হাত-দশেকের বেশী না। তবু মনে হচ্ছিল, ও যেন অনেকদিন ধরে অনেক পাহাড় পার হয়ে চলেছে। কিন্তু কষ্ট হচ্ছে না —আজ ছ-মাস পরে শরীরটা অদ্ভুত লঘু হয়ে গেছে ওর। নন্দা এখন ওর হাত ছেড়ে দিলেই ও যেন মাটি ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে যেতে পারবে—পেরিয়ে

যেতে পারবে সামনের বাগানটা, লাল মাটির পথটুকু, দূরের শালবন, পাহাড়ের টিলাটা, রূপনারায়ণপুরের স্টেশন—তারপর—

বারান্দায় বড় ডেক-চেয়ারটায় শুইয়ে দিলে ওকে। পাখির ছানা রেখে দেওয়ার মতো সতর্ক কোমল ভঙ্গিতে ঠিক করে দিলে মাথাটা। দুধের ফেনার মত শাদা শালটাকে সযত্নে বিছিয়ে দিলে শরীরের উপর। তারপর একটু দূরে একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে রইল নন্দা তন্ময় হয়ে।

নন্দার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে ওর কষ্ট হচ্ছিল- তাই সামনের দিকে চোখ মেলে দিলে। মগ্ন-চৈতন্যের সেই প্রখর উজ্জ্বল রোদটা নয়—বাগান, লাল মাটির পথ আর শালবনের ওপরে আধ-পাকা কমলা লেবুর রঙ ঝিল্‌মিল্ করছে। শরতের রোদ। কাছাকাছি কোন নদী থাকলে তার বালিডাঙায় কত কাশফুল দেখা যেত এখন।

ইটের কেয়ারির ভিতরে দুটো একটা সিজ্‌ন ফ্লাওয়ার মুখ খুলছে। কয়েকটা গোলন-চাঁপা আর রজনীগন্ধার মঞ্জরী প্রায় জড়াজড়ি করে হাওয়ায় কাঁপছে। বা-দিকের শাদা হয়ে যাওয়া শিউলিতলা থেকে পচা ফুলের কেমন একটা অস্বস্তিকর গন্ধ ভেসে আসছে ঝলকে ঝলকে।

—তোর দাদা কোথায় নন্দা?—ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে কষ্ট হয় তাই সামনের দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করল।

—কিছু বলছিলে বৌদি?—যেন স্বপ্ন থেকে নন্দা জেগে উঠেছে।

—এই সকালে তোর দাদা আবার গেল কোথায়?

—রজতদা—মানে ডাক্তারবাবুর ওখানে!

রজতদা—মানে ডাক্তারবাবু! কি রকম সামলে নিয়েছে নন্দা! কিন্তু একটুখানি ঠাট্টা করতেও ইচ্ছে হয় না মেয়েটাকে। ভারী ভীতু—ভারী কোমল। ফুলের উপর শিশিরের মতো চোখ দুটো জলে যেন টলটল করছে—সামান্য ছোঁয়া লাগলেই টুপটুপ করে গড়িয়ে পড়বে।

ওকে বিয়ে করলে সুখীই হবে রজত। যে-কেউ সুখী হবে। অবশ্য গায়ের ফর্সা রঙটাকেই যারা বড় করে দেখে তাদের কথা আলাদা।

একটু কষ্ট হল, তবু নন্দার দিকে মাথা ঘুরিয়ে একবারটি তাকিয়ে দেখবার লোভ ও সামলাতে পারল না। তেমনি তন্ময় হয়ে বসে আছে নন্দা। শালবনটা দেখছে? দেখছে পাহাড়টাকে? নাকি রজতকে ভাবছে—রজতের কথাই ভাবছে শুধু?

—আবার এই সকাল বেলাতেই রজতবাবুকে বিরক্ত করা কেন ?—নন্দার কালো বিনুনিতে লাল ফিতের ফাঁসটা দেখতে দেখতে ও বললে, আমি খুব ভালো আছি আজ। মনে হচ্ছে, একেবারেই সেরে গেছি।

নন্দা এবার ওর দিকে চোখ ফেরাল। সেই টলটলে চোখ। আজকে যেন আরো বেশি চকচক করছে। মনে হচ্ছে কেবল কয়েক ফোঁটা জলই নয়—ও দুটোই কখন ঝরঝরিয়ে ঝরে পড়তে পারে।

নন্দার ঠোঁট দুটো খুব অল্প অল্প নড়ে উঠল, যেমন করে মৌমাছির ডানার হাওয়ায় ফুলের পাপড়ি নড়ে ওঠে। আবার নিঃশব্দ স্বর ভেসে এল। আজ আর কোনো কষ্ট হচ্ছে না বৌদি ?

—কিচ্ছু না। একেবারেই নয়।—পুরো ছ'মাস পরে আজ ও সম্পূর্ণভাবে প্রফুল্ল হয়ে উঠল, একটা ছোট্ট কাঁটাও খচ্‌খচ্‌ করল না কোনোখানে।

—এতো খুব ভাল কথা বৌদি।

—ভালো কথা আর কী করে হল ?—ওর মনের অপরিমিত খুশিটা কমলা রঙের রোদের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে লাগল। আবার তো তোর দাদাকে বকাবকি করব। মার্কেটিঙে নিয়ে যাবার জন্যে বিরক্ত করে মারব। তার চেয়ে আমি মরে গেলেই ভালো হত। তোর দাদা বেশ শান্তশিষ্ট মনের মতো একটি বউ ঘরে আনত—সাত চড়েও একটি রা ফুটত না যার মুখ দিয়ে। না রে ?

—কী যে বলছ বৌদি !—অভ্যাসবশে আজও প্রতিবাদ করল নন্দা; কিন্তু সে রাগের ভঙ্গিটা নেই কোথাও—কেমন ভিজে ভিজে গলার স্বর। রজতের কথা ভাবছে নন্দা ?

—কিন্তু আমি মরব না। দু'দিনের ধাক্কা যখন সামলে উঠেছি—আর মরব না। দেখিস, এক মাসের মধ্যেই আবার আগেকার শরীর ফিরে পাব আমি—আবার ব্যাড্‌মিন্টন খেলব তোদের সঙ্গে। তোর দাদার জন্যেই দুঃখ হচ্ছে আমার। দিব্যি আর একটা বিয়ে করার চান্স পাচ্ছিলেন—একটুর জন্যে ফসকে গেল।

—এত কথা বলছ বৌদি—তোমার ক্ষতি হতে পারে।

—ক্ষতি হবে কিরে ? দেখছিস না, এক ফোঁটা জ্বর নেই আজ ? শরীরটা কেমন হালকা হয়ে গেছে। আজ কিন্তু দুটি ভাত খাব আমি, বলে দিস্ ঠাকুরকে।

—বেশ তো, দাদা ওঁরা আসুন। যদি বলেন—নন্দার ঝাপ্‌সা স্বর ভেসে এল।

—ওঁরা আপত্তি করলেই বা শুনছে কে ?—নিজের মনেই ও কথা কইতে লাগল। বাগানের ফুলগুলো, শালবনের ভিতর দিয়ে লাল মাটির পথ—দূরের পাহাড়টা—শরতের ঝিলমিলে রোদ-মাখানো এদের সকলের সঙ্গেই কথা কইতে লাগল ও। নন্দা সামনে না থাকলেও চলত এখন।

—এখন ভাল হয়ে উঠতেই হবে আমাকে : পৃথিবীর ঘনগন্ধ, বাগানের মাটিতে অভ্রের ঝিকিমিকি, পাশাপাশি সই-পাতানো দোলন-চাঁপা আর রজনীগন্ধার দোলা ওর রক্তে রিন্‌রিন্ করতে লাগল : ইস্—এই ছ'টা মাস কী ভাবে কেটেছে! কিছু দেখতে পারিনি—একটা কাজ করতে পারিনি বাড়ির। মণ্টু আর খোকন একেবারে পড়াশুনো করেনি, ঝি-টা ডজন ধরে কাচের গেলাস আর চায়ের পেয়ালা ভেঙেছে, তোর দাদা ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে হোটেল-রেস্তোরাঁয় যা-খুশি খেয়ে বেড়িয়েছে। এবার তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে যেতে হবে—আবার গুছিয়ে নিতে হবে সমস্ত। কত কাজ—কত কাজ আমার।

কেন ছট্‌ফট্ করে উঠল নন্দা ? কেন হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো ? ওর ভালো লাগছে না ? রজতের কথা ভাবছিল—ওকি তাতে বাধা দিচ্ছে বারে বারে ? একটুখানি লজ্জিত হয়ে ও চুপ করল। নন্দা আস্তে আস্তে নেমে গেল বারান্দা থেকে—শিউলি গাছটার পাশে একরাশ বিবর্ণ ঘাসের ওপরে বসে পড়ল।

ও নন্দার দিকে তাকিয়ে রইল। নন্দাকে দেখতে পাচ্ছেনা, দেখছে সাত বছর আগেকার নিজেকে—যখন ওর বয়স ছিল সতেরো, যখন ও থার্ড ইয়ারে পড়ত। অনিল এসে দাদার সঙ্গে গল্প করে চলে যাওয়ার পর এমনিভাবে ও-ও এসে বসত শরৎ ব্যানার্জি রোডের বাড়ির দোতলার বারান্দায়—নিজের মধ্যে মন ডুবিয়ে চেয়ে থাকত খানিকটা সবুজ পোড়ো জমি আর টালির বস্তির দিকে। অনিলকে ভাবতে চাইত, কিন্তু আশ্চর্য—অনিলের মুখখানা কিছুতেই ওর মনে আসত না। খালি চোখের উপর ভেসে উঠত, সিউড়ীতে ময়ূরাক্ষীর ধারে বৃষ্টি থেমে যাওয়া শীতল একটা শান্ত গোধূলি, তালবনের উপর নিখুঁত একটা সম্পূর্ণ রামধনু। অতবড় রামধনু জীবনে ও কোনোদিন দেখেনি।

নন্দা কি ভাবতে পারছে রজতের মুখ ? কিংবা ভাবছে শেষ রাত্রের কোনো গ্যাস পোস্টের স্তিমিত আলোটার কথা ? কিংবা গিরিডির সেই মহুয়া গাছটার এক ঝাঁক হরিয়াল ? কিংবা ?

খুব ভালো হবে রঞ্জতের সঙ্গে নন্দার বিয়ে হলে। খুব খুশি হবে ও। কতদিন বিয়ে হয়নি বাড়িতে। সানাইয়ের সুর—নানা রঙের শাড়ি—হাসি, গান, কোলাহল, চারদিকের জোরালো আলোগুলোতে চেলী চন্দনের রঙ। কতদিন দেখেনি। সেই বিয়ের দিনে আবার পাঁচ বছর পরে ও বেনারসী পরবে একখানা; ফুলশয্যার রাত্রে যে গন্ধের শিশিটা উজাড় করে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল ওর শাড়িতে, ওদের বিছানায়, আবার তাই একটু মেখে নেবে নতুন করে। নন্দার এই রাতটির মধুচক্র থেকে ও-ও চুরি করে নেবে একটুখানি, সংগ্রহ করে রাখবে একছড়া মালা আর একটুখানি চন্দন; নিরিবিলি সুযোগ পেলেই সেই চন্দনের ফোঁটা এঁকে দেবে অনিলের কপালে, মালাটা ঝুলিয়ে দেবে গলায়। অনিল আশ্চর্য হয়ে একটাও কথা বলবার আগেই খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে পালিয়ে যাবে সামনে থেকে—পাঁচ বছর আগে যেমন করে পালিয়ে যেত!

কল্পনাটা ওর মনে একটু একটু করে নেশার মতো ঘনিয়ে আসতে লাগল। আবার একটা হাসির অস্পষ্ট রেখা ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণায়। দেড় মাস আগে যখন ওকে হাসপাতাল থেকে অনিল নিয়ে এল—সেদিন কেউ কোনো কথা বলেনি; কিন্তু ও বুঝতে পেরেছিল—বুঝতে পেরেছিল সকলের মেঘলা মুখের দিকে তাকিয়ে। ডাক্তারেরা শেষ জবাব দিয়েছে। আমাদের আর কিছু করবার নেই—এখন তোমাদের মধ্যে গিয়েই শেষের ক'টা দিন শান্তিতে কাটিয়ে দিক। আর সেই শান্তিতে যাতে এতটুকুও ব্যাঘাত না হয় সেই জন্যেই অনিল ওকে এখানে নিয়ে এসেছে—এই শালবনে, লাল মাটির এই পথের ধারে, আধ-পাকা কমলা লেবুর মতো এই ঘুম্-ঘুম্ রোদের ভেতরে।

গত দু দিন ধরে সেই ছুটির ডাক ও শুনেছিল। গলার ওপরে সাপের বেড়ীর মতো কী একটা পাক দিয়ে দিয়ে ধরছিল বার বার। ঘরের কোণে যেখানে পরিচিত রেডিয়োটার 'ম্যাজিক আই' জ্বলছে, ওখানে দাঁড়িয়ে শাদা-শাদা দু' তিনজন কী যেন আলোচনা করছিল ফিস্‌ফিস্ গলায়। আর ছিল সীমানাহীন একটা মাঠের ভিতর অসংখ্য অগণিত হরিণের রঙ—একরাশ রঙিন বলের মধ্যে নিজেকে ও খুঁজে ফিরছিল, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিল না কিছুতেই।

কিন্তু সে-ঘোর ওর কেটে গেছে। যে-শরীরটাকে ফেলে ও চলে যেতে চাইছিল—এখন সেই শরীরটাকেই গভীর মমতার সঙ্গে ও জড়িয়ে থাকতে চাইছে। নিজের শুভ্র শীর্ণ ডান হাতখানা ও চোখের সামনে তুলে ধরল।

আঙুলগুলো যেন হাতীর দাঁত দিয়ে গড়া—বিবর্ণ নীরক্ততার ওপরে আংটির চুনীটা জমাট রক্তের মতো টক টক করছে। তবু হাতখানাকে ওর ভালো লাগল—ভালো লাগল সমস্ত শরীরটাকে—ভালো লাগল আলো-গন্ধ-মাটির মধ্যে এমনি নিবিড় হয়ে বসে থাকতে।

—আর ভয় নেই, এবার আমি বাঁচব। আর আমি মরব না।—হাত-খানাকে ও বুকের উপর নামিয়ে আনল, অনুভব করতে চাইল নিজের জীবনের স্পন্দন। বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে—বেঁচে থাকার কথা ভাবতেও আশ্চর্য আনন্দে ভরে যাচ্ছে আমার মন। মাত্র চব্বিশ বছর আমার বয়েস—এখনো কোনো কিছু আমার শুরুই করা হয়নি। খুব ভালো আছি আজ—ছ' মাসের মধ্যে এত ভালো কখনো থাকি নি। এখন আমি অনেকদিন বাঁচব!

হ্যাঁ। নন্দার বিয়েব দিনে। সেই দিনই আরম্ভ করতে হবে আবার। হঠাৎ কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে গলায় মালা ঝুলিয়ে দিলে কি রকম হবে অনিলের মুখের চেহারা? কৌতুকভরা সুখের আবেশে ওর মন ডুবে যেতে লাগল। কোন্ শাড়িটা পরব? ওই আকাশের মতো মৃদু নীল যার রঙ? কিংবা লাল মাটির পথটার লাল আভা দিয়ে যেটা জড়ানো? কোন্‌টা পরব আমি—কোন্‌খানা?

আসন্ন সানাইয়েব সুরে, আগামী সুগন্ধের রোমাঞ্চে, ভালো হয়ে—সম্পূর্ণ হয়ে বেঁচে থাকার আনন্দে ও এমনভাবে মগ্ন হয়ে গেল যে টেরই পেল না কখন গেট দিয়ে ঢুকল অনিল আর ছোকরা ডাক্তার রজত। দেখতেই পেল না কখন নন্দার ভীতিব্যাকুল মুখের ওপরেও একটুখানি লজ্জার আভাস দোল খেয়ে উঠল। এমনকি অনিল আর রজত যখন ওর পাশে এসে দাঁড়াল, রক্তবিন্দুর মতো চুনীর আংটিপরা শীর্ণ শুভ্র হাতখানা রজত তুলে ধরে যখন পরীক্ষা করতে লাগল—তখনো না—তখনো ওর ঘোর ভাঙল না। তাকিয়েও দেখল না বারান্দার কোণায় কখন অনিলকে ডেকে নিয়ে গেল রজত।

—আপনার মা-কে এখুনি টেলিগ্রাম করে দিন্ অনিলদা। আর দেরি করবেন না—

—কিন্তু আশ্চর্য ভালো ছিল সকাল থেকে—একটুও কষ্ট ছিল না—সব জেনে, সব বুঝেও বলতে চাইল অনিল। রজতকে নয়—যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিতে চাইল শেষ চেষ্টায়।

—'টি-বি'র লাস্ট স্টেজে ওটা জীবনের আলেয়া অনিলদা। রাতটাও বোধ হয় কাটবে না।

অনিল জানে—রজতের চেয়ে বেশি করেই জানে। তৈরিও হচ্ছিল একটু-একটু করেই। তবু পাংশু হয়ে গেল মুখ। নন্দার মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল না—কেবল শরীরটাকে এলিয়ে দিলে থামের গায়ে, নইলে হয়তো মাটিতেই লুটিয়ে পড়ত।

—আপনি থাকুন, আমিই বরং টেলিগ্রামটা করে আসছি—রজত বলল।

কিন্তু ও তথনো স্বপ্ন দেখছিল। আর নিজের অজ্ঞাতেই আস্তে আস্তে আকাশ-মাটি-রোদ-শাড়ি আর সানাইয়ের সুর কথন মুছে যাচ্ছিল একটু-একটু করে।

আবার সেই মেঘ হয়ে ভেসে যাওয়া। আর নীচে নিবিড়-উজ্জ্বল সবুজ মাঠের ভিতর সেই অজস্র অসংখ্য হরিণের রঙ।

বসন্তপঞ্চম

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

কলেজ স্ট্রীটের ন্যাশনাল স্টোর্সে কলমের জন্যে আমার সপ্তাহে দু'বার-একবার ক'রে না গেলে চলে না, তার মানে এই নয় যে, আমি সপ্তাহে দু-বার ক'রে কলম বদলাই। আমার কলম-বিশেষজ্ঞ বন্ধু বিজয় সেনের হাতে পুরোনো কলমটা তুলে দিয়ে অপেক্ষা করি। তিনি ফ্লো কমান বাড়ান, নিবের অবস্থানটি একটু নেড়ে-চেড়ে ঠিক ক'রে দেন। তারপর আমাকে কলমটা ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, 'এবার লিখে দেখুন', তখনকার মতো বেশ লেখা পড়ে ; কিন্তু দু-চার দিন বাদে আবার যা তাই।

বিজয়বাবু নানারকম মন্তব্য করেন, 'দোষটা কলমের নয়', কোনোদিন বলেন, 'ফাউন্টেন পেন বাদ দিয়ে আপনার খাগের কি পাখের কলমেই লেখা ভালো।'

কোনোদিন বা বলেন, 'আপনার ম্যানিয়া হয়েছে মশাই, কলমের কিছু হয় নি।'

দীর্ঘ দিনের পরিচয়ে আমরা ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক পার হ'য়ে আরও ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছি। তাই তাঁর ঠাট্টায় আমি রাগ করি নে। আর আমি তাঁর খুব ব্যস্ততার মুহূর্তে গিয়ে হাজির হ'লেও তিনি বিরক্ত হন না। স্মিতমুখে মাথা নাড়েন। হাতের কাজ সেরে শুধু কুশল প্রশ্ন নয়, দু-চার মিনিট সুখ-দুঃখের গল্পও করেন।

বছর পঁয়তাল্লিশেক বয়স হয়েছে ভদ্রলোকের। একটু লম্বা বড়ো বড়ো চুল রাখতে ভালোবাসেন। সেই নিবিড় কালো ঘন চুলের মধ্যে আজকাল রূপালী রেখা বেশ চোখে পড়ে। শ্যামবর্ণ, ছিপছিপে চেহারার সৌম্যদর্শন মানুষটি। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মিষ্ট ভাষায় শিষ্টাচারে সেলসম্যানের পক্ষে একেবারে আদর্শ। তাঁর কাউন্টারের সামনে ক্রেতাদের ভিড় লেগেই থাকে। পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের এবং তাদের মধ্যে স্কুল-কলেজের কিশোরী তরুণী

ছাত্রীদের সংখ্যাই বেশি দেখা যায়। কলম সম্বন্ধে ছাত্রীদের ভারি কৌতূহল। নানারকম কলমের দর-দাম থেকে শুরু ক'রে তাদের উপযোগিতা উৎকর্ষ অপ-কর্ষের কথা বিজয়বাবুকে বলতে হয়।

আমি একদিন ঠাট্টা ক'রে বলেছিলাম, 'আপনি ভাগ্যবান পুরুষ। লক্ষ্মীদের পায়ের ধুলি আর কারো ঘরে এত পড়ে না।'

বিজয়বাবু একটু হাসলেন, তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'ঘরেতে এলো না সে তো কাউন্টারে নিত্য আসা-যাওয়া।'

তাঁর কৌতুকের সঙ্গে এমন একটু বিষণ্ণতার সুর মিশে রইলো যে আমি ভারি অপ্রস্তুত হলাম। তিনি অবিবাহিত সেকথা আমার জানা ছিলো।

আমার ভাবান্তর দেখে তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'দিন, আপনার কলম দিন। কি হয়েছে দেখি।'

সেদিন কলম দেখাবার কোনো দরকার ছিলো না। কিন্তু আজ দরকারের সময় এসে দেখি তিনি নেই। গ্লাস-কেসে নানা রঙের নানা নামের নানা দামের ফাউন্টেন পেন। তার পিছনে বিজয়বাবুর ছোট্টো টুলটি শূন্য। তাঁর সহকারী বলাই জন দুই ক্রেতার সঙ্গে কথা বলছে।

'বিজয়বাবু কোথায় গেছেন?' বলাইকে জিজ্ঞাসা করলাম।

বলাই আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললো, 'তিনি আর-একজনের সঙ্গে কথা বলবার জন্য বাইরে গেছেন। তাঁর ফিরতে খুব—খুব দেরি হবে। কলমটা আজ আমাকে দিয়েই পরীক্ষা করিয়ে নিন, কল্যাণবাবু।'

বললাম, 'তা না-হয় নিলুম। কিন্তু তুমি অত হাসছো কেন? ব্যাপার কি?'

বলাই হেসে বললো, 'বিজয়বাবুর এতদিনে বিয়ের ফুল ফুটেছে।'

দোকানে আর-কোনো বাইরের লোক ছিলো না। কিন্তু আমিও তো ভিতরের লোক নই। তাই হোসিয়ারী ডিপার্টমেন্টের চারুবাবু, বুড়ো-ক্যাসিয়ার প্রমথবাবু, স্টেশনারী ডিপার্টমেন্টের বিনোদবাবু সবাই প্রায় একসঙ্গে ধমক দিয়ে উঠলেন, ও কি হচ্ছে, বিজয়বাবু তোমার কত সিনিয়র। আর তুমি—'

বলাইয়ের বয়স আঠারো-উনিশের বেশি নয়। টুইলের হাফ-সার্টে আর ব্যাকব্রাস-করা-চুলে খুব স্মার্ট দেখায় বলাইকে। কিন্তু একসঙ্গে এত লোকের ধমক খেয়ে বলাই একেবারে থ' ব'নে গেলো। হোসিয়ারীর চারুবাবু মুখ নিচু ক'রে শাদা গোঁফের মধ্যে হাসি লুকোলেন, তা আমার চোখ এড়ালো না।

'আচ্ছা, আমি আর-একদিন আসবো।'

বলাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। রাস্তা পার হ'তেই বিজয়বাবুর সঙ্গে দেখা। শুধু তিনি নন, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আর-একজন ভদ্রমহিলা। মাথায় প্রায় বিজয়বাবুরই সমান। বরং মনে হয় যেন বিজয়বাবুর চেয়েও একটু বেশি লম্বা। দৈর্ঘ্যে সাড়ে পাঁচ ফুটের কম হবেন না তিনি। প্রস্থ সেই অনুযায়ী না হ'লেও বেশ পুষ্টাঙ্গী বলা চলে। গায়ের রং গৌর। মুখখানা বেশ ভরাট, চেহারায় খানিকটা রাশভারি ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের কম হবে না। পরনে শাদা খোলের শান্তিপুরী শাড়ি। পাড় বেশ চওড়া। রংটিও কাঁচা সবুজ। আভরণ খুব অল্প। গলায় চিক্‌চিকে একটু হার। বাঁ-হাতে কালো ফিতের একটি সোনার ঘড়ি। আর-কোথাও কিছু নেই। হাতে শান্তিনিকেতনী একটি ভ্যানিটি-ব্যাগ আর দু-খানা মলাটে-ঢাকা মোটা বই। লক্ষ্য করলাম সিঁথির রেখাটি শাদা। আমাকে দেখে বিজয়বাবু একটু যেন অপ্রস্তুত হলেন। কিন্তু আমি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই তাড়াতাড়ি আমাকে কাছে ডাকলেন, 'ওকি, চ'লে যাচ্ছেন কেন কল্যাণবাবু, আসুন আলাপ করিয়ে দিই। কল্যাণকুমার রায়। সাহিত্যিক। আর শ্রীমতী সুমিতা দাশগুপ্তা। অধ্যাপিকা।'

আমরা নমস্কার বিনিময় করলাম।

শ্রীমতী দাশগুপ্তা স্মিতমুখে বললেন, 'ও।'

আর আমি সেটুকুও না ব'লে শুধু স্মিতমুখ হ'য়ে রইলাম।

এরই মধ্যে দক্ষিণগামী ডবলডেকার স্টেট-বাসটি এসে পড়লো। তিনি হাত উঁচু ক'রে বাসটাকে থামিয়ে তাতে ওঠবার আগে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাই। আজ বড়ো তাড়া আছে।'

বিজয়বাবু বললেন, 'এই বাসেই যাবে?'

সুমিতা বললেন, 'হ্যাঁ, বিজয়, যাই! কল্যাণবাবুকে নিয়ে একদিন যেয়ো-না আমাদের ওখানে। আলাপ করবো। দয়া ক'রে যাবেন একদিন।'

আমি স্মিত সৌজন্যে ঘাড় নাড়লাম।

সুমিতা দাশগুপ্তের বাড়িতে যাওয়া আর হয়ে ওঠে নি। তবে তাঁর কাহিনী বিজয়বাবু একদিন বলেছিলেন। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের শ্রীমন্ত কেবিনের

নিরালা কোণে আমরা ব'সে চা খাচ্ছিলাম। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছিলো। আকাশে পুরু মেঘ থাকায় দুপুরকে আর দুপুর ব'লে মনে হচ্ছিলো না। বিজয়-বাবুর পকেটে একটি লেডিজ শেফার্স পেন দেখে কৌতূহলটা আবার আমার মনে জেগে উঠলো। বললাম, 'এমন দিনে শুধু তারে নয়, আমাকেও সব কথা বলা যায়। বলুন বিজয়বাবু।'

বিজয়বাবু আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, 'আপনি কিছুকাল থেকেই এ-ধরনের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। আর আমাদের দোকানের কলিগরা, এমনকি ছোকরা বলাই পর্যন্ত হাসি-তামাশায় আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছে। কিন্তু সত্যি বলছি, বলবার বেশি-কিছু নেই কল্যাণবাবু।'

বললাম, 'বেশ, বেশি-কিছু না বলতে চান অল্প-কিছুই বলুন।'

আরো-একটু ওজর-আপত্তির পর বিজয়বাবু মুখ খুললেন, মন খুললেন:

আমি কেন যে বিয়ে করি নি তা আপনাকে আকারে-ইঙ্গিতে আরো কয়েকবার বলেছি। যে-চাকরি করি আর যা মাইনে পাই তাতে বিয়ে করা চলে না। দোকানের সেলসম্যানরা কি বিয়ে করে না? করবে না কেন, আমাদের দোকানের এক বলাই ছাড়া সবাই বিবাহিত। প্রত্যেকেরই ছেলে-মেয়ে এমন কি নাতি-নাতনী পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু আমার সেভাবে বিয়ে করবার জো ছিল না। আমাদের পরিবারে আমার কাকাদের মধ্যে ভাইদের মধ্যে কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার, কেউ প্রফেসার, কেউ বড়ো সরকারী চাকুরে। আর আমি হংস মধ্যে বক। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, রোজগারে সবচেয়ে অধম। আমার আবার বিয়ে! আমি তো জানি, বাড়িতে ওরই মধ্যে যার রোজগার কম, যার ক্ষমতা কম তার বউয়ের কি দশা। সব সময় নিচু হ'য়ে তাকে থাকতে হয়। আর সেই তুলনায় আমার বউকে তো একেবারে ঝি হ'য়ে থাকতে হবে। তাই বিয়ে আমি করবো না এটা প্রথম বয়সেই ঠিক ক'রে ফেলেছিলাম। দিব্যি আছি। কাকিমাদের, বউদিদের ফাইফরমায়েস খাটি। আর অবসরমতো বই-টই পড়ি। সেই অবসর কতটুকুই বা জোটে। সকাল আটটায় বাড়ি থেকে বেরোতে হয় আর কাজকর্ম সব সেরে ফিরি রাত দশটা সাড়ে-দশটায়। তাতেও কোম্পানির সেক্রেটারী ম্যানেজারের মন ওঠে না। নিজের কথা ভাববারই সময় নেই তো বউয়ের ভাবনা। তবু আমার ছোটো ভাই ইঞ্জিনীয়ার অজয়ের যখন গ্রাজুয়েট আর গীতশ্রী উপাধি-পাওয়া সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলো, মনটায় যে একেবারে নাড়াচাড়া লাগে নি এ-কথা হলফ ক'রে বলতে পারবো না। অবশ্য

তার বিয়ের আগে মা অনেক রাত্রে আমার ঘরে এসে আমার হাত ধ'রে কেঁদে পড়েছিলেন, "আমার কথা শোন বিজু, ওর আগে তুই বিয়ে কর। তুই হ'লি বড়ো। তোর আগে ও বিয়ে করবে এ কি ম্লেচ্ছপনা শুরু হয়েছে এ-সংসারে।"

আমি হেসে বলেছিলাম, "ম্লেচ্ছপনা হবে কেন মা, আজকাল তো এরকম হচ্ছে। তাছাড়া আমি তো সম্মতিই দিয়েছি। কোনদিনই বিয়ে করবো না।"

মা রাগ ক'রে বলেছিলেন, "কেন করবি নে শুনি। তোর যোগ্য মেয়ে বিয়ে কর তুই। গরিবের ঘরের অল্প লেখাপড়া জানা মেয়ে। তেমন সম্বন্ধ তো আমার হাতে আছে। বেশ, এ-বাড়িতে থাকতে তোর লজ্জা করে তুই আলাদা বাসা ক'রে থাক। আমি তোর কাছে বছরে ছ-মাস গিয়ে থাকবো।"

বলেছিলাম, "তার কি দরকার মা, তার চেয়ে আমি তোমার কাছে সারা-বছর থাকবো সেই ভালো।"

অল্প মাইনেয় আলাদা বাসা ক'রে স্ত্রী আর বেশি ছেলেপুলে নিয়ে কি দুর্দশায় ভুগতে হয় তা আমি বিনোদ দাসের বাসায় গিয়ে একবার দেখেছিলাম।

তার চেয়ে বেশ আছি! মাস অন্তে যা পাই হাত-খরচটা রেখে মা-র হাতে সব ধ'রে দিই। আর কোনো ঝামেলা-ঝক্কি নেই।

তারপর সেই মা-ও একদিন গেলেন! আমি বাঁচলুম। আর বিয়ের তাগিদ শুনতে হয় না। কাকারা যাঁরা আছেন সবাই যুক্তিমার্গী মানুষ। আমার যুক্তির পথে কেউ বাধা দিতে আসেন না। তাদের সময়ই বা কই, বছরে কতটুকুই বা তাদের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই, মাদ্রাজে তাঁরা ছড়িয়ে আছেন। কলকাতায়ও কেউ-কেউ আলাদা বাড়ি-গাড়ি করেছেন যারা তা পারেন নি তাঁরাই শুধু পৈতৃক বাড়ি আগলে প'ড়ে আছেন।

আর আছি আমি। বেশ আছি। এতদিন বাদে ছাদের ওপর একখানা ঘর পেয়েছি। একজোড়া টেবিল-চেয়ার আর একটি বইয়ের র‍্যাক। ইংরেজি বিদ্যে তত নেই, আপনাদের ওই বাংলা গল্প-উপন্যাসই পড়ি। সব যে বুঝি, সব যে ভালো লাগে তা নয়, তবু পাতা উল্‌টে যাই। পড়তে-পড়তে যেদিন বড্ডো ঘুম পায় বই বন্ধ ক'রে ঘুমিয়ে পড়ি। আর যে-রাত্রে একেবারেই ঘুম আসে না জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। গরাদের ফাঁক দিয়ে কখনো বা চাঁদ দেখা যায়, কখনো বা দুটি-একটি তারা। ভাবি, একজন মানুষের পক্ষে এই তো যথেষ্ট, এর চেয়ে বেশি আর কি দরকার।

কোনো দরকারই ছিলো না তবু একদিন—মানে বছর তিনেক আগে সুমিতার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো। নতুন কলম কিনতে এসেছে। সেই সঙ্গে পুরানো কলমটাও নিয়ে এসেছে রিপেয়ার করাবার জন্যে। আমি প্রথমে চিনতেই পারি নি। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কলম বাছতে-বাছতে দাম জিগ্যেস করতে-করতে ও হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকায়, "আরে, বিজু না, তুমি যে এখানে!"

হেসে বললাম, "আমি এখানে না থাকলে তুমি কলম কিনতে কার কাছ থেকে!"

সুমিতা হেসে বললো, "তা বটে। রাজসাহীর কথা তোমার মনে আছে?"

রাজসাহীতে সুমিতার বাবা ছিলেন সিভিল সার্জন, আর আমার বাবা সাব জজ। বাড়ি ছিলো পাশাপাশি। দুই পরিবারের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলো। তখন সুমিতার বয়স দশ আর আমার বারো। আমি ওকে উঁচু ডাল থেকে কাঁচা পেয়ারা পেড়ে দিতাম, আর ও আমাকে আচার, জেলি আর নিষিদ্ধ বই জোগাতো। ওর সঙ্গে আমারই ভাব ছিলো সবচেয়ে বেশি। আমার দাদারা এ নিয়ে আমাকে হিংসে করতেন। তারপরও বড়ো হ'য়ে সুমিতার সঙ্গে দু-একবার এই কলকাতাতেই দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু ও তখন কলেজে-পড়া রূপসী, বিদুষী মেয়ে। ক্লাসের ছাত্ররা থেকে আরম্ভ করে তরুণ প্রফেসররা পর্যন্ত ওর অনুরক্ত, আর আমি পাড়ার আকাট মুখ ছোকরা। আমি কেন ওর কাছে পাত্তা পাবো। পাত্তা পাওয়ার জন্যে আমার যে আগ্রহ ছিলো তাও না। শুধু চাল-চলনে, আচার-আচরণে নয়, মনের দিক থেকেও আমি নিচের সিঁড়িতে নেমে এসেছিলাম।

আশ্চর্য, এতদিন বাদে সত্যিই তা হ'লে ও আমাকে চিনতে পারলো। চিনতে যখন পেরেছে আমিই বা অকৃতজ্ঞ হবো কেন, আমিও আগের পরিচয় স্বীকার করলাম। যত বেশি পারা যায় কমিশন বাদ দিয়ে দাম নিলাম ওর কাছ থেকে। স্টকে যা ছিলো তার মধ্যে বেছে সবচেয়ে ভালো কলমটাই দিলাম। এক কৌটো কালি এগিয়ে দিয়ে বললাম, "এর দাম লাগবে না", মানে দামটা আমি নিজের পকেট থেকে দিলাম। পুরোনো কলমটা ও রেখে গেলো মেরামত করবার জন্য। বললাম, "দিন দুই পরে এসে নিয়ে যেয়ো।"

দ্বিতীয় দিনে কলমের খবর নেওয়ার জন্যে সুমিতা আমাকে কলেজ থেকে ফোন করলো, "ঢ্যাখো, আমি গিয়ে উঠতে পারবো না, বড্ডো কাজের চাপ। তুমি কলমটা আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দাও।"

বললাম, "দিতে পারতাম। কিন্তু আমার যাঁরা মালিক তাঁরা যে ছুটি দেবেন না। আমারই বা সময় কই।"

ফোনের ভিতর দিয়ে হাসির শব্দ শুনতে পেলাম, "বুঝতে পেরেছি। তা হ'লে, যেদিন ছুটি আছে সেদিনই এসো। রবিবার সকালে। অবিশ্যি। এসো, এক সঙ্গে ব'সে চা খাবো।"

কলমটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে অগত্যা যেতেই হ'লো। সত্যেন দত্ত রোডের ওপর বিরাট তেতলা বাড়ি। আমি এসেছি শুনে ও একতলার ঘরে নেমে এলো। বড়ো বসবার ঘরখানায় ওর ব্যারিস্টার দাদার মক্কেলরা ভিড় ক'রে রয়েছেন। ও আমাকে সেই ভিড়ের ভিতর থেকে তুলে পাশের ছোট্টো আর-একখানা ঘরে নিয়ে এলো। সে-ঘর থেকে সবুজ ঘাসের লন দেখা যায়। চোখে পড়ে নির্গন্ধ মরসুমী ফুলের টব। মাঝখানে ছোটো একটি টেবিল। তার দু-দিকে দু-জনে মুখোমুখী বসলাম।

সুমিতা প্রথমেই বললো, "সত্যিই খুব ভাল কলম তোমার। কি চমৎকার লেখা পড়ছে দেখবে?"

বললাম, "কই দেখি।"

সুমিতা চাকরকে ডেকে ওপর থেকে একটা লম্বা-মতো খাতা আনিয়ে নিলে। তারপর পাতা খুলে আমাকে দেখালো। ছোটো-ছোটো ইংরেজি অক্ষরে পাতা ভরতি।

সুমিতা হেসে বললো, "থিসিস তৈরি করছি।"

কী সাবজেক্টে তা আমিও জিগ্যেস করলাম না, সুমিতাও বললে না।

হেসে বললাম, "হ্যাঁ, ফ্লো তো ভালোই দেখা যাচ্ছে। কি মজার কাণ্ড ঢ্যাখো। আমরা দু-জনেই কলমের কারবারী। যত অমিলই থাকুক, এই মিলটুকু আমাদের মধ্যে আছে।"

সুমিতা একটু যেন গম্ভীর হ'য়ে গেলো। তারপর খাতাটা ফেরত পাঠিয়ে চায়ের সেট আনতে হুকুম দিলো। নিজেই চা করলো, চা ঢাললো কাপে।

দু-জনে দু-জনের পরিবারের আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নিলাম।

তারপর আমি বললাম, "তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না তো ?"

সুমিতা বললো, "স্বামী কোথায় যে আলাপ করিয়ে দেবো ! তোমার খবর কি ? তোমার ছেলেপুলে ক'টি ?"

হেসে বললাম, "সেই মহাভারতের যুগ আর নেই। এ-যুগে ছেলেপুলে চাইলে বিয়ে করতে হয়।"

সুমিতা বললো, "তা বটে। কিন্তু বিয়ে কেন করো নি ?"

সত্যি কথাই বললাম।

জিগ্যেস করলাম, "আর তুমি কেন বিয়ে করলে না ?"

সুমিতা একটু হাসলো. "বর জুটলো না বলে।"

বুঝতে পারলাম কথাটা এড়িয়ে গেলো সুমিতা। কথাটা আমার মতো অত সহজ নয়।

রিপেয়ার-করা কলমটা পকেট থেকে বের ক'রে ওর হাতে দিলাম। ও সেই কলম দিয়ে একটু লিখে বললো, "বাঃ, একেবারে নতুন কলমের মতো লেখা পড়ছে যে, কত খরচ পড়লো বলো ?"

বললাম, "অতি সামান্য। সে-হিসাব আর-একদিন করা যাবে। আজ উঠি।"

সেই কলম মেরামতের খরচটা মিটিয়ে দেওয়ার জন্যে দিনকয়েক বাদেই সুমিতা ফের একদিন আমাদের দোকানে এসে হাজির হ'লো, আমি সেদিনও দাম নিলাম না। দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম।

তারপর প্রায়ই সে আসতে লাগলো। আপনার মতো তার কলমও মাঝে মাঝে বিগড়ায়। তা ঠিক করে নিতে হয়। তা ছাড়া টুকিটাকি আরো জিনিসপত্তরও সুমিতা আমাদের দোকান থেকে কেনে। কলিগ্‌রা গা টেপা-টেপি করে। কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার যে এত আলাপ আছে তা ওরা ধারণাও করতে পারে নি। আর এ-মেয়ে কী সে-সে মেয়ে ? একেবারে রাজেন্দ্রাণী। বিনোদবাবু পর্যন্ত হাসি-ঠাট্টা করেন। বলেন, "আপনি বুঝি এই জন্যেই বিয়ে করেন নি বিজয়বাবু। তা ও-মেয়ের জন্যে এক জন্ম কেন, একান্ন জন্মও অপেক্ষা ক'রে থাকা যায়।"

আমি জবাব দিই, "ছি-ছি-ছি. কি যে বলেন। জানেন ওরা কত বড়ো-লোক ! আর দেশী বিদেশী কতগুলো ডিগ্রী ওর নামের সঙ্গে জুড়ে আছে।

আমি তো ওর চাকর হওয়ারও যোগ্য নই। আমি কলম সারাই, আর ও সেই কলমে লেখে, আমাদের মধ্যে শুধু এইটুকুই সম্পর্ক।”

মাস ছয়েক ধ'রে এমনি দেখা-সাক্ষাৎ চললো। তারপর ও হঠাৎ একদিন এসে বললো, “বিজু পুরী যাবে ?”

আমি অবাক হ'য়ে বললাম, “পুরী ?”

সুমিতা বললো, 'হ্যাঁ, চলো না, বেড়িয়ে আসি, দাদা-বউদিরা শিলং যাচ্ছেন। ওঁদের সঙ্গে যেতে আমার ইচ্ছে নেই। পাহাড়ের চেয়ে আমার সমুদ্রই বেশি ভালো লাগে।”

বললাম, “কিন্তু আমি তো ছুটি পাবো না।”

ও বললো, “একা-একা যেতে ইচ্ছে করছে না। অন্তত দু-তিন দিনের জন্যেও যেতে পারো না ? তুমি শুধু আমাকে পৌঁছে দিয়ে চ'লে আসবে।”

বললাম, “তা হয়তো পারি।”

ও আমার আপত্তি মোটেই শুনলো না। আমার গাড়ি-ভাড়াটা ও-ই দিলো। সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিটই কাটলো দু-খানা।

হোটেল-নির্বাচনও, ওর পছন্দ মতোই করতে হ'লো। সমুদ্রের ধারে দোতলায় পাশাপাশি দুটো ঘরই আমরা পেলাম। ঠিক তিনদিনে ফিরে আসতে পারলাম না। সপ্তাহখানেক লাগলো। ক'টা দিন খুব হৈ হৈ ক'রে কাটলো। সকাল সন্ধ্যা দু-বেলা বেড়ানো, দুপুরে স্নান। মনে হ'লো, বয়স যেন দু-জনেরই বিশ বছর ক'রে ক'মে গেছে। তারপর অনেক রাত অবধি অন্ধকারে বালির মধ্যে সমুদ্রকে সামনে রেখে ব'সে থাকা। আকাশে তারা। আমার সেই জানলার দুটি-একটি নয়, অসংখ্য। অগুনতি তারা আর অগুনতি তরঙ্গের মাঝখানে ব'সে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমি একদিন জিগ্যেস করলাম, 'এবার বলো, সুমিতা, কেন তুমি বিয়ে করো নি। তোমার এত রূপ, এত বিদ্যা, এত সম্পদ—। আমার মতো অভাজন তুমি নও। কেন তবু তুমি বিয়ে করলে না।”

সুমিতা একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বললো, “দ্যাখো, এ-প্রশ্নের জবাবে প্রথম বয়সে একেক জনকে একেক কথা বলতাম। আজ আর একটি কথাও খুঁজে পাই নে। সব যেন মন থেকে হারিয়ে গেছে। যতটা মনে পড়ছে, কারো ভালোবাসা পেলাম না ব'লেই আমার বিয়ে করা হ'লো না।”

আমি অবাক হ'য়ে বললাম, "এ-কথা কি বিশ্বাস করতে বলো? তোমার মতো মেয়ে—"

সুমিতা বাধা দিয়ে হেসে বললো, "যার এত রূপ, এত বিদ্যে, এত বুদ্ধি তাই না? কিন্তু জানো বিজু, ভালোবাসা রূপ-গুণ, বিদ্যা-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে না। যে পাবার সে ও-সব না থাকলেও পায়। যে পায় না, সে সব থাকলেও পায় না।"

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

সুমিতা বলতে লাগলো, "তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, ভালোবাসা আসে নি। তবে অনেক সম্বন্ধ এসেছিলো। বড়ো-বড়ো সম্বন্ধ। দাদারা ভাবতেন আরো বড়ো আসুক। আমিও হয়তো তাই ভাবতাম। এমনি ভাবতে-ভাবতেই দিন চ'লে গেলো। আমার অবশ্য আরো ভাবনা ছিলো। নিজের কেরিয়ারের ভাবনা, কেরিয়ারের সাধনা। ভাবলাম তাতেই বেশ ডুবে থাকা যাবে। কিন্তু জ্ঞান-সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার মতো শক্তি ক'জনের থাকে! আমার যে তা নেই, সেই জ্ঞান যখন হ'লো তখন সময় গেছে।"

বললাম, "সময় গেছে এ-কথা কেন বলছো সুমি, সময় হয়তো এখনো আছে।"

সুমিতা হঠাৎ আমার হাত চেপে ধ'রে বললো, "আছে! সত্যিই তুমি একথা বিশ্বাস করো বিজু! একটু আগে রূপ, সম্পদ, বিদ্যা, বুদ্ধির কথা বলছিলে। কিন্তু ও-সব অনেক সময় অনেকের বেলায় বাধা। অন্যের কাছে বাধা, কিন্তু এমন ঢেউ কি নেই যা সব ভাসিয়ে নিতে পারে!"

কতক্ষণ ব'সেছিলাম ঠিক নেই। হঠাৎ হোটেলের চাকরের ডাকে আমাদের চমক ভাঙলো। দেরি দেখে সে আমাদের খুঁজতে এসেছে।

পরদিনই আমরা কলকাতায় চ'লে এলাম। আসার সময় সুমিতার যেমন বেশি গরজ ছিলো, ফেরার গরজটাও তেমনি ওরই বেশি দেখলাম। আমার মনে হ'লো ও লজ্জা পেয়েছে। অন্ধকার সমুদ্রতীরে দ্বিতীয় রাত সুমিতা কাটাতে চায় না। আমিই বা কেন কাটাতে যাবো। আমারও চাকরির টান আছে।'

বিজয়বাবু থামলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর?'

বিজয়বাবু একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বললেন, "তারপর আর কি। আপনাদের কার যেন একখানা উপন্যাসে পড়েছিলাম, কলকাতাও সমুদ্র,

জনসমুদ্র। কিন্তু সেই অন্ধকার নির্জন সমুদ্র থেকে এ-সমুদ্র অনেক আলাদা। এখানে আমরা কেউ অসম্ভব স্বপ্ন দেখি নে, অসম্ভব আশা করি নে। এ অতি বাস্তবের রাজ্য।"

বললাম, 'তাই নাকি!'

বিজয়বাবু বললেন, "হ্যাঁ। এখানেও কাজের ফাঁকে, কি কাজে ফাঁকি দিয়ে রাস্তার মোড়ে এসে আমরা মাঝে মাঝে দাঁড়াই। কত লোক যায়, কত লোক আসে। কত ঢেউ ওঠে, কত ঢেউ পড়ে। কিন্তু সেদিন যে-কথা হঠাৎ থেমে গিয়েছিলো তা আর ফের সুরু করা হয় না।"

জিজ্ঞাসা করলাম "কেন হয় না?"

বিজয়বাবু বললেন, "কি ক'রে হবে! বয়স হয়েছে, বুদ্ধি বেড়েছে, চুলে পাক ধরেছে যে। এখন হঠাৎ কিছু করা তো ভালো নয়, কল্পনা করবারও সাহস নেই। এতকাল আইবুড়ো থেকে সুমিতার মতো মেয়ে কি সাধারণ একজন সেলসম্যানকে বিয়ে করতে পারে! লোকে ছি-ছি করবে যে। আর আমি স্বামী হ'তে পারলাম না সেই দুঃখে কেন এক অধ্যাপিকার বেয়ারা হ'য়ে থাকবো। হ'লোই বা সে যশস্বিনী। আমার অন্তরাত্মা যে অনুক্ষণ ধিক্কার দেবে। তার চেয়ে এই কলম সাবাবার চাকরি অনেক ভালো।"

রেস্টুরেন্টের বয় এসে দাঁড়াতে বিজয়বাবু জোর ক'রে চা-টোস্টের দাম চুকিয়ে দিলেন। আমাকে কিছুতেই দিতে দিলেন না।

বেরোতে গিয়েও আমরা ঠিক সঙ্গে-সঙ্গে বেরোতে পারলাম না। তখনো সমানে বৃষ্টি পড়ছিলো।

তৃতীয় ব্যক্তি

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবধারিত কোনো শোচনীয় দুর্ঘটনা থেকে দৈবাৎ কোনক্রমে বেঁচে গেলে, সেই মুহূর্তে মানুষের যে-অবস্থা হয়, ঠিক্ তেমনি পাণ্ডুর হয়ে গেল মুখের বর্ণ, নিশ্চল হয়ে গেল ভাবভঙ্গী—নিথর, নিস্পন্দ একটা প্রস্তর-মূর্তির মতো ব'সে রইল কিছুক্ষণ আমাদের থার্ড ইঞ্জিনীয়ার সুরেশ্বর দাস। ওর ভাব দেখে, আমার বা সেকেণ্ড অফিসার মহাদেবনেরও মুখে কোনো কথা সরছিল না। জ্বলন্ত সিগারেট হাতেই পুড়ে ছাই হচ্ছে দুজনের, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই আমাদের তাতে! ওর অবস্থা দেখে আমরাও কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম।

একটা ক্যাম্বিসের ডেক্ চেয়ার টেনে নিয়ে এসে আমাদের কাছ ঘেঁসে বসেছিল সুরেশ্বর। এক সময় সিগারেটের প্যাকেট বার ক'রে, আমাদের দু'জনকে একটা-একটা দিয়ে নিজেও ঠোঁটে চেপে ধরল একটা। ধরে, প্যাকেটটা আবার পকেটে রেখে দেশলাই বার করতে যাবে—ইতিমধ্যে মহাদেবন্ তার দেশলাইটা জ্বালিয়ে একটা কাঠিতেই তারটা আর আমারটা ধরিয়ে, ওরও ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেছে। ও অভ্যাস মতো সিগারেটটা আগুনে ছুঁইয়েই, হঠাৎ কী মনে করে ক্ষিপ্র হাতে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

বেশ রাত হয়ে গেছে। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত আট-টা পর্যন্ত জাহাজের ডিউটিকে বলে, 'সেকেণ্ড ডগ্-ওয়াচ্'। এই সেকেণ্ড ডগ্-ওয়াচে কী এক যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য সুরেশ্বরের ডিউটি পড়েছিল আজ। সেটার পরে, খাওয়া-দাওয়া সেরে, ডেক-এ যেখানে আমি আর মহাদেবন্ বসেছিলাম, সেখানে এসে-ছিল আমাদের সঙ্গে গল্প করতে। রাত আটটা থেকে বারোটার ডিউটিকে বলে, 'ফার্স্ট ওয়াচ্।' এই 'ওয়াচ'-এর প্রথম ঘণ্টা পড়ে আট বার। তারপরে আধ-ঘণ্টা অন্তর-অন্তর ঘণ্টা বাজে। কিছুক্ষণ আগে তিনটে ঘণ্টা শুনেছি। তাহ'লে রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। সুন্দর হাওয়া বইছে মৃদু মৃদু। সমুদ্র

খুবই শান্ত। সারা আকাশটা তারায় ভরা। চাঁদ নেই। কৃষ্ণপক্ষের রাত বুঝি। কোথায় কার ঘরে যেন রেডিও বাজছে—উদাস-করা কোমল এক সুর!

মহাদেবনই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করল। লজ্জিত কণ্ঠে বলল—আমি অতটা বুঝতে পারিনি। ক্ষমা করো।

আমি বলে উঠলাম—না-না, ক্ষমায় কী আছে? মানে হয় না এসব কুসংস্কারের।

কুসংস্কার!—এতক্ষণে কথা ফুটল সুরেশ্বরের মুখে, গম্ভীর কণ্ঠে সে বললে,—কোথায় বসে কথা বলছ? সমুদ্রের বুকে এক কাঠিতে তিনটী সিগারেট ধরালে কী যে হয়, তোমরা ঠিক না জানলেও আমি জানি। থার্ড মাস্ট ডাই। তৃতীয় ব্যক্তি মরে যাবে নির্ঘাত।

বললাম—মানি না। সমুদ্রেই থাকি, আর যেখানেই থাকি, কুসংস্কারকে কুসংস্কার বলতে আমার বাধা নেই। আর তাছাড়া, সুরেশ্বর, তোমার মত লোক যে এসব মানবে—এ আমি ভাবতেই পারি না। অ্যালিওয়েয় যেটুকু বিচ্ছুরিত আলো এসে পড়েছে এই বোট-ডেকে—তারই স্বল্পালোকে বেশ দেখতে পেলাম—থরথর্ ক'রে তখনো কাঁপছে ওর হাতদুটো। বললে আমিও তোমার মতো ওসব মানতাম না। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপারের পর আর না-মেনে আমার উপায় নেই। বলতে পারো, বিদেশীদের এ সংস্কার আমরা ভারতের লোক হয়ে মানতে যাবো কেন? একথা আমারও প্রথম-প্রথম মনে হয়েছিল। কিন্তু তখন ত জানতাম না—"Once a sailor, always a sailor!" একবার জলচর যদি হও ত চিরদিনের জন্য জলচরই হ'তে হবে তোমাকে। জলে তোমার স্বদেশ নেই, বিদেশ নেই—সব দেশ এক হয়ে যায়। অথবা নানান দেশের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হ'তে হ'তে গড়ে ওঠে স্বতন্ত্র এক দেশ—যেখানে ভাষা-ধর্ম-আচার-বিচার সব ছাড়িয়ে এক বিচিত্র মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হয়। তুমি মাত্র সেদিন এসেছ জাহাজের লাইনে, তাও রাইটার হয়ে—আমাদের মতো সাত-আট বছর কাটাও, তখন দেখবে, জাহাজী লোকের কাছে সংস্কার কী জিনিস!

একটু হেসে বললাম—বুঝেছি। কিন্তু তুমি পাশ করা ইঞ্জিনীয়ার, তুমি বলো ত এই যে এক কাঠিতে সিগারেট না-ধরানোর নিষেধ, এর পিছনে কোন্ যুক্তি আছে?

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল সুরেশ্বর, যেন কী-এক গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছে। তারপরে এক সময়ে হঠাৎ স্বপ্ন-দেখে-জেগে-ওঠার মতো, সোজা ব'সে, চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করল আমার ওপর, বললে—আমি যে উনিশ বছর বয়সে ট্রেনিং জাহাজে ভর্তি হয়ে ফায়ারম্যানের পরীক্ষা পাশ করে ফায়ারম্যান হয়ে প্রথম জাহাজে ঢুকি, তা বোধহয় জানো না?

সবিস্ময়ে বললাম—তাই নাকি! তা ত কোনোদিন বলো নি?

মহাদেবন বললে—ফায়ারম্যান থেকে থার্ড ইঞ্জিনীয়ার—রিমার্কেব্‌ল্ কেরিয়ার। পরীক্ষাগুলো পাশ করতে হয়েছে ত?

—তা' ত নিশ্চয়ই! সুরেশ্বর বললে,—ভদ্রলোকের ছেলে, খেতে না পেয়ে জাহাজে ঢুকেছিলাম খালাসি হয়ে। 'কেউ জানত না যে, স্কুলে ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত পড়েও ছিলাম। সারেঙ্ আর ফার্স্ট টিণ্ডেলের পা-ও টিপেছি একদিন। কিন্তু যাক্ সে-কথা। যে-কথা বলতে যাচ্ছি, তাই শোনো। জাহাজের নাম করার দরকার নেই, ধরে নাও এরই মতো সে-ও একটা ইণ্ডিয়ান জাহাজ—কোস্টাল কার্গো নিয়ে ভারতের উপকূলে-উপকূলে ঘুরে বেড়ায়। এবং এ-ও ধরে নাও যে, এ জাহাজের মতো সেটাও সেদিন যাচ্ছিল কলকাতা থেকে কলম্বো। এর মতো তারও কলম্বোর কার্গোই ছিল বেশী। অর্থাৎ কলম্বোতে তার থাকবার কথা এরই মতো বেশ কয়েকটা দিন।

কথায় বলে, "There is no promotion without the Ocean." আমরা দুজন বছর আড়াই ধরে দু'দুটো মহাসমুদ্র পারাপার ক'রে অবশেষে এক দেশী কোস্টাল জাহাজে 'ডঙ্কিম্যান' হয়ে ঢুকলাম। অর্থাৎ মাসিক মোট ১৩৫৲ টাকা থেকে ১৭১৲ টাকায় উঠেছিলাম।

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম—কিন্তু দু'জন! দু'জন মানে?

একটু থেমে, তারপর সুরেশ্বর বললে, —হ্যাঁ, তার সঙ্গে প্রথম জাহাজেই বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে-ও বাঙালী। ঋষিকেশ তার নাম—ঋষিকেশ চন্দ বোধ হয়। আমরা ডাকতাম 'ঋষি' বলে। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু তখন, অর্থাৎ প্রথম প্রথম যখন বাঙালী হিন্দুর ছেলেরা জাহাজে খালাসী হয়ে ঢুকতে লাগল, সারেঙ্ আর খালাসীর দল ভালো মনে সেটা নিতে পারেনি—তখন অপমান আর অবহেলা নিত্য সঙ্গী ছিল আমাদের। আর, অযথা পরিশ্রম? তার কাহিনী না শোনাই ভালো। দরকার হলে, সারেঙ বা টিণ্ডেলদের সঙ্গে বন্দরে বন্দরে নিষিদ্ধ পল্লীতেও যেতে হতো। অন্য কিছু নয়, তাদের

অনুচর হিসাবে, দেহরক্ষীরূপে। ঋষি মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠত, আমি ওকে সামলে রাখতাম। বলতাম, ধৈর্য পড়াশুনা আর পরীক্ষাই আমাদের বাঁচাবে।

কিন্তু জাহাজ ত অধ্যয়নের বা তপস্যার ক্ষেত্র নয় ফায়ারম্যান হিসাবে। তাই যা কিছু করতাম, তা লুকিয়ে লুকিয়ে। লোকে পাপ লুকোয়, আমরা লুকোতাম—পুণ্য। আমি অনাথ ছেলে, মামাবাড়িতে অনাদরে মানুষ। ও' তা নয়—ওর মা ছিল। কিন্তু তার কথা দু-একবার উল্লেখ করা ছাড়া, আর কিছু বলেনি—মনে হতো, মায়ের প্রসঙ্গের প্রতি ওর এক অভাবিত বিতৃষ্ণা আছে।

ছিলাম আমরা অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। ফার্স্ট টিণ্ডেলের তা সইল না, সে ওকে আর আমাকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য সব-সময় ভিন্ন-ভিন্ন ডিউটিতে রাখত। এমন কি, ওর শোবার জায়গাও সরিয়ে দিলো আমার কাছ থেকে দূরে, অন্য কেবিনে। অবশ্য তাতেও তেমন-কিছু আসে-যায় না। কিন্তু, দিনে-দিনে যা দেখতে লাগলাম, তা হ'লো ওরই এক ভিন্নতর মানসিক অবস্থা। পড়াশুনায় তেমন মন নেই, ফার্স্ট টিণ্ডেলের পিছন-পিছন যায়, বন্দরে জাহাজ লাগলে তারই সঙ্গে ঘুরতে বেরোয় বেশী, চলনে-বলনে রীতিমত 'জলচর' হয়ে উঠেছে বলা যায়।

একদিন একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম—করছিস্ কী তুই, ঋষি?

ঠোঁট উল্‌টে বললে—কী করছি!

বললাম—কোথায় যাস্ তুই টিণ্ডেলের পিছন-পিছন?

বাঁকা একটু হেসে বললে—তুমি কাল কোথায় গিয়েছিলে সারেঙের সঙ্গে? আমি জানি না, না?

বললাম—না বলে তোর মতো···

বললে—তোর মতো, কী? বল্? কথার জবাব দে? মদ খেয়েছি একটু? বেশ করেছি। না খেলে, ও আস্ত রাখত? খাটিয়ে-খাটিয়ে মেরে ফেলতো না?

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ওর সামনে, মাথা নিচু ক'রে। বলার নেই, করারও নেই কিছু। এক, পালানো জাহাজ থেকে। কিন্তু কোথায়? এক জাহাজ থেকে পালিয়ে আরেক জাহাজেই যে যাওয়া হবে! সর্বত্রই ত জাহাজের মতো গণ্ডী। সেই গণ্ডীতে যে একটু ক্ষমতাবান সে দুর্বলকে প্রহার করছে, কোথাও বা দেহে, কোথাও বা মনে! এই নিষ্ঠুর সত্য সেই বয়সেই জেনেছিলাম আমরা।

ক্রমে-ক্রমে অনেক-কিছু সহনীয় হয়ে এলো আমাদের। দুজনের দেখা হয় কম, কিন্তু যেটুকু দেখা হয়, তারই মধ্যে কথা হয়ে যায় আমাদের, প্রতিজ্ঞা যেন না ভুলি। পাশ করে করে বড়ো হতে হবে আমাদের। আর, কাজ শেখা? তার জন্য সারেঙদের সঙ্গে নিষিদ্ধ পল্লী ত ভাল কথা, ওদের পা টিপতেও রাজী আছি।

এসব বর্ণনা বিশেষ ক'রে লাভ নেই। বাহুল্য মনে হবে।

একদিন ওকে বললাম—এই, ফাস্ট টিণ্ডেল ত এখন তোর হাতের মুঠোতে। ওকে ব'লে আমার কেবিনে আমার পাশের বাঙ্কে আবার ফিরে আয় না।

ঋষি বললে—আমিও সেকথা ভাবছি ক'দিন ধ'রে। বোধ হয়, রাজী হবে। দেখছিস্ না, তোকে-আমাকে বেশীক্ষণ কথা বলতে দেখলে আজকাল আর কিছু বলে না।

—কেন বল্‌তো?

ও একটু হেসে বললে—তুই যে সায়েবের পেটোয়া।

হেসে উঠলাম। ওর হাত ধরে বললাম—মনে থাকে যেন। ওদের ভজিয়ে-ভাজিয়ে যেমন করে হোক, সব কাজ শিখে নিতে হবে। উন্নতি নিশ্চয়ই করতে হবে জীবনে।

—নিশ্চয়ই।

তারপরে সত্যিই আবার একদিন ও আমার কেবিনে ফিরে এলো। এবং, শুধু তাই নয়, জাহাজ যাবে কলকাতা থেকে কলম্বো—নির্বাপিত ফার্নেসের প্রথম আগুন দেবার একস্ট্রা ডিউটি পড়ল আমাদের দুজনেরই এক সঙ্গে। মহা আনন্দে দুজনে ফায়ারম্যানদের সঙ্গে একেবারে হাত মিলিয়ে কাজ করতে লাগলাম সেদিন। ফায়ারম্যান্‌রা প্রত্যেক ফার্নেসের 'ফায়ার গ্রেটিংস্'-এ আধ ফুট উঁচু ক'রে কয়লা সাজিয়েছে। আমরা তারপরে, মাঝখানকার ফার্নেসের দরজার কাছে কিছু বড় কয়লার খণ্ড সাজালাম এস্কিমোদের বরফ-এর সাজানোর মতো ক'রে। দিলাম কিছু কাঠ-কুটরো আর তেলেভেজা কটন্-ওয়েস্ট। অর্থাৎ যেমন হয় আর কী, তেমনি করে আগুন জ্বালালাম বয়লারে। ফাস্ট টিণ্ডেল আর সারেঙ—দুজনকেই দেখলাম খুব খুশী আমাদের ওপর।

এর দু'দিন পরে যখন আমরা কলকাতার পাইলটকে বিদায় দিয়ে হুগলী পয়েন্ট আর লাইট্ হাউস ছাড়িয়ে সমুদ্রে অনেকটা চ'লে এসেছি—তখন ফাস্ট

ওয়াচের ডিউটিতে নীচে আমাদের দুজনকেই ডেকে নিয়ে গেল ফার্স্ট টিণ্ডেল।

সব-কিছু চেক্-আপের পর, গলদ্ঘর্ম হয়ে যখন ব্লোয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে দুজনে একটু হাওয়া খাচ্ছি, টিণ্ডেল এলো একটা বড়ো মগে এক মগ চা নিয়ে। বললে—থাপ বার করো।

'থাপ'—অর্থাৎ 'কাপ'। এনামেলের দুটো কাপ নিয়ে এলো ঋষি, বললে —দাও।

টিণ্ডেল বললে—এসো একটু বসি।

তিনজনে চা খেতে-খেতে গল্প করছি। টিণ্ডেল কী মেজাজে ছিল কে জানে, তার জীবনের কাহিনী বলতে সুরু করল। সে-সব নানান্ দেশের নানান মধুরতার কাহিনী। ঋষি শুনে খুব হাসছিল। ঋষি আজকাল অবশ্য খুবই হৈ-হৈ করে। হাসতে-হাসতে একে চাপড় মারে, তাকে চাপড় মারে। এখনো তাই করছিল। বলে উঠছিলাম—উঃ! করছিস্ কী?

—মিঞাসাহেবের গল্প শুনছিস্?

টিণ্ডেল পান-খাওয়া ঠোঁটে একটু হাসল, বললে—ফাঁচ-ফাঁচবার সাদি করছি। ফাঁচ-ফাঁচটা বন্দরে। হুঁ কতো আর শুন্বা, বলো?

বলেই হঠাৎ ঋষির একটা হাত ধরে মারল টান, বললে—তোমার সেই হুরীর খবর কী?

সবিস্ময়ে ব'লে উঠলাম—হুরী!

ঋষি একটু লজ্জাই পেয়েছিল বোধ হয়। আমতা-আমতা ক'রে বললে-মিঞাসাহেবের রসিকতাও বুঝতে পারছ না? হুরী, মানে—

বাধা দিয়ে টিণ্ডেল বললে—হুরী, মানে—জরু। সাদী করবে মেয়েটারে! কলকাতায় চিঠি পেয়েছ না?

প্রশ্ন করলাম—কে মেয়েটা? কার চিঠি পেয়েছিস্?

মিঞা ওকে বললে, দোস্তকেও বলোনি? বলেছে, আমারে বলেছে। জাহাজ ত সেই হুরীর দেশেই যাচ্ছে।

···হুরীর দেশ মানে?

টিণ্ডেল বললে—মোদের কাছে কলম্বো, ওর কাছে হুরীর দ্যাশ! বুঝলে না? ওর হুরী যে সেখানে!—বলেই হি-হি করে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে ওরই গায়ে চিম্‌টি কেটে বললে—পেরানটা না পাখি হয়ে যায়!

ততক্ষণে প্রাথমিক লজ্জাটা কাটিয়ে উঠেছে ঋষি, বললে—তোকে বলব-বলব করে বলা হয়নি, মানে—

বড়ো অদ্ভুত লাগছিল পরিবেশ। গম্ভীর মুখে আমি উঠে দাঁড়ালাম। আর দাঁড়ানো মাত্র ও আমার হাত দুটো ধ'রে আবার বসিয়ে দিলে, বলল—রাগ করিস নি। এবার তোকে দেখাবো। আলাপ করিয়ে দেবো। আরে, বিয়েতে তুই-ই ত হবি সাক্ষী! দেখিস—ভারী মিষ্টি মেয়ে!

টিণ্ডেল তখনো হাসছে, বললে—আমার সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিও দোস্ত্।

ঋষি বললে—আমার মনটাকে বুঝে দেখ্। সত্যিই পাখির মতো উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে তার কাছে।

বললাম—কিন্তু এসব আমাকে একটুও জানাস নি?

—জানাবার সময় পেলাম কই! তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল ঋষি—সে এক আশ্চর্য কাণ্ড! মিঞাসাহেব জানে, তুই জিজ্ঞাসা কর!

টিণ্ডেল বললে—দোস্তকে তুমিই সব বলো। বসো। এই নাও, এক-একটা করে কাঁইচি খাও। কলকাতার কাঁইচি। পাঁচ আনা পয়সা দিয়ে নগদ কিনছি।

বলতে-বলতে আমাদের দুজনের হাতে দুটো সিগারেট এগিয়ে দিলো। আমি দেশলাই বার করে কাঠি জ্বালিয়ে সেই কাঠিতেই আমারটা আর মিঞা সাহেবেরটা ধরিয়ে, তারপর জ্বালিয়ে দিলাম ঋষির সিগারেট। প্রথমটায় কারুরই খেয়াল হয়নি, কয়েকটা উপর্যুপরি টান দিয়ে হঠাৎ ঋষি নিজেই লক্ষ্য করল ব্যাপারটা। সিগারেট ঠোঁট থেকে বার ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চট্ করে উঠে দাঁড়ালো, বললে—সর্বনাশ হয়েছে!

তারপর এগিয়ে গিয়ে পায়ের জুতো দিয়ে পিষে-পিষে নিভিয়ে ফেল্লে সিগারেটটা।

সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে আমরাও। বললাম—কী হলো!

কণ্ঠস্বর কেমন যেন কেঁপে গেল, ঋষি বললে—এক কাঠিতে তিনবার ধরালে, তিনের লোকটি মরে যায়। জানো না? ব'লে মুখটা ঘুরিয়ে স্টোকহোল্ডের অপর পারে চলে গেল সে।

মুহূর্তে সব সুর যেন কেটে গেল মনে হ'লো। টিণ্ডেলও একটুক্ষণ উস্খুস্ ক'রে তারপরে কাজের অজুহাতে চলে গেল অন্যদিকে। আমি ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম ঋষির, বললাম—এসব সংস্কার মাথায় ঢুকিয়েছে কে?

মাথাটা ঝাকি দিয়ে মুখটা ফেরালো আমার দিকে, বললে—জাহাজে কে আবার কাকে কী শেখায়?

বলে পুনর্বার সরে গিয়ে পকেট থেকে দস্তানা বার ক'রে সেদুটো পরে পোর্টসাইড বয়লারের ফার্নেস-ডোরটা খুলে গনগনে আগুনের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী যেন দেখল, তারপরে দরজাটা বন্ধ ক'রে দস্তানা পকেটে রেখে ব্লোয়ারের হু-হু হাওয়ার নীচে গিয়ে মাথা পেতে দাঁড়ালো।

কাছে গেলাম, কোমল কণ্ঠেই বললাম—সিলোনীজ মেয়েটার নাম কী? কবে, কীভাবে আলাপ হল তোর সঙ্গে?

কোন উত্তর না দিয়ে সরে গেল সেখান থেকে। স্টারবোর্ড বাঙ্কারের দরজায় দাঁড়িয়ে কালো কালো কয়লার পাহাড়ের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

আমি আমার ওয়াচে ফিরে গিয়ে বয়লারের প্রেসারটা লক্ষ্য করতে লাগলাম।

কাজ শেষ ক'রে আবার একসময় গেলাম ওর কাছে। ও তখন স্টোক-হোল্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে কী দেখছিলো, বললাম—হঠাৎ হ'লো কি তোর ঋষি।

ঝংকার দিয়ে বলে উঠল, কী হ'লো বুঝতে পারো না? জাহাজ পৌঁছবে কলম্বো।

শিউরে উঠ্‌লাম সঙ্গে সঙ্গে—বলছিস কি অলুক্ষণে কথা! জাহাজ বে অফ বেঙ্গলে। এ সমুদ্রকে কেউ কখনো বিশ্বাস করে না। যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে!

হিংস্র শ্বাপদের মতো আমার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলতে লাগল—মরতে হ'লে একা মরব ভেবেছ? সবাই মরব। একসঙ্গে।

এবার একটু জোরে ধম্‌কেই উঠলাম ওকে—বল্‌ছিস্‌ কী সব পাগলের মতো!

বললে, জাহাজ না ডুবলে মরব কী করে? আর জাহাজ ডুবলে সবাই ডুববে। বুঝতে পারলে, কী সর্বনাশ হতে চলেছে?

বললাম—তুই আমার সঙ্গে ঘরে চল্‌।

বললে—সবে এগারোটা দশ। ওয়াচ্‌ শেষ হতে এখনো পঞ্চাশ মিনিট।

আর কোনো কথা হয়নি ওয়াচের ঘণ্টা পর্যন্ত। একসঙ্গেই ফিরলাম কেবিনে। চারজনের সীট্। দুজন ফায়ারম্যান আর আমরা। এই দুজন ফায়ারম্যানের মিড্‌ল ওয়াচ, অর্থাৎ বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত ডিউটি পড়েছে। অতএব, রাত্রিটা নিরিবিলি পাওয়া যাবে।

ও কিন্তু, হাতমুখ ধুয়ে কেবিনে এলো না। লক্ষ্য রেখেছিলাম বলেই দেখতে পেলাম, অ্যালি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে চার নম্বর পাঁচ নম্বর হ্যাচ পার হয়ে আফ্‌ট পার্টের ছাদে গিয়ে উঠল। ধীরে ধীরে আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম পাশে। আশে-পাশে ছিল না ক্রু-দের কেউ। পিছনের জলরেখার দিকে মুখ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ঋষি। বললাম—আমি অতো না ভেবেই দেশলাইয়ের কাঠিটা এগিয়ে দিয়েছিলাম। বিশ্বাস কর, ওর মধ্যে আমার কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

মুখ ফেরালো আমার দিকে, বললো—উদ্দেশ্যের কথা আমি বলি নি।

কণ্ঠস্বর একটু উচ্চে তুলেই বলে উঠলাম—তবে এ সবের অর্থ কী? কী ব্যবহার করছিস আমার সঙ্গে, তা একবার ভেবে দেখ।

কোনো উত্তর দিলো না। আকাশের দিকে তাকিয়ে কী-যেন দেখতে লাগল। এক সময় বললে—সুরেশ?

কী?

বললে—আকাশে মেঘ-মেঘ করছে না?

—কই! কোথায়?

—ঐ কোণের দিকে তাকিয়ে দেখ।

বললাম—দূর! আকাশ একেবারে ঝক-ঝকে। সমুদ্রও খুব শান্ত।

বললে—কিন্তু ঝড় উঠবে।

আমি বললাম—দেখে নিস্। আজ, নয় কাল।

—জাহাজ কলম্বো যাবে না।

বলেই তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

পিছন-পিছন গেলাম আমিও।

কেবিন। এসেই ও শুয়ে পড়ল। পাশে গিয়ে বসলাম। আপত্তি করল না। বললাম—মেয়েটির নাম বল্‌বি না?

হঠাৎ অদ্ভুত একটা কথা বলে উঠল। বললে—কেন? আমি মরলে, মেয়েটিকে বিয়ে করার ইচ্ছে নাকি?

যেন চাবুক খেয়ে সোজা হয়ে বসলাম। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। তারপরে বললাম—সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ঘুমো তুই আজ।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। ভোর চারটের ফায়ারম্যান দুজন ফিরে আসার পর ঘুম ভাঙল। আটটায় ডিউটি আবার আমাদের। যাকে বলে—ফোরনুন ওয়াচ—সকাল আটটা থেকে বারোটা। আরেকটু ঘুমিয়ে নিলে হয়। কিন্তু ঘুম এলো না। উঠে দেখি, বিছানায় ঋষি নেই।

দেখা হলো ছ'টার পর—অর্থাৎ সানরাইজ সিগন্যালেরও বহু পরে। সেলুনে। চমকে উঠলাম চেহারার অবস্থা দেখে। সারাটা রাত ও ঘুমোয় নি, বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তাহলেও মাত্র একটা রাত্রির জাগরণে মানুষের চেহারা যে এমন ভেঙে পড়তে পারে, এ ওকে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। বললাম—কোথায় ছিলি ?

তেম্‌নি ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল—তাতে তোমার কী ? সবেরই কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি ?

শুধু আমি নয়, ঘরের অন্যলোকগুলি পর্যন্ত চম্‌কে উঠ্‌ল ওর কথায়। কেউ কেউ কিছু মন্তব্যও করে বসল। ও কোনরকমে চায়ের কাপে একটু চুমুক দিয়েই উঠে পড়ল। ভাল করে খাবারটাও খেলে না পর্যন্ত।

স্টোক্‌হোল্ডে ডিউটিতে এসে ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাইনি। একটা বয়লারে স্টীম-প্রেসারের তারতম্য হচ্ছিল, একজন ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে বারোটা পর্যন্ত ভয়ানক ব্যস্ত ছিলাম।

বারোটার পর দেখা হলো ফিরে এসে—কেবিনে। বললাম—খেয়েদেয়ে ঘুম দাও দেখি। এভাবে থাকলে যে সত্যিই মরে যাবে !

কালির বৃত্ত আঁকা চোখদুটি তুলে ধরল আমার দিকে, বলল—মরব যে, তাকি তুমি বুঝ্‌তে পারো নি ?

ঘরে আর কেউ ছিল না। এগিয়ে গিয়ে দুহাতে ওর দুটো কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললাম—বল, আমি কী করেছি ? সেই থেকে এ'রকম ব্যবহার করছিস কেন ?

দুটি চোখ বুজে ফেলল। আর আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে দুটি গালের ওপর নেমে এলো দুটি অশ্রুর ধারা।

মুহূর্তে কোমল হয়ে এলো আমার মন। বুঝলাম, ও সংস্কার ওর বুকে চেপে বসে আছে। টলানো যাবে না।

আস্তে ডাকলাম—ঋষি ?

দুটি হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল ওর বিছানায়। বললে—জাহাজ যদি না-ও ডোবে, তবে বয়লার বার্স্ট করবে। একটা কিছু হবেই।

—বাজে কথা। কিচ্ছু হবে না।

—নিশ্চয়ই হবে। আমার মন বলছে। আমার বুকের ভিতরটা কী রকম ধড়ফড় করে উঠছে মাঝে মাঝে, তা জানো ?

বললাম—সে তুমি সারা রাত ঘুমোওনি বলে। সারা রাত যা-তা ভেবেছ বলে। দুর্বল বোধ করছ ত ?

বললে—করছি। কলম্বো কবে পৌঁছানোর কথা ?

—আরও চারদিন আছে।

বললে—এই চারদিন। বড়জোড় এই চারদিন আমার আয়ু।

ফের বাজে কথা !

বললে—না সুরেশ। তবে, মনে হচ্ছে, তোমাদের কিছু হবে না। ঝড় হলেও তোমরা বাঁচবে। হয়তো ডেকের ওপর ভেঙে পড়া ঢেউয়ে আমি ভেসে যাবো কুটোর মতো।

বললাম—পাগল ! ঝড় যদি ওঠেও, তোমার ডিউটি থাকবে কোথায় ? ডেকে নয়। ইঞ্জিন রুমে। সুতরাং ভাসবে কী করে !

বললে—তাহলে বয়লার এক্সিডেন্ট হবে। আমি পুড়ে মরব।

—তাও হবে না।—বললাম—বয়লারে এক্সিডেন্ট হলে তুমি একা যাবে না, বহুলোক যাবে।

—তাহলে ?

বললাম—তাহলে—কী ?

অস্থিরভাবে বলে উঠল, কিন্তু, তাহলে আমি মরব কেমন করে ?

বললাম—মরবে কেন তুমি ! দেখ ঋষি, স্কুলে তুমিও উঁচু ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছিলে, লেখাপড়া জানো, তুমিও কী বুঝতে পারছ না, এটা কতো বড় কুসংস্কার ?

বললে—তাই যদি হবে ত আমার মন এমন করে কেঁদে মরছে কেন ?

এমন সময় টিণ্ডেল এলো ঘরে। তাকে ডেকে বললাম সব কথা। সে শুনে তেমন কিছু বললে না, কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করে চলে গেল।

এ-ও আশ্চর্য ব্যাপার। পিছন-পিছন বাইরে এসে বললাম—কী হলো? উঠে এলে যে?

টিণ্ডেল বললে, সুবিধার মনে হচ্ছে না। মরতে পারে। সারেঙকেও বলেছি। সে-ও বললে, একই কাঠির আগুনে তিনবারের বার বিড়ি-সিগ্রেট্ খেলে লোক বাঁচে না। এটা সবাই জানে। ভালো কথা, অফ্‌সরদের কাণে যেন না যায়। বাড়িওয়ালা ভারী ধার্ম্মিক লোক, শুনলে ওকে নিয়ে কী করবে কে জানে? জলে ফেলে দেবার হুকুম দেয় যদি? আগে আগে কত হয়েছে এমন।

বিস্মিত হয়ে শুনছিলাম ওর কথা। ভাবছিলাম, তাহলে কি এ সংস্কারের পিছনে কোন অলৌকিক ব্যাপার আছে?

'বাড়িওয়ালা' অর্থাৎ ক্যাপ্টেনকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা আমাব নেই, তবে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের কাছে যেতে পারি। তাকে কি সব কথা গিয়ে খুলে বলবো? যদি হিতে বিপরীত হয়?

এইসব ভাবতে ভাবতে সেদিনের ওয়াচও কেটে গেল। রাত বারোটার পব আবার আমরা এলাম আমাদের কেবিনে। দুজনেই শুধু আছি, আর দুজন ডিউটিতে। দেখি চেহারা যেন আরো খারাপ হয়ে গেছে খবির। বললাম—খাওয়াদাওয়া করছিস ত?

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর এলো—বসেছিলাম! খেতে পারলাম না। যেন বমি ঠেলে আসছিল।

বলে নিজের টিনের সুট্‌কেশটা বার করে চাবি লাগিয়ে খুলে ফেললে। তার মধ্য থেকে কী যেন খুঁজে বার করে, বাক্স আবার বন্ধ ক'বে আমার কাছে এলো। বললে—দেখ দেখি ফটোটা? পছন্দ হয়?

ওর হাত থেকে ফটোটা টেনে নিয়ে দেখতে লাগলাম। ছাপা শাড়ি পরা তরুণী একটি মেয়ের ফটো। হাসি-হাসি মুখখানা—মোটামুটি সুশ্রী বলা যেতে পারে। ফটো দেখে যতটা আন্দাজ করা যায়, গায়ের রং খুব ফর্সা নয়।

ফটোটা দেখে ফেরৎ দিতে যাচ্ছি ওর হাতে। মুখ তুলে চেয়ে দেখি—সরে গিয়ে ও ওর বিছানায় টান্ টান্ হয়ে শুয়ে পড়েছে। উঠে, ওর বিছানায় ওর কাছে গিয়ে বসলাম। চোখ বুজে আছে। বাস্তবিকই মুখের দিকে তাকানো যায় না। চোখের চারিদিকে কালির বৃত্তটা আরও গাঢ় হয়েছে। চোয়ালের হাড় দুটো উঁচুতে। গাল দুটো ভেঙে পড়েছে। অদ্ভুত মায়া হতে লাগল ওকে

তখন ওভাবে দেখে। কোমল কণ্ঠে ডাকলাম—ঋষি? এই নে তোর ছবি। চমৎকার মেয়ে। তুই ভাগ্যবান।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল, বলল—আমার সুটকেশে আর কিছু নেই। গোটা কতক প্যান্ট্ আর শার্ট। দামী কিছু নেই। সারাজীবনে জমাতেও কিছু পারিনি। এই হাতঘড়িটা তা-ও দামী নয়। দামী জিনিসই জীবনে পাইনি। আমার নিজের মা আমাকে কোনদিন ভালো চোখে দেখতে পারেনি।

বলতে বলতে ওর গলা ধ'রে এলো, চোখ দুটি উঠল ছলছল করে। বলল—বাবা ভালো লোক ছিল না। মদ খেতো, আর রাত্রে এসে মাকে মারত। শেষে, নিজেই লিভারের রোগে মারা গেল। কিন্তু বাবাকে মা মনে মনে ঘৃণা করত ব'লে আমাকেও দেখতে পারত না। কাকী-জ্যেঠীদের সংসারে সবার মন যুগিয়ে চল্‌ত মা, আর উদয়াস্ত খাটত। কাকী-জ্যেঠীদের সঙ্গে মিশে আমার ওপরও নির্যাতন করতো। এই ত জীবন আমার সুরেশ, কিছুই নেই, মনে-রাখার-মতো ছোটবেলার কোনো সুখের স্মৃতিও নেই। আছে ঐ ফটোটা। না চাইতেই নিজের হাতে ও আমাকে দিয়েছিল। ওর মতো মূল্যবান জিনিস আমার জীবনে আর কিছু নেই।. তাই মানুষ যেমন লুকিয়ে রাখে তার সব থেকে প্রিয় জিনিসটিকে সবার চোখের আড়াল থেকে—তেমনি এটির কথাও কাউকে কোনদিন বলিনি, কাউকে কোনদিন দেখাইনি। লুকিয়ে লুকিয়ে নিজে দেখতাম, নিজেই আড়ালে পাগলের মতো কথা বলতাম ছবিটার সঙ্গে। আমার জীবনের সবথেকে দামী জিনিসই আজ তোমাকে দিচ্ছি সুরেশ, ওটা তুমি রেখে দাও তোমার কাছে। আমি নিয়ে করব কী? আমার দিন শেষ হয়ে গেছে।

ঝর্‌ঝর্ করে কেঁদে ফেলল। ওর হাত দুটো ধরে বলালম—যেমন ক'রে হোক তোকে বাঁচাবো। রাখ তোর ফটো তোর কাছে।

না-না?—ঋষি বললে—বাঁচাতে আমাকে পারবে না! কিন্তু বলছ কী? ছবিটা তুমি নেবে না!

ওর অদ্ভুত কণ্ঠস্বর আর বিস্ময়বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলাম—না-না, তা' আমি নিচ্ছি। দাড়াও রেখে আসছি আমার বাক্সে।

ব'লে বাক্সে ছবিটা রেখে সোজা তখ্‌খুনি ছুটে গেলাম চীফ্ ইঞ্জিনীয়ারের কাছে। বৃদ্ধ লোক, জার্মান। যুদ্ধের পর বহু জার্মান অফিসার ভারতীয় জাহাজে চাকরী নিয়েছিলেন, ইনিও তাঁদের মতো একজন। ওঁকে যতটা গুছিয়ে পারি,

বললাম, শুনে বললেন—ভয়ানক কথা। ওকে নেক্সট্ পোর্টে ছেড়ে দিতে হবে। বেচারা সত্যিই মারা যেতে পারে। তাছাড়া, এক কাঠিতে তৃতীয় সিগারেটটা ধরাতেই বা গেল কোন্ আহাম্মক ? পৃথিবীসুদ্ধ সেলাররা সেটা জানে আর মেনে চলে, তা' সে জানে না ? তাকে ধ'রে চাবকানো উচিত !

দ্রুত সরে এলাম চীফের কাছ থেকে। 'উচিত'ই মাত্র নয়, সত্যিই যেন চাবুক দিয়ে আমাকে প্রহার করা হ'লো সেই মুহূর্তে। সর্বাঙ্গে যেন একটা দুর্বিসহ জ্বালা। ফোরক্যাসলে পিক্ট্যাক্টা দেখবার অছিলা ক'রে গিয়ে ব'সে রইলাম নিভৃতে একা—কিছুক্ষণ। মনে হলো, তবে কি আমিই দায়ী ? তবে কি এ মাত্রই সংস্কার নয় ? এর মধ্যে সত্যি কিছু আছে ? সত্যিই মানুষ মরে তৃতীয় কাঠিতে ? সত্যিই তাহলে মরে যাবে ঋষি ?

—না-না, হতে পারে না !—নিজের মনে বিড়বিড় ক'রে উঠলাম। তারপরে ছুটে এলাম বাইরে। তাকালাম চারিদিকে। নীল সমুদ্র, শান্ত আর স্থির। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। আকাশের কোনো কোণে কোনো কালো মেঘ নেই। হাল্কা মেঘের সাদা ভেলারা দিগন্তে ভিড় করে আছে শুধু।

ছুটতে ছুটতে কেবিনে এলাম ফিরে। দেখলাম, সেই একইভাবে শুয়ে আছে ঋষি। ঘুমুচ্ছে না, চোখ দুটি খোলা—তন্ময় হয়ে কী যেন ভাবছে।

আস্তে ডাকলাম—ঋষি।

যেন চমকে উঠল মুহূর্তে, বলল—কে ! ও' তুমি ?

হ্যাঁ, আমি।—কাছে গিয়ে বসলাম—মন থেকে মুছে ফেল সব। মনে কর, কিছুই হয়নি। একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলে শুধু।

—দুঃস্বপ্ন !—ব'লে একটু হাসল, ঠোঁটের কোণে কষ্টে টেনে আনা ম্লান একটু হাসি। বললে—দুঃস্বপ্নই বটে !

বললাম—চীফের কাছে শুনলাম, তোর যে অবস্থা, তোকে ওরা কলম্বোতে নামিয়ে দিয়ে যাবে। শাপে বর হবে, কী বল্ ?

একটু যেন আগ্রহ দেখলাম ওর মধ্যে। বললে—ঠিক বল্‌ছিস ! কলম্বোতে নামাবে আমাকে !

—হ্যাঁ রে !

পরক্ষণেই যেন সব আগ্রহের জ্যোতি ওর নিভে গেল, বললে—কিন্তু তার আগেই ত আমি শেষ হয়ে যাব। আমি জানি। আর দেখা হবে না ওর সঙ্গে।

বললাম, মেয়েটির নাম কী রে ?

বললে—কমলা।

—কমলা ! সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, এযে একেবারে বাঙালী নাম !

ধীর, শান্ত আর স্তিমিত কণ্ঠে বললে, বাঙালীই সে।

—বলিস কী ! কলম্বোতে বাঙালী মেয়ে।

—হ্যাঁ। টিণ্ডেল জানে, ওকে সেদিন বলেছিলাম সব ! ঋষি বললে, গতবার কলম্বোতে আলাপ। তারপর চিঠি লেখা-লেখি। হ্যাঁ, ভালো কথা, চিঠিগুলোও তুমি নাও ভাই। একতাড়া চিঠি। ঐ বাক্সের কোণটাতে আছে। চাবির দরকার নেই, বাক্স খোলাই রেখেছি। কই, নিয়ে এসো ?

ও যাতে ব্যথা না পায়, সেই বুঝে, উঠে নিয়ে এলাম চিঠিগুলো। একটা সুতোয় বাঁধা—যত্ন করে রাখা—একগোছা নীল খাম। ওর শিয়রে এনে রাখতেই, তার ওপরে সস্নেহে হাতখানা বুলোতে বুলোতে বলল, পরে অবসর মতো পড়ে নিও। সব জানতে পারবে। এইবারই আমাদের বিয়ে হবার কথা ছিল।

বললাম, আমিও বলছি, হবেই এ বিয়ে। আমিই হবো সাক্ষী।

ম্লান হাসলো,—আমার জীবনটাই এমনি। পেয়েও পাই না। ভেবেছিলাম, কিছুই ত দেয়নি ভাগ্য, বোধহয় এইবার একটু আলোর রেখা দেখলাম। কিন্তু সে-ও মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে গেল। তাকে পাবো না। কিছুতেই পাবো না।

একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে বললে, সুরেশ ?

—কী ?

বললে, ছোট্ট একটা ঘরে সে থাকে। চিঠিতেই তার ঠিকানা আছে, তুমি গিয়ে দেখা করো। বড়ো ভাল মেয়ে। একটা অফিসে টাইপিস্টের কাজ করে।

বললাম, বাঙালী মেয়ে ওখানে গেল কী করে ?

বললে, সে এক অদ্ভুত কাহিনী। আমি টিণ্ডেলের সঙ্গে নিষিদ্ধ এক পল্লীতে গেছি। গা ঘিনঘিন করে গলির চেহারা দেখলে। আমাকে একটি বাড়ির দরজায় দাঁড় করিয়ে ভেতরে গেল। পরে ফিরে এসে বললে, তুমি যাও। আমি রাতটা এখানে থাকব। সারেঙকে ব'লে ভোরবেলা এখানে এসো। এসে, আমাকে ডেকে নিয়ে যেও।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আমি চলে এলাম। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। ভাবলাম, এখনি ফিরব কী জাহাজে? একটু বেড়িয়ে যাই। ঘুরতে ঘুরতে বড়ো রাস্তায় এলাম। হাঁটতে হাঁটতে শহরের এক প্রান্তে চলে এসেছি। হঠাৎ, একটা বইয়ের স্টলে থান দু'চার বাঙলা বই নজরে পড়ল। সে যে কি আনন্দ, তা ভাষায় বোঝাতে পারব না! এগিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বইগুলি উলটে-পালটে দেখছি। কতক্ষণ ধরে দেখছি, তার ঠিক নেই, হঠাৎ কানে এলো মেয়েলী এক কণ্ঠস্বর—বইগুলি দেখা হয়েছে কী?

কণ্ঠস্বরে যতটা না চমকে উঠলাম, ততোধিক চমকে উঠলাম কলম্বোতে বাঙলা ভাষার উচ্চারণ শুনে।

দেখি, আমারই মতো বইয়ের আকর্ষণে একটি যুবতী এসে দাঁড়িয়েছেন স্টলে।

বেশী বর্ণনা দেওয়া বাহুল্য মাত্র, মেয়েটির সঙ্গে এইভাবে আমার আলাপ। নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার? পেটি রিপেয়ারের জন্য জাহাজটা সেবার ওখানে ছিল প্রায় দিন দশেক। তাই না?

—তা হবে।

বললে,—এই দশ দিন রোজ তার সঙ্গে দেখা করেছি। তার অফিসও সে চিনিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, যখন সুবিধা হবে, তখনি আসবেন। অফিস-টাইম হলে অফিস থেকে ছুটি নেবো। কিছুই না। দুজনে খালি ঘুরে বেড়াতাম। অমন করে ঘোরার আনন্দও যে কতো হতে পারে, তা যদি আগে জানতাম! অদ্ভুত মেয়েটির জীবন। বললে, কলকাতাতেই তার শৈশব কেটেছে। নারকেলডাঙায়। ছোট বেলাতেই মা মারা যায়। বাপ আর মেয়ের সংসার। বাপ সংসারের ওপর বীতশ্রদ্ধ। ঘা খেয়ে খেয়ে ভদ্রলোক কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। বাঙালী প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিশতেন না, মেয়েকেও মিশতে দিতেন না। মিশতেন তিনি অবাঙালীদের সঙ্গে, তাঁর কারবারও ছিল অবাঙালীদের সঙ্গে। বলতেন, বাঙালীরা খুব যে স্বার্থপর তা নয়, কিন্তু এতবড়ো পরশ্রীকাতর জাত আর নেই।

মেয়েকে নিজে পড়াতেন বাড়িতে। প্রাইভেট ম্যাট্রিক পাশ করিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ এক গোঁ। বাঙালীর সঙ্গে মিশতে দেবেন না, এমন কি বিয়েও দেবেন না বাঙালীর সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত বিয়ে দিলেন এক সিলোনীজ ভদ্রলোকের সঙ্গে। সে ভদ্রলোক কলকাতাতেই থাকতেন। কিন্তু বিয়ের পর কী জানি

কেন, তাঁর মত বদলাল, চাকরিতে ট্রান্সফার নিয়ে বউকে সঙ্গে করে চলে গেলেন একেবারে কলম্বো।

তারপর ?

ঋষি একটু থেমে থেকে তারপরে বললে, বছর দুই পরে সেই ভদ্রলোক একদিন তাড়িয়ে দিলেন বউকে। অন্য বিয়ে করলেন। নিঃসহায় মেয়ে। কেই-বা সাহায্য করবে? বিয়ে তো হয়েছিল কলকাতায় হিন্দু মতে, পুরুত ডেকে বাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মে বৌদ্ধ ভদ্রলোক সিলোনে এসে যদি সে বিয়েকে একদিন অস্বীকার করে বসেন, তুমি প্রমাণ করছ কোন্ দলিল দিয়ে ?

কেন, বাপ ?

ম্লান হেসে ঋষি বললে, এও অদ্ভুত ব্যাপার। মেয়েকে ওভাবে বিয়ে দিয়ে দূরদেশে পাঠিয়ে বোধ হয় অনুশোচনা হয়েছিল ভদ্রলোকের। পাড়ার লোকেরাও বলত, মেয়ে-বেচা কশাই। তা টাকা তিনি নিয়েছিলেন মেয়ের বিয়েতে, বেশ কিছু টাকা, কারবার বাড়াবার জন্যে। কিন্তু কী যে হল, কলকাতার পাট উঠিয়ে দিয়ে কোথায় যে গেলেন, তা কেউ জানল না। একদিন খবরের কাগজের মাধ্যমে জানা গেল, পুরীর সৈকতে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পকেটে চিঠি। তাঁর নাম-ঠিকানা। লেখা, আমার আত্ম-হত্যার জন্য কেউ দায়ী নয়।

সোজা হয়ে উঠে বসেছি। বললাম, বলিস কী! এসব বানানো গল্প না তো ?

না।—ঋষি বললে, তাকে দেখলে তুইও বুঝবি, মিথ্যে কিছু বানানোর মেয়ে সে নয়। আর তা ছাড়া, তাকে লেখা তার বাপের চিঠিগুলোও আমি দেখেছি। তীব্র অনুশোচনার স্বর তাতে বেশ ধরা পড়ে।

তারপর ?

ঋষি বললে, তারপর আর কী? কোনক্রমে ওর দিন কাটে সেলাই করে, ছেলে পড়িয়ে। শেষ পর্যন্ত টাইপরাইটিং আর স্টেনোগ্রাফি শিখে অফিসের চাকরি। আমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা নেহাতই দৈব ছাড়া আর-কিছু নয়।

বললাম, তা, তাকে তো কলকাতায় নিয়ে আসতে পারতিস ?

ঋষি বললে, বলেছিলাম। বলেছিলাম, বিয়ের পর তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যাব, কেমন? কিন্তু সে রাজী হল না। বললে, দেহে যতদিন প্রাণ আছে, ততদিন বাংলা দেশ কেন, ভারতের মাটিও ছোঁব না।

একটু হেসে বললাম, হয়তো এ অভিমান।

হবে।—ঋষি বললে, মেয়েদের সঙ্গে কখনও মিশি নি। কিন্তু এমন মেয়েও কখনও দেখি নি। এত মিশেছি, কিন্তু কখনও প্রশ্রয় দেয় নি। বলেছে, ভালবাসতে শেখো, লক্ষ্মীটি। পাওয়ার পরে ভালবাসা নয়, ভালবাসার পরে পাওয়া। আমাকেও পেতে দাও তোমাকে তেমনি করে।

বলত, তোমার কাছে আমি আকর্ষণীয়, আমার কাছেও তুমি সমান আকর্ষণীয় হয়ে ওঠ।

একদিন বললে, একটা ধবধবে ফরসা লোক আমাদের ফলো করে, লক্ষ্য করেছ?

না তো!

বললে, লক্ষ্য করে দেখো। ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে হবে তোমাকে।

কেন? দুষ্টু লোক?

না, তা ঠিক নয়।—বললে, আমাকে যে বিয়ে করেছিল কলকাতায়, সে আমাকে এখানে এনে তাড়িয়ে দেবার পর ওই লোকটাই আমার জীবনে আসে। সীলোনিজ খ্রীষ্টান। ভালবাসতে শুরু করল। তোমার কাছে সত্য গোপন করব না, আমারও ভাল লাগত তখন লোকটিকে। কিন্তু আমার মন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হবার পূর্বেই ও একদিন জোর করে অধিকার করল আমাকে। ঘৃণায় সর্বশরীর রি-রি করে উঠেছিল। ওকে প্রত্যাখ্যান করেছি। সেই থেকে পরিহারও করে চলছি।

হেসে সেদিন ওকে বলেছিলাম, তা হলে তোমার জীবনে আমি তৃতীয় ব্যক্তি, কী বলো?

হাসতে গিয়েও হঠাৎ কী ভেবে হাসি আর হাসতে পারে নি। বরং কী এক অব্যক্ত বেদনার ছায়ায় ম্লান দেখাচ্ছিল ওর মুখ।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী হলো?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, না, কিছু না।

নিশ্চয় কিছু। বলবে না?

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললে, এদেশের এক জাতের মেয়েদের মধ্যে কী ধারণা আছে জান? যদি কোন মেয়ের জীবনে এমন ঘটনা ঘটে যে, পর পর দুজনের পর তৃতীয় পুরুষটির আবির্ভাব ঘটল তার জীবনে, তা হলে সেই তৃতীয় মানুষটি বাঁচে না।

হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম ওর কথা শুনে। বলেছিলাম. যত সব কু-সংস্কার।

ও কিন্তু অত সহজে উড়িয়ে দিতে পারে নি কথাটা। প্রথম দিকে খেয়াল করে নি, চৈতন্য হয়েছিল আমারই কথায়। আর যখন হল, তখন থেকে কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে থাকত।

এর পর আরও চার দিন ছিল আমাদের জাহাজ, অর্থাৎ ওই ঘটনার পর আরও চার দিন দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। কথাটা সে মন থেকে কিছুতেই দূর করতে পারে নি, ওটা যেন কাঁটার মত বিঁধে ছিল তার মনে। বলেছিলাম, তুমি সেই জাতের মেয়ে নও, তোমার অত ভাববার কী আছে?

বললে, না হলেও, সেই জাতের মেয়েদের সঙ্গে এক আকাশের নীচে বাস করি তো, একই বাতাসে নিশ্বাস নেই!

তারপরে একদিন নিজেই বললে, আচ্ছা, শোন। একটা কথা মনে হয়েছে ও-লোকটা আমার জীবনে ধূমকেতুর মত এলেও ওকে তো আমি ভালবাসি নি। অতএব, ওকে দ্বিতীয় পুরুষ ধরব কেন? দ্বিতীয় পুরুষ তুমি।

আর প্রথম পুরুষ?

বললে, যে বিয়ে করেছিল, সে। ভালবেসেছিলাম, সে কথা সত্যি।

তার কথা বলতে বলতে চোখ ছলছল করে এসেছিল। দেখে-দেখে ভেবেছিলাম,—অত্যাচারীকেও মানুষ ভালবাসতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক, শেষ দু দিন ওকে অতটা বিমর্ষ দেখি নি, ও যেন নিজের মনে-মনেই একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু বিপদে পড়লাম আমি নিজেকে নিয়ে। সীলোনিজ লোকটিকে ধরে আমি কিছুতেই নিজেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি ভাবতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, আমিই তৃতীয় ব্যক্তি, যে বাঁচবে না।

জানি এটা সংস্কার তবু অদ্ভুত মানুষের মন! এই যে কাঁটা প্রবেশ করল মনে, তাকে এই কয় মাস ধরে আর ওঠাতে পারি নি। চিঠি-পত্রে তার আভাস আছে। ও আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখেছে, বলেছে—আমার হিসাবে তুমি দ্বিতীয়।

কিন্তু আমি তা কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। এইরকম যখন ক্রমাগত দ্বন্দ্ব চলেছে মনে, এমন সময় ঘটল ওই সিগারেটের ঘটনাটা। মুহূর্তে সমাধান হয়ে গেল সব দ্বন্দ্বের। বুঝলাম, অমোঘ এই বিধান। মৃত্যু আমার

আসবেই। কলম্বো পৌঁছনোর আগেই যেমন করে হোক আমি শেষ হব। ওকে চোখের দেখাটুকুও আর দেখতে পাব না।

চোখ দুটো বুজল ঋষি। আবার তেমনি দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল ওর চোখের কোণ থেকে।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলাম আমি। সারেঙের সঙ্গে দেখা করে ওকেও বললাম সব। বললে, টিণ্ডেল বলেছে, ও মরবে ঠিক। ওকে মরণে ধরেছে। জাহাজে ওরকম হয়। এক জাহাজে এ-রকমটা হয়েছিল। নিজের চোখে দেখা। এডেন থেকে জাহাজ ছেড়েছে। খুব গরম। লোহার রেলিংয়ে পর্যন্ত হাত দেওয়া যায় না, ফোস্কা পড়ে। ইঞ্জিন রুম থেকে একটা লোক ছুটতে ছুটতে ওপরে এল, ঘামে তার পাজামা আর গেঞ্জি গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে। দেখতে-না-দেখতে, ধরতে-না-ধরতে 'আল্লা-হো-আকবর' বলে চিৎকার করে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরিয়ায়।

তোমরা বাঁচালে না?

কাকে বাঁচাব! কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজের পিছনে কিছুটা জল টকটকে লাল হয়ে উঠল।

লাল কেন?

বললে,—জলে পড়ামাত্র হাঙরে ধরেছে আর কী?

সর্বাঙ্গ দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল মুহূর্তে। বললাম, কিন্তু ঋষির তা হলে কী হবে?

কী আবার হবে! চোখে-চোখে রাখতে হবে। এই রকমই ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যায় মানুষ। তবে, যাই কর শেষ পর্যন্ত আটকানো যাবে না। আর-একটা জাহাজে একবার—

আমি আর শুনতে পারলাম না। ছিটকে বেরিয়ে এলাম ওর কাছ থেকে। বুকের কাছটা কেমন মুচড়ে-মুচড়ে আসছিল। গলার কাছটাও যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে, যেন নিশ্বাস নিতে পারছি না। চোখের পাতা দুটোও ভিজে ভিজে আসছিল। এর জন্য যে আমি দায়ী—আমি দায়ী। ভগবান ওকে বাঁচিয়ে দাও—যেমন করে হোক, ওকে বাঁচিয়ে দাও।

বাইরে গিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালাম। শান্ত সমুদ্র। তাকালাম আকাশের দিকে। একটা কোণের দিকে—

ও কী! কালো মেঘের একটা খণ্ড।

হয়তো কিছু নয়, কিন্তু আমার বুকের ভিতরটা দুর দুর করে কেঁপে উঠ হঠাৎ। নামতে গিয়ে দেখা হয়ে গেল টিণ্ডেলের সঙ্গে। তাকেই ব ফেললাম আকাশের কথা। সে তাড়াতাড়ি উঠে এসে মেঘটাকে দেখল বললে, ভাল ঠেকছে না। তুফান হবে। গাজী বদর-বদর!

দেখতে দেখতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে, প্রগাঢ় কালো মেঘে ঢেকে গেল সম আকাশ। সমুদ্রও যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠল জেগে। ক্রিং-রি-রি-রিং শ বাজতে লাগল ঘণ্টা। সবাই ডিউটির জন্য হলাম প্রস্তুত।

ঋষি বললে, টিণ্ডেল এসে এক বোতল মদ দিয়ে গেছে—আর কি পাতিলেবু। ড্রাই জিন, লেবুর রস দিয়ে খেতে বললে। আমি মুখেও তুলত পারলাম না। কী হবে? কেন নষ্ট করব নিজেকে শেষ মুহূর্তে? মর আসছে, ওর কাছে নিজেকে যখন সঁপেই দিতে হবে, পবিত্র ভাবেই দিই। ক খারাপ ব্যবহার করেছি তোদের সঙ্গে মাঝে মাঝে সুরেশ, আমাকে ক্ষ করিস।

বলতে বলতে গলা ওর ধরে এল, বললে, তাকে আর পাওয়া হল না জীবনের একমাত্র কামনা ছিল তাকে পাওয়ার। হল না। তার মুখখানি দেখা হল না শেষ সময়ে। যদি মরা দেহটা কোনরকমে পাস তো নি গিয়ে কলস্রোতে দাহ করিস।

চেঁচিয়ে উঠলাম, চুপ কর্ তুই ঋষি।

বললে, তুফান এসে গেছে। আর আমার মরণকে ঠেকায় কে?

হেসে উঠল পাগলের মত।

কিন্তু মাত্র ওকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে আমাদের চলবে না, ঝড়ের বিরু আমাদের যুদ্ধ করতে হবে প্রাণপণ। যার যেদিকে যেটুকু ক্ষমতা। যতক্ষণ ঝ না থামবে, ততক্ষণ কী অফিসার কী খালাসী, কারও বিশ্রাম নেই মুহূর্তের জন্য জেগে থাকা আর বুদ্ধি স্থির রেখে যার যার কাজ করে যাওয়া, আর নয়তে জাহাজডুবি হয়ে সমুদ্রের অতল-তলে চির বিশ্রাম।

ডেক ডিপার্টমেন্টের লোকেরা ছুটোছুটি করতে লাগল এদিক-ওদি পাগলের মত,—আর আমরা ছড়িয়ে পড়লাম জাহাজের জঠর-প্রদেশে ডেকের লোকেরা জাহাজডুবি হলে লাইফ বোটের সাহায্য নিতে পারে, কিন ইঞ্জিন-রুমের আমরা কলে-পড়া ইঁদুরের মত মারা পড়ব অসহায় ভাবে মুহুর্মুহু ওপরের দিকে তাকাচ্ছিল সবাই, যে কোন মুহূর্তে প্রবল জলস্রোত ওপ

থেকে নীচে এসে পড়তে পারে দুর্ধর্ষ প্রপাতের মত। আমরা ঘাড় ভেঙে মরতে পারি, আবার খাঁচায়-পোরা পাখির মত ছটফট করেও মরতে পারি। সারেঙ বললে, দরিয়ার অবস্থা ভাল নয়। পাহাড়ের মত সব ঢেউ উঠছে।

তামার ভয়েস-পাইপে ব্রীজ থেকে ইঞ্জিন-রুমে সব সময়ই ক্যাপ্টেনের নির্দেশ আসছে। ইঞ্জিনের গতি-নির্দেশক ফলকের কাঁটা-টা 'অ্যাহেড-অ্যাসটার্ন'-এর মাঝে কাঁপতে কাঁপতে চরম গতিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ জাহাজ চলছে এবার ফুল স্পীডে,—কোন্‌দিকে কে জানে!

কাজের ফাঁকে বেশ কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম, স্টোকহোল্ডে স্টারবোর্ড-বয়লারের ওয়াচে দাঁড়িয়ে ঋষিকেশ। টিণ্ডেল বোধ হয় ওর ওপর মায়াপরবশ হয়েই হালকা কাজ দিয়েছে ওকে। কিন্তু দূর থেকে ওকে ওভাবে দেখে বুকের ভিতরটা কী-এক আশঙ্কায় ধক করে উঠল মুহূর্তের জন্য। বয়লারের ওয়াচে এখন খুবই সতর্ক থাকা উচিত। পূর্ণগতিতে জাহাজ চলছে, বয়লারের প্রেসারে না তারতম্য ঘটে! জাহাজের দুর্দান্ত আন্দোলনে অথবা বয়লারের 'ওয়াটার-লেবেল' খুব বেশী হয়ে, বিপদের সম্মুখীন না হতে হয়।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। অন্যমনস্ক থাকলে ওকে এখন চলবে না। ওর সামান্য অন্যমনস্কতার জন্য জাহাজের এতগুলি প্রাণ না বিপন্ন হয়ে পড়ে! চড়া গলায় ডাকলাম, ঋষি!

চমকে কেঁপে উঠল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, কী?

বয়লারে স্টিম-প্রেসার কত? ওয়াটার-লেভেল?

অপ্রস্তুতের মত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল বয়লারের কাছে। দেখে এসে যা বললে তাতে বুঝলাম, সব ঠিকই আছে। বললাম, শোন। ভাবালুতার সময় এটা নয়। জাহাজের এতগুলি লোকের মরণ-বাঁচন। ওয়াচে কোনরকম গাফিলতি কোর না।

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখা যায় না ওর চেহারা। চোখ দুটো বসে গেছে, কপালে ভাঁজ পড়েছে, গলার হাড় দুটো অস্বাভাবিক উঁচু। শরীরও বেশ রোগা হয়ে গেছে। ম্লান হেসে বললে, বৃথা চেষ্টা। বাঁচাতে পারবে না।

শোনামাত্র হিংস্র আক্রোশে ওর জামার কালারটা চেপে ধরলাম: ফের অমন অলক্ষুণে কথা বলবে তুমি?

কিছু বলল না, প্রতিরোধও করল না। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে যাবার পর বলে উঠল, এক কাজ করলে বেঁচে যাবে তোমরা। আমাকেই ফেলে দাও

জলে। আগেকার ক্যাপ্টেনরা যেমন নাকি করত অলক্ষুণেদের নিয়ে। আমি অলক্ষুণে—আমি অপয়া।

বলতে বলতে দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল ছেলেমানুষের মত। বললে, কিছু পাই নি জীবনে। মরুভূমি। শুধু ওর ওই কয়েকদিনের সাহচর্য। কিন্তু সে যে বসে থাকবে আমার জন্য। সে স্থির জানে, আমি এই জাহাজেই যাচ্ছি তাকে বিয়ে করতে। এই জাহাজে তার বর আসছে। কী হবে তখন? তুমি দেখা কোর। তিন সত্যি কর যে দেখা করবে?

কোন উত্তর না দিয়ে আমি সরে এলাম ওর কাছ থেকে। এবং সেই যে সরে এলাম, আর কাছে যেতে পারি নি পুরো দুটো দিন, মানে আটচল্লিশ-ঘণ্টার জন্য। কিন্তু, মনে মনে বার বার বলেছি,—ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাক, ওকে বাঁচিয়ে রেখো। সংস্কার যে মিথ্যা, এর প্রমাণ যেন ওকে আমি দিতে পারি।

কেটে গেল আটচল্লিশ ঘণ্টা। ক্লান্ত পায়ে মুমূর্ষুর মত এসে বিছানায় এলিয়ে পড়লাম। আমার মত আরও অনেকে অসুস্থ হয়েছে। ওরই মধ্যে তাকিয়ে দেখি, ঋষি ওর বিছানায় শুয়ে আছে। কিন্তু এ কী কঙ্কালসার চেহারা হয়েছে ওর!

ফায়ারম্যানদের কাছ থেকে শুনলাম, এই দু দিনে চার-পাঁচবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ও। ওষুধ-পত্র দিয়েছে এসে চীফ অফিসার আর স্টুয়ার্ড। ডিউটি থেকেও অফ করে দেওয়া হয়েছিল। কোন ক্রমে এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। মাতালের মত টলছি। বললাম, কেমন আছিস?

আমাকে দেখে আবার কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, বললে, কমলার সঙ্গে একটিবার দেখা করবে তো? বলবে, আমি তাকে ভুলি নি?

তা কাঁদছিস কেন হতভাগা? করব, দেখা করব। একটিবারের জন্যও ভুলি নি।

আমার হাতটা টেনে নিয়ে রাখল বুকের ওপর। বললে, বাঁচলাম। জান, মরতে আমার দুঃখ নেই। কিছু পাওয়া যে আমার ভাগ্যে নেই, তা আমি জানি।

হাত ছাড়িয়ে সরে এলাম নিজের বিছানায়। তারপরে আর-কিছু মনে নেই। কে যেন বলেছিল, আমি একসঙ্গে ঘুমিয়েছিলাম আটটি ঘণ্টা।

উঠে, বিছানায় তাকিয়ে দেখি, ঋষি নেই। ঘরে কেউই নেই। পোর্টহোল্

দিয়ে ঝকঝকে রোদ এসে পড়েছে ঘরে। ওই ফাঁক দিয়েই দেখলাম, চক্রাকারে ঘুরছে সব সাদা সাদা সাগর-পক্ষীর দল। ঝড় থেমে গেছে। কিন্তু, এ কী, কোন পোর্টে এসে লেগেছে নাকি? তবে কি কলম্বো? লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সেলুনে গিয়ে দেখলাম, আমার অনুমান ঠিক। ঋষি টেবিলের সামনে বসে আছে চা-টোস্ট নিয়ে। ফরসা প্যাণ্ট আর শার্ট পরনে, মুখখানিও কামানো, চোখ দুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। কণ্ঠ তখনও দুর্বলতায় ক্ষীণ, বললে, শীগ্‌গির তৈরী হয়ে এস। তোমাকে আমাকে দুজনকেই এবেলা ছুটি দিয়েছে সারেঙ। কলম্বো এসেছি চার ঘণ্টা হয়ে গেল,—কলম্বো।

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতে সময় লাগল কিছুক্ষণ। তারপরে একটা আকস্মিক আনন্দের জোয়ারে যেন উদ্বেল হয়ে উঠলাম মুহূর্তে। প্রাতঃকালীন সব কাজ সেরে, বেশ করে পেট ভরে খেয়ে ভাল কাপড়-জামা পরে বেরুলাম ওর সঙ্গে। চীফ বললে, এজেণ্টকে চিঠি দিয়েছে ক্যাপ্টেন। ওকে কলম্বোতে ছেড়ে যাব আমরা। ডাক্তার এসে ওকে দেখে গেছে, বলেছে—খুব দুর্বল। ওকে 'সিক' করে দিয়ে গেছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে ওর পিঠ চাপড়ে বললাম, ভালই হল হতভাগা। বিয়ে করে দিনকতক কাটা শান্তিতে! কিন্তু দেখলি তো সংস্কার-টংস্কার সব বাজে।

ও কিছু বললে না, একটু হাসল শুধু।

পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। আলাপ হল মেয়েটির সঙ্গে। আমিও বাঙালী শুনে চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। বেশ মেয়ে, কথাবার্তায় বেশ সপ্রতিভ। কিছুক্ষণ কাটিয়েই ফিরে এলাম। আমি ফেরার ঘণ্টা দুয়েক পরে ও-ও ফিরল।

কী রে, এলি যে?

বললে, ও যে অফিসে গেল। শোন সুরেশ, রেজিস্ট্রার ওর চেনা। কাল বিকেল পাঁচটায়, তোমার অফ থাকবে জানি, আমার সঙ্গে যাবে সাক্ষী হতে। কালই বিয়ে। সব ঠিক হয়ে গেছে। আর দেরি করতে চাই না। ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারি না।

তাই হল। যথারীতি অনাড়ম্বর বিয়ে হয়ে গেল ওদের। কমলার ঘরখানা সাজানো হয়েছিল ফুল দিয়ে। গল্পে গল্পে খাওয়া-দাওয়ায় রাত হয়ে গিয়েছিল। টিণ্ডেল সারেঙ আর আমি উঠে এলাম। বললাম, আজ তোর ফুলশয্যা। চললাম। আমার কাল সকালে ছুটি আছে, ভোর হলেই আসব।

তারপরেই গলা নামিয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, এসে শুনব সব।

লজ্জায় খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখখানা, হাসতে হাসতে বললে, ব্যাপারের মীমাংসা করতে পারছে না কমলা। আমি ওর জীবনের তৃতীয় ব্যক্তি আমি জানি। কিন্তু ও বলছে—দ্বিতীয়।

যাও!—বলে লজ্জা পেয়ে ঘর থেকে উঠে বেরিয়ে গেল কমলা।

আমরা চলে এলাম। এ কাহিনী যদি এখানেই আমি শেষ করতাম, তা হলে ভাল হত রাইটার, কিন্তু তা তো হবার নয়। যিনি সকল কাহিনী, জীবন আর মনের নিয়ামক, তিনি এ কাহিনী আরও একটু দূরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

পরদিন সকালে যথারীতি ওদের ওখানে গিয়ে যা দেখলাম, তা যে কোনদিন দেখব, তা কল্পনাও করি নি। দেখলাম, লোকজন ভিড় করে আছে বাড়িটাকে ঘিরে। দু-একটা গাড়িও।

বলতে হবে, সিংহলের রাজপুরুষেরা খুব নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলেন। পুলিসের সামনে ডাক্তার লিখে দিতে দেরি করলেন না যে, মৃত্যু হয়েছে আকস্মিক হৃদ্‌স্পন্দন থেমে গিয়ে।

সারাটা দিন গেল মর্গ আর শ্মশান নিয়ে। সব শেষ করে এসে পরদিন যখন কমলার সঙ্গে দেখা করলাম, দেখি নিশ্চল প্রতিমার মত বসে আছে ও ঘরের এক কোণে।

কাছের একটা চেয়ারে আমিও গিয়ে বসলাম। কিন্তু কথা বলতে পারি নি অনেকক্ষণ। ঝাউগাছের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে দীর্ঘশ্বাসের মত। বললাম, সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন মনে হচ্ছে। অবশ্য তোমার শোকের সান্ত্বনা নেই, কিন্তু কেমন করে ঘটল এটা?

যেন সমস্ত লাবণ্য ওর দেহ থেকে শোষণ করে নিয়েছে কেউ। ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে কমলা বললে, সে রাত্রে আপনি চলে যাবার পর ও যেন মেতে উঠল আমাকে নিয়ে। বলতে বাধা নেই, আমিও ধরা দিলাম। কিন্তু ডাক্তারসাহেব যা বললেন, তাতে বুঝলাম, সেটাই আমার ভুল হয়েছে জাহাজে ওর যে অত মানসিক বিপর্যয় গেছে তা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি,

ও স্থিরই করেছিল, বিয়ে আমাদের হবে না। আমাকে ও পাবে না। কিন্তু সেই আমাকেই যখন আবার পেল, তখন সেই অতর্কিত পাওয়ার আনন্দের উচ্ছ্বাস ওর দুর্বল স্নায়ুতে ও সহ্য করতে পারল না। গল্প করতে করতে শেষরাত্রে এক সময় কেমন স্তিমিত হয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম—ঘুম পাচ্ছে? বললে—না, বুকের ভিতরটা কেমন করছে। বাস্, সে-ই শেষ কথা। ডাক্তার এসেও কিছু করতে পারলেন না।

চুপ করল সুরেশ্বর দাস। আকাশ তখন ফরসা হয়ে এসেছে। কেউই কোনও কথা বলতে পারছি না, আমিও না মহাদেবনও না।

অনেকক্ষণ পরে একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। জাহাজে সূর্যোদয় আসন্ন। আমরা তিনজনেই উঠে দাঁড়ালাম। মহাদেবন বললে, মেয়েটির কী হল শেষ পর্যন্ত?

কিছুই হল না।—সুরেশ্বর বললে, তারপরেও দুবার দেখা হয়েছে, সেই একই ভাব। সেই দিনকার সেই প্রস্তরমূর্তির মতন লাবণ্য-ঝরা চেহারা—দিনের পর দিন অফিসে কাজ করে চলেছে একই ভাবে, কথা বললে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, মিশতে চায় না কারুর সঙ্গে। ঋষির সেই বিশ্বাস,—পেয়েও পাবে না। সেই বিশ্বাসের মত, তার জীবনেও যে কিছু-একটা হবে না, কমলা এটা স্থির বুঝে নিয়েছে এতদিনে।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিররূপা

সন্তোষকুমার ঘোষ

প্রমীলার মালা দিয়ে সাজানো ফটোটার সামনে দাঁড়িয়ে যমুনা বলেছিল, 'আমিও ছবি হ'য়ে যাব।'

একটু আগে এই কথাটাই শাদা একটা কাগজে লিখেছে। লেখাটা পছন্দ হয়নি, ছিঁড়ে কুটিকুটি ক'রে উড়িয়ে দিয়েছে।

কেননা, ঘাড় ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মানে হয় না।

স্পষ্টকথা সোজাসুজি লেখাই ভালো। বিষয়ী যেভাবে উইল লেখে। সাত উকিলে চেঁড়াছিঁড়ি ক'রেও যার দুটো মানে পায় না। ডাক্তার লেখে প্রেসক্রিপশন—দাগে-দাগে মাপা হিসেব। বাজারের ফর্দেরও একটাই মানে হয়।

অর্থাৎ এসব লেখা তেমনই হওয়া ভালো, যার অর্থের কোনো বাড়তি ছায়া পড়ে না। একটুও ধোঁয়া নেই। যতটুকু লেখা হয়েছে ঠিক ততটুকু।

তা তো নয়, যমুনা লিখেছিল কিনা, 'আমি ছবি হ'য়ে যাব।' মাৎ হ'তে ব'সেও রহস্যের একটা সস্তা কিস্তি দিতে চেয়েছিল। সেটা যেই টের পেয়েছে, কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

তবু ফটোটার সামনে দাঁড়িয়ে আবার সেই কথাই তো বলল। বলল, সে-ও ছবি হবে। তার আগেই অবশ্য সে ভেবে নিয়েছে, মানুষ কী-কী হ'তে চায়, হ'তে পারে। পাখি, ফুল, তারা—এইসব হয়তো হ'তে চায়, যমুনা ঠিক জানে না। সে তো চায় না। হওয়া যায় না ব'লে। সহজে যা হওয়া যায়, তা হ'ল, ছাই কিংবা মাটি। অথবা পাথর। প্রাতঃস্মরণীয়েরা যা হন। চৌরাস্তার মোড়ে, পার্কের ধারে।

পাস-করা হোক বা যা-ই হোক, আসলে তো সামান্য মেয়েমানুষই, বিশেষ ক'রে যার মন ভেঙে গেছে, সে আর কী হবে, যমুনা শুধু ছবি হ'তে চায়। দেওয়ালের ছবি, এনলার্জ-করা, ফুলের মালায় ঘেরা। যাক, ফুলেই বা কাজ

কী, ফুল তো শুকোয়। নিত্য নতুন তাজা রং যোগাবে কে। কার দায়।

তার চেয়ে শুধু ছবিই ভালো। শাদাসিধে ফ্রেমে বাঁধানো একখানি মুখ, খানিকটা আলো, খানিক ছায়া; কপোলে চিবুকে আলো, ছায়া চুলে আর চোখে। আর ঠোঁটের কোণের এই হাসিটুকু ফুলের মতো দু-দিনেই তো বাসী হবে না।

বিয়ের পর প্রথম তিন বছর ওই ফটোটার কিন্তু অস্তিত্ব ছিল না। ওটা আবিষ্কৃত হ'ল শ্রীধর মিস্ত্রির লেনের ছোটো বাসাটা যখন ছেড়ে এল, সেই সময়ে।

সেখানে মোটে একখানাই ঘর। বিছানা পড়লে ভ'রে যেত। পা রাখবার জায়গা থাকত না। পাপোশে পা মুছে, আঁচলে হাত ঘ'ষে যমুনা টুপ ক'রে আলো নিবিয়ে পা টিপে-টিপে বিছানায় উঠত। তারপর অন্ধকারে সমীরের নাকের কাছে সন্তর্পণে হাত নিয়ে পরখ করত, নিশ্বাস জোরে পড়ছে কি ধীরে। মানুষটা ঘুমিয়েছে কিনা। সেই হাতের অঙুলটাই ধ'রে ফেলত সমীর। ছোঁয়াত ঠোঁটে, রাখত বুকে। তারপর শুধু হাতটা না, মুখ-বুক সব টেনে নিয়ে নিজের সঙ্গেই যমুনাকে মিশিয়ে দিত।

'এক আর এক কত হয়?'

পুরনো প্রশ্ন, উত্তরটা জানা। তবু যমুনা রোজই বলত, 'দুই।'

'কক্ষনো না। এই দেখ, এক আর এক যোগ দিয়েও আমরা একই র'য়ে গেছি।'

আরও একটা খেলা ছিল সমীরের। একে আর একে একাকার হ'য়ে যাবার পরও, ঘুমিয়ে পডবার ঠিক আগে জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করত, 'ভালোবাসো?'

'বাসি।'

'ভালোবাসো?'

'বাসি।'

'ভালোবাসো?'

যমুনাকে আবার বলতে হ'ত, 'বাসি।'

তিন সত্যি করিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে সমীর ঘুমিয়ে পড়ত।

একটি মোটে দরজা ছিল পুব দিকে; দরজার উপরে সবুজ রঙের কাচ—

বসানো স্কাই-লাইট ছিল। সকালের রোদটুকু সবুজ হ'য়ে ঘরে ছড়িয়ে পড়ত। মনে হ'ত যেন জ্যোৎস্না।

ভোরে স্নান সেরে আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে যমুনা ঘন চুলের ভিতর দিয়ে চিরুনি টানত; তখন শুয়ে-শুয়েই সমীর ওকে ইশারায় কাছে ডাকত।

দাঁতে চুলের ফিতে চেপে ধ'রে ঘাড় ফিরিয়ে যমুনা বলত, 'কী।'

সমীর শুধু হাতটা বাড়িয়ে দিত।

'সিগারেট খাবে বুঝি? প্যাকেটটা দেব?'

সিগারেট না। যা খেলেও ফুরোয় না, সমীরের তাই চাই।

যমুনা বলত, 'অসভ্য'; বলত, 'ছিঃ, এটা দিনের বেলা না?'

'কেন, তুমি কি দিনকা বাঘিনী?'

'কেউ যদি দেখে?'

'কেউ নেই। কেউ আসবে না। আমরা যে একঘরে।'

'সত্যিই সেই একটিমাত্র ঘরে একঘরে থাকতেই তখন যেন ভালো লাগত। বাইরের লোকজনকে মনে হ'ত উৎপাত।

স্নানের পর রোজ সিঁথির পুরনো রেখাটাকে খুঁজে বের করার মতো প্রতিদিন সকালে পুরনো নিয়মগুলোই একের পর এক শুরু হ'ত।

টুনিটার জন্যে সেই বাসা বদলাতে হ'ল। অসুবিধে হ'ত ওটা পেটে আসার পরেই। ছোটো ঘরটাতে তখন ভারি গরম লাগত, থেকে-থেকে যমুনার মনে হ'ত, দম বন্ধ হ'য়ে যাবে। জামা ঢিলে ক'রে দিত, শুয়ে গায়ে আঁচল রাখত না।

দুপুরে নিজের কাছে নিজে বেহায়া হ'য়ে শুয়ে আছে, সমীর হয়তো তখনই কোনো বন্ধুকে নিয়ে এল। যমুনা তখন কাপড় সামলাবে, না নিজে পালাবে, আর পালাবার মতো আলাদা ঘরই বা কোথায়।

টুনি এসে অসুবিধা আরও বাড়াল। ওটা ট্যাঁ-ট্যাঁ ক'রে কাঁদত। প্রথম-প্রথম মজা পেত সমীর, বাচ্চাটার গাল টিপে আদর ক'রে ভোলাতে চাইত। শেষে বিরক্ত হ'তে শুরু করল। সেসব শান্তির দিন গেছে। টুনিটা সারা রাত ধ'রে চেঁচিয়ে কেঁদেছে, যমুনাও কেঁদেছে মুখ বুঁজে। আর বিনিদ্র বিছানায় চিৎ হ'য়ে সমীর একটার পর একটা সিগারেট টেনেছে।

তখন ভাগ্যে মোটা মাইনের নতুন চাকরিটা হ'ল, নইলে শ্রীধর মিস্ত্রির লেনের খুপরি ছেড়ে এখানে উঠে আসা হ'ত না।

আর বাসা বদলাতে গিয়েই তো ফটোটা বেরিয়ে পড়ল।

সমীর বলেছিল, 'পুরনো জঞ্জাল কিছু নিয়ো না। নেহাৎ যা না হ'লে নয়, তাই নেবে। নতুন বাসায় আমরা নতুন আসবাব দিয়ে ঘর সাজাব।'

সেইজন্যেই যমুনা বাছাই করতে বসেছিল।

নতুন সুটকেস দুটোর নিচে ছিল পুরনো একটা তোরঙ্গ—ওটা নাকি সমীরের ছাত্র জীবনের। এতদিন খোলবার দরকার হয়নি।

উঠে আসবার আগের দিন যমুনা বাক্সটা খুলল। প্রথমে নাকে কাপড় দিতে হ'ল। অনেককালের পুরনো, পোষা, ভাপসা একটা গন্ধ প্রথম সুযোগেই বেরিয়ে এসেছে।

কিছু বই আর কাগজপত্রে তোরঙ্গটা ঠাসাঠাসি হ'য়ে ভ'রে আছে। বইগুলো মুছে-মুছে যমুনা আলাদা ক'রে রাখল তারপর কাগজের পর কাগজের স্তূপ, কোনোটা কলেজের নোট, কোনোটা চিঠি, সবগুলোই বিবর্ণ মলিন, দরকারী কি অদরকারী যমুনা জানে না। জানলে তো উনুনে ঢুকিয়ে দিয়ে এখনই নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

তখনই ছবিটা হাতে পড়ল।

অনেক নিচে চাপা প'ড়ে ছিল ব'লেই বুঝি সময় বা সময়ের চর পোকা ছবিটাকে নষ্ট করতে পারেনি। কাঁচটা ঈষৎ ঝাপসা হ'য়ে এসেছিল, আঁচল দিয়ে মুছতেই যার ছবি তাকে দেখা গেল।

কুড়ি কি বাইশ বছরের একটি মেয়ে, ফটো দেখে রং বোঝা যায় না, তবু মনে হয় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা; চোখ দুটি মায়াবী, মুখশ্রী কোমল।

মেয়েটি হাসছে। সামান্য একটু হাসি, যা ঠোঁটের কোণটুকু ছুঁয়ে থাকে, কিন্তু সারা মুখে ছড়িয়ে যায় না, রহস্যের ঈষৎ ইশারা দিয়ে মানুষটাকে একই সঙ্গে দূরের আর কাছের ক'রে তোলে।

ঠিক তখনই সমীর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ছবিটা তুলে ধ'রে যমুনা বলল, 'দেখ তো, এটাও জঞ্জাল নাকি, নতুন বাসায় কি নিয়ে যাবে?'

সমীর যদি বলত, 'নিয়ে চলো', তা হ'লেও যমুনা সবটা বুঝত না। তা তো না, সমীর হাত বাড়িয়ে ছবিটা ছিনিয়ে নিল। কোনো জবাব দিল না। এতদিনের এত চেনা মানুষটা হঠাৎ কেমন কঠিন আর হিংস্র হ'য়ে গেছে। যমুনা ভয় পেল।

আজ এতদিন পরে প্রমীলার ফটোটার দিকে চেয়ে যমুনা মনে-মনে বলল, 'বেশ তো ছিলাম, তোমার পরিচয় যতদিন জানিনি। কেন যে সব-জানার সর্বনাশা সাধ আমাকে পেয়ে বসল।'

'নতুন বাসায় সত্যিই নতুন আসবাব এল। জানালায় নীল পর্দা ঝুলিয়ে দিলাম। ফুলদানিতে রাখলাম ফুল। আর একটি কোণে জলে আর রোদে আর হাওয়ায় একটি লতা দিনে-দিনে পাতা মেলে বড়ো হ'ল।

'কিন্তু স্কাই-লাইট ছিল না; সকালেও-সবুজ জ্যোৎস্নায় বিছানা ভ'রে যেত না।

'রোজই ও বাসায় ফেরবার সময় কিছু-না-কিছু কিনে আনত। ঘর সাজাবার টুকিটাকি; কিংবা উপহার। আমার হাতে তুলে দিয়ে ও হাসত। হাসতাম আমিও, কিন্তু তোমার কথা ভুলিনি।

'রোজই দুপুরে না ঘুমিয়ে পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতাম। যদি কোথাও একটু হদিস মেলে। পাওয়া যায় এক টুকরো চিঠি, কিংবা একটি নাম। যার মায়াবী চোখ দুটিকে ফটোর ফ্রেম ধ'রে রেখেছে, তার পরিচয় যে আমাকে জানতেই হবে।'

যমুনার মনে পড়ল, সেই সময়ে সমীর ওকে আরও বেশি আদর করত। প্রায়ই অনুযোগ করত, 'তুমি রোগা হ'য়ে যাচ্ছ।'

রোগা হবে না, পেটে তখন আরেকটা শত্রু এসেছে যে। খবরটা টের পেয়ে সমীর বলল, 'আবার?'

মাথা নিচু ক'রে যমুনা বলল, 'আবার।'

সমীর এমন ভাব দেখাল যেন সে খুশি হয়েছে। আসলে কিন্তু বিরক্তই হয়েছিল। অফিসে বেরুবার সময় পান না পেয়ে সেদিন বিশ্রীরকমের রাগারাগি করেছিল।

সেই রাগটা মাসকাবারে ফেটে পড়ল আরও কুৎসিতভাবে। যমুনা বুঝি বলেছিল, 'দেখ, এ-মাসে আমাকে আরও কয়েকটা টাকা বেশি দিয়ো।'

'বেশি! কেন?'

'দুধ-টুধ, আরও নানা খরচাই তো বেড়ে গেছে, আমি আর কুলিয়ে উঠতে পারছি না।'

'রাবণের গুষ্টিতে ঘর ভ'রে ফেললে আরও পারবে না' এমন কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল সমীর, যেন দায়িত্ব যমুনার একার।

একটু-একটু ক'রে সংসারের চেহারাই যেন বদলে যাচ্ছিল। সমীর যেন আলাদা মানুষ। কিংবা আলাদা নয়, মানুষটার এদিকটা যমুনা আগে দেখতে পায়নি। যেমন গরমে যখন রোদ পায় মানুষ, পৃথিবীর শীতকালের দিকটা তখন উল্টো দিকে থাকে।

সম্পর্কের ঋতুচক্রে ধীরে ধীরে ঘুরে গিয়ে সেই শীতকালটা আজ এসেছে।

ভাতের থালা মাঝে-মাঝে ঠেলে দেয় সমীর, বলে, 'একেবারে মুখে তোলা যায় না যে। এতটা ধ'রে গেল কী ক'রে।'

দোষ তো যমুনার নয়, দোষ তার ঘুমের। হঠাৎ মাথাট ঘুরে উঠেছিল, তাড়াতাড়ি ঘরে এসে শুয়ে পড়তে হয়েছিল তাকে। কখন ভাত ধ'রে গেছে টের পায়নি।

ঝোলের বাটি মুখে তুলে সমীর বলে, 'পানসে। পানসে।' বলে, 'কাল থেকে হোটেলে খেয়ে আসব।'

যমুনা আজ নিজেকে বলল, 'তাতেও আমি মনে কিছু করিনি ; বা, করলেও মুখ বুজে থেকেছি। কিন্তু সেদিন অমন অপমান কেন করল।

'কেন লুকিয়ে-লুকিয়ে খুলল সেই পুরনো বাক্সটা, ফটোটা বের করল। আমি পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ও টের পায়নি। কাঁচের ফ্রেমের ওপর আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে দিল। গাঢ়, খুব নিচু গলায় ওকে একবার বলতে শুনলুম, "প্রমীলা!"

'হঠাৎ কী ক'রে থাকব, চমকে পিছন ফিরে চাইল। লুকোতে গেল ছবিটা।

'আমি শান্ত সংযত গলায় বললুম, "দাও, ছবিটা দাও।" আগের দিন ও ছিনিয়ে নিয়েছিল, আজ আমার ছিনিয়ে নেবার পালা।

'ছবিটা হাতে নিয়ে চ'লে যাচ্ছি, ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, ও অসহায়ের মতো চেয়ে আছে। ওর চোখে স্পষ্ট দুশ্চিন্তা আঁকা স্পষ্ট দেখলুম। বোধ হয় ভেবেছিল, ছবিটা আমি চুরমার ক'রে ভেঙে ফেলব।

'ও আমাকে চেনেনি।

'খানিক পরে শোবার ঘরে ও যখন চুপে-চুপে ফিরে এল, তার আগেই ফটোটাকে আমি সযত্নে মুছে দেয়ালে ঝুলিয়ে দিয়েছি। ফ্রেমটাকে ঘিরে দিয়েছি একছড়া মালায়। মালাটা আমার খোঁপায় ছিল।

'ওকে বললুম, "চুরি ক'রে আর দেখবে কেন, এখন থেকে রোজ এখানে দাঁড়িয়েই তোমার প্রমীলাকে দেখো।"

'তখনও মাত্র নামটাই জানি।

'ও মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল, দেখলুম এই সুযোগ। এইবার জেরা ক'রে-ক'রে গোপন কথাটি জেনে নেব।'

যমুনার মনে আছে, সমীর প্রথমে বলতে চায়নি। কিন্তু ছাড়েনি যমুনাও। কাছে ঘেঁষে এসেছে, সমীরের কাঁধে হাত রেখে বলেছে, 'বলো না, বলো না গো, প্রমীলা তোমার কে।'

সমীর স'রে যেতে চেয়েছে। বলেছে আস্তে-আস্তে, 'জানতে চেয়ো না, জেনে তুমি সুখী হবে না।'

চেষ্টা ক'রে যমুনাকে খিলখিল ক'রে হেসে উঠতে হয়েছে। '—কেন, ও কি আমার সতীন। বলো না, আমাকে বিয়ে করবার আগে তুমি কি প্রমীলাকে বিয়ে করেছিলে।'

গম্ভীর গলায় সমীর বলেছে, 'না, আমাদের বিয়ে হয়নি। হ'তে পারেনি।'

'বাধা ছিল বুঝি ?'

ফটোটার দিকে চকিতে চেয়ে সমীর বলেছে, 'হ্যাঁ, দুস্তর বাধা।'

যমুনা বলেছে, 'ও।' তারপর নিজেকে আর ধ'রে রাখতে পারেনি, পরিহাসের মিথ্যে মুখোশ খসিয়ে দিয়ে ব'লে উঠেছে, আমাকে এতদিন বলোনি কেন ? প্রমীলাকেও ডেকে আনো না ! তা, এই একটিই, না আরও অনেক আছে ? একটি, দুটি, তিনটি ? দশটি, না বিশটি ?'

পাথরের মতো চুপ হ'য়ে সমীর দাঁড়িয়ে আছে দেখে হিংস্র হাতে তাকে ধাক্কা দিয়ে যমুনা বলেছে, 'বলো না ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, বলোই না।'

সেই আকস্মিক আক্রমণে সমীরেরও স্থৈর্য টুটেছে। সেও কটুকণ্ঠে ব'লে উঠেছে, 'সে-হিসেবে তোমার দরকার ? বেশ, জেনে রাখো, অনেক—অনেক ছিল। তুমি কি ভাবো মন্ত্র প'ড়ে উলু দিয়ে তোমার সঙ্গে ওরা যখন আমাকে শুইয়ে দিয়ে গেল, তার আগে আমি কোনো মেয়ের দিকে চোখ তুলে চাইনি ?'

সমান জোর দিয়েই যমুনা বলেছে, 'শুধুই চেয়েছ, না চেখেছ ?'

'চুপ করো' সমীর এবার ধমক দিয়ে উঠেছে, 'যার তুমি পায়ের নখের যোগ্য নও, তাকে নিয়ে বিশ্রী ঠাট্টাগুলো কোরো না।'

আশ্চর্য, যমুনা আজ টেবিলে মাথা রেখে ভাবল, 'তখনও আমার সাধ হয়নি যে, ছবি হই। আজ কেন হ'ল।

'আমি কি বিনিটাকে বিয়োবার অপেক্ষায় ছিলুম। তাই যদি হয়, তবে ভালো করিনি।

'কেননা, বিনিও হ'ল, আমিও বিছানা নিলুম। মন তো কবেই ভেঙেছে, শরীরটাও ভেঙে একেবারে পড়ল। সংসারের কাজে আরও খুঁত হ'তে থাকল।

'ফটোটা কিন্তু র'য়ে গেল ওই দেওয়ালেই। উঠতে বসতে চোখে পড়ে। আমার, আমার স্বামীর। চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে হয়তো ফটোটার সামনে গিয়েও থমকে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখে। কী দেখে। আমাদের মধ্যে কে বেশি সুন্দরী?

'দেখুক, আমি ভেবেছি, ও যদি বাড়াবাড়ি কিছু না করে, আমিও করব না। যা উবে গেছে তার জন্যে হা-হুতাশ ক'রে লাভ কী, যেটুকু আছে তা দিয়েও একটা সংসার চ'লে যায়!

'তবু তো সেই চূড়ান্ত ঘটনাটা আজই ঘটল।

'একমাস ভুগে আজই প্রথম তো পথ্য করেছি। বিকেলে কী খেয়াল হ'ল, গা ধুয়ে এসে পরলুম একটা ডুরে শাড়ি। মুখে একটু পাউডার বুলিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালুম। এখনই ওর আসবার কথা আছে।

'ও এল। মুখ কালো, হয়তো ক্লান্ত, হয়তো কারও সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছে। পা থেকে মাথা অবধি আমাকে একবার দেখে নিল। তারপর বিরস গলায় বলল, "দেখ, তুমি আর এভাবে সাজগোজ কোরো না। করলেও বাইরে দাঁড়িয়ো না।"

'প্রথম সম্ভাষণ এই? জ্ব'লে গিয়ে বললুম, "কেন।"

"বোঝো না, কেউ ফিরেও তাকাবে না ব'লে।"

'আমি কাঁপছিলুম। মুখে কথা ফুটছিল না। কোনোক্রমে রুদ্ধশ্বাসে বললুম, "কী, আমি বাইরে দাঁড়াই, লোকে তাকাবে ব'লে?"

'ও কিছু না ব'লে ঘরের ভিতরে এল। আমি চেঁচিয়ে বললুম, "ছোটো-লোক, অভদ্র, ইতর।"

'ও শান্ত গলায় বলল, "তোমার সম্মানের জন্যেই বলেছি। তুমি বোধ হয় জানো না, তোমার বয়স বাড়ছে। ওসব সাজ আর মানায় না।"

'ওকে তখন টেনে এনেছি ফটোটার সামনে। বিবেচনাহীন পাগলের মতো চিৎকার ক'রে বলেছি, "বয়স বুঝি একা আমারই বাড়ছে? তোমার প্রমীলা বুঝি ছুঁড়ি, বয়স বাড়ে না?"

"না।" কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে আগেকার মতোই অবিচলিতভাবে ও বলেছে, "না, বাড়ে না।"

'কান্না পেয়েছে, তবু অত্যন্ত তীব্র, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ গলায় হেসে উঠেছি, "তোমার প্রমীলা বুঝি উর্বশী?"

'ঠাট্টাটায় কান না দিয়ে ও বলেছে, "বাড়ে না, বাড়াবার উপায় নেই ব'লে।"

"কোথায়, কোথায় সে।"

'ওকে আস্তে-আস্তে বলতে শুনেছি, "কোথাও না। কিংবা জানি না, হয়তো উপরে, স্বর্গে। তিনদিনের জ্বরে মারা গেছে। আমাদের বিয়ের ঠিক দেড় বছর আগে।" ব'লে আর দাঁড়ায়নি, জামা গায়েই ছিল, ও আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।'

তারপর এই এত ঘণ্টা কেটে গেল, এখনও ফেরেনি সমীর। চুপ ক'রে ব'সে থেকে-থেকে যমুনার সমস্ত রাগও যেন জুড়িয়ে গেছে। বন্যার জল যেমন বাড়ে, তেমনিই একটু-একটু ক'রে রাত বেড়েছে। আর, ক্লান্ত যমুনা ধীরে-ধীরে মাথা নেড়ে আপন মনেই বলেছে, 'আমিও ছবি হ'য়ে যাব।'

এতদিনে সে টের পেয়েছে, কোথায় প্রমীলার জোর। সে যে ছবি। ছবি হ'য়ে আছে ব'লেই তার বয়স কোনোদিন বাড়বে না, রূপ ঝ'রে পড়বে না, বছর-বছর বাচ্চা বিইয়ে ফতুর হবে না; মায়াবী চোখ আর ঠোঁটের হাসি অবিকল থাকবে। ছবি ব'লেই সংসারের খরচ নিয়ে কথা কাটাকাটি ক'রে স্বামীর চোখে সে ছোটো হ'য়ে যাবে না। স্বামীকে কারণে-অকারণে সন্দেহও করবে না। আর চিত্তের সমস্ত মাধুর্য নিয়ে ওই ফ্রেমের বাঁধনে চিররূপা হ'য়ে থাকবে।

এই অসম প্রতিযোগিতায় যমুনার হার তো হবেই। তাই, এই নিরিবিলি রাত্রে, কোথাও যখন সাড়া নেই, শব্দ নেই, যমুনা ধীরে-ধীরে মাথা নেড়ে প্রমীলার ফটোর দিকেই চেয়ে, মৃদুস্বরে বলল, 'আমিও ছবি হ'য়ে যাব। ও দেয়ালে ঝুলিয়ে দেবে আমাকেও। আমি প্রমীলার সমান হব।'

আবার বলল, এবার আরও মৃদুস্বরে, 'এতদিন বুঝিনি, যতদিন প্রাণ আছে, ততদিন ভয়। ভয় দেহ দিয়ে; কেননা, সুখ শখ, সব দেহেরই। ভয় আবার

দেহটাকে খোয়ানোরও, অথচ মৃত্যুই দেহোত্তর জীবন, আর সেই জীবনই সম্পূর্ণ। কারণ কিছুই খোয়ানোর ভয় তখন নেই।'

স্থির, অকম্পিত হাতে যমুনা মালিশের শিশিটা মুখের কাছে নিয়ে এল।

আতসী উজ্জ্বল

রমাপদ চৌধুরী

শহর দক্ষিণের এ অংশটা যুদ্ধের সময় ছিলো মার্কিনদের মিলিটারি হাসপাতাল। তারপর সেই সাজসরঞ্জাম, বাড়িবাগান জুড়ে দেশী রুগীদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা হলো। গড়ে উঠলো একটা নতুন ডাক্তারি কলেজ, আর হাসপাতাল।

দোতলা বিরাট প্রাসাদের মত বাড়িখানা এলো সরমাদের জিম্মায়। এক একখানা ঘরে দু দুজন নার্স। সারা ম্যানশনটায় কম করে পঞ্চাশজন সেবিকার আবাস।

মানসী বয়সে ওর চেয়ে বেশি বড় না হলেও বেতনে এবং বিদ্যায় নিশ্চয়। গা-ছোঁয়া হাসপাতালটার মেট্রন ও। তাই আর-আর সিস্টারদের মনের কোণে ওর প্রতি যেটুকু ভালবাসা আছে তা ভেজালে মেশানো। সরমা কিন্তু সত্যি বেশ আপন হয়ে উঠেছে মানসীর। অন্তরঙ্গ। তাই দখিন-খোলা মাঝের সেরা ঘরখানাই হয়েছে মানসী আর সরমার কুমারীকুঠি।

ছোট্ট ঘর। দু-দিকের দেয়াল ঘেঁষে দুখানা একক পালঙ্ক। একটা কম-দামী ড্রেসিং টেবিল। চিঠি লেখবার একখানা ক্ষুদে মেজ, সবুজ রং করা। আর খান দুই তেপায়া। সারা ঘরটায় ঐশ্বর্যের ছাপ নেই কোথাও। দারিদ্রের আছে হয়তো। তবু কত পরিচ্ছন্ন। পরিপাটি। বাফ্ রঙের ডিসটেম্পার করা দেওয়ালের গায়ে কোন এক নাম-করা ওষুধ কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার।

সহজ কথায় সরমা আজ সুখী।

খাওয়া-পরার খরচ চালিয়েও বেশ কিছু টাকা হাতে থাকে ওর। কিন্তু সব টাকাই মা-কে পাঠাতে পারে না। ইচ্ছে হয় বৈকি। ছোট্ট বোন আর ছোট ভাই দুটি। তিনজনেই ইস্কুলে পড়ছে। মার অসুখ আর পুজো-পার্বণও যেন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে! যে ক-টা টাকা পাঠায় ও, চারজনের

পাকে তা কতটুকু? ইস্কুলের মাইনে, বই কেনার টাকা। ওষুধের দাম, মা কালীর মানত। আরো কিছু যদি পাঠাতে পারতো!

ব্যয়ের অঙ্ক ও অনেকখানি সংক্ষেপ করেছে, রুচির হানি ঘটিয়েও। এ বোর্ডিঙের আর পাঁচজনের মত দু-জোড়া জুতো অবধি রাখে নি। রঙিন-শাড়ীর সঙ্গেও ঐ সাদা জুতোটাই চালিয়ে দেয়। প্রসাধনের পায়ে প্রণামী দেয় না, সিনেমা দেখে কচিৎ কখনো।

ফুরসত পায় ছুটির দিনে। ফূর্তির ফোয়ারায় গা ডুবিয়ে দেয় সেদিনটা। সারা সকালটা হৈ-চৈ করে। এর ওর ঘরে ঢোকে, কারো বাক্সপ্যাটরা খোলে, কারো বা চিঠিতে চোখ আঁটে। এ দরজায় টোকা দেয়, ও দরজার ফাঁকে ছুঁয়ে দেয় দু-এক কলি ভাঙা গানের সুর, কাউকে টিটকারি দেয়, কাউকে সহানুভূতি।

সারা দুপুরে এদিকে দল বেঁধে রাস্তায় টোঁ-টোঁ। নিউ মার্কেটের ফলের দোকান, হোয়াইট্যাওয়েের শো-কেস। সিনেমার স্থির ছবির উইনডো, ওদিকে হকার্স-কর্নার, দশ-বারোজন মিলে এখানে-ওখানে জবরদস্তি দেখাবার চেষ্টা করে। বাসট্রামের সামনে হাত তুলে দাঁড়ায়, চাপা দাও নয়তো থামো। ব্লাউজের ছিটের দর কষাকষি করে হিন্দিতে ধমক দেয়। তারপর ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে।

আর-আর দিনগুলো একঘেয়ে। একঘেয়ে হলেও বিরক্তির নয়। সারা দিনের খাটুনিতে যা কিছু শ্রমাতুর ভাব তা সান্ধ্যরোমাঞ্চের বাতাস ওর কপাল থেকে মুছে নেয়।

বিকেলের মেঘের রক্ত যখন জমে কালো হয়ে যায়, হলুদ-রঙা বাতাসের তাপ কমে, তখন স্নানান্তের স্নিগ্ধসৌরভ মেখে সামনের বারান্দায় এসে বসে সরমা। এদিকে আকাশের প্রথম তারারা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। সাড়া না দিয়ে পারে না ও।

সারিবাঁধা কৃষ্ণচূড়ার পাতা নড়ে ওঠে। সন্ধ্যার সুগন্ধি বাসিবাতাসকে টেনে নিয়ে যায়। আর নরম ঘাসের বীথিপথের ওপর হাল্কা পায়ে পায়চারি শুরু করে সরমা। এক একবার আচমকা মাথা তোলে, চোখের দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয় অনেক অনেক অন্ধকারের দূরত্বে। আবছা আলোর ফিকে রোশনাই আর আরো দূরের জমাট অন্ধকার। এভেন্যুর দু-পাশে ল্যাম্পপোস্টের সারি। প্রহরী-আলোর আমেজটুকুও দূরে গিয়ে দিক হারিয়েছে। ফিকে হয়ে গেছে জনতার ভিড়। তবু এগিয়ে যায় সরমা। তারপরই হঠাৎ হয়তো চোখে

পড়ে একটি ছায়াপুরুষ। প্রতীক্ষাসফল আনন্দের হাসি উছলে ওঠে ওর চোখের নীলায়।

অমানিশার অন্ধকারই থাক বা শুক্লজ্যোৎস্নার জোয়ারই জাগুক আকাশে, নিরালা পৃথিবীর মাঝে, বন-কৃষ্ণচূড়ার আঁধারের চাঁদোয়ায় ঢাকা নিরালোক পৃথিবীর মাঝে এসে নামে ওরা। পাশাপাশি। একটি নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে এসে বসে ওরা দুজনে।

রাত গভীর হয়ে আসে। আর মন। তারপর, একসময় যতি পড়ে ওদের মুগ্ধমনের কথালাপে। একক শূন্যতার মাঝে ফিরে আসে সরমা। কুমারী-পালঙ্কের নরম শয্যায় শরীর ছড়িয়ে রেখে চোখের পাতায় ঘুম নামাবার মন্ত্র পড়ে।

ওদিকের রোগা খাটে মানসী।

তন্দ্রাবেশে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সরমা। তবু ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে বলতে হয়। ওর দৈনন্দিন রোমাঞ্চের ইতিহাস শোনাতে হয় মানসীকে। নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ হয়ে আসে সারা দুনিয়া। শব্দহীন। শুধু ওদের দুজনের টুকরো টুকরো হাল্কা কথা। কাঁচের গেলাসে গুঁড়ো বরফের কুচির মত ঠাণ্ডা, ভাঙা ভাঙা।

মানসীর কাছে কিছু লুকোতে চায় না সরমা। লুকোতে পারে না। বুক উজাড় করে অদ্ভুত একটা আনন্দ পায় ও। ভরসাও।

কিন্তু—হ্যাঁ, মানসীর কাছ থেকেও একটা দিনের কাহিনী গোপন রেখেছে সরমা। শুধু একটি দিন।

বিকেল পাঁচটার ঘণ্টা পড়লো। আর অন্যান্য দিনের মতই সেদিনও কি এক অবোধ্য অস্বস্তি এসে ঢুকলো সরমার বুকে।

রোজই এমন হয়।

লম্বা ওয়ার্ড। দু-পাশে সারি-বাঁধা রোগশয্যা। মাঝখানে সরু একটা প্যাসেজ। সমস্ত ঘরখানায় একটা পরিচ্ছন্নতার প্রলেপ। শান্ত আর নিঃশব্দ। প্রতিটি লোহার খাটে শ্বেতশুভ্রতার বিছানা বিছানো। আর রুগীদের শিয়রের কাছে টাঙানো এক একটি গ্রাফ-আঁকা চার্ট। হাসপাতালের সুদীর্ঘ ওয়ার্ড— এ দরজা থেকে ওদিকের ফটক অবধি যেতে পাঁচ মিনিট অন্তত লাগবে। অথচ সারাটা দিন সরমা অক্লান্ত।

কপালে ওর ঘাম ফোটে, মুখে হয়তো বা শ্রমোজ্জল রক্তিমাভা। কিন্তু চোখে শ্রান্তির আবেশ দেখা দেয় না। রুগীরা কেউ সহজ, কেউ বা আড়চোখে লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্য করে। হাসপাতাল ছেড়ে যাবার বহুদিন পরেও হয়তো ওদের মনের পটে ভেসে ওঠে এখানকার দৃশ্যটুকু।

সরমা। নাতিশীর্ণ দেহ জড়িয়ে যার একখানি সাদা ফুটফুটে শাড়ী, পায়ে সাদা জুতো, মাথায় কালোকেশের কোমল প্রাচুর্য ঢেকে শুশ্রূষকের শ্বেতচিহ্ন; সব মিলে অদ্ভুত সুন্দর দেখায় ওকে। জীবন্ত যৌবন। একটি ভ্রমরাকাঙ্ক্ষী রজনীগন্ধার অন্ধ কলির মত। উদ্দাম আর চঞ্চল। উন্মাদনা আর চপলতা। হ্যাঁ। খুটখুট করে ফ্ল্যাট-হিল্ জুতোর হাল্কা আওয়াজ চেপে চেপে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে সারাটা দিন। তখনই থার্মোমিটার দিচ্ছে এর জিভের নিচে, জ্বরতরঙ্গের গ্রাম আঁকছে চার্টের গায়ে। আর তখনই হয়তো ওর ঠোঁটের কাছে ধরেছে ওষুধের গ্লাস। ছুটো হাল্কা হাসি এর দিকে, ওকে ছুটে সান্ত্বনা দেওয়া, আরেকজনকে হয়তো বা তর্জনী-তোলা ধমক।

সত্যি। সারাটা দিন ও অক্লান্ত। কিন্তু পাঁচটার ঘণ্টা শুনতে পেলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে ও। ছুটির ডাক শুনতে পায়, দিনান্তের রোদো বাতাস ওর মদো রক্তকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে শুরু করে।

জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের পৃথিবী দেখা যায়। হাসপাতালের দক্ষিণের দেয়াল ছুঁয়ে গেছে চওড়া সড়ক। দু-পাশে একপথো পীচের রাস্তা, মাঝখানে ঘাসের জমিন। আর পথ বড় হলেও এদিকটায় গাড়ীঘোড়ার উৎপাত নেই; বেশ ঠাণ্ডা, চুপচাপ। পোড়া পেট্রোলের গন্ধ আসেনা নাকে, হর্নের হঠকারিতা নেই।

পাঁচটার ঘণ্টা ওদিকে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরের পৃথিবী থেকে ছিটকে এলো খানিকটা চঞ্চল বাতাস। সান্ধ্যভ্রমণাদের ভিড়-ভিড় গুঞ্জন কানে এলো সরমার।

আর একটি ঘণ্টা। তারপরই ছুটি।

হঠাৎ ঘরের আলো কাঁপলো। ভাঙলো নিঃশব্দতা। কারও কণ্ঠে উচ্চকিত স্বর, কারও চোখে বিষণ্ণ হাসি। টুকরো টুকরো কথার কাকলিতে ঘর কেঁপে উঠলো।

হ্যাঁ। প্রতিদিনই, ঠিক এই সময়টায় রুগীদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা এসে হাজির হয়। দৈনন্দিন সাক্ষাতের জন্যে।

আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বার বার ওর চোখ যায় একশো বাষট্টি নম্বর বেডের দিকে। খাটের পাশের টুলটিতে এসে বসে সে। রোগশয্যায় শায়িত বন্ধুকে সাক্ষাতের সান্ত্বনা দিতেই আসে। কিন্তু চোখ থাকে তার সরমার দিকে। প্রথম প্রথম কৌতুক বোধ করতো সরমা। নিজেরই অজান্তে ঠোঁটের কোণে ওর হাসি দুলে উঠতো, তারপর সচেতন হতেই ঠোঁট টিপে হাসি চাপতো।

মন মন্দির হ্ত না সত্যি, কিন্তু হাসিটা মধুর। তাই হয়তো অন্য কোন অর্থ পেয়েছিল লোকটি, ভুল ভেবেছিল। ফলে সাহস বেড়ে গেল তার। যা ছিল মোমবাতির আলোর মত ঠাণ্ডা মোহময় দৃষ্টি, আশার আগুনে তা জ্বলে উঠলো।

অসহ্য লাগলো সরমার। অস্বস্তি বোধ করলো ও। মানসীর কাছে অনুযোগ করলো। উত্তর এলো বিদ্রূপের হাসি। শুশ্রূষকের জীবন বেছে নিলে এমন অনেক কিছুই নাকি সয়ে যেতে হয়।

সরমা প্রতিবাদ করলে, তা বলে অমন বিশ্রীভাবে তাকিয়ে থাকবে কেন?

মানসী হাসলে।—ও তো শুধু তাকিয়েই থাকে।

সরমা মনে-মনে চটে। বেশ। ও নিজেই এর ব্যবস্থা করবে।

সেদিন কিছু একটা বলবে বলেই লোকটির দিকে এগিয়ে গেল সরমা। ভর্ৎসনার স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল।

—শুনুন।

না। সরমা নয়। ও কিছু বলবার আগেই লোকটিই ডেকে বসলো। সরমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালে, কথা জুটলো না ওর মুখে।

দু-খানা দশ টাকার নোট ধরলে লোকটি ওর চোখের সামনে।—এ'র জন্যে কিছু ফলমূল আনাবার ব্যবস্থা করে দেবেন? এই টাকা কটা—

রুগীদের জন্যে ফলমূলের ব্যবস্থা নেই। টাকার বিনিময়ে সে ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সাধারণতঃ সেটা করে হাসপাতালের জমাদার বেয়ারার দল। দু-পাঁচ টাকা বখশিশের লোভে। তা বলে, সরমাকে? তবু হয়তো ক্ষমা করতো ও, কিন্তু লোকটির দুর্বোধ্য হাসি আর টাকার পরিমাণ—এ দুটো মিলিয়ে কি এক অর্থ পেল সরমা। রাগে রী রী করে উঠলো সারা শরীর।

মানসীকে বললে, এরপরও লোকটার আসা বন্ধ করবে না?

মানসী হাসলে।—এত সহজ ভাবিস?

—তবে ডিউটি বদলে দাও আমার। অন্য ওয়ার্ডে দাও।

উত্তর এলো—বোকা মেয়ে!

গোলাপী টার্কিশ টাওয়েলটা ওড়নার মত বুকে কাঁধে জড়িয়ে হাঁতে সাবানের কৌটোটা তুলে নিয়ে সান্ধ্যস্নানের জন্যে পা বাড়াচ্ছিল সরমা। পেছন থেকে ওর আঁচলটা টেনে ধরলো মানসী।

—এত তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছিস কোথায় শুনি?

সরমা মৃদু হেসে বললে, বেশ যা হোক্। দিলে তো যাত্রাটা মাটি করে। গিয়ে দেখবো বাথরুমে পাম্পের জল নেই।

—খনার বচন পড়িস নি? আগে হতে পিছে ভালো যদি ডাকে মা-য়।

—দিদি, মা নও বয়সটা একটু বেশি হলে নয়—

—উঁহু, তা হলে কি আর তোর প্রেমের গল্প শুনতে পেতাম।

—দেখো মানুদি, গল্প-গল্প বলো না বলছি।

—ওঃ, চটেই লাল হয়ে আছেন মেয়ে। মান অভিমান দেখাতে হয় তার কাছে দেখিও। গম্ভীরভাবে বললে মানসী। পরক্ষণে হেসে ফেললে।—চুপ করে বসে আগে তোর উপাখ্যানটা বলে যা।

—বাঃ! কাল রাতে তো বললাম।

—উঁহু। দ্বিতীয় প্রেমিকটির কথা। ঐ হাসপাতালের ভদ্রলোক।

—ভদ্রলোক! কথাটার ওপর অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলে সরমা।—লোকটার কথা ভাবতেও আমার গা ঘিন-ঘিন করে।

—তবে, প্রথম প্রেমিকের কথাই বল্।

সরমা হাসলে, কি বলতে বাকী রেখেছি?

সত্যি। কিছুই বাকী নেই। এর আগে কতবার যে বলেছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে, ঘুমন্ত তো নয়। জাগর প্রেম। দিনে দিনে ঘটে নতুন সংযোজনা। আরো কথা। আরো কামনা।

ব্যাপার হলো এই যে, সঞ্জীব আর সরমা দুজনে মন-দেয়া-নেয়া করেছে।

আত্মীয়স্বজন নয়, পাড়াপড়শী নয় এরা কেউ। অতএব সে-খবরে মানসীর এত উৎসাহ কেন? কেন কে জানে। তবে ঔৎসুক্য মানুদির চেয়ে কারও কম বলে তো মনে হয় না। আজ আর সঞ্জীব-সরমা উপাখ্যান কারও অজানা নয়। সরমার ডাক-নাম যে 'ঠাণ্ডা' তা যেমন জানতে বাকী নেই কারও।

একজনই দিয়েছে এ নাম, আর একজনেরই ডাকবার কথা এ নাম ধরে। কিন্তু মানুদির জ্বালায় কি কিছু গোপন রাখবার জো আছে। দু-মাসও হয় নি

ও এ বোর্ডিংটায় এসেছে। অথচ ইতিমধ্যেই এমন অবস্থা যে তিনজন এক জায়গায় হয়েছে কি দুজনের কথা—সঞ্জীব আর সরমা।

দোষই বা কি! ছ-টার ছুটি হতে না হতে এসে ঢুকবে ও স্নানের ঘরে। তারপর মানসীর পাউডারের কৌটোটা টেনে নিয়ে পাফ্‌টা দু-গালে বুলিয়ে নেবে। চুলটা আঁচড়ে, শাড়ী ব্লাউজ ঠিক করে নেবে চটপট। তারপর এক পীস পাউরুটি আর এক কাপ ঠাণ্ডা চা। বোর্ডিংয়ের নেপালী ঝি গৌরীমায়া চায়ের পেয়ালাপিরিচ সরিয়ে নিয়ে যাবার আগেই সরমা রাস্তায় নেমে পড়েছে।

এ যেন নেশার ডাক, নিশীথের ডাক।

ড্রেসিং টেবিলটার সামনে বেঁটে টুলটায় বসে চুল আঁচড়াচ্ছিল সরমা। আর গুনগুন করে গাইছিল কি-একটা গানের কলি। স্নানের পর বেশবাস বদলাতে, প্রসাধন-সাধনে এত সময় কোনদিনই দেয় না সরমা।

তাই মানসী জিজ্ঞেস করলে, কি ব্যাপার, ডিউটি দিতে যাবি না বুঝি?

সরমার এই সন্ধ্যার অভিসারকে 'ডিউটি' বলে ঠাট্টা করে সবাই। শুনে শুনে অভ্যেস হয়ে গেছে সরমার। বললে, না।

—কেন? অভিমান না অনিচ্ছা?

সরমা হাসলে।—আসবে না আজ।

তারপর চট করে উঠে এসে মানসীর খোঁপাটা ঠিক করে দিতে দিতে বললে, চলো মানুদি। ঘুরে আসি।

কিন্তু না। মানসী এ ব্যতিক্রমে রাজী নয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই দেয়ালঘেরা ঘরের বন্ধ বাতাসে কাটিয়ে দিয়েছে, এই বিজলী বাতির চোখবাঁধানো তিমিরের গভীরতায়। খোলা আকাশ, খোলা বাতাস সহ্য করতে পারে না ও।

অগত্যা একাই বেরিয়ে পড়লো সরমা।

দু-ধারে ল্যাম্পপোস্টের কনভয়। মাঝখানে নরম ঘাসের জনপদ।

সবুজ নয়, অন্ধকারে কালো দেখায়। যেন একটা সুস্থযৌবন সাঁওতাল পুরুষের গলায় মুক্তোর মালা।

লঘুপায়ে হাঁটতে শুরু করে সরমা। কৃষ্ণচূড়া আর আমলকী, হিজল আর হরিতকী গাছের আড়ালে ঢাকা আধা-চাঁদের ছায়ার দিকে।

রাস্তার এ পাশে ফ্লোরেসেণ্ট আলোয়-ঝলমল একটা পানের দোকান। উঁচু হাসি আর তীক্ষ্ণ তর্কের বুলি কানে আসতেই ফিরে তাকালো সরমা। চকিত চোখে।

সেই একশো বাষট্টি নম্বর বেডের পাশের একজোড়া চোখ। হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট।

চোখাচোখি হলো। তারপর, তারপর আরেকবার ফিরে তাকাতে ইচ্ছে হলো সরমার। তবু পারলো না। যেমন হেঁটে চলেছিল, হেঁটে চললো। পায়ের গতি হয়তো বা একটু দ্রুত হলো। কে জানে!

জনহীন ঘনবনের নিঃশব্দতায়, পথের পাশের ল্যাম্পপোস্টগুলো যেখান থেকে ফিরে এসেছে, তারও ওপারের অন্ধকারে ডুব দিয়ে হাঁপ ছাড়লো সরমা।

নির্জন। নির্জন আর অন্ধকার।

প্রতিদিনের মতই সেই নির্দিষ্ট বেঞ্চিটাতে এসে বসলো সরমা। একা। কি একটা রাতজাগা পাখী পাখা ঝটপট করে উড়ে গেল।

নিশ্চুপ বসে রইলো সরমা। আপন চিন্তার গভীরতায় ডুবে রইলো। হঠাৎ।

কাছের গাছের আড়ালে চোখ গেল। একটা ছায়াশরীর। মুখ দেখা যায় না। শুধু সাদা পরিচ্ছদটা চোখে ভাসে। একটা দেশলাই জ্বালার শব্দ হলো। সিগারেট ধরালো কে যেন, দু-হাতের তালুতে আগুনের শিখাটা আড়াল করে। কিন্তু, ঐ সামান্য আলোতেই চিনতে পারলে ও।

ভয়ে আশঙ্কায় উঠে দাঁড়ালো সরমা। তারপর দ্রুত পায়ে বোর্ডিংয়ের পথ ধরলে। পিছনের উচ্চকিত হাসির শব্দ কানে এসে পৌছলো। ধাক্কা দিলো বুকের ভেতর।

মানসী প্রশ্ন করলে, কি, এত তাড়াতাড়ি ফিরলি যে?

সরমা হাসবার চেষ্টা করে বললে, এমনি।

পরে অবশ্য সেদিনের কথাটা মানসীকে বলেছিল সরমা। আর দুজনেই প্রচুর হেসেছে। সরমা নিজেই বিস্মিত হলো ভেবে, এত ভয় করবার মত কি ছিল? মানসী বললে, গেঁয়ো! এখনও শহুরে হলি না তুই। এখানে

আসবার টিকিট দিয়েছিল কে তোকে? সরমা হেসে বললে, কেন, স্টেশনের টিকিটঘরেই তো কিনেছিলাম। মানসী বললে, সেই তো সুবিধে হয়েছে তোদের। এখানে আসবার যোগ্যতা আছে কিনা তা তো দেখে না, পয়সা দিলেই ট্রেনে চড়তে পাওয়া যায়।

সঞ্জীবও হেসেছে হো হো করে—ভারি ভীতু তো তুমি! তাই বুঝি আসো নি এ দু-দিন?

ঠোঁটে হাসি টিপে রেখে মাথা নীচু করেছে সরমা। আঙুলে-শাড়ীর পাড়টা জড়াতে জড়াতে বলেছে, না, ভয় করবে না! একা একা এই অন্ধকারে……

—এখন আর ভয় করছে না তো?

—হ্যাঁ, করছে। একা একা ভালো লাগে তোমার?

সঞ্জীব হাসলো।

সরমা বললে, হাসছো তুমি। কথা বলবার একটা লোক পর্যন্ত নেই।

—সে কি, অত লোক তোমাদের বোর্ডিংয়ে। মাসুদি রয়েছে!

—কথা ঘুরিও না।

—এতদিন তো সবুর করলে। আর কয়েকটা দিন সবুর করো।

—কেন?

সঞ্জীব চুপ করে রইলো।

অনুযোগ করলে সরমা, উত্তর না পেয়ে।—তোমার কাছে আমি একটা কথাও লুকিয়ে রাখি না, অথচ তুমি…

কথা খুঁজে না পেয়ে সঞ্জীব পকেট থেকে নতুন কেনা ফাউণ্টেন পেনটা বের করলে।—এই নাও তোমার কলম। কোন্ ভাগ্যবানকে চিঠি লিখবে কে জানে।

—মনে আছে যা হোক্। বাঃ বেশ ছোটখাটো তো। কত দাম?

পরের অংশের বিদ্রূপটা যেন কানেই গেল না ওর।

—উপহারের বিচার কি দাম দিয়ে করবে নাকি?

সরমা হাসলে।—তা নয়। বুঝেসুঝে হিসেব করে চলবার উপদেশ দিতাম।

—এখন থেকেই?

—এখনই আমার কথায় কান দাও না, পরে বড়ো শুনবে!

সরমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সঞ্জীব বললে, শুনবো গো শুনবো।

—এতও পারো। সরমা হাসলে।

তারপর দুজনেই চুপচাপ।

এদিকে রাত বাড়ে। হিম পড়তে শুরু করে। তবু, চমৎকার একটা আমেজ, কত কত তারায় ভরা আকাশ। বাতাস ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা আর নরম। রেশমের মত। আর ঘুম-ঘুম রোমাঞ্চ। দয়িতস্পর্শের শিহরণ। আমলকীর পাতা নড়ে। কৃষ্ণচূড়ার পাতা নড়ে। শিমূল আর শিশু গাছের চন্দ্রছায়া কেঁপে ওঠে।

—চলো, উঠি।

—নাই বা ফিরলে।

—সে কি! সঞ্জীব হাসলো।—সারা রাত এইখানে থাকবে?

সরমাও খিলখিল করে হেসে উঠলো, উঠে দাঁড়ালো।

সঞ্জীব বললে, পৌছে দিয়ে আসবো?

—এটুকু পথ আমি একাই যেতে পারবো।

সরমার কণ্ঠস্বরে অভিমান ফুটে উঠলো। সঞ্জীব হয়তো বুঝতে পারলো না।

তবু বললে, চলো না, পৌছে দিয়ে আসি।

—তোমাকে তো এমনিতেই এতটা পথ হাঁটতে হবে।

অর্থাৎ দুজনের গন্তব্য দু-মুখে। একজন পুবে, অন্যের পথ পশ্চিমে।

সঞ্জীব বললে, বেশ, যাও তা হলে।

—তুমি যাও, আমি যাবো এখন।

কেউ আর কি আগে যেতে চায় না। শেষে সঞ্জীবই নিজের পথ ধরলো। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ফিরে তাকালো। সরমা তখনও দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। ওর দিকে চোখ রেখে।

সঞ্জীব হাসল।—কি হলো, যাবে না?

সরমাও হেসে ফেললে। কিন্তু নড়লো না।

সঞ্জীব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলো। তারপর ধীরে ধীরে গাছগুলির জমাট অন্ধকারের মধ্যে ডুব দিলো। নিশ্চল, নিশ্চুপ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে

সেদিকে তাকিয়ে রইলো সরমা। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। একেবারে নিঃশেষে যতক্ষণ না মিলিয়ে গেল সঞ্জীব। তারপর গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

বোর্ডিং-এর পথ ধরবার জন্যে পিছন ফিরতে যাচ্ছিল সরমা।

কিন্তু।

তার আগেই এক্‌জোড়া সবল হাত ওকে বোবা করে দিলো। ভয়ে বিস্ময়ে চোখ চাইবার চেষ্টা করলে সুরমা। আশঙ্কায় অক্ষম পা-দুখানা টললো। মুখে কথা যোগালো না। ওর শরীরের আপত্তি নিস্তেজ হয়ে পড়লো।

একটি দিন। শুধু একটি দিনের ইতিহাস ও বলতে পারে নি মানসীকে। সঞ্জীবকে তো নয়ই।

কতদিন কত মুহূর্ত এসেছে। মনে মনে নিজেকে দৃঢ় করেছে সরমা। না, সঞ্জীবের কাছ থেকে অন্তত ওর জীবনের কোন অন্ধকারকেই চেপে রাখবে না। কিন্তু শেষের ক্ষণে সাহস হারিয়েছে ও। ভরসাও। ভেবেছে, মিলনের ভিত আরো গভীর হোক—তারপর, তারপর।

মানসীর চোখে পড়েছে কখনো কখনো। ওর মুখের বিষণ্ণ ব্যথার প্রলেপ, ওর চোখের মাটিহারানো উদাস দৃষ্টি।

প্রশ্ন করেছে মানসী—কি এত ভাবিস ?

—না, কিছু না তো।

মানসী ভাবতো ওদের প্রেমের স্বচ্ছন্দ গতিতে বুঝি যতি পড়েছে। তবু কিছু বলতো না, প্রশ্ন করতো না।

মানসী সেদিন তখনও ঘুম থেকে ওঠে নি। চাদরটা সারা গায়ে জড়িয়ে পড়ে আছে।

সরমা টুথব্রাশ ঘষতে ঘষতে সামনের ছোট বারান্দাটায় বেরিয়ে এলো।

হোস-পাইপের জলের ফুরফুরি আছড়ে পড়ছে নীচের রাস্তায়। ঝিরঝির করে চমৎকার একটা ঐকতানিকপের শব্দ বাজছে। আর পুবের আকাশে

হলদে বড় সূর্য। চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ভোরবেলাকার ঠাণ্ডা বাতাস।

সরমা মুখ হাত ধুয়ে আসতেই নেপালী ঝি গৌরীমায়া বলল—ঠাণ্ডাদি, নীচের বাকাসে চিট্টি ছিলো।

—দেখি।

সরমা চিঠিটা পড়লো। আনন্দ আর খুশীর হাসিতে ভরে উঠলো ওর মুখ। বুকে সুর বেজে উঠলো।

ছুটে গিয়ে ঘুমন্ত মানসীর পাশে বসলে। একটা ঠেলা দিয়ে ডাকল—মাহুদি।

—উঁ।

হাসি-হাসি মুখে সরমা মানসীর পাশেই শুয়ে পড়লো। মানসীকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বললো, ওঠো ওঠো। কতক্ষণ আর ঘুমোবে।

—কেন জ্বালাচ্ছিস। ঘুমন্ত চোখ না খুলেই মানসী বললে।

—ওঠো ; সুখবর আছে।

ব্যাপারটা হলো এই যে, সরমা লিখেছিল, মা, সেবারে ছোটমাসীমার বাড়িতে সঞ্জীবকে তো তুমি দেখেছিলে। তোমার মত জানিও।

মা উত্তর দিয়েছেন, মা সরো, তুমি এতদিন যা বুঝেছ তাই তো করে এসেছ। কোনদিন খারাপ ফল তো হয় নি।

মানসী উঠে বসতেই চিঠিটা দেখালে সরমা।

বিকেলে সঞ্জীবকে।

তারপর।

হৈচৈ ধূমধাম হলো না। রোশনচৌকি বাঁধা হলো না ফটকের মাথায়। নহবত বাজল না, সুর ধরল না সন্ধ্যার সানাই। লাল শালু আর সাটিনের চাঁদোয়া নয়। খুব ঠাণ্ডাভাবেই বিয়েটা হয়ে গেল। বাসর জাগল, বাসর কাটল।

তারপর, ফুলশয্যার রাত।

আনন্দে উচ্ছল ওরা দুজনে। মর্তের সম্বিত যেন হারিয়ে ফেলেছে।

নানা ফুলে সাজান হয়েছে ঘরখানা। ফুলেরই শয্যা যেন।

চম্পা-চামেলির সুবাসে স্নিগ্ধ, মালা-মল্লিকার মোহ। খাটের বাজুতে রজনীগন্ধা আর নাম-না-জানা কি একটা রঙিন লতা জড়ান। পুষ্প-সুরভির স্নান! কোণের ভাসটায় একজোড়া শ্বেতকমল।

সঞ্জীব আপত্তি করেছিল প্রথমে। কিন্তু, সুধাদেবী আপত্তি শুনলেন না। বললেন, এটুকু না করলে চলে না।

—কেন?

—সত্যিকারের ফুলশয্যা তো তোমাদেরই ঠাকুরপো। অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন সুধা দেবী। তারপর বললেন, চললাম ভাই, আর বিরক্ত করবো না। মনে মনে তো এর মধ্যেই গালাগালি দিচ্ছ, আধখানা রাত বৌদিই মাটি করে দিলে।

সরমা ঠোঁট টিপে হাসলে ঘোমটার আড়ালে। খাটের ওপর যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইলো। নড়লো না।

বৌদি চলে যেতেই কপাটে খিল দিয়ে এসে বিছানার ওপর বসলো সঞ্জীব।

সরমা চাপা কণ্ঠে বললে, উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন না তো?

—দিলেই বা।

সরমাও হয়তো সাহস পেল সঞ্জীবের কথায়। একটানে ঘোমটা খুললো—বাবা, ঘেমে নেয়ে গেছি। বলে বিছানা থেকে নামতে গেল। চট্ করে ওর হাতটা ধরলে সঞ্জীব।

—কোথায় যাচ্ছ?

—ভয় নেই, পালাচ্ছি না। ছাড়।

—হাত ছেড়ে দিলে সঞ্জীব।

সরমা উঠে এসেই সুইচ টিপে আলোটা নিভিয়ে দিল। আর সেখান থেকেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বললে চাপা স্বরে, এসো না কিন্তু।

সঞ্জীব সাড়া দিল না। হয়তো হাসল, সরমা দেখতে পেল না। আলো জ্বেলে খাটের ওপর দেহ ছড়িয়ে দিলে সরমা। চোখ বুজলো।

—ও কি! শুয়ে পড়লে যে!

আব্দারে শিশুর মত ঢলা গলায় সরমা বললে, ঘুম পাচ্ছে আমার।

—আমার যে ঘুম পাচ্ছে না।

—তবে জেগে জেগে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাক। আমি ততক্ষণ ঘুমিয়ে নিই। বলেই মুখ ফেরালে সরমা, হাসতে হাসতে। চোখ চাইলে।

বুকের নীচে একটা বালিশ টেনে নিল সঞ্জীব। তারপর সরমার মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে একখানা হাত টেনে নিয়ে সরমার অনামিকায় আংটিটা পরিয়ে দিলো।

মৃদু হেসে আংটির পাথরটার দিকে তাকালে সরমা, মুগ্ধচোখে।

প্রশ্ন করলে, কি পাথর এটা ?

—আতসী। এর আরেক নাম হলো চন্দ্রকান্তমণি। চাঁদের কিরণে চকমক করে, সূর্যের কিরণে আগুন জ্বালানো যায়। বেশ কাব্য করে বললে সঞ্জীব।

আর সরমার মনে পড়ে গেল আরেকটা কথা।—চাঁদের জ্যোৎস্নাটা মিথ্যে মায়া, মন ভোলাতেই পারে। সূর্য সত্য। জীবনকে জীবন্ত করে তোলে। সত্য মায়া নয়, মিথ্যের মত অনিষ্ট করে না সে। মারা যাবার আগে সরমার বাবা উপদেশ দিয়েছিলেন মেয়েকে। ইস্কুলের মাস্টার ছিলেন, সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে জীবন কাটিয়ে গেছেন। ছেলে-মেয়েদের আজীবন শুধু উপদেশই দিয়ে গেছেন। আর কিছু নয়।

সম্প্রদানের সময় মার চোখের জল দেখে বাবাকে মনে পড়েছিল সরমার। তারপর হাসি হল্লা, রহস্য রসিকতার মাঝে ভুলে গিয়েছিল।

সঞ্জীবের কথার সঙ্গে বাবার উপদেশটার কোথায় যেন একটা ক্ষীণতম যোগসূত্র আছে। রঙধনুকের আবেশবৈচিত্র্যে দৃষ্টি হারিয়ে গিয়েছিল ওর, আবার যেন চোখ ফিরে পেল। রামধনুর আড়ালে স্পষ্ট আর গভীর একটা কালো দাগ। কলঙ্কের অলঙ্কার।

খচ্ করে বুকের মাঝে এসে বিঁধলো একটুকরো বিস্মৃত ছবি।

একটা দিন। শুধু একটা দিনের ইতিহাস বলতে পারে নি ও। না মানসীকে, না সঞ্জীবকে। বহুদিন, বহুবার চেষ্টা করেছে। অবোধ্য এক অস্বস্তিতে নিজেই জলেছে। ভয় আর আশঙ্কা। হয়তো তাল কাটবে, সুর

হারাবে। স্বচ্ছন্দে গড়া ওদের মুগ্ধস্রোত জীবনের ঘুঙুর হয়তো বা বেতাল বেজে উঠবে।

এই আশঙ্কাতেই বলি বলি করেও বলে উঠতে পারে নি।

শুশ্রূষকের চাকরিতে ইস্তফা দেয় নি সরমা। সঞ্জীবের কিছুটা অমত ছিল, তবু বুঝিয়ে রাজী করাল তাকে। বাবা কটা টাকাই বা রেখে গেছেন! আর জামাইয়ের টাকায় তো সংসার চালান যায় না। তাই, ক-টা মাস অপেক্ষা করতে বলেছে সরমা। ছোট ভাই সৌমেন আই-এস-সি পাশ করেছে—চেষ্টাও করছে চাকরির। তখন আর হাসপাতালের চাকরি রাখবে না। না, একেবারে ছেড়ে দেবে কেন! যথেষ্ট অর্থ আর উদ্দীপনা খরচ করে নার্সিং শিখতে হয়েছে ওকে।

সেদিন হাসপাতাল থেকে ফিরে বেশ বদল করতে করতে সঞ্জীবের কণ্ঠস্বর কানে এলো ওর। তা হলে এর মধ্যেই ফিরে এসেছে! কিন্তু একা নয়। আরো কে যেন রয়েছে। গলা শুনতে পেল সরমা!

হাতে মুখে জল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সরমা এসে দাঁড়াল আয়নাটার সামনে। শ্রান্তির স্বেদবিন্দু সারা দেহে। চোখের কোণে সাময়িক লুপ্তলাবণ্যের রেখা। চম্পাবরণ একখানা শাড়ী বের করে পরলো সরমা। আর হাঁসুলিগলা ব্লাউজ—রঙ মিলিয়ে। সুরভি-বিন্দু ছিটিয়ে নিলে এখানে ওখানে। নিজের প্রসাধন-প্রসাধিত রূপ দেখলে কিছুক্ষণ।

তারপর, খাটের ওপর বালিশে ঠেস দিয়ে বসলে দু সেকেণ্ড। ওদিকের কেদারাটায় উঠে গেল। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বই-কাগজগুলো উল্টে দেখতে শুরু করলো। অকারণে শব্দ করলে, কখনও পেয়ালা-পিরিচের, কখনও বা হাত থেকে বই ফেলে। চাবির থোকাটা ঝনঝন করলো, দরজার খিলটা একবার লাগালো, একবার খুললো। শুকনো কাশি কাশলো। শেষে চীৎকার করে ঝি দুখীর-মাকে ডাক দিলো।

একটু পরেই সঞ্জীব উঠে এলো বাইরের ঘর থেকে।

—একজন বন্ধু এসেছে। বাইরে গিয়েছিল, ক-মাস পরে ফিরেছে

বিয়ের সময় তো আসতে পারে নি, তাই আজ এখানে ফিরেই এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আজ বোধহয় আর সিনেমায় যাওয়া হলো না।

সরমা অনুযোগ করলে।—সারাদিন খেটেখুটে এসেও তোমার দেখা পাওয়া যায় না। বন্ধু! অন্য সময়ে যেন আসতে পারে না।

—আহা, ওর কি দোষ বলো। সঞ্জীব বোঝাতে চাইলো।

সরমা উত্তর দিলে, আজই তো প্রথম নয়। রোজই তো তোমার একটা না একটা লেগেই আছে।

সঞ্জীব হাসলে।—কি করবো বলো! বন্ধুবান্ধবরা তা নইলে যে বৌপাগলা বলবে। এমনিতেই তো বলে, আমায় নাকি তুমি আঁচলে বেঁধে রেখেছ।

সরমাও হেসে ফেললে। বললে, বলুকগে। সকালে তো দু-মিনিট কথা বলবার সময় পাই না। দুপুরে তুমিও বেরিয়ে যাও, আমিও বাইরে থাকি। একা-একা চুপচাপ বসে থেকে আমি বাপু হাঁপিয়ে উঠি।

—কেন, বৌদির সঙ্গে তো গল্প করে কাটাতে পার।

সরমা চটে গেল।—বেশ, তাই যাচ্ছি। সন্ধ্যাবেলাটাও যদি তোমার বন্ধুদের না হলে—

—চটছো কেন?

—আমি তার চেয়ে আবার বোর্ডিংয়ে ফিরে যাব। সেখানে তবু পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটে।

সঞ্জীব হেসে হাতটা চেপে ধরলো সরমার। বললে, এখন চলো তো, হিমাংশুর সঙ্গে দেখা করে আসবে।

প্রথমটা আপত্তি করে সরমা। মুখে বলে, চিড়িয়াখানার জীবজন্তু তো নই যে রোজ-রোজ একজন করে দেখতে আসবে।

মনে মনে আর কি লজ্জা পায়। তা ছাড়া ভালও লাগে না।

শেষকালে রাজী হয় ও। সঞ্জীবের পিছনে পিছনে নীচের বসবার ঘরে গিয়ে ঢোকে। কি একটা পত্রিকার পাতায় চোখ ছিল হিমাংশুর। শব্দ শুনে মাথা তুললে। নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত মুখে মৃদু হাসি। পরক্ষণেই হিমাংশুর মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল। হাত আর উঠলো না।

সরমাও চমকে উঠেছিল। সঞ্জীব লক্ষ্য করলো না, নয় তো সরমার সাদা চাদরের মত রক্তহীন মুখটা দেখতে পেত।

আলাপ করিয়ে দিলো সঞ্জীব। কিন্তু ওরা দুজনেই বড় অস্বস্তি বোধ করলো। রেহাই পেলেই যেন বাঁচে।

তারপর একসময় হিমাংশু চলে গেল বিদায় নিয়ে।

সরমা ভাবলে, ও বোধহয় আর কোনদিন আসবে না।

ভুল!

দিনকয়েক পরেই আবার এলো হিমাংশু। আসতে শুরু করলো।

প্রথম প্রথম সরমার চোখে জাগতো ভয়ার্ত ভাব। শঙ্কার শিহরণ। ক্রমশ ঘৃণা আর বিরক্তি বোধ করলে সরমা। কারণে অকারণে জেদ ধরে কেন সঞ্জীবের কাছে, সরমাকে ডেকে আনায় কেন। কখনো বলে, চলুন বেড়িয়ে আসি; কখনো সিনেমায়। টুকিটাকি দু-চারটে জিনিস কিনতে যাবে হয়তো সরমা আর সঞ্জীব, হিমাংশু এসে জোটে।—চলুন আমিও যাই। আর ক্ষণে ক্ষণে চোরা চোখে তাকাবে সরমার দিকে সেই কুৎসিত অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে।

সেদিন সঞ্জীব ফেরে নি তখনও। হিমাংশু এসে হাজির হলো।

সরমা ওর দিকে না তাকিয়েই বললে, উনি আসেন নি এখনও।

—তা হলে একটু অপেক্ষা করি, কি বলো? হিমাংশু হাসলো। একটু থেমে বললে, আপত্তি নেই তো তোমার? শেষের শব্দটার ওপর অতিরিক্ত জোর দিয়েই বললে।

চমকে ফিরে তাকালো সরমা। ক্রোধে ফেটে পড়লো যেন। বেশ স্পষ্ট আর দৃঢ় গলায় বললে, হ্যাঁ, আপত্তি আছে আমার। বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান আপনি এখান থেকে। নির্লজ্জের মত কোনদিন আর আসবেন না এখানে।

অপ্রতিভ হয়ে উঠেছিল হিমাংশু প্রথমটা। তারপর হো হো করে হেসে উঠলো।

বললে, ভুল করছো সরমা। বেরিয়ে যদি যাই—

অসমাপ্ত কথার নিঃশব্দতাই যেন ভয় দেখাল।

বিস্ময়ে ক্রোধে হিমাংশুর মুখের দিকে তাকালো সরমা। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। অপমান আর ব্যর্থতার আগুনে জ্বলছে তার চোখ দুটো! প্রতিহিংসার আগুনে।

আর এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারলে না সরমা। পালিয়ে এলো ঘরের

ভেতর। বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লো। সমস্ত বুক যেন ফাঁকা ফাঁকা। মাথা ঝিমঝিম করে। কি একটা বিপর্যয়ের জন্যে যেন থমকে থেমে গেছে পৃথিবী। দুনিয়ার সমস্ত কলরোল যেন হঠাৎ চুপ করেছে। শুধু অসহ্য বাতাস শিস দেয় ফিসফিস করে।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ পড়ে রইলো সরমা। নিশ্চুপ নিথর।

সঞ্জীব ফিরে এসেছে। গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে সরমা! আর হাসির শব্দ। হিমাংশু আর সঞ্জীব হাসাহাসি করছে।

মনকে শক্ত করে উঠে দাঁড়ালো সরমা।

লাল, গাঢ় লাল রেশমী রঙের শাড়ীখানা জড়ালে শরীরে। যৌবন-দেহের প্রতিটি রেখা সুস্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুললে। পুরুষের মন ভোলাবার যা কিছু ছলাকলা! রেশমের আঁট ব্লাউজের আবরণকে নিরাবরণের রূপ দিলো। মুখে মাখলো শুভ্ররেণু, চোখে কাজল টানলো। রাঙির চাকতি বুলিয়ে নিলো গালে, আর পাতলা ঠোঁটে বহ্নিশিখা জ্বলিয়ে দিলো। হাতে-পরলো আইভরির রুলি আর স্বর্ণকঙ্কণ। গলায় দোলালে বুকছোঁয়া লাল প্রবালের মালা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল। নিজের রূপে নিজেই মোহিত হয়ে গেল।

তারপর ঠোঁটে স্নিগ্ধ হাসির আবেশ এঁকে পা বাড়ালে সরমা।

সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে বললে, চলো বেড়িয়ে আসি।

আর হিমাংশুর চোখে অপরূপ মোহাবেশের চোখ রেখে মৃদু হেসে বললে, চলুন, আপনিও চলুন। একটু বেড়িয়ে আসি। সন্ধ্যার সময় ঘরের ভেতর—হাঁপিয়ে উঠি আমি।

তিনজনেই পথে বেরিয়ে পড়লো।

রাতের বুকে জ্বলন্ত মশালের মত সরমাই যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

কত হাসি, কত রসিকতা। ফূর্তিতে-আনন্দে যেন নেচে উঠেছে সরমা। চোখের কোণ ওর খুশীতে ভরে উঠেছে।

ধীরে ধীরে হেঁটে চললো ওরা। আর সরমার মুখে অনর্গল কথা। কথা,

কথা, কথা। আর উচ্ছল হাসির তুফান। কখনো সঞ্জীবের গায়ে ঢলে পড়ছে, কখনো হিমাংশুর গায়ে।

পশ্চিমাকাশের জাফরানের বন ক্রমশঃ নীলাভ হয়ে এলো। নামলো ধূসর অন্ধকার। শিশু-সন্ধ্যার বাতাস কালো হয়ে এলো। একটা, দুটো, অনেক অনেক তারার ফুল ফুটেছে আকাশের বাগিচায়। চুপে চুপে চাঁদ এলো একলাটি। ভিড ভিড সান্ধ্যভ্রমণাদের জনতায় এসে মিশে গেল ওরা। জনতাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল।

সবুজ ঘাসের জাজিম পাতা রয়েছে পায়ের নীচে। দু-পাশে ল্যাম্পপোস্টের সারি। আলোর মালা। দূর দূর গাছগাছালির শ্যামল অন্ধকারের বুকে দিগন্ত দিক হারিয়েছে যেন। কৃষ্ণচূড়া আর আমলকী গাছের নীচে চাঁদের ছায়া পড়েছে। আলো নেই, আওয়াজ নেই।

সরমাকে উৎফুল্ল দেখায়। হাসি আর হাসি। কথা আর কথা। হঠাৎ যেন আনন্দে মাতাল হয়ে উঠেছে ও। ওর মদো রক্তে নতুন করে যেন উন্মাদনা জেগেছে। ঘুঙুরের মিহি মিঠে বোল বেজে চলেছে যেন ওর বুকের ভেতর।

কখনো ঢলে পড়ছে হিমাংশুর গায়ে, কখনো সঞ্জীবের হাতটা জড়িয়ে ধরছে।

—জানো, হাসপাতালে একটা লোক না এমন তাকিয়ে থাকতো আমার দিকে যেন গিলে খাবে।

সশব্দে হেসে উঠলো সরমা।

সঞ্জীবও হাসলো।

—জানেন হিমাংশুবাবু—সরমার কথা আটকে যায় হাসির তোড়ে—লোকটা একদিন না···আবার হেসে ওঠে সরমা।

—কি ব্যাপারটা তাই বলো। সঞ্জীবও না হেসে পারে না।

—লোকটা না একদিন আমার পেছনে পেছনে এখান অবধি ধাওয়া করেছিল। খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে আবার।

স্মিত হাসি হেসে সঞ্জীব প্রশ্ন করে, তারপর ?

—ঐ যে গাছটা দেখছো, একদিন তুমি চলে গেলে, তারপর দাঁড়িয়ে আছি···আবার হেসে গড়িয়ে পড়লো সরমা।

—জানেন হিমাংশুবাবু—

কিন্তু কোথায় হিমাংশুবাবু! চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে সঞ্জীব।

হিমাংশু! হিমাংশু ?···কোথায় গেল হিমাংশু? সঞ্জীব চিন্তিত হয়ে উঠলো।

আর সরমা সশব্দে হেসে জড়িয়ে ধরলো সঞ্জীবকে। আরেকটু হলেই হয়তো পড়ে যেত ও।

হাসতে হাসতে বললে, পালিয়েছে।

—মানে ?

সরমার মুখ থেকে হাসি অন্তর্হিত হলো। বললে, শোন। তোমার কাছ থেকে কোন কথাই কোনদিন লুকিয়ে রাখি নি আমি। একটা দিন. শুধু একটা দিনের কথা তোমাকে বলতে পারি নি।

সপ্রশ্ন চোখে তাকালে সঞ্জীব। সরমার দিকে তাকিয়ে রইল।

অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে সরমাকে। সমস্ত মুখখানা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভোরের সূর্যের মত রক্তিমাভা ফুটে উঠেছে ওর সারা দেহে। নিষ্কলুষ আগুনের মত উজ্জ্বল। অনামিকার আংটিতে বাঁধা আতসী পাথরটাও জ্বলে উঠেছে।

পূবের আকাশে ওটা চাঁদ নয়!

বিমলচন্দ্র চৌধুরী

মিলন ত্রিযামা

অশোককুমার রাঙ্গ

রঙীন হাসির ঝরণায় নিজের প্রাণের সব রকম সুন্দর সুখকে ভাসিয়ে দিতে যে কোন প্রেমিকা মেয়েই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে এমনি একটি রাতের প্রথম যামে। মধুমাসের জ্যোৎস্নার সাগরে ডুব দিয়ে অন্য আর একজন প্রেমিক সুজনের খুশির ফোয়ারা থেকে হাজার রকমের আনন্দ-আবেশ কেড়ে নিতে অনেকেই হয়ে ওঠে আহ্লাদিনী আর সঞ্চারিণী। ঠিক ঝর্ণা, সুন্দরী ঝর্ণার মতনই তারা তখন তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন বর্ণা। কে না জানে এমন একটা মোহ জড়ান, সেই সঙ্গে মায়া মেশান আর সুষমা ছড়ান মধুরীম রাত জীবনে একটিবারই আসে। সে রাতের প্রত্যেকটি যাম যে প্রাণকে নানান রঙে রঙীন কোরে তোলে। প্রতি পলকে পলকে এক প্রাণ আর এক প্রাণের মুখেতে সুধার পেয়ালা তুলে ধরে। মুখে মুখ রেখে সুধা খাইয়ে দিতে দিতে মদির বিহ্বলতায় ভাসে। রভস তৃষ্ণায় প্রাণকে হিল্লোলিত কোরে সুখের তরঙ্গ-দোলা ফুটিয়ে তোলে। সুখের সে তরঙ্গ-দোলায় দুলতে দুলতে যে কোন মেয়েই চিরন্তনী প্রিয়ার ছন্দখানা পেয়ে অন্য জনের প্রাণ ছাপিয়ে নেচে যায়। রঙের পরশ আর মনের পরশ—এই দুইয়ে এক হয়ে মিলে গিয়ে নিত্য-নতুন আনন্দ-নাচের রিম্ ঝিম্ রিদম্ সৃষ্টি করে। প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যেন বীটোভেনের অমর সুরের মূর্ছনা জেগে ওঠে।

রাধাকে দেখলে কিন্তু এ কথার ভেতরে এখন কোন রকম মিতাক্ষরের ছন্দখানাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে যেন চিরা-চরিত প্রেমিকা মেয়েদের থেকে একটি ব্যতিক্রম। মিলনের মধুরাত হাতের মধ্যে পেয়েও সে ব্যাপারে রাধা যেন বড় বিবাগিণী। একটা কি যেন অজানা ব্যাপার তাকে ঘিরে ঘিরে

চলেছে। সে ব্যাপারটুকু এখনই প্রকাশ পেতে চায়।—কিন্তু প্রকাশ হতে চেয়েও হতে পারছে না। রাধার তেইশ বছরের পরিপূর্ণ নিটোল যৌবনের দীপ্তিলতার দরজায় এসে তা বাধা পড়ছে। তার রূপ-সুষমার ঘোমটার অন্তরালে তা লুকিয়ে রয়েছে। রাধার মিলন রাতের জন্য আপন অঙ্গ-সজ্জার লাল সাজের আবরণের ভেতরে সে ব্যাপার অন্তরালবর্তী। তবু;—তবু, যেন সে প্রেমের একটা মৃদু ছন্দের মূর্ছনা জাগছে তার চোখের মধ্যে। রাধার সে চোখেতে কিসের—সত্যি কিসের যেন একটা ছবি দেখা দিয়েছে। সে কি রাঙা বেনারসীর ঝিলি-মিলিতে নেচে ওঠা তেইশ থেকে এই মুহূর্তে অষ্টাদশীতে রূপান্তরিতা নববধূর প্রথম প্রেমরাগের আবৃত্তিম লজ্জায় জড়ানো রাধার ছবি? সত্যি বধূ রাধার,—না, অন্য কিছুর! কোনটা?

—হঠাৎ রাধার মধুময় বধূবেশের লজ্জা মাখানো যুবতী দেহখানা যেন ককিয়ে কেঁদে উঠলো সাদা ভেলভেটের মোলায়েম চাদরে ঢাকা বিছনার ওপরে। পা গুটানো অবস্থায় বসে থেকে হাঁটুর মধ্যে মুখখানা চেপে ঢেকে রেখে রাধা তার তেইশ বছরের তেইশটা বসন্তকে ভয়ানক করুণ ভাবে কাঁদিয়ে তুলল। কান্নার দোলায় রাধার নিটোল শরীরের সুন্দরী যৌবন দুলে দুলে ফুলে উঠতে লাগল।

সে সময়ে আনন্দরূপ বিছানা ছেড়ে সেখান থেকে একটু তফাতে বসে ছিল একখানা সোফার ওপরে আধ শোয়া অবস্থায়। তারও মন এখন এক অজানা ব্যথায় মোচড খাচ্ছে। সত্যি সে এমন কি দোষ করেছে যার জন্যে এই একটুখানি আগে রাধা তার ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করল? আনন্দরূপের কাছ থেকে একটা সামান্য আদরের পরশও নিতে চাইল না শুধু রাধা।

আনন্দরূপের চব্বিশ বছরের প্রাণও তাই কেঁদে উঠলো রাধার এমন ব্যবহারে। যে বিশেষ রাতের প্রতিটি যাম সাক্ষী থেকে তাদের দুটি জীবনের গ্রন্থিকে দৃঢ়তম বাঁধনের মধ্যে বাঁধতে এলো তখনি ঘটলো এমন এক অপ্রীতিকর জিনিস। সোফায় বসে বসে অকুল-পাথারি ভাবে ছাই-পাশ ভাবতে ভাবতে চলল তার মন। অত সব ভেবেও এর কূল-কিনারার কোন হদিস মিলল না। শেষে নিজের মন যখন প্রায় কান্নার সামিল হয়ে উঠল, তখনি আনন্দরূপ শুনতে পেল রাধার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ।

কান্নার হঠাৎ পাওয়া চমক তখন ভেঙে গেল আনন্দরূপের ভেতর থেকে। সোফা ছেড়ে খাটের কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। আর তখনি বিছানার

ওপরে বসে পড়ে মুহূর্তের ভেতর আনন্দরূপ দু হাত দিয়ে রাধাকে এক রকম জোর করেই কঠিন আলিঙ্গনে ধরে রেখে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আটকাল। একটু আশ্চর্য হলো। এবার ত রাধা কোন রকম ভাবে বাধা দিতে চাইল না তাকে। বরং তার প্রিয়তম মানুষটির বুকেতে আশ্রয় পেয়ে সেই আশ্রয়টুকু যাতে হাত ছাড়া হয়ে না যায় তারই চেষ্টা করতে লাগল সে। প্রেমের আবেশে ভরা চোখ দিয়ে তাই দেখে দেখে আনন্দরূপের মনে হলো বয়সে তেইশ বছরের হলেও অষ্টাদশীর মতন দেখতে রাধা যেন একটি ছোট্ট শিশুতে রূপান্তরিতা হয়ে উঠেছে। শুধু একটি ছোট্ট শিশু। তা ছাড়া আর কি! মনে হলো আরো কিছু। এই মুহূর্তে রাধা যেন অনেক বেশী অসহায়া হয়ে পড়েছে। অনেক আগে থেকেই সে একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এখন আনন্দরূপের বুকের মধ্যে সে তার খুঁজে খুঁজে বেড়ান পরম আকাঙ্খিত আশ্রয়টুকু পেয়েছে। তবু,—তবুও যেন মনে হচ্ছে—এখনও সে সম্পূর্ণ নিরাপদ হতে পারে নি। কি যেন একটা অব্যক্ত ব্যথার কথা রাধার সমস্ত যৌবন-দেহের ভেতরে গুমরে গুমরে মরছে। প্রকাশ পেতে চায় অচিরেই। তবু প্রকাশিত হতে চেয়েও হতে পারছে না। সেই হতে পারছে না বলেই এখনও তার তনুরাগের ভেতরে করুণ কান্নার মৃদু কম্পন রেখা জেগে জেগে উঠছে। তার সুছাঁদের অপরূপ দেহবল্লরীর মদালসা রূপ এলোমোলে হোয়ে পড়ছে। তার পুলক জাগান বুকের যৌবন রঙ জল জল অবস্থায় স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের ভাবে ফুলে ফুলে দুলে চলেছে। নিজের হাতের কঠিন বাঁধনের মধ্যে থাকায় তা স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে আনন্দরূপ। অবশ্য এইমাত্র রাধার স্নিগ্ধা রূপের ভেতর থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শেষ আবেগটুকু থেমে গেছে। বিছানার ওপরে পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে রাধা এখন আনন্দরূপের বুকের ওপরে তার রেশম জামার তুলতুলে ভাবের মধ্যে নিজের মুখখানা লুকিয়ে রেখে আদুরে মেয়ের মত ঘষতে লাগল। একটু পরেই আবার ছড়ানো পা দুটোকে টেনে এনে গুটিয়ে রাখল! আনন্দরূপের আরামে ভরা আবেশে বিহ্বল কোরে তোলা বুকের কঠিন বাঁধনে থাকা আলিঙ্গনের মধ্যে সে শিশু হয়েই রইল। বড় নিশ্চুপ তার এখনকার ভাবের অভিব্যক্তি। কোন রকমে ভালবাসার সাজ লাগানো দু' একটি মিষ্টি কথার কাকলি শোনাবার মত শক্তিটুকুও যেন নববধূ রাধার ভেতরে নেই।

আনন্দরূপ এবার তার প্রিয়া রাধাকে আদরের ভেতরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে

চেষ্টা করল। তবু আপন প্রিয়ার রূপ ঝলসানো যুবতী দেহের কোথাও কোন রকমে একটি কি ছ'টি মাত্র কথা বলে তাকে শোনাবার জন্য অনুভূতিময় সূক্ষ্ম কম্পনের রেখাটুকুকেও জাগতে দেখা গেল না। মুখ তার নির্বাক। তাই দেখে দেখে বধূর রঙীন তনুশোভার সুন্দর সুন্দর ছবির মতন চোখে মুখে বুকে পিঠে আর ঘন তমসাবৃত অলকের গুচ্ছে গুচ্ছে আনন্দরূপ নিজের আবেশে ভরা আদর মাখানো হাত বুলালো প্রথমে। শেষে দু হাতের মুঠোর মধ্যে রাধার মধুক্ষরা মুখখানা নিয়ে নিজের রূপ পিয়াসী চোখের সামনে তুলে ধরল। যুবতী প্রিয়ার তেইশ বছরের তেইশটা বসন্তে ভরা আরক্তিম মুখের দীপ্তির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে অসম্ভব রকম সরলতায় পরিপূর্ণ শিশুর স্বর্গীয় সুধামাখা মুখখানা। সে শিশু মুখের দিকে তাকালে পর চোখ জুড়িয়ে আসে আপনা থেকেই। পরিপূর্ণা প্রেমরাগে রঞ্জিতা নিটোল যৌবনের ভারে লাজুকা রাধার ঠোঁটের প্রগাঢ় রঙের লাল আভার মায়াবেশ আর সিঁথির টক্‌টকে লাল রঙের জ্বলজ্বলে কিরণ ছড়ানো পবিত্রতা দুইয়ে মিলে চোখ জুড়িয়ে দিল আনন্দরূপের। প্রিয়া বধূর চোখ থেকে অপরূপ আলোর পরশ ছড়িয়ে পড়ছে ভেজা ভেজা অবস্থায়। সে আলোকের ভেতরে যেন একটা বিশেষ অভিব্যক্তির পরিচয় আছে। আনন্দরূপ তার কিছুই ধরতে পারল না। একটি যুবতী মেয়ের এ সময়কার মনের ভেতরে যদি সে ঢুকে পড়তে পারত মোকাবিলায় তা হোলে বুঝতে পারত রাধার চোখের ঐ আলোর পরশটুকু কিসের। আর রহস্যটুকুই বা কি? সে অত সব ভাবতে চাইল না। কোন সন্ধানও করল না সে রহস্যের উন্মোচনে। আর শুধু শুধু সময় নষ্ট করতে ভাল লাগছেও না তার। এটা হলো তার আর রাধার বিবাহিত জীবনের পরিপূর্ণ যুগল রূপের ভেতর থেকে এক সাথে শয্যা গ্রহণের প্রথম মিলন রাত। অবশ্য আনন্দরূপ যদি এ নিয়ে অন্তত: একটিবার ভেবে দেখত। আর যদি একবার নিজের প্রিয়া সুজনার সম্বন্ধে মনোবিশ্লেষণ কোরত তা হোলে নিশ্চয়ই সে ধরতে পারত আসল জিনিসকে।—রাধার টানা টানা চোখের মধ্যে যে ছবি ফুটে উঠেছে তা কি সত্যি নববধূর পরিপূর্ণ যৌবনের ভারে জড়ো-সড়ো শুধু একখানা লজ্জারুণ ছবি?—না, অন্য কিছুর ব্যঞ্জনা আছে সে ছবির মধ্যে? কোনটা সত্যি?

অত কিছু এখন ভাববার সময় নেই আনন্দরূপের। সুন্দরী অনন্যা রাধার যৌবনের বিচিত্র রঙে ও রূপে অভিষিক্ত দেহরাগের অপূর্ব ছন্দখানাকে চোখের

অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগল। তাই দেখে তার নিজের হাসি মাখানো ঠোঁটের ফাঁকে এক সুন্দর কামনার ছবি ফুটে উঠল। সে মধুর ছবির অভিব্যক্তি চঞ্চল হয়ে ছুটে চলল তার পরিপূর্ণতা খুঁজতে। আর তা খোঁজবারও কোন প্রয়োজন নেই। আনন্দরূপের স্মিত হাসি মুখের ঠোঁটের ফাঁকে দেখা দেওয়া মিষ্টি কামনার ছবিটুকুর পরিপূর্ণ হয়ে রূপ পাওয়ার আধার তার আপন পিয়াসী মুখের সামনে নিজেরই দু হাতের শক্ত মুঠোর মধ্যে ধরা আছে। অপলক চোখের চাহনি নিয়ে দেখতে দেখতে মুহূর্ত মধ্যে তার কামনাযুক্ত মিষ্টি মাখানো অধর সামনে হেলে লুটিয়ে পড়ল রাধার রূপানুরঞ্জিত ঢলঢলে মুখের লাল ঠোঁটে। মিষ্টি মধুর পরশ খাইয়ে চলল আনন্দরূপ তার প্রিয়া বধূর মুখের ঢলঢল'নি রূপের এখানে-সেখানে। একবার যুবতী সুজনার জলেতে ভেজা কাজল চোখেতে আর একবার তার টোল খেয়ে গড়িয়ে পড়া গালের গোলাপী কোমলতায় আবার একবার তার অগ্নিউজ্জ্বল রাঙা টক্‌টকে অধরে নিজের পিপাসিত মুখ থেকে শতধারায় উপ্‌ছে পড়া সুন্দর কামনা জড়ানো মিষ্টি ঠোঁটের পরশ ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে নিয়ে গেল।

মাঝখানে একবার কথা বলে নিল আনন্দরূপ আদর মাখানো গলায়—রাধা। আমার লক্ষ্মী রাধা। আমার দুষ্টু রাধা। আমার রাধা। মিষ্টি রাধা।

আরো এ রকম অনেক মধুর কথাকেই হয় ত বলে বলে শোনাত আবেগে। কিন্তু বলল না রাধাকে এখনও একটা ছোট্ট কথা মুখে এনে উচ্চারণ কোরতে না দেখে। পুনরায় সে তার রূপসী স্মিতার মুখেতে মধুর সুধার আস্বাদ ঢেলে গেল। ঐ ভাবে ব্যতিব্যস্ত কোরে তোলার চেষ্টা করল যুবতী প্রিয়ার মৌন অবস্থাকে। তা হলে যদি কথা বলে রাধা। এভাবে চলায় আস্তে আস্তে তার তনুশোভার লাল লজ্জারূপ বেপথুমন হয়ে উঠল। ওদিকে ততক্ষণে একটু একটু করে আনন্দরূপের হাতের কঠিন বাঁধন শিথিল হতে হতে শিথিলতর হয়ে এসেছিল। এবার যুবক স্বামীর গভীর প্রেমে পূর্ণ বুকের মধুর আশ্রয় থেকে বিছানার ওপরেতে গড়িয়ে পড়ল তার বিপর্যস্ত দেহখানা। শাড়ীর আঁচলখানা সুন্দরী অনন্যার তেইশ বসন্তে পরিপূর্ণা বুকের নিটোল সৌন্দর্যের ওপর থেকে খসে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছে বিছানার সাদা রঙের ভেলভেটিনের ওপরে। সাদার মধ্যে লাল বেনারসীর লাজ-রাঙা পবিত্র রূপ ঝিকিমিকি ঝিলিমিলি খেলায় মেতেছে।

কথা বলল না এখনও রাধা। তাই দেখতে পেয়ে আনন্দরূপের চোখ

দুটো এবারে সত্যি করুণ বেদনায় ছল্‌ ছল্‌ করে এলো। কিন্তু তা ক্ষণেকের জন্য।

আবার রাধা তার ঐ বিপর্যস্ত রূপ নিয়েই বিছানায় চাদরের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আনন্দরূপ সত্যি এবার মরিয়া হ'য়ে উঠেছে। যে করেই হোক্‌ তাকে জানতেই হবে তার সুহৃদয়ার ভেতরে কি এমন গুরুতর ব্যাপারখানা ঘটে আছে যার জন্যে আজকের এই রাতের প্রতিটি যাম নষ্ট হতে চলেছে! তাকে জানতেই হবে। সে যে কোরেই হোক্‌। কারণ সে আজ রাধার স্বামী। কিছু নিয়ে কোন রকম লুকোচুরি অন্ততঃ তাদের দু জনের মধ্যে আদপেও হওয়া উচিত নয়। তার কাছে আসল ব্যাপারটুকু কি খুলে বলতে লজ্জা পাচ্ছে তার সুস্মিতা বধূ। কিন্তু তার পক্ষে ত কখনো একটুও লজ্জা পাওয়ার কথা নয়। শুধু কি আজকের এই শুভ রাত্রিতেই দু জনের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় ঘটল নববধূ আর নব বর রূপে! কিন্তু, তা ত মোটেই সত্যি নয়।

—রাধা নামে এক মেয়ে আর আনন্দরূপ নামে এক ছেলে—আর তাদের দু জনারই পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হয় বেশ কয়েক বছর আগেই। রাধার তখন বয়েস ছিল ষোল—আর আনন্দরূপের তখন সতেরো। —কৈ, কোন দিনই ত তার কাছে রাধা কোন কিছু নিয়ে, তা সে জিনিস যতদূর গোপনই হোক্‌ না কেন বলতে বিন্দুমাত্র লজ্জা পায় নি অকপট ভাব নিয়ে! সব জায়গায় যে কোনও ব্যাপারে, সব সময়েতেই আনন্দরূপের কাছে রাধার ব্যবহার ছিল বড় বেশি খোলা-খুলি ধরণের। কোন বিষয় নিয়ে কোন জিনিসকে রাধা একদিনের এক মুহূর্তের জন্যেও গোপন করা বরদাস্ত করতে পারত না।

আনন্দরূপ তাই ভাবল—তবে, আজ সে কেন নিজেই অমনটি করছে? আজ এমন ব্যবহার করা মোটেই শোভা পায় না এই নতুন পরিচয়ের লীলাসঙ্গিনীর পক্ষে। ভাল লাগবারও কথা নয় তা। এত বছর পরে এই ত আজই তারা বর আনন্দ আর বধূ-রাধা—দুজনেই নিজেদের

ভালোবাসাবাসির চরম আকাঙ্খিত বিবাহিত জীবনে গ্যায়তঃ ভাবে প্রবেশ করতে পেরেছে।

স্বইচ্ টেপার একটা শব্দ হলো খুট্ করে। নিবে গেল দপ্ করে ঘরের ভেতরকার অত্যুজ্জ্বল আলো। অন্ধকারের ভেতর দেহের শৌখিন পোশাক না ছেড়েই বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল আনন্দরূপ। শুয়ে পড়েই হাত দিয়ে সজোরে কাছে টেনে এনেই বুকের ওপরে জড়িয়ে ধরল রাধার কান্নার বেগে ফুলে ফুলে ওঠা কোমল কমনীয় দেহখানা। ঝড়ের বেগে এবার যুবতী প্রিয়াকে হাত-পা দিয়ে নিজের শরীরের সঙ্গে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধতে লাগল আনন্দরূপ।

সত্যি এই মুহূর্তে রাধা যেন নিজের সঠিক রূপটির মধ্যে ফিরে আসতে পারল ঘরের অন্ধকারের মায়াজাল আর বাইরের জ্যোৎস্নার আলোর লুকোচুরি খেলার মধ্যে আনন্দরূপের বুকেতে শায়িতা থেকে। খুশী হয়ে রাধা এখন আদর দিতে গিয়ে তার সুদর্শন স্বামীর চব্বিশটা বছরের বসন্ত রূপকে একই ভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে লাগল নিজের মুঠো মুঠো আরাম ঝরানো বুকের সুস্নিগ্ধ মোলায়েম আবেশের মধ্যে। তার এখন অভিমানিনীর মতন মূর্তি। আনন্দরূপকে দিয়ে নিজের অভিমান ভাঙাতে চাইল। সুজন স্বামীর আদরের মধ্যে সে তার নিজের অভিমানকে ভাসিয়ে দিতে চায়। নিজে গলে যেতে চায় সেই আদর পাওয়ার সুখেতে। সে সুখ পেয়ে ঝিলমিলিয়ে উঠবে তার প্রাণ। তার মন। সেই সঙ্গে তার সুন্দরী দেহের মধুরা প্রেমরাগ।—আর আনন্দরূপকেও রাধা সে সুখের ভাগ দেবে। ভালোবাসাবাসির মধ্যে সে তাকে তা দেবে ও নেবে। আর নেবে ও দেবে।

পরম প্রিয়জনকে সুখ দেবে ভেবে সে মুহূর্তেই রাধা নিজের মধ্যে গুমরে মরা সেই অব্যক্ত বিষাদময়তাকে ভুলে যেতে বাধ্য হলো। আর একটু ভাবল —ছিঃ, ছিঃ। আজকের মতন এমন একটি দিনে নিজের প্রেমময় যুবক সুদর্শনের প্রতি এই ধরণের ব্যবহার করাটা কি তার শোভা পায়? আচ্ছা, একটুও কি তার লজ্জা কোরল না আনন্দরূপের মত একটি ছেলেকে অমন ভাবে শুধু শুধু মনেতে ব্যথা দিতে?—"তোমার হৃদয়ের মতনই আমার হৃদয় হোক্"—এই প্রতিজ্ঞাটুকু রাধাকে অগ্নিসাক্ষী রেখে করতে হয়েছে তারই অন্তরতমের জন্য। প্রেমিকা স্ত্রী হয়ে এরকমটি করলে পর যে আনন্দরূপের

জন্মেই অমঙ্গল ডেকে আনা হবে। না, তা কখনও হতে পারে না। রাধার আজ আনন্দরূপ ছাড়া নিজের সমস্ত পরিচয়ই যে মিথ্যা। আনন্দরূপই যে তার সব সত্তা। রাধার মনের সুখ। আর সেই সঙ্গে লীলার সঙ্গী।

রাধার এবার মন নাচল। প্রাণ হাসল। কথা বলল বড মধুরভাবে আদর ঢেলে। আস্তে আস্তে বলল—আনন্দরূপ। আমার আনন্দ। আমার রূপ। তুমি রাজা। তুমি শুধু আমার। আমাকে কত ভালোবাস তুমি। তোমাকেও 'বাসি'। ভালবাসি খু-উ-ব। আমি তো-মা-র-ই। তো-মা-র—···

আবেগে কথা বন্ধ হয়ে গেল রাধার। বেশ কাটা কাটা ভাবে শেষের কথাগুলো বলে গেল। এর মাঝখানে আনন্দরূপ নিজের মুখ থেকে একটা উষ্ণ পরশ দিয়ে সিক্ত টিপ এঁকে দিল তার কপালের কেন্দ্রস্থলে। আবার বোধ হয় এর থেকে বেশী কিছু করতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু করতে দিল না রাধা হাসির তীব্র ঝলকানি দেওয়া নিজের মুখ সরিয়ে নিয়ে। আনন্দরূপের চোখ থেকে খুশীর উজ্জ্বল রূপটি মুখের শুভ্র হাসির ঝিলিকে ঝিলিকে ঝরে পডছে।

বলল আনন্দরূপ—তুমি দুষ্টু।

—জানই ত বড দুষ্টু আমি। এবার কিন্তু আমার। আমি দোব। বাধা দিও না। দুষ্টু ছেলে।

বলতে বলতে রাধার শরীরের মধ্যে হাসির তরঙ্গে তরঙ্গে আনন্দ-দোলার সৃষ্টি হলো। চোখের মধ্যে বার কয়েক পলক পডল ও উঠল। তারপরেই অষ্টাদশীর মত অথচ তেইশটা বসন্তে ভরা রাধার রাঙা ঠোঁট দুটি এগিয়ে এসে কঠিন হয়ে আটকিয়ে থাকল আনন্দরূপের খুশীর রভস হাসিতে উপছে পড়া আদরে-সোহাগে ভরা মুখেতে। ঐ ভাবে দুজনেই একে অপরের মুখ থেকে সুধা আহরণ করতে লাগল। আনন্দরূপের বুকেতে রাধার যৌবনে পরিপূর্ণা নিটোল বুকের পেশলতা আরামের শিহরণ তুলে পরস্পরের সুদৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে পরশের ঘনিষ্ঠতায় অন্তরঙ্গতার লাজহর রভসে ভরিয়ে দিল। অপরূপ আনন্দের প্রবল আতিশয্যের তাডনায় অশেষ পুলক-আদর লাগিয়ে গেল। যুগল লীলার পারিজাতের মদিরায় তারা হয়ে থাকল

মাতোয়ারা। রাধা সুখ দিয়ে খুশী করল আনন্দরূপকে। আনন্দরূপ খুশী হয়ে সুখ ঢেলে দিল রাধার মধ্যে। সুখ হলো খুশী। খুশী পেলো সুখ।

ভালোবাসাবাসির পবিত্র পরিণয়ের যুগল লীলায় কেউই ক্লান্ত হলো না। সুধা খেয়ে আর সুধা দিয়ে দুজনেই হয়ে উঠেছে প্রাণের অণুতে অণুতে চিরশক্তিতে উচ্ছল! সমুজ্জ্বল! খাঁটি প্রেমের যে তাই ধর্ম।

আনন্দরূপ বলল—আমার একটা কথার উত্তর দেবে, লক্ষ্মী রাধা?

তাই বলে সে তার যুবতী বরবর্ণিনীর পিঠেতে হাত বুলাল আস্তে আস্তে।

বলল রাধা আদরে গলে যাওয়া গলায়—দোব, আনন্দ। নিশ্চয়ই দোব।

কথা বলতে বলতে আনন্দরূপের কাঁধের ওপরে আবেশ ভরে মাথা রেখে আরামে চোখ বন্ধ করল রাধা। একটু পরেই হাসির নাচনে তার চোখের বন্ধ দৃষ্টি খুলে গেল। আনন্দরূপকে দেখতে লাগল আলো-আঁধারির রূপের মধ্যে অপলক চাহনি নিয়ে। দেখতে দেখতে ছোট্ট শিশুর মত আবদারের মধুর সুরে ভেঙে পড়ল রাধা।

রাধা কথা বলল মুখের শুভ্র হাসির ঝলমলানি ছড়িয়ে—কি দেখছ আনন্দ, মুখের দুষ্টুমি ভরা হাসিতে মুখর হয়ে? তোমাকে আজ রাতে বুকের বাঁধন থেকে কিছুতেই আর ছাড়ছি না, আনন্দ। এ ভাবে তোমার বুকের মধ্যে আটকা থেকে নিজের সুখের উদার আশ্রয়টুকু স্থায়ী করে রাখব অন্ততঃ যতদিন না,—সে আসে! সে সত্যি আসি আসি করছে।

এই কথা বলতে বলতে রাধার উজ্জ্বল রাঙা মুখের রঙীন হাসির ঝরণা আর চোখের চঞ্চলা হরিণীর দৃষ্টি অন্ধকারের মধ্যেই নিথর নিশ্চল হয়ে এলো। ঝরণা তার নিজের গতি হারালো মুখের হাসি মরে যাওয়ায়। দৃষ্টি অন্ধ হলো হরিণীর নিশ্চলতা প্রাপ্তিতে।

আনন্দরূপ দেখেও এর কোন কিছু ঠাহর করতে পারল না। বোধ হয় ভুলেই গেছল যে—ভালবাসার নরম মেয়েরা সুখ আর দুঃখ যখন যেটা আসে—তখনি হাসির কি কান্নার স্রোত, সেটার যে কোন একটির মধ্যে অনায়াসেই

নিজেদের ভাসিয়ে দিতে পারে। রাধার এখন সেই অবস্থা। দুঃখের কথা মনে হওয়াতেই তার চোখ দিয়ে জল ঝরার উপক্রম হলো।

সেদিকে আনন্দরূপের কোন রকম ভ্রূক্ষেপ ছিল না। রাধার মুখের এই কথার কোন মানেই করতে চাইল না। খিল্ খিল্ করে হেসেই আনন্দরূপ উড়িয়ে দিতে পারল সে কথা।

কিন্তু একি!

চমকে উঠলো আনন্দরূপ।

আলো-আঁধারির মধ্যে রাধার চোখ চিক্ চিক্ করে উঠল জলে ভরা অবস্থায়!

আবার কান্না!

আর এক মিনিটও দেরি করতে পারল না আনন্দরূপ এই দেখে। বিছানার ওপরে উঠে বসে রাধাকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বুকেতে জড়ালো। বিছানায় লুটানো প্রিয় নারীর বুক থেকে খসে যাওয়া আঁচলখানা হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে রাধার উদোল বুকের অনিন্দ্য রূপশিল্প ঢেকে দিয়ে তার গালেতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আদর করলো।

আনন্দরূপ বলল—আমার রাধা। লক্ষ্মী রাধা। আমাকে কি তুমি বলবে না এমন কি কথা ভেবে ভেবে নিজেকে এই ভাবে কষ্ট দিচ্ছ? রাধা, তুমি কি আমাকে তোমার মনের ভেতরকার অব্যক্ত ব্যথার কথা না জানিয়ে এমনি করে কাঁদাতে চাও? বল লক্ষ্মীটি।—বলতে বলতে রাধার কপালেতে আনন্দরূপ নিজের গাল ধরে লাগিয়ে রেখে আদর করল তার পিঠে মাথায় হাতের পরশ ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে।

ডুকরে কেঁদে উঠলো এবারে রাধা।

বলল কান্নার সঙ্গেই—আনন্দরূপ। আমাকে তুমি ক্ষমা করবে বল? আগে বল, তাই করবে? আমি যে তোমার প্রতি মিথ্যাচার করেছি। হ্যাঁ, মিথ্যাচারই করেছি। সত্যি বলছি। বিশ্বাস কর আনন্দ। সত্যি তাই।

এ ধরনের কথা শুনতে শুনতে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়ে নিজের আলিঙ্গনের মধ্যে আরো শক্ত করে চেপে ধরলো আনন্দরূপ তার সুন্দরী অনন্যা স্ত্রী রাধার ক্রন্দসী দেহকে।

বলল—এ সব তুমি কি বলছ, রাধা ?

কান্নায় ফুলতে ফুলতে রাধা বলল—বিশ্বাস কর আনন্দ, সত্যি কথাই বলছি। আমার রূপ, আমি যে তোমার সন্তানের মা হতে চলেছি। তুমি যে হবে তার বাবা। রূপ, মিথ্যাচার করে খুব গর্হিত অন্যায় করে ফেলেছি, তাই না ? বল আনন্দ, বল লক্ষ্মী রূপ, এজন্যে আমি তোমার কাছে ক্ষমার যোগ্যা কি ? বল, আমার লক্ষ্মী আনন্দ !

সব কথাই শুনল আনন্দরূপ। তার পায়ের নীচে থেকে যেন পৃথিবী কেঁপে উঠল দারুণ ভাবে একটা ভূমিকম্প হয়ে যাওয়ায়। একি কথা বলছে রাধা ! একি অঘটনের ব্যাপার ! তার সমস্ত শরীর আর মন থর থর করে কেঁপে গেল অজানা ভয়ের প্রহেলিকায়। আর একটু হলেই খাটের কিনারে বসে থাকা আনন্দর বেসামাল দেহখানা সেখান থেকে নীচের মেঝেতে পড়ে যেত। রাধা ছিল তার বুকের আশ্রয়ে। আর সেও এই একটু আগে সরে সরে এসে বসেছিল একেবারে বিছানার ধার ঘেঁষে। সে সময়ে হঠাৎ রাধা নিজের সংবিতটুকু ফিরে পেল। তার এই অবস্থায় নীচের দিকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখে রাধা চকিতের মধ্যে আনন্দরূপকে সজোরে নিজের বুকেতে টেনে এনে জড়িয়ে ধরলো। এ অবস্থায় যুবতী বধূ তার ভয়ে বেপথুমন স্বামীকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিল।

রাধার ছবির মত মুখশ্রী শুভ্র হাসির ছটায় ঝলমল্ করে উঠল। তার টানা টানা চোখ আনন্দে ডগ মগ্ করে নেচে গেল। ঠোঁটের গাঢ় রঙ আরো বেশী লাল হয়ে উঠতে লাগল। গালেতে হাসির তরঙ্গে টোল গড়িয়ে পড়লো।

বলল হাসিতে ঝলমলিয়ে—সব বলছি আনন্দ, আগে তুমি শান্ত হও লক্ষ্মীটি।

মুহূর্ত মধ্যে আনন্দরূপের মনের সমস্ত আঁধার যেন কেটে গেল। আর এক হঠাৎ আলোর ঝলকানি খেলে গেল তার সমস্ত প্রাণ জুড়ে। সে আলোর ঝলকানো আভায় উদ্ভাসিত হলো তার মনের গোপন কথার।

—"বুঝেছি রাধা, বুঝেছি আমি।" বলতে বলতে আনন্দরূপ আষ্টে-পৃষ্ঠে রাধাকে বুকেতে বাঁধতে লাগলো। স্ত্রীর আরক্তিম গালেতে নিজের গাল জোরে ঘষতে লাগলো।

বলল আনন্দরূপ ঐ রকম ভাবে তার প্রিয়া স্ত্রীকে আদর করতে করতে—আচ্ছা রাধা, সে ত কবেই ঠিক হয়ে চুকে গেছে। কিন্তু তার পরেও এ তুমি

কি কথা বলছ, রাধা? আজ থেকে ঠিক পাঁচ মাস আগের হঠাৎ ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা—যা সম্ভব হয়েছিল আমাদের দু জনকারই মনের এক অপ্রতিরোধ কামনা পূর্ণ করার প্রবলতম ইচ্ছা জাগায়—আর সে ইচ্ছাকে পূর্ণ করাতেই ঘটে গেল সেই ব্যাপার—সর্বাংশে শুধু তোমাকে ঘিরে। আর সচেষ্ট হবে তখনি সেই ঘটনার রেশটুকুকে তোমার ভেতর থেকে সমূলে উৎপাটন কর হয়েছে। কিন্তু রাধা, তার পরেও তুমি একি কথা বলছ! একি কথা…

কথা শেষ হলো না আনন্দরূপের। নিজে থেকেই সে তা শেষ করতে পারল না। আবেগে তার গলা বন্ধ হয়ে এসেছে। ভয়ের ভয়ানক শিহরণে কেঁপে উঠল তার শরীর। চোখ অসম্ভব রকম ছল্‌ছল্‌ করে উঠল জলে ভরা অবস্থায়।—আনন্দরূপের প্রেমে ভঁরা চব্বিশ বছরের প্রত্যেকটি বসন্ত এই কাঁদল বলে!

আনন্দরূপের কান্নার সামিল সবুজ প্রেমের মাধুরী জড়ানো মুখের ওপর নিজের ছবির মতন আলো-হাসির ঝিলিক দেওয়া প্রেমের রভস মুখখানা ধরে রাখলো রাধা। দেখতে লাগলো গর্ব ভোরে আপন স্বামীর সরলতায় মুগ্ধ অপরূপ মুখ-চোখ। দেখে দেখে স্বামী গর্বে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। আনন্দ গরিমায় নিজের অঙ্গরাগ মাখাল রুমঝুম করা ছন্দে।

ভাবল রাধা—পৃথিবীর কোটি কোটি লোকের মধ্যে আর কেউ তার আনন্দরূপের চাইতে কোন অংশেই আপন নয়। তার সমস্ত সত্তা একমাত্র এই সুন্দর ছেলেটির জন্যে-ই।—যে ছেলে তার সমস্ত জীবনানন্দের লীলাসঙ্গী। তার অকৃত্রিম বন্ধু। মনে হলো তার—উঃ, কত ভাল তার আনন্দরূপ। অতুলনীয়।

রাধা বলল—ছিঃ আনন্দ, পাগলামি করে ভয় পেয়ো না। তুমি মেয়ে নও তোমার পরিচয় ছেলে, সেটা আগে খেয়াল রেখো। আর আমি যদি মেয়ে হয়েই সব রকম সামাজিক লজ্জা আর ভয়কে তুচ্ছ মনে করে অস্বীকার করতে পারলাম, ও সেই সঙ্গে যে ঘটনা অপ্রতিরোধ্য ভাবে ঘটলো তোমাকে আমাকে ঘিরে, তাকে যদি ভগবানের অভিপ্রেত কাজ বলে মেনে নিতে পারলাম—আরো জানলাম যে ওটা তাঁর-ই আশীর্বাদের এক পবিত্র ফুল বই আর কোন কিছু নয়। মেয়ে হয়ে আমি যা করতে পারলাম, কৈ তুমি সবল ছেলে হয়ে ত সেটুকু সাহস করতে পারলে না? কেন পারলে না, রূপ? তুমি তখন নিশ্চিন্ত হবার জন্য ভাবলে—তুমি যা যা ব্যবস্থা আমার জন্যে করে দিয়ে

তাইতেই ঘটনার মূল তার গোড়া সমেত নষ্ট হয়ে গেছে।—কিন্তু এর পরেও দেখা গেল ঘটনার ফলটুকু সমূলেই রয়ে গেছে আগের মতনই প্রাণ চঞ্চল। একটু কোন আঁচড়ের দাগও পডতে পারল না তার গায়েতে। সে প্রাণে বেঁচে থাকল আমারই জন্যে। তোমার দুষ্টু শিরোমণি রাধার-জন্যে-ই।

এক টানে এতগুলো কথা বলে এখানে এসে থামল রাধা।

ছল ছল চোখে আনন্দরূপ বলল—তোমারই জন্যে রাধা? তুমি-ই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছ?

গর্বিত ভাবে বলল রাধা—হ্যাঁ, আমি। আমিই তোমার সেদিনকার সেই সন্তানকে বাঁচিয়ে রেখেছি। দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে তাকে আমার রক্ত দিয়ে অপার স্নেহ দিয়ে অকৃত্রিম ভাবে সৃষ্টির রূপটুকু দিয়ে আসছি শিল্পীর মতন। দেখ আনন্দ, বিশ্বাস যদি তোমার এক রকম নাই হয়, তা হলে লক্ষীটি রূপ,—আমার শরীরের এইখানটায় নিজের হাতে ধরে স্পর্শ করে দেখ। হাত ছুঁইয়ে পরখ করে দেখলেই তোমার ভাবী সন্তানের প্রাণের স্পন্দনটুকু টের পাবে এর ভেতর থেকে। এখানে সে দিনে দিনে বড় হচ্ছে পৃথিবীতে উন্মুক্ত আলোকের মধ্যে এসে তার উজ্জ্বল ধারায় স্নান করে নিজে অপরূপ হয়ে উঠবে বলে। ভুলে যেও না সে তোমারই সৃষ্ট। তাই তোমার-ই মত হবে মূর্ত তার প্রাণ। সে যে তুমি-ও। আমার আদর আহ্লাদ দেওয়া নেওয়া আর পাওয়ার লীলাসঙ্গী আনন্দরূপেরই সে হবে এক ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে উজ্জ্বল রাঙা টুক্‌টুকে সংস্করণ। সে দেখতে কতটুকু হবে জান—এই এত-ত-টুকুন।

রাধা খিলখিল করে হাসতে হাসতে হাত দিয়ে পরিমাণটুকু দেখিয়ে বলল—বুঝলে আনন্দ, সে এই, এই এত-ত-টুকুন হবে।

বলে ও দেখিয়ে দিয়ে আনন্দরূপের ডান হাতখানা টেনে নিয়ে রাধা তার উদরেতে ছুঁইয়ে ধরে রেখে বলতে লাগল - সেদিন অসময়ে আমাদের দুজনের ক্ষণিকের দুর্বলতার জন্য আমার উদরে অবৈধ ভাবে তোমার সন্তানের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে কুমারী হয়েও জননীর মূর্তি ধরতে হলো আমাকে। তুমি তাই দেখে আমার কুমারীত্বের মর্যাদাকে অক্ষত করে রাখবার জন্য চেষ্টা করলে। উঃ, সে কি ভীষণ ব্যাপার। সাধারণ একটা সামাজিক লোক-লজ্জার জন্য শেষে একটি শিশুর প্রাণকে অকারণে হত্যা করতে হবে। তুমি ত সেই ব্যবস্থাটুকু করেই কলকাতায় ফিরে গেলে। সেখানে ফিরে গিয়ে এই

ভেবে তুমি নিশ্চিন্ত হলে যে, সব রকম অঘটন চুকে গেছে। ভয়ের বা দুশ্চিন্তার আর কোন অন্য কারণ এর পরে থাকতে পারে না, আর নেই-ও। আমি কিন্তু তোমার কোন পরামর্শকে গ্রহণ করতে পারি নি। দেখ আনন্দ, তুমি অবুঝের মত যা করতে চেয়েছিলে, আমি বুঝে কখনও সেটি হতে দিতে পারি না। দেখ রূপ, আমি একজন মেয়ে। মেয়েরা জীবনে এক সময়ে না এক সময়ে মা হয়। তবে অনেক সময় অনেক জায়গায় মেয়েদের ভেতর থেকে অনেকেই হয় ত সব দিক অনুকূল থাকা সত্বেও মা নাও হতে পারে। এর মানে এই নয় যে, তারা মা হওয়ার অনুপোযুক্তা। এর পেছনে সব সময়ে উপস্থিত থাকে প্রাকৃতিক কোন কারণের ব্যতিক্রম বা মানুষের আদর্শের কোন মহান দৃষ্টির উদার প্রসারতা বা কামনার সাব্লিমেশন্। মেয়েদের এই বিশেষ দিকটিও বাস্তব জীবনের দিক দিয়ে সত্য—আবার অন্য দিকটিও অতিমাত্রায় বাস্তবে সত্য—যেখানে নির্বিশেষে সব মেয়ের মধ্যেই প্রিয়ার মতন স্বতন্ত্রতা নিয়ে মায়ের শাশ্বত রূপটি বিরাজ করে। আনন্দ, তোমার সঙ্গে সেদিন পর্যন্ত আমার বিয়ে হতে পারে নি বলে কি আমি তোমার সন্তানের মা হতে পারব না? ওগো আনন্দ, আমি যে একমাত্র তোমাকেই আমার আরাধ্য স্বামী, আমার প্রাণের অর্ঘ্য দেওয়া দেবতাটি রূপে দেখতাম সেদিনের অনেক আগে থেকেই। আমার রূপ, তুমি কি তা জানতে না? আমি জানি, আমার আনন্দ সেটুকু জানলে পর অমন করে ভয় পেত না। তাই ভয় পেয়ে সরে গেছিলে তুমি।

সে কথা শুনতে শুনতে আনন্দরূপের নিজের সত্তা হারিয়ে যাচ্ছিল প্রিয়ার গর্বিত ভাবের মধ্যে। তার চোখের মধ্যে ভরা জল থৈ থৈ করছে। কান্না আসছে তাঁর দারুণ ভাবে। কিন্তু কাঁদতে চেয়েও কাঁদতে পারছে না। এর মত কষ্ট নেই। কেন না একবার কেঁদে ফেললেই কষ্টের অনেকটা অবসান হয়। তাই দেখে কথা থামিয়ে রাধা তার মুখের খিল্‌খিল্ হাসিতে মাখানো মিষ্টি আদর ঢেলে দিল আনন্দরূপের জলে ভরা চোখেতে। বেশ শান্ত হয়ে উঠলো তার ঐ অবস্থার ভয়ানক অস্থিরতা।

ঐ ভাবে তাকে শান্ত করে রাধা বলল—ওগো আনন্দ, কৈ, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ ত? আমি তোমার সেদিনকার অবাঞ্ছিত সন্তানের মা আর কয়েক মাস পরেই হব তাই বলে কি তুমি আমায় ক্ষমা করবে না? শুধু একটা সামাজিক ঘটনা ঘটবার আগেই এমনটি হলো বলেই কি এর জন্যে কোন

রকম ক্ষমা নেই ? বিয়ের পর সবই বুঝি বৈধ ? আর তার আগে সবই বুঝি অবৈধ ? তাহলে আনন্দ, তুমি যে আমাকে অনেক বছর ধরেই ভালবেসে এসেছ, সেটাও ত একরকম অবৈধ ভালবাসা ? আর অবৈধ বলে আমাকেও ত আনন্দ, তোমার উচিত ছিল এই পৃথিবীর আলো-বাতাসের মধ্যে থেকে সরিয়ে ফেলা। কিন্তু রূপ, তুমি ত তা করলে না। আমার প্রতি তোমার সীমাহীন ভালবাসাই যে তোমাকে সেরূপ কিছু করতে দেয় নি। তবে এই ভাবী শিশুর বেলায় কেন অমনটি করতে চেয়েছিলে ?

আরো আবেগের সঙ্গে রাধা জানাল—তুমি কি জানতে .না যে, তোমার আমার এই যৌথ প্রয়াসের সৃষ্টি কাজের মূলই হলো আমাদের ভালবাসার পূর্ণাহুতি। ধর আনন্দ, বিয়ের পরে আমাদের জীবনেতে কোন না কোন সময়ে আমাব মধ্যে তোমার সন্তানের প্রাণ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারত। আর সম্ভাবনা দেখা দেওয়া কি হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। রূপ, তখন সে সন্তানের ব্যাপারে বৈধতাব প্রশ্ন জাগে না, আর যত প্রশ্ন জাগে তার সবই আমার মত মেয়েদেরই ব্যাপারে ? আনন্দ, বাস্তবের মধ্যে সমাজ অনুমোদিত বিবাহিত জীবনেও ত দৈনন্দিন হাজার রকম অবৈধ ব্যাপার ঘটে চলেছে।—কিন্তু সে নিয়ে ত সমাজের কোন রকম মাথা ব্যথা হতে দেখা যায় না। বরং নিশ্চিন্তে হেলে-দুলে ঘুমিয়ে থাকে সে সব সমাজ ব্যবস্থাগুলো। কোন জুজুবুড়ির অতি দাপটে তার মুখ সেলাই করা থাকে। সে মুখ খোলবার উপায় থাকে না তার। তাই ত সত্যি। এ কি আনন্দ, চুপ করে রইলে কেন ? কথা বল লক্ষ্মীটি। কি হলো তোমার ? লক্ষ্মী আনন্দ, ছিঃ, পাগলামি করে না অমন ভাবে। কথা বল, ওগো রূপ। ওগো আনন্দ, আমায় তুমি এবারে ক্ষমা করেছ নিশ্চয় ?

রাধা কথা শেষ করলো। তার বলার যতটুকু ছিল, বলেছে সে ততটুকুই। এবারে আবেশে ভোরে নিজের মাথা রাখলো আনন্দরূপের কাঁধেতে শুইয়ে। হাতের আঙুল দিয়ে স্বামীর সুন্দর মুখেতে বুলানো পরশ লাগিয়ে আদর করতে লাগলো।

নিজের ভুলে আর রাধার মহানুভবতার শান্তরাগে ভরানো ভাবী মায়ের অপূর্ব গরিমায় সুস্নাতা মূর্তির কাছে এই মুহূর্তে আনন্দরূপের অভাবনীয় পরাজয় ঘটে গেছে। রাধা মেয়ে হয়ে যে অসম সাহসের পরিচয় দিতে পারল, ছেলে হয়ে আনন্দরূপ ত তার এক অংশও সাহস করতে পারেনি। প্রিয়া নারী যা

করতে ভয় পায় নি, তাই করতে ভয় পেয়েছিল তার-ই প্রিয়তম পুরুষ। সত্যি প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছে এই পরাজয় স্বীকারের মধ্যেই তার আনন্দের সুখ সব চাইতে বেশী। তাই মনে করে আনন্দরূপের চব্বিশ বছরের পরিপূর্ণ যৌবনের সুখী প্রাণ কেঁদে উঠলো শিশুর মত। তার চোখ থেকে জমা হয়ে থাকা জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো বিছানার ওপরে দুই গাল বেয়ে।

রাধা তখন অস্থিরা হয়ে উঠলো তাকে ও ভাবে কাঁদতে দেখে। এ যে চায় নি কখনো। অন্ততঃ তার লীলার সঙ্গীকে কাঁদতে দেখলে নিজেকে না কাঁদিয়ে রাখা যায় না। আনন্দরূপের বুকের ওপরে রাধা উপুড় হয়ে পড়ে তার চোখের জলের দিকে তাকিয়ে বলল—ছিঃ, আনন্দ, তুমি ছেলে হয়ে চোখের জল ফেলছ? লক্ষ্মীটি রূপ, কষ্ট পেয়েছ আমার কথা শুনে?

বলতে বলতে রাধা ক্ষিপ্রগতিতে আনন্দরূপের জল-ভরা চোখ দুটো থেকে সমস্ত জল মুখ লাগিয়ে পরশে পরশে শোষণ করে নিল। শেষে বলল রাধা—আমার রূপ, এবার বেশ একটু খিল্‌খিল করে হাস। ঝক্‌মকিয়ে হেসে ফেল লক্ষ্মীটি আমার।

ঝক্‌মকিয়ে তখনি হাসির ঝিলিমিলি রূপ ফুটে উঠলো আনন্দরূপের মুখেতে —তুমি রাধা। তুমি আমার ভাবী সন্তানের মা হবে। তুমি মিষ্টি রাধা তুমি মিষ্টি মা হবে। উঃ, কি সুখের কথা! রাধা, শুধু অফুরন্ত সুখ। রাধা তুমি শুধু সুখ আর সুখ।

বলতে বলতে ছোট্ট শিশুর মত হয়ে উঠলো আনন্দরূপের মনের তাজা উচ্ছলতা। সুখের শুধু মধুর নাচ নাচতে লাগলো তার প্রাণ জুড়ে। হাত দিয়ে টেনে নিয়ে রাধার লাজুক শরীরের যৌবন চঞ্চলতাকে বুকেতে কঠিন বাঁধনের ভেতরে জড়াতে লাগল। মুখ দিয়ে তার শুধু খুশীবিভোর হাসির রঙীন ছররা ছুটেছে।

ওদিকে রাধা তার নিটোল মধুর ভাবে সেখানকার মোলায়েম রূপের মধ্যে অপরূপ পুলকানন্দের ছোঁয়াচ্ পেল। তার বুকের শিল্পোশোভার এই অনন্য ব্যঞ্জনার মধ্যে নিজের মুখখানাকে এনে রেখেছে আনন্দরূপ। রাধা অনুভবে পরশে পরশে মাতোয়ারা হয়ে উঠতে লাগলো প্রিয়তমের মুখের এক একটি উষ্ণ পরশের মদিরা সিক্ত বিহ্বলতায়। সুখের তালে খুশীর কাকলিতে কল কলিয়ে উঠলো রাধার তেইশ বসন্তে ভরা রাঙা যৌবন।

—আমার আনন্দ। আবার রূপ। তুমি আমার ভাবী শিশুর বাবা

আর আমি তার মা। কত সুখী আমি। সুখী তোমারই জন্যে, রূপ। আমার মিষ্টি রূপ।

কথা বলে নিয়ে আনন্দরূপের বুকেতে কঠিন বাঁধনের মধ্যে বন্দী অবস্থাতেই হাসির খুশীবিহ্বল ঝরণায় ঝলমল করে নেচে উঠলো প্রিয়ার সুখ আর খুশী। রাধা মুখ নীচু করে আনন্দরূপের গালেতে হাসির সে ছোঁয়াচ্ বসিয়ে দিল। হাসির তরঙ্গের মাঝে আলো-আঁধারির লুকোচুরি খেলাতে সুখের মদির সুরভিতে কল-কাকলি মুখর হয়েই থাকল তারা দু জনা বেশ কিছু সময়। তারা দু জনা। এক সুখ আর তার খুশী। আনন্দরূপ আর রাধা।

—তখন রাতের শেষ যাম।

অশোককুমার রায়

অভিসারিকা

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

পিঠময় তার ঘন কালো এলো চুলের রাশি এই একটু আগেও বিপর্যস্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে ছিল। সমস্ত চুলকে এখন পেছন থেকে সামনে বুকের ওপরে টেনে এনে ফেলল সুপ্রিয়া। আপন মনে আলতো ভাবে চুলগুলোকে হাতের মুঠোয় নিয়ে খেলা করতে লাগল। আঙুলে চুলের গিঁট পাকিয়ে চলল। সুপ্রিয়ার পরিপূর্ণা যুবতী দেহের টাটকা রূপের রঙীন ছটা ছড়িয়ে পড়ছে ঘরময়।

একই ভাবে আঙুলে চুলের গিঁট লাগাচ্ছে। পেছন থেকে ঘাড়ের ওপর দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে রাখা এলো কেশের কয়েকটা গুচ্ছকে মুঠোয় ধরে আলতো করে নাচাতে নাচাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল সুপ্রিয়ার রূপানুরক্ত শরীরের হিল্লোলিত ছন্দখানা। সুন্দরীরাগের লালিমা জড়ানো অঙ্গে পরেছে চকোলেট রঙের মুর্শিদাবাদী রেশম। সুপ্রিয়ার চিকন সোনার মতন উজ্জ্বলা তনুতে ঐ রঙের ঝিলিমিলি খেলা মিতালি পেতেছে অঙ্গ-সুষমা ঝলকানো দুধের সঙ্গে মিলে যাওয়া রাঙা আলতায়।

লোভাতুর দেহের আজকের সুপ্রিয়ার যৌবন পঁচিশটা শান্ত বছরের সুষমায় পরিপূর্ণ। এই একটু আগে—অন্তত একটা অপ্রত্যাশিত লিপিকা তার হাতে এসে পৌছানোর আগের মুহূর্ততেও দেহের মধ্যে যৌবনের আনন্দ-মুখর চঞ্চলতার চিহ্নটুকুন পর্যন্ত ছিল না।—লিপির প্রতিটি অক্ষর পড়তে পড়তে তার মনেতে দারুণ মোহময় আবেশের অনুভব জাগে। অপ্রতিরোধ্য আবেগের ঝড়ে হুলুস্থুলু হলো তার মনের অভিমান। আপন মনের খেয়ালে, অন্য একজন মানুষের প্রেমময় মধুর সঙ্গ-সুখকে নিজের জন্য একান্ত করে পাওয়াকে অস্বীকার করে বিশ বছরের প্রগল্ভ যৌবন থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘ পাঁচ বছরেও টেনে চলেছিল ভুলের বোঝাকে। খেয়ালের ঝোঁকে ক'রে ফেলা ভুলের মাশুল তাকেই গুনতে হোয়েছে।—কিন্তু হাতে পাওয়া লিপিখানা তাকে এখন অকল্পনীয় ভাবে আশ্বাস

জানালো, আরাম দিল, আবেশ দিয়ে যৌবনের নিছক করা অভিমানকে ভাঙ্গালো—সব শেষে সুপ্রিয়াকে দুর্লভ পারিজাতের সুধা খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে বড্ড বেশী খুশী করালো। লিপিখানা এসেছে দূরের, বহু দূরেকার সাত সমুদ্র আর তের নদীকে পরিক্রমা শেষ করে। লিপি পাঠিয়েছে এক ব্যারিস্টার যুবক—ঐ পাঁচ বছরের মতনই দীর্ঘ সময় ধরে যাকে ভালোবাসার অপূর্ণতার জন্য আপন বিবেকের কাছে কষাঘাত খেতে হোয়েছে তীব্র রকম—আর সুপ্রিয়া যাকে আপন মনের মিথ্যা অভিমানকে বজায় রাখবার জন্য ভুল বুঝে প্রীতির, মমতার, আনন্দের জগত থেকে ভাগ্যাহত করেছিল।—অবশ্য ওরকম করে সে নিজে কিন্তু একদিনের জন্যও তৃপ্তা হোতে পারে নি। প্রেমের মানুষটিকে ভুল বুঝে হারিয়ে তারপর তাকে ভালোবাসার জন্য কাছে না পাওয়ায় সব সময় তার মনের আকুলতা ভরে থাকত দ্বন্দ্বে।—শেষ পর্যন্ত আজ এই মুহূর্তে প্রেমতৃষিতা, ভালোবাসা দিতে আত্মহারা সুপ্রিয়ার পঁচিশটা বছরের আবেশে পাগল যৌবন চরম রকম খুশীতে মেতে উঠলো মাত্র একটি কথার ভেতর থেকে।—সে জানলো, এতদিন পরে তার কাছ থেকে পাওয়া অবহেলার জন্য হারিয়ে যাওয়া বড় বেশী রকম ভালো-সুজন সুন্দর প্রেমিক মানুষটি তারই কাছে ফিরবার জন্য এক রকম ছুটে আসছে। সে লিখেছে—"ওগো, দুষ্টু মেয়ে। আমাকে ভুল বুঝে আর কত দিন অভিমান করে থাকবে। ছিঃ, একটা কাজের জন্য কি তুমি আমাকে ক্ষমা কোরতে পারছো না। আচ্ছা তুমি কি তাতে নিজে খুব সুখী হোতে পেরেছো?—আর কেন, এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতন আমার দিকে ফিরে তাকাও। আমি আজ ক্লান্ত। আমি তপ্ত। ভালোবাসার ব্যাপারে আজ সর্বস্ব হারিয়েছি। তবু মনে জোর রেখেছি যে—তোমার আমার সম্বন্ধে ভুল বোঝা একদিন শেষ হবেই,—কেন না, আরো জোর দিয়ে তোমাকে শুধোচ্ছি—তুমি, তুমি যে আমারই সুপ্রিয়া।—আমি আর পারছি না একলা একলা এ ভাবে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে। তাই আমি তোমার কাছেই আজ ছুটে আসছি। শুধু তোমার বুকের স্নিগ্ধতার মধ্যে আমাকে বন্দী কোরে রাখার চেষ্টা করো—যাতে আমি আর তোমার কাছ থেকে কাছ-ছাড়া না হোতে পারি এক পলকের জন্যেও। তোমার প্রতি এই রইলো আমার অন্তরের মিনতি। এই রইল আমার আশীর্ব্বাদ।"—লিপি শেষ করেছে সে নিজের নাম উল্লেখ না করেই। 'ইতি' কথাটাকে একটা ড্যাসের পর লিখে তার নীচুতে একটা বেশ লম্বা করে টানা রেখা টেনে তার দুধারে ওপর দিক দিয়ে একটা করে কমার বন্ধনী দিয়ে

রেখেছে।—লিপিখানাকে বার বার পড়েছে সুপ্রিয়া ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। তবু তার মন আপন অন্তরের পরম জনের এখুনি এসে পৌঁছবার কথা জেনেও কিছুতে শান্ত হোতে পারছে না। যত পড়ছে ততই তার মন মোচড় খাচ্ছে ব্যথায়। অন্তর কাঁপছে ভয়েতে—কত ছোট হয়ে যাবে তার অভিমানযুক্ত মনের গরিমা—যখন সে এসে তাকে তার তপ্ত-তৃষিত বুকের মধ্যে অসম্ভব রকম ভাবে বন্দী করে ফেলবে।—সহজে ছাড়তে চাইবে না তৃষিত আলিঙ্গনের ভেতর থেকে—যদি সুপ্রিয়া আবার তাকে ভুল বুঝে কষ্ট দেয়।—না, না, না। এবার আর সে অবুঝ অভিমানিনী মেয়ের মত ভুল করে ঠকতে চায় না। সুপ্রিয়ার অবস্থা ক্রমশঃ বেপমান হোয়ে উঠছে প্রিয়তমের তাপিত বুকের আলিঙ্গনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার অধরে অধর ছুঁইয়ে পারিজাত সুধাকে মুষলধারায় বর্ষণ করাবার জন্য। ছিঃ ছিঃ, এরি মধ্যে সে লাজহীনা হোয়ে উঠে লিপিখানার ওপরেই চুম্বনের বৃষ্টি ঝরাল। তবু সে শান্ত হোতে পারল না। পঁচিশ বছরের পূর্ণ যৌবন তার সংযমকে বাধ মানাতে অক্ষম হল। লিপিখানাকে বুকে চেপে ধরে নিরুদ্ধ কান্নার বেগে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ এক অজানিত আসঙ্গের ভাবনায় আরামের তৃপ্তি পেয়ে শান্ত হলো। কান্নার ভেতর দিয়ে সে তার কষ্টকে লাঘব করলো। সুপ্রিয়া তখন শান্ত হোয়ে জানালার ধারে এসে পর্দা সরিয়ে দাঁড়াল। বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল সৌন্দর্য পিয়াসিনী চোখের দৃষ্টি নিয়ে। হাজারীবাগের মনোলোভা রূপের অনেকটা ধরা পড়েছে সুপ্রিয়ার চোখেতে। দেখতে লাগল ফুলের বাগানের বাহারে শোভা। নানান জাতের নানান পরিচয় সে সব ফুলের। তার মধ্যে আছে নাম-না জানাটিরও প্রকাশ। বাগান শেষে সুদূর পর্যন্ত দেখা যায় ছড়িয়ে আছে খোলা মাঠের মসৃণ জমি। কৃষকেরা সেখানে মানুষের জন্যে তৃপ্তির ফসল ফলায়। মাঠের শেষে মনে হয় আকাশ যেন নীচের দিকে নেমে এসে ক্ষেতের আঙিনা ছুঁয়ে আছে।

সেখানটায় একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সুপ্রিয়া। তন্ময় হয়ে হাজারীবাগের রূপ দেখতে দেখতে তার মনে পড়ল কলকাতার কথা। সেখানে থাকেন তার মা-বাবা। বাবা এখন অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের জজ্। সে বাড়ীটা খুব বড়। জমিদারী আমলের ঐতিহ্য লাগানো। সেখানে থাকেন দাদা—আর বৌদি। আর ছ বছর আগে থাকত তার এক বছরের ছোট বোন সুমিতা। সুমিতা এখন সেখানকার এক নামজাদা মিল মালিকের স্ত্রী। স্বামী তাকে অসাধারণ রকম ভালবাসে, তাই সুমিতার গর্বের সীমা নেই। সত্যি

ও সুখী।—আর দাদা বড় চাকরী করেন। বৌদি তাকে ভালোবাসে সব কিছু ভুলে গিয়ে। এমন গভীর ভালবাসা—যা তাকে সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। বৌদি অদিতি সুপ্রিয়ারই বয়েসী। তার বিয়ে হয় আঠারো বছরে। একই সাথে তারা কলেজে পড়েছে। তারপর বি. এ. পাশ করে অদিতি আর পড়তে পারল না। তখন সে ছিল সন্তান-সম্ভবা। কিছুদিন পরে দাদা-বৌদির একটি শিশু জন্মাল। জন্মাবার আধ বছরের মধ্যেই হঠাৎ একদিন ডিপ্‌থেরিয়া হয়ে মারা গেল তাদের মেয়ে। অদিতি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। পরে অসুখে ধরেছিল তাকে। অসুখ থেকে সেরে উঠে অদিতির কাজ হলো রমেনদা'কে চোখে চোখে রাখা। তার মনেতে এখন নারীর চিরন্তন ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল। সন্তানকে হারিয়েছে সে। কিন্তু তাই বলে স্বামীকে ত আর হারাতে চায় না। তার অন্তরে ভরা সন্তানের জন্য মঙ্গলময় সমস্ত প্রীতির সেবা-যত্ন এসে আশ্রয় পেয়েছিল রমেনদা'র ওপরেতে। পাগলের মত অজ্ঞান হয়ে ভালবাসতে লাগল স্বামীকে। এক মুহূর্ত রমেনদা তার চোখের আড়াল হলে মুষ্‌ড়ে পড়ত অদিতি।—এই রকম তুলনাহীন ভালবাসা দিয়ে দাদাকে ভালবাসতে দেখে অদিতির জন্য সময়ে সময়ে তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজের ভেতরকার আবেগময় কান্নাকে সুপ্রিয়া আর চেপে রাখতে পারত না। আজও অদিতির পক্ষ থেকে রমেনদা'র জন্য সে গভীর প্রীতির ব্যাপারে এতটুকু ত্রুটি দেখা যায় নি। হাজারীবাগের জীবনে থেকেও দাদা-বৌদির ঐ ভালবাসার গভীর অনুভূতির সূক্ষ্মতম রেশটুকুও সুপ্রিয়ার অন্তরে দোলা জাগায়। তার যৌবন-আবেশের পর্যাপ্ত ভারসাম্যে পুষ্প স্তবকের মত বিনম্র বক্ষদেশর আরক্তিম আভাকে কাঁপিয়ে তোলে ফুলিয়ে ফুলিয়ে। আজও বোধ হল তার—সেই ভাবাবেশের অনুরণন বয়ে চলেছে নিজের শরীরে। আগের মতই ঘন ঘন চিঠির লেনদেন লেগে আছে ননদ-বৌদি, সুপ্রিয়া-অদিতির সখিত্বে। অদিতির সুখের তুলনা হয় না। রমেনদা ছুটি পেলেই অদিতিকে নিয়ে যান আজ এখানে বেড়াতে—কাল সেখানেতে।—আর ঐ দুর্ঘটনার পর থেকে আজ প্রায় বছর কয়েক হল। আজও অদিতির আর কোন সন্তান হয় নি।

সুপ্রিয়া এ কথা ভাবতে ভাবতে হেসে ফেলল—সত্যি, সুমিতা কিন্তু অদিতির চাইতে আর একটু বেশী সুখী। সুখটা অবশ্য সুমিতার সন্তান-ভাগ্যে। ছ বছর হল বিয়ে হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে সে এক ছেলে আর তিন মেয়ের মা হয়েছে। শুধু কি তাই! কিছুদিন আগে একখানা চিঠি এসেছে, সুমিতার

কাছ থেকে। তার মধ্যে লিখেছে, এই সময় তার পাঁচ বারের জন্য কনফাইনমেন্ট পিরিয়ড্ চলছে। সুপ্রিয়া খিলখিল করে হেসে ফেলল সুমিতার আর একটা কথায়—ছিঃ, সুমিতা কি লাজহীনা মেয়েরা বাবা। কিছু লিখতেও যেন ওর লজ্জায় বাধে না। লজ্জার মাথা খেয়ে লিখেছে সুমিতা—'কি করব দিদি, জমি যদি খুব উর্বরা হয় তাহলে যে অতি সহজেই সেখানে ফসল ফলে যায়। আমার হল তাই।'

খিল খিল হাসি সুপ্রিয়ার মুখেতে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল—সত্যি, সুমি একটা বেহায়া মেয়ে। কিছু লিখতে বাধে না একেবারে। সুমিতার লাজ নেই।

বিকেলের রোদ ঝিকি-মিকি খেলা আরম্ভ করলো সুপ্রিয়ার মুখশ্রীর মিষ্টি ছড়ান ভাবটুকুকে নিজের চিক্ চিকে নরম আলোতে ছাপিয়ে দিয়ে। হেসে হেসে ঐ রোদটুকু তার মনের গোপন কথাগুলোকে রঙীন করে তুলেছে।

দেখতে দেখতে দূরে ধানক্ষেতের সীমার প্রান্তে হেলে পড়েছে বৈকালী রোদ। তার রামধনু রঙের সাত রঙা দিক-চক্র-রেখাঙ্কনের অপূর্ব মাধুর্য্যকণা ছড়িয়ে গেছে। অস্তাচলের পথে এগিয়ে আসা নরম রোদের অভিসারিকার রূপখানা নেচে উঠলো এই সময়েতে সুপ্রিয়ার বন্ধ ঠোঁটের ফাঁকেতে। সে সময়ে আলোতে রঙীন মধুবিকার হাসিতে ভরে উঠল অধর ছাপিয়ে তার মুখের আসমানী রূপ। চোখের তারার মধ্যে হাসির তরঙ্গ ঝক্-মকিয়ে নেচে গেল।

শুধু মাত্র হাসিই সুপ্রিয়ার নরম অধর পাত্রে ওঠে নি ঝক্‌মকিয়ে। ঐ স্মিত হাসির উৎফুল্ল প্রকাশ সাড়া এনে দিয়েছে তার নীরব মনের নিশ্চলতার ভেতরে। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে মনের নিশ্চুপতা। আর তা ভেঙেছে খান খান হয়ে।

সুপ্রিয়ার মনের বন্ধ দরজা এই মাত্র অর্গল মুক্ত হয়ে গেল নিজের হৃদয়ের এক গোপন তত্ত্বের আকস্মিক চাঞ্চল্যে। যে তত্ত্ব এতদিন ধরে তার

অন্তরের মণিকোঠায় লীন হয়ে ছিল আপন সত্তা হারিয়ে ফেলায়। সে মণি কোঠার দরজায় কপাট হয়ে লেগেছিল বাইরের জগতের কতগুলো ভাব-ধারণা

শেষ বারের মত সুপ্রিয়ার এই বৈকালী রাগেতে ছোপান চিন্তার জাল ছিঁ করে সরে গেল অদিতি-সুমিতার নিজের নিজের দাম্পত্য-অভিসার জীবনের খুচরো মুহূর্তের মিষ্টি চিত্র-বহুল সুন্দরম্ ব্যঞ্জনা।

—তাদের প্রেমের ছবি উধাও হলো।

কিন্তু যাবার আগে নিজেদের প্রেমের সুবাসে মদির৷ করে গেল অধ্যাপিক সুপ্রিয়াকে। তার চোখের সামনে একটা হারিয়ে যাওয়া প্রেমের ছন্দ প্রবল চমক লাগিয়ে দেখা দিল। স্মৃতিলোকের এক তীব্র আলোকের সুতীক্ষ্ণছটা তীরের মত এসে বিঁধে গেছে সেখানকার চঞ্চল দৃষ্টিতে।

পঁচিশ বছরের মধুরিকা যুবতী এই সময়েতেই তার অধ্যাপিকার জ্ঞানের জগত থেকে পেছিয়ে গেল বহু পেছনের দিকে।

তারপর পেছুতে পেছুতে এসে দাঁড়াল এক লাস্যময়ী সবুজ প্রাণের কাকলি-মুখর মেয়ের অফুরন্ত উদ্দাম তরঙ্গের মধ্যে। তা হলো পেছনের দিকে ফেলে আসা পাঁচ বছর আগের পুরনো কথা।

আজ এক রকম তা ইতিকথা।

অস্তাচলের পথে সূর্য তখন শেষ বারের মত আর কয়েকটা মিনিটের জন্য তার রক্তাভ সোনালী আভাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে কোন এক অদৃশ্য যাদুকরের মায়াজাল সৃষ্টি করে। ঐ মায়াজালের মায়া-কারাগারে বন্দী হয়ে থাকল বৈকালী রাগের অঞ্জন মাখা চোখের চঞ্চল দৃষ্টিপাত।

সুপ্রিয়া খোলা জানালার ভেতর দিয়ে দেখতে পেল—সূর্যের ঐ রক্তাভ সোনালী আভার ভেতর থেকে দেখা দিচ্ছে এক সুস্মিত কান্তি, হাসিতে উজ্জ্বল, নব যৌবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা চির-সুন্দর পথিক যুবক—কোন বহু প্রতীক্ষিত ও পরম আকাঙ্খিত কল্পনার রাজপুত্র!

—কিন্তু ঐ মূর্তি বড় আবছা বলে মনে হচ্ছে সুপ্রিয়ার। চশমা ছাড়া চোখ নিয়ে জোর করে ঐ আবছা ভাবকে স্পষ্ট করে দেখবার প্রয়াস থাকায় দৃষ্টি ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল। চোখ আর এখন কি জানি তার দৃষ্টি মেলে দিয়ে তাকিয়ে থাকতে পারছে না। সূর্যের ঐ রক্তাভ সোনালী আভা তীব্র হয়ে দৃষ্টিপথে বাধা সৃষ্টি করছে। চোখ আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে এলো সুপ্রিয়ার।

চোখের দৃষ্টি বন্ধ হল ;—কিন্তু খুলে গেল তার হৃদয়ের চোখ।

পদ্ম ফুলের একটি একটি করে ফুটে ওঠা পাঁপড়ির মতন সুপ্রিয়ার হৃদয়ের চোখ একটু একটু করে খুলতে খুলতে তার সমস্ত দৃষ্টিকে মেলে ধরল সূর্যের ঐ রক্তাভ সোনালী আভার মধ্যে দেখা দেওয়া স্মিত রূপের ব্যঞ্জনাময়, যৌবনের পথিক-পুরুষের প্রতি।

রক্তাভ সোনালী আভার ঐ পথিক পুরুষ পাঁচ বছর আগে ছিল না আজকের মনে দাগ কাটা কল্পলোকের রূপ-দর্শন রাজপুত্র। সে ছিল পাঁচ বছর আগে নানান রঙীন স্বপ্ন মাখা বিশ বছরের এক উদ্দাম সুখ। সে সুখের নাম অরিন্দমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রেসিডেন্সীর এক নামী ছেলে। এক দামী ছেলে।

ঝাপসা চোখের মধ্যে জ্বালা অনুভব করলো সুপ্রিয়া। সে জ্বালার আধার প্রেম। আর তা হল যৌবনের জ্বালা।

তাই বলে এর মধ্যে এখন উত্তাপ নেই। আর ছিল না সে রকম কোনও একটি তপ্ততা সেই পাঁচ বছর আগেও। এই মুহূর্তেও সুপ্রিয়ার মধ্যে এক অপরূপ হিমেল বাতাসের শীতল পরশে সে জ্বালা হয়ে উঠেছে কোমল সুন্দর।

বৈকালী রাগের নরম অঞ্জনকে সে ছুঁয়ে আছে।

এক বিদ্রোহী যৌবনের ছুটন্ত প্রগলভ সুখ ফিরে এসে পঁচিশ বছরের কুমারী অধ্যাপিকার বন্ধ চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে অশ্রুকণার বৃষ্টি ঝরান আরম্ভ করলো। মাথা নীচু করে অশ্রু-ধারাকে রোধ করবার জন্য চোখেতে আঁচল চাপা দিল সুপ্রিয়া।

রুমঝুম কোরে পুরোনো কাহিনী দোদুল ছন্দে এলোমেলো করে দিতে চাইল মঞ্জুলা মেয়ে সুপ্রিয়ার সব রকম বিহ্বলতাকে।

পাঁচ বছর আগের কাহিনী এখন প্রবলভাবে আলোড়ন তুললো সুপ্রিয়ার নিথর মূর্তির আনাচে কানাচে…

…সেদিন প্রেসিডেন্সীর ছেলে-মেয়েদের ভেতরে সুপ্রিয়া ছিল রূপ-সৌন্দর্য্য-সুষমার একটি নিঁখুত মডেল।

সেই অপূর্ব সৌন্দর্য্য একদিন জানতে পারল—সে ভালবেসেছে এক শ্রেণী উঁচুতে পড়ে, চতুর্থ বৎসরের অরিন্দমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সে লাজাঞ্জলি দিয়ে ভালবেসেছে এক ক্ষমাসুন্দর যুবকের সবুজ জীবনকে।

—যে ছেলে এক অপূর্ব সুস্মিত হাসির মধুময় ছন্দকে গাঢ় সবুজ রঙে ছাপিয়ে রেখেছে আপন প্রাণের বিশ বছরী দীপ্ত যৌবনের আকাঙ্খাগুলোকে।

তাই শেষ পর্য্যন্ত নানান রঙীন স্বপ্ন মাখা অরিন্দমকুমারের বুকের উদ্দাম সুখের মধ্যে বন্দী হলো মায়া কাজল লেপা, আবেশ ছড়ান যৌবনের শ্যামল-শুচিশুভ্র যাত্রা পথে এসে দাঁড়িয়ে থাকা সুপ্রিয়া। মধুর মেয়ের চঞ্চল উর্মিমুখর জীবনের উনিশটি বছরের ছুটন্ত প্রেমের স্বপ্ন-সুখ জড়িয়ে গেছে।

আটক হয়ে এভাবে সুপ্রিয়ার উচ্ছল যৌবনের পূর্ণ তনুর মাধুর্যভার নিশ্চিন্তে ছোট মেয়েটির মতন আদর করে আবদার করে মাতিয়ে রেখেছিল অরিন্দম-কুমারের বুকের উদ্দাম সুখের শিহরণগুলোকে।

প্রেম চললো তার নিজের সচল গতিবেগ নিয়ে।

কোন ছুটির দিন দেখা গেল মার্লিন পার্কের সুপ্রিয়াদের ছবির মত দোতলা বাগান বাড়ীটির গাড়ী বারান্দার নীচে এসে ব্রেক কষে থেমে যায় বেলভেডিয়ার রোডের 'ইন্দ্রপুরী' ভবনের বিচারপতি রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোলস্ রয়েস্।

গাড়ী থেকে নামে রমেশবাবুর একমাত্র সন্তান অরিন্দমকুমার। রমেশবাবু প্রায়ই এখানে আসেন। আত্মীয় না হলেও এই মার্লিন পার্কের বাড়ীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিকটতম আত্মীয়ের চেয়েও প্রগাঢ়। কারণ সুপ্রিয়ার বাবাও হলেন একজন অনারেবল জাষ্টিস এবং এক সঙ্গে হাইকোর্টে যাওয়া-

আসায় আগেও বিচারপতি রমেশ ও বিচারপতি বীবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিলেতে থেকে একই সময়ে লিঙ্কনস্ ইন্ থেকে ব্যরিষ্টার হয়ে বার হন। অবশ্য বীরেন্দ্রবাবু মাত্র বছরখানেক হল বিচারপতি হয়েছেন। ঐ দিক থেকে একাদিক্রমে দীর্ঘ দশ বৎসর ধরে রমেনবাবু বিচাবপতিব বায় দিয়ে আসছেন হাই কোর্টের বিচার ব্যবস্থায়।

শুধু এইটুকুই নয়। আবো আছে। সেটুকু হলো এই।

অরিন্দমকুমার তাব মেম্ মায়ের সন্তান। দশটি বছরেব যখন সে, সে সময় এক কঠিন অসুখের কবলে পডে তাব মেম্-মা ছেলেব ওপব থেকে সমস্ত বকম মমতা কাটিয়ে উঠে পবলোকে চলে যান। সেই থেকে আজও পবিচয় বহন করে চলল অবিন্দমকুমার এক মা হারানো ছেলেব ভূমিকায়। আব বমেশবাবু হয়ে থাকলেন মৃতদাব। কাবণ বাবা আর ছেলে, দুজনের কেউই পবলোকগতাকে একটু ভুলতে প্যারেন নি। স্ত্রী এবং মা হিসাবে আজকেব অনুপস্থিতা যিনি, মেম্ হয়েও কোন অংশে আদর্শ হিন্দু বমণীব চেয়ে একটুও কম ছিলেন না।

এ ভাবে মেম্-মা অরিন্দমকুমারকে একলা ফেলে বেখে গেলেন। দশ বছরেব অরিন্দমকুমার তখন দেখতে ছিল একটি ছোট্ট মতন রাজপুত্র।

—তার সৃষ্টির উৎস হল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, দুই ধাবার দুইটি শোণিত-বিন্দুর 'মিলিত ছন্দ হোতে। দুই বিদেশী রক্ত-ধাবাব মিতালি-সুন্দব ছোট অরিন্দম-কুমারের মায়ের অভাব মেটাবার জন্য এগিয়ে আসেন সুপ্রিয়ার মা আপন স্নেহেব ছায়া বিস্তার করে। সেই ছায়ার ভেতবে আশ্রয় পেয়ে শান্ত হল মা হারানো ছেলেব কাঁচা মনেব ছোট-খাটো আবদারগুলো। তারপব থেকে বয়েস বাডাব সঙ্গে সঙ্গে অবিন্দমকুমারেব মনেব আবদাব কমতে কমতে এখন প্রায় কমে এসেছে। মার্লিন পার্কের বিচারপতি মুখোপাধ্যায়েব ছবিব মত মনোবম বাড়ীতে প্রতিনিয়ত যাতায়াত লেগে থাকল বেলভেডিয়াব বোডের অপব আব এক বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র সন্তান অরিন্দমকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

এই নিয়মের কোন বকম ব্যতিক্রম না করে আরো দশটি বছবেব মত একটা দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হয়েছে। এখনও সেই নিযমেই চলছে। মার্লিন পার্কের মায়ের সেবা-যত্নে ভরে উঠেছে অরিন্দমকুমারেব বিশ বছরের যৌবন। শরৎ কালীন প্রভাতের প্রথম মঙ্গলরাগের স্পর্শ এসে লেগেছে রূপদর্শন যুবকেব বিশ বছরী প্রাণের তন্ত্রীতে। তার এখনকাব সবটাই পরশিত হয়ে আছে মার্লিন পার্কের স্নেহময়ী মায়েব গরিমাযুক্ত শুভ্রোজ্জ্বল আদুরে আভায়।

এতদিন এক নিয়ম মেনে মার্লিন পার্কে চলে এসেছে অরিন্দমকুমার তার হারানো মায়ের কাছ থেকে ছিটকে যাওয়া সব আদর-যত্নকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। সুপ্রিয়ার আদুরে মায়ের ছায়াময় স্নেহনীড় থেকে আপন মা'কেই ফিরে পেয়ে ধন্য হয়ে উঠেছে তার আজকের সমস্ত সত্বা।

কিন্তু এতদিন পরে বিশ বছরের যৌবন হঠাৎ অন্য কিছু অনুভব করল মার্লিন পার্কের এক রহস্যময়ী বরনারীর আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া আবেগচঞ্চল প্রকাশ মূর্ছনায়।

সেই বরনারী একদিন তার উনিশটি বাসন্তী পূর্ণিমার পূর্ণ জ্যোৎস্নার শোভায় স্নাতা হয়ে এসে ভর্তি হল প্রেসিডেন্সির কলা বিভাগের তৃতীয় বছরে। আর সেই মুহূর্তে রূপকথার কোন এক কন্যার মঞ্জু-বিকচ কুসুমরূপের হঠাৎ আলোর ঝলকানি খেয়ে ঐ প্রেসিডেন্সিরই চতুর্থ বছর কলার এক বিশ বছরী যৌবন কেঁপে যাওয়ায় চিনতে দেরি হল না অরিন্দমকুমারের,—এই কন্যা মার্লিন পার্কেরই বরনারী সুপ্রিয়া। তাই দেখে তার হৃদয় অপরূপ শিহরণে নেচে গেল বর্ষা ঋতুতে অভিসারে আসা ময়ূরীর সঙ্গে এক হবার আশায় ময়ূরের রঙীন পেখম তুলে ধরে আনন্দ নাচ্ নাচার মতন।

—সেদিনই সুপ্রিয়া তার বহু প্রতীক্ষিত প্রিয়দর্শন অরিন্দমকুমারের সান্নিধ্যে এসে পরিপূর্ণ করে লুট করে নিল একটি সুন্দর ছেলের বিশ বছরী সবুজ যৌবনকে আপন প্রেমের মুঠো মুঠো মাধুরীরাগ ছড়িয়ে দিয়ে। কল্ কল্, ছল্ ছল্ স্রোতস্বিনী নদীর মতন প্রেমের রবাব তুলে সুপ্রিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে অরিন্দমকুমারের বুকের উদ্দাম সুখেতে নিজের ছোট্ট নীড়টুকু বাঁধবে বলে।

—ভালোবাসার ছুটন্ত স্বপ্ন নিয়ে সত্যি মার্লিন পার্কের অনারেবল জাস্টিসের মেয়ে নীড় বাঁধল বেলভেডিয়ার রোডের অপর এক অনারেবল জাস্টিসের একমাত্র আদরের ছেলের প্রীতি-ঘেরা বুকেতে। অরিন্দমকুমারের বুকের উদ্দাম সুখের কঠিন বাঁধন আবেশে মর্মরিত করে তুলতে লাগল সুপ্রিয়ার যৌবনের মায়ারাগ রঞ্জিত দেহমনের খুশীকে।

—আজকাল আগের নিয়ম মতই ছুটির দিনে মার্লিন পার্কে আসে

অরিন্দমকুমার। বাবা অনারেবল আর-সি-র সঙ্গে করে এলে আসে রোলস্ রয়েসে চরে। একলা এলে নিজের হাতে চালিয়ে আনে ছোট ফোর্ডখানা। ফোর্ড চালিয়ে একলাই বেশী আসে এখানে অরিন্দমকুমার।

আজ কাল মার্লিন পার্কের মায়ের কাছে তার আসা-যাওয়ার ব্যাপারটা হল গৌণ। আর আসল হল সেই সুন্দর মতন দোতলা বাড়ীর মধুরিকা মেয়ে সুপ্রিয়ার কাছে অরিন্দমকুমারের আসাটা। যে মেয়ে প্রতিনিয়ত এক একদিন এক এক রঙের নয়নাভিরাম শাড়ীতে আর সাজেতে নিজেকে ইতিহাসের পদ্মিনী করে তোলে। আনন্দমুখর খিল্ খিল্ হাসিতে উপছে পড়া অবস্থায় গুনগুন করে মধুর গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়ায় বাড়ীর পেছনের বাগানেতে এক রূপদর্শন ছেলের আসার অপেক্ষায়। যার বুকের ভেতরে মুহূর্তে মুহূর্তে অনুরণন জাগতে থাকে ঐ ছেলেটির কাছ থেকে আর কতক্ষণে ভালবাসার পুলক দেওয়া সুখগুলোকে নিজের মধ্যে দয়িতের উষ্ণ পরশ পেয়ে লুট করে নিতে পারবে। আর সে জন্যে সেই মেয়েটির এই সুন্দর ইচ্ছাটুকু ভরে থাকে তীব্র ব্যাকুলতায়।

—এরই মধ্যে এই দেখে মার্লিন পার্কের মা বাবা দু জনেই খুব খুশী হয়ে পড়েছেন। না হয়ে উপায় নেই। কারণ অরিন্দমকুমারের মত ছেলে লাখের মধ্যেও একজন মেলে কিনা সন্দেহ। যারা তাকে চেনে, সে সকলের চোখেতে রূপে ঐ ছেলে কল্পলোকের রাজপুত্র। আর গুণে প্রেসিডেন্সির সেরা রত্ন। তাই একদিন মার্লিন পার্কের মা-বাবা এই নিয়ে এসে আলোচনা করে গেলেন বেলভেডিয়ার রোডের অনারেবল জাস্টিসের সঙ্গে। রমেশবাবুও এ বিষয়ে এক মতাবলম্বী। তাঁর মতে সুপ্রিয়ার মত অসাধারণ রকম মিষ্টি মেয়েই উপযুক্তা। সেই পাবরে অরিন্দমকুমারের সঙ্গে মিলে নিজেদের জীবনকে অনন্ত মধুর করে তুলতে। তাদের এ মিলন হবে আদর্শ রকম।

তারা ঠিক করলেন আসছে বছরের ফাল্গুনের প্রথম লগ্নেই এক করে দেবেন দুটি সবুজ যৌবনের প্রতীক মাধুর্য্য—একটি ছেলে ও একটি মেয়ের মঞ্জুল প্রেমের উভয় সত্তাকে।

—দেখতে দেখতে এভাবে এক একটি দিন করে পুরো একটি বছর কেটে গেল। অরিন্দমকুমার পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়ে প্রেসিডেন্সি ছেড়েছে। সম্মানিত হয়েছে সকলের মধ্যে থেকে প্রথম হওয়ার কৃতিত্ব নিয়ে। সুপ্রিয়া এখন চতুর্থ বছরে।

—এর কয়েক দিন পরের ঘটনা। দয়িতের কৃতকার্য্যে সুপ্রিয়ার দেহ-মন

তখন আনন্দ যুক্ত গরিমায় আচ্ছন্ন। এমনি এক দিন সুপ্রিয়ার জীবন কল্পনাতীত ভাবে হয়ে ওঠে সুতৃপ্তা। রভস মুখর হয় তার আনন্দের যত মিষ্টি সুখ। আর গরিমা রঞ্জিত হয়ে ওঠে হৃদয়ের বিহ্বল রাঙা যত খুশী।

—সেদিন অন্যদিনের মতই কলেজ থেকে বাড়ী এসেই সুপ্রিয়ার সমস্ত মন হিল্লোল তুলে আনচান করে গেল অরিন্দমকুমারের উপস্থিতিতে। অনেকদিন হ'ল এক সঙ্গে তারা বাইরে বেড়াতে যেতে পারে নি। আজকে তা হ'লে নিশ্চয়ই তারা বেরুবে। এক সঙ্গে বেড়ানোর এক অদম্য ইচ্ছা পেয়ে বসল সুপ্রিয়াকে। চেনা-শোনা জনের মধ্যে কেউ হয় ত অমন জায়গাটিতে তাদের দুজনের মতই ঘুরে বেড়াতে এসে দেখে যাবে, মার্লিন পার্কের মেয়ে বেলভেডিয়ারের ছেলের হাতে হাত রেখে চলার তালে তালে পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছে ময়দানের নির্জন প্রান্ত ধরে দুর্গের দিকে, যেখানে তাদের সৌখীন গাড়ীখানা পার্ক করা রয়েছে। ঐ চেনা জন হয় ত মনে মনে একবার ভাববে, সুপ্রিয়া কত লজ্জাহীনা। তাই না নিজের মতন এক নিলাজ ছেলের বুকের সবুজ সুখকে মদিরা স্রোতে অবগাহন করিয়ে নিজেকেও সুপ্রিয়া হতে দেয় খুশীয়ালিনী।

—ঐ কথা ভাবতে ভাবতে সুপ্রিয়া দোতলায় নিজের ঘরে চলে এল। তর্ তর্ করে শ্বেত পাথরের মসৃণ সিঁড়ির এক একটি ধাপ পার হয়ে এসেছিল স্লিপারের শপ্ শপ্ শব্দ তুলে কোন এক চাঁদনী রাতে প্রিয়জন মিলনে আবেগ-মুখর হরিণীর মৃদুল ছন্দ নিয়ে। মা এতক্ষণ তার ঘরেতে অরিন্দমকুমারকে বসিয়ে রেখে গল্প করছিলেন। সিঁড়িতে মেয়ের আসার শব্দ পেয়ে তিনি ঘর থেকে বারান্দায় এলেন। মুখো-মুখী অবস্থায় পড়ে গেল মা আর মেয়ে। দুজনেরই মুখ হাসিতে মুখর। মায়ের মুখের হাসি থেকে সেই মুহূর্তে মুঠো মুঠো লজ্জাকণা এসে ছাপিয়ে গেল মেয়ের হাসি মুখের খুশীকে। সুপ্রিয়া হেসে ফেলে বারান্দার মোজাইক করা মেঝেতে চোখের দৃষ্টি নামিয়ে নিল।

মা হেসে বললেন— অরিন্দমকে তোমার ঘরেই বসিয়েছি। অনেক আগেই এসেছে। ওর কাছে বসে কথা বলে বিশ্রাম কর গিয়ে। আমি এদিকে তোমাদের খাবারের ব্যবস্থা করি। ও কি হ'ল মা, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে। যাও, অরিন্দম একলা বসে আছে। ও বুঝেছি, আমি বললাম বলে বুঝি লজ্জা হচ্ছে। দাঁড়াও এই ফাল্গুন এলেই আমি তোমার লজ্জা ভাঙ্গাব।—এই কথা বলতে বলতে

মেয়ের কাছে এসে চিবুক ধরে আদর করে নিয়ে বারন্দা ঘুরে চলে গেলেন অন্যদিকে।

মায়ের চলে যাওয়ার দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে নিজের ঘরের সামনে এল। অন্যদিন হ'লে তার নিজের অনুপস্থিতিতেও অরিন্দমকুমারকে নিয়ে মুখর হয়ে থাকত হয় দাদা, নয় বৌদি অদিতি, আর নয় ত ছোট বোন সুমিতা। কখনও বা তিন জনেই এক সাথে গল্পে মেতে থাকত তার মনের মধুর খুশীর সঙ্গে। আজ তাদের তিনজনেই গেছে কোন একটা সিনেমা দেখতে। তাই সেই খুশী ছেলেটির অবস্থা এই একটু সময়ের জন্য অন্ততঃ হয়ে আছে বড় বেশী নিশ্চুপ। আর দেরি করা চলে না। সুইস্ সিল্কের রঙীন পর্দা সরিয়ে পা টিপে ঘরে এসে দাঁড়াল। অরিন্দমকুমার তার দিকে পেছন দিয়ে চেয়ারে বসে আছে। বোধ হয় কোলের ওপরে একটা বই রেখে পড়ছে। তাই তার মাথা সেদিকে একটু ঝুঁকে আছে। সুপ্রিয়ার চোখমুখ তখন সুন্দর হাসিতে ছোপান। বিছানার ওপরে কলেজের বই-খাতা রেখে আস্তে করে চেয়ারের পেছনে এল। অরিন্দমকুমারের চোখ দুটো টিপে ধরল হাত দিয়ে। সুপ্রিয়ার কোমল হাতের শীতল স্পর্শ চোখেতে পেয়ে বই বন্ধ করে টেবিলের ওপরে রেখে দিল। দু হাতের মুঠোয় করে তার হাতের নরম শিহরণকে চেপে ধরে বলল অরিন্দমকুমার—তুমি। এই এলে।

চোখ ছেড়ে দিয়ে সুপ্রিয়া তার গলা জড়িয়ে ধরে গালেতে নিজের মুখের একাংশ ঘনিষ্ঠভাবে স্পর্শ করে বলল—হ্যাঁ। এই এসেছি। তোমার সুখ তোমাকে অনেকক্ষণ একলা করে রেখেছিল। তাই না?

—না। এই ত আমার কাছেই তুমি। সুখ ত আমার হাতেই ধরা পড়ে আছ নিজে থেকে।

অরিন্দমকুমার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘুরে দাঁড়াল সুপ্রিয়ার দিকে। তার পরনে আজ ধূপছায়া রঙের একটা নতুন সুট। বুকে ঝুলছে লাল টাই। তার মধ্যে সোনার চেন ক্লিপে করে আটকান।

কাছে টেনে নিল সুপ্রিয়াকে হাতে ধরে অরিন্দমকুমার। বলল—সুপ্রিয়া।

নিজের কানেতে নিজের নাম আরো গাঢ় অনুভবের পরশ পেয়ে শোনবার জন্য সুপ্রিয়া মুখের হাসি মাখা অধর যুগলে মৃদুল সুখের কাঁপন জাগিয়ে রেখে বলল—সুপ্রিয়া আমার নাম। কিন্তু তোমার আমি প্রিয়া।

অরিন্দমকুমার এক হাতে তার চিবুক ধরে আদুরেগলায় উচ্চারণ করল—*প্রিয়া!*

ঐ ভাবে ডেকে হাসির জোয়ারে ভেসে গেল অরিন্দমকুমার নিজে। কঠিন বাহুর মধ্যে রেখে সজোরে বুকেতে আটকে রাখল সুপ্রিয়াকে।

আকস্মিক একটা লজ্জার ভাব প্রকাশ পেল সুপ্রিয়ার নারী দেহের সর্বত্র। ইচ্ছা হল নিজেকে প্রিয়জনের কঠিন আলিঙ্গনের বন্ধনী থেকে ছাড়িয়ে নিতে। কিন্তু ইচ্ছা হলেও নিজে থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার কোন শক্তি পেল না। শুধু বলল—ছিঃ অরিন্দম ; মা দেখে ফেলবে। লক্ষীটি আমার। এবার ছাড়। বাইরে বেরিয়ে যত ইচ্ছা দুষ্টুমি করব। এখানে নয়। আমরা মেয়ে। লজ্জা পাই বাড়ীতে অন্য কেউ থাকলে।

কথা বলল ঠিকই। তবে, নিজেই কিন্তু অরিন্দমকুমারকে ছেড়ে দেবার কোন রকম ইচ্ছা দেখাল না। মনের খুশী ছেলেটির আলিঙ্গনের মধ্যে তপ্ততার ছোঁয়াচ পেয়ে সুপ্রিয়ার বুকের সমস্ত উদ্বেল ভাব ছুটন্ত সুখ হয়ে নেচে চলেছে। নিজের নরম হাতেও শক্ত করে ধরে রেখেছে তার দয়িত পুরুষের যৌবন-স্নিগ্ধ বুকের সবুজ স্বপ্নকে।

অরিন্দমকুমার বলল—প্রিয়া। এখন বেড়াতে যাবে।

আবেশে ভরা গলায় বলল—যাব। নিশ্চয়ই যাব। অনেকদিন হল তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাই নি। একটু পরেই বেরুব, অরিন্দম। নিজের পোশাক আগে বদল করে নেব একটু।

—কিন্তু কোন্ ধরনের পোশাকে নিজেকে সাজাবে মনে আছে?

অরিন্দমকুমার ঐ কথা বলে একটু দুষ্টু হাসি হাসল।

—একশ' বার মনে আছে অরিন্দম। পরতে হবে আমাকে তোমারই ফরমায়েসী সাজ-সজ্জা।

আর একবার সুপ্রিয়ার চিবুক ধরে আদর করল অরিন্দমকুমার। বলল—বড় লক্ষী মেয়ে তুমি। তাই না?

—ও সব বুঝি না। তুমি আমায় যা করতে আদেশ করবে, আমি তাই তখনি করব। ভাল-মন্দের ভার সব তোমার ওপরে।

বলতে বলতে সুপ্রিয়ার সুন্দর অজন্তা ছাঁদে তৈরি ঠোঁটের বাইরে বেরিয়ে আসছে মুক্তো-শুভ্র ঝক্‌মক্ হাসির আনচান করে তোলা হল্লোড়। তুল্‌তুলে নরম গালেতে হাসির দাপটে টোল খাচ্ছে। সেখানকার দুধে-আলতা রঙ টোল খেয়ে মিলিয়ে যাবার সময় আরো রঙীন হয়ে উঠছে।

—প্রিয়া ; যা বলব, করবে তাই?—অরিন্দমকুমারের চোখের দৃষ্টি রয়েছে

সুপ্রিয়ার চোখের মঞ্জুল রূপের স্নিগ্ধতায়। ও চোখ দুটোর কাজল রঙে যেন রয়েছে কবি-কল্পিত অনেক অনেক বছর আগেকার বিদিশা নগরীর কোন এক দিনের জ্যোৎস্না-স্নাতা রূপোলী সন্ধ্যা।

সুপ্রিযা বলল—হ্যাঁ, করব তাই।

—আচ্ছা আমি যদি তোমায খাবাপ কিছু করতে বলি! তবুও কি তাই করবে?

মুক্তো-শুভ্র হাসি সুপ্রিযাব দুধে আলতা বঙেব জৌলুসকে অপূর্ব রকম শুচিশ্রী করে তুলেছে এই মুহূর্তে অবিন্দমকুমাবেব কথাব উত্তব দেবাব সময়।

—হ্যাঁ, অবিন্দম; খাবাপ কিছু যদি আমাকে কবতে আদেশ কব তুমি, তা হলে জেনে বাখ, নিশ্চযই আমি তা কবব।

—তুমি কাজটা খাবাপ হলেও তা কববে, প্রিয়া! কিন্তু কেন?

অবিন্দমকুমাবেব ভেতবে একটা বিস্ময-সূচক ভাব জেগেছে। তার নিবৃত্তি যেন এখনি চাই।

চোখের রূপোলী সন্ধ্যাব স্নিগ্ধ বাগে রাঙিযে দিল অবিন্দমকুমারের মনকে কথার উত্তর দিতে যাবাব মুহূর্তে। তার মনের বিস্ময ভাঙতে লাগল চিরন্তনী প্রিয়ার মাধুর্য ভরা গর্বিত কথার উজ্জ্বলাভায।

- কেনব উত্তর তোমাব নিজের মনেতেই আছে। তবু অবিন্দম, আমায় যখন প্রশ্ন করেছ, উত্তরটাও তখন আমার কাছ থেকেই পাবে।

থামল একটু সুপ্রিয়া। একটু ছেদ টেনে নিল পরে বলবার কথার জন্য। ওরই মধ্যে দেখে নিল তাব মনের খুশী অবিন্দমকুমারের বিস্ময়-বিহ্বল চোখের পলক শূন্য চাহনির দিকে। শান্ত রূপটি নিয়ে তার দৃষ্টি সোজা ভাবে ঠিক্‌রে পড়ছে ঐ ছেলেটিরই প্রেমিকা সুজনার মায়াঞ্জন চোখের রূপসাগরে।

বলল সুপ্রিয়া কথার পূর্ণ ছেদ টেনে দিতে গিয়ে—অরিন্দম; তুমি করাচ্ছ বলেই আমি তা করব। তুমি কেবল আমায় ভালবাস বলেই আমি তোমার কথা মেনে কাজ কবতে বাধ্য। ভাল-মন্দের বিচারের ভার ত বলেছিই সব তোমার ওপরে।

—কিন্তু খারাপ কাজ করলে যদি তোমার বদনাম হয়, তখন?

—তখন।—বলে হেসে ফেলল সুস্মিত ছন্দে। বিহ্বলার মুখের মুক্তো-শুভ্র রূপ ঝলসানো সুজনার নারীপ্রেমকে আবির রঙে রাঙালো।

—অরিন্দম, তুমি ভুলে গেছ আমাদের আসল পরিচয়কে? আমাকে বাদ

দিয়ে কি তুমি তোমার সত্বাকে আলাদা করে নিতে পার? যদি না পার, তা হলেই ত তোমার মনের সমস্ত বিস্ময়ের সুসমাধান হযে যায়। আমি যদি তোমার দেখানো কোন খারাপ কিছু কাজ করে লোকের কাছ থেকে বদনাম পাই, তা হলে তুমি কি ভেবেছ, সে রকম দুর্নামের হাত থেকে নিজে ছাড়া পাবে? আমায় যখন লোকে দুষবে, তখন তোমার নাম করেই তা করবে। বলবে অমুকের বাগদত্তা তমুক কাজ করেছে। ঠিক বলি নি?

সেই মুহূর্তে তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অরিন্দমকুমারের দেহ-মনকে পরিপূর্ণ ভাবে আশ্রয় করে কোন অজানা অভিসারের আনন্দ-পুলক রিমঝিমিয়ে উঠল। রোমাঞ্চের অসংখ্য ঢেউ সুন্দর উপলব্ধির জোয়ারে অস্থির করে কাঁপিয়ে তুললো। নিজের হাতের কঠিন বাঁধনের মধ্যে বন্দিনী সুপ্রিয়ার মধুরিকা সত্বার সঙ্গে মিশে যেতে চাইল।

আর কিছু বলতে চাইল না অরিন্দমকুমার সুপ্রিয়ার মধ্যেকার এক জাগ্রত সত্বার পরিচয় পাওয়ায়। শুধু বলল—কিছু না। চল, আর দেরি করো না। লক্ষ্মী মেয়েটির মত তাড়াতাড়ি করে আমার ফরমায়েসী পোশাকেই সেজে এসো।

বাঁধন খুলে সুপ্রিয়া হাসতে হাসতে চলে যায় সাজ-পোশাক বদল করতে। বলে গেল—তুমি একটু বসে না হয় বই পড অরিন্দম। আমি এখনি আসছি।

ফরমায়েসী পোশাকে সাজ-গোজ সেরে কিছু পরে সুপ্রিয়া এসে দাঁড়াল অরিন্দমকুমারের কাছে। নিজের মনের মত করে সাজ করে আসা সুপ্রিয়াকে দেখতে দেখতে তার মুখের হাসি নেচে উঠল আনন্দে। তার ফরমায়েসী সাজে সাজার ফলে সুপ্রিয়ার সমস্ত দেহ-রূপ ছাপিয়ে আগুনের রঙ জ্বল জ্বল করে উঠেছে। লালাভ রঙ্গীন মোলায়েম শাড়ী আর ব্লাউজ। অপরূপ মসৃণতার দরুণ শাড়ীর লালরূপ ঝকমকিয়ে তুলেছে শরীরের নরম পেশল যৌবনের রাগলতাকে। ব্লাউজখানার পিঠে, গলায় ও হাতায় সোনালী জরির চওড়া মতন কাজ করা। চক্ চক্ করছে বেশ নয়নাভিরাম হোয়ে। এর গঠনটা একটু আঁট-সাঁট মতন। তাই আঁচলের আবরণ ছাপিয়ে আঁট জামার ভেতরকার পেশতলা আনচান করা রিমঝিমানিতে আর দুষ্টুমিতে দোদুল। প্রকটিত বুকের চরম সৌন্দর্য লজ্জারু আগুন রূপের মধ্যে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। বুকের মধ্যে দেখা দেওয়া

তরঙ্গ-দোলার ওপরে দোদুল ভাবে ঝুলছে দামী পাথর দিয়ে সেট করা অজন্তার ছাঁচে গড়া হারের লকেটখানা। লকেটের মধ্যে একটা সবুজ পান্না।—একবার লকেটখানা দুই আঙুলের মধ্যে নিয়ে পান্নার সবুজ মসৃণতা অনুভব করতে করতে সুপ্রিয়া অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বেশ ছোট্ট এক মেয়ের মতন খিলখিল করে হাসতে লাগল। অধরে ছোপানো লাল প্রবালের মধ্যে হাসির দাপট রাঙিয়ে উঠে মিষ্টি করালো অরিন্দমের মনকে। কপালে কুম-কুমের টিপ চিকচিক করছে। ডাগর ডাগর ঘন তমসাচ্ছন্ন চোখের মায়া-ঢাকা রূপকে আরো বেশী করে জ্বালিয়ে তুলেছে পাতার প্রান্তে প্রান্তে টানা চিকন কালোর কাজল রঙ। অরিন্দম তার ঐ চোখের ভেতরকার মদিরাপাশে বন্দী হলো।

শিশুর দেয়ালা হাসিতে উপচে পড়া সুপ্রিয়া বলল—এই, দুষ্টু ছেলে! কি দেখছ?

—দেখছি আমার দুষ্টু বাগদত্তাকে। এই, শোন, এদিকে এসো।

বলে হাত দুটো সুপ্রিয়ার দিকে এগিয়ে দিল। মুখেতে তার ভালোবাসার হাসি ভুর ভুর করছে।

—বুঝেছি। তোমার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলেছে। আমি আর আসছি না সরে তোমার কাছে।

এক পা, এক পা করে পেছন ফেরা অবস্থাতেই দরজার দিকে সরতে চেষ্টা করল সুপ্রিয়া। দু'এক পা সরে আর সরতে পারল না। অরিন্দমই কাছে সরে এসে ধরে ফেলে সজোরে বুকেতে টেনে নিয়ে বন্দী করল।

কোন বাধা দিল না সুপ্রিয়া। আরাম পাওয়ার সুরে বলল সুপ্রিয়া—এই পর্য্যন্তই থাক। আর এগিয়ো না। ছিঃ, তুমি বড় লজ্জা দেও আমাকে। তোমাকে ত আগেই কথা দিয়েছি বাড়ির বাইরে গিয়ে আমার ওপরে তোমার যত খুশী দস্যিপনা করতে ইচ্ছা হয়, তাই করো। আমি তাতে একটুও লজ্জা পাব না। কিন্তু, এখানে বাড়ীর মধ্যে আমার বড্ড লজ্জা করে। তুমি বাড়ীর মেয়ের অবস্থা বুঝেও কিছু বুঝতে চাও না। ছিঃ, লক্ষীটি অরিন্দম—বলতে বলতে সুপ্রিয়া অতর্কিতভাবে তার মুখের কাছে-ঝুঁকে পড়া অরিন্দমের মিষ্টি সুরভি ভরা অধরেতে হাত দিয়ে চাপা দিল। এভাবে তাকে বিরত করে বলল—লক্ষী অরিন্দম, তুমি রাগ করলে?

—দূর, বোকা মেয়ে। তোমার ওপরে কি রাগ করা যায়। চল, এবার

বেড়াতে যাওয়া যাক। বলতে বলতে অরিন্দম তার তুলতুলে গাল আদর করে টিপে দিয়ে সেখানটাকে আরক্তিম করে তুললো।

দরজার পর্দা সরিয়ে বারান্দায় আসতেই অরিন্দমের দেখা হলো সুপ্রিয়ার মা'র সঙ্গে।

তিনি বললেন—অরিন্দম, তোমরা দু জনে কি এখনি বেরুচ্ছ? সুপ্রিয় কোথায়, ঘরে?

—হ্যাঁ মা, ও ঘরেতে। এখনি বেরুব বলে ঠিক করেছি।

অরিন্দম বলতে গেলে তার মা'র পরলোকগমনেব পর থেকে এক রক সুপ্রিয়ার মা'র কাছেই মানুষ হোয়েছে। তাই 'মা' বলেই অরিন্দম তাঁবে ডাকে।

সুপ্রিয়া ঘর থেকে বাইরে এসে বলল রিমঝিমিয়ে—মা, আমি আর অরিন্দ একটু বেড়াতে যাচ্ছি। গাড়ীতে করে যাব। ভয় নেই, সাবধানেই যাব।

মা বললেন—সত্যি, ত? সাবধানে চালাবে ত?

—হ্যাঁ। সত্যি। এখন তা হোলে চলি।

—ভাল। বেড়িয়ে এসো। রাস্তা-ঘাট ভালো করে দেখে গাড়ী চালাবে কিন্তু

—'আচ্ছা' বলে দু জনেই মা'র কাছ থেকে চলে গেল।

এক তলায় নেমে এলো হাত ধরা-ধরি করে। বাইরের গাড়ী বারান্দা নীচে এসে দাঁড়াল। সেখানে অরিন্দমদের বাড়ীর নতুন কেনা ফোর্ড 'ডি-লুব সুপার' খানা নিশ্চল হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ীখানার চেকনাই দেওয়া আয়না মত স্বচ্ছ লাল রঙের দিকে তাকিয়ে থেকে দু-জনেই একটু পরে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে ফিক-ফিকিয়ে হেসে ফেলল। চোখের ইশারায় দুজনে দুধার থেবে গাড়ীর দরজা খুললো। পলকের মধ্যে ভেতরে উঠে বসলো। দুম-দা করে পর পর দুটো শব্দ তুলে দু পাশের দরজাই বন্ধ হোয়ে গেল। চালকে আসনে অরিন্দমকুমার। তার পাশে ব্যবধান রেখে বসেছে সুপ্রিয়া। গাড়ীে স্টার্ট পড়ল। মার্লিন পার্কের বাগান বাড়ীর লেনের ধার দিয়ে গাড়ী চলল। ঘুটি দেওয়া পাথরের কুচি ছড়ানো সরু রাস্তা দিয়ে গতি বাড়াতে বাড়াতে গেট পা হোয়ে সদর রাস্তায় এসে পড়লো। খোলা রাস্তা পেয়ে গাড়ী আরো জোরে ছুটে চলল। তার যাবার জায়গা হোল চৌরঙ্গী। এভাবে মাঝ রাস্তা অবধি চলে আসার পর সুপ্রিয়া মৌনতা ভাঙ্গলো কথা বলে—এই ভালো ছেলে বড্ড যে ভালো বনে গেছে দেখছি। ব্যাপার কি?

অরিন্দমের মুখে প্রগলভ হাসি। বলল—ব্যাপার কিছুই হয় নি। ভাবছি তোমায় কিভাবে দুষ্টু বুদ্ধির প্যাচে ফেলতে পারি।—কথাটুকু বলে নিয়েই সে তার বা হাত দিয়ে সুপ্রিয়ার গলাতে সুড়-সুড়ি দিতে লাগল। কিন্তু বেশীক্ষণ পারল না। সে তার বা হাতখানা নিজের দু-হাত দিয়ে ধরে ফেলেছে। হঠাৎ কি মনে হওয়ায় সুপ্রিয়া সরে এসে অরিন্দমের গায়েতে ঘনিষ্ঠভাবে গা লাগিয়ে তার কাঁধেতে মাথা রেখে বলল—অরিন্দম, কোথায় যাচ্ছ আমাকে নিয়ে, বলবে না? এই, বল। লক্ষী ছেলে।

—বলব নিশ্চয়। তবে আগে পোঁছে নেই ঠিক জায়গাতে।

—লক্ষীটি অরিন্দম, বল না একবার, কোথায় যাচ্ছ?

—লক্ষী সুপ্রিয়া, বলছি না বলে কি তোমার ভয় করছে?

—মোটেই না। তুমি কাছে আছ, ভয় কেন করব, বল।

—তবে কি, কোন রকম সন্দেহ কোরছ?

—সন্দেহ করছি! তার মানে?

—মানে জানতে চাইছ? এই ধর আমাকে।

—কি বললে, আর একবার বল ত?

—বলছি, আমাকে কি সন্দেহ কোরছ, আমার সুপ্রিয়া?

—সন্দেহ কাকে! তোমাকে কোরছি। ছিঃ অরিন্দম, তুমি ঐ কথা ভাবতে পারলে তা হোলে আমার সম্বন্ধে? তোমার মত সুন্দর ছেলেকে জগতের কেউই সন্দেহ কোরতে পারে না, এ কি তুমি নিজে জান না?

গাড়ীর গতি আস্তে করে দিয়ে অরিন্দম বাঁ হাত দিয়ে সুপ্রিয়াকে জড়িয়ে কাছে টানল, গালেতে আদর করে নিজের গাল ছুঁইয়ে বলল—সে ত ঠিকই জানি সুপ্রিয়া। আমি সুন্দর ছেলে, মানে ভালো ছেলে না হোলে নিশ্চয়ই আমাকে আজকের মতন এমন অনিন্দ্য মধুরভাবে কখনই ভালোবাসতে পারতে না তুমি?

—কি হলো, মুখ লুকোচ্ছ যে? লজ্জা পেলে?

—ধ্যাৎ। তুমি ভালো না হোলেও তোমাকে ভালোবাসতাম।

—কেন তবু ভালোবাসতে আমাকে?

—শুধু তুমি আমার তুমি বলে। তুমি শুধু তুমি, তাই।

—এ বড্ড বেশী লক্ষী মেয়ের মত উত্তর দিলে, তুমি।

—এর চেয়ে বেশী বুঝতে চাই না বলেই, বললাম।

—বুঝতে তুমি ঠিকই চাও। এটা তুমি ভালো করেই জান যে, সুন্দর সময়ে সময়ে তার খোলস বদলে অসুন্দরও হোতে পারে। জগতে যেমন সুন্দর সত্য তেমনি সত্য হোল অসুন্দরটাও। তুমি কি বাস্তবের এই সত্যকে অস্বীকার করতে পার, সুপ্রিয়া ?

—তা অবশ্য পারি না।

ঐ পর্যন্তই থাক সুপ্রিয়া, আব কিছু বলো না। ওটুকু বলতে বলতে চৌবঙ্গী রোড ধরে এসে লয়েড্‌স ব্যাঙ্কের কাছে গাড়ী থামাল। কি মনে হওয়ায গাড়ী ঘুরিয়ে ট্রাম লাইন পাব হোয়ে মাঠেব মধ্যে এনে বাখল চারধাবে নির্জন পরিবেশ। ঝি ঝি পোকা তাব রব মুখব করে তুলেছে।

ঐ নিস্তব্ধতা ভাঙ্গতে চেষ্টা করল সুপ্রিয়া—এই, শোন, লক্ষ্মীটি অরিন্দম।

কোন কথা না বলে সুপ্রিয়াকে বাঁ দিকে ঠেলে সরিয়ে অরিন্দম স্টিয়ারিং হুইলেব কাছ থেকে সবে এলো। সরে এসে সুপ্রিয়াকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে দারুণভাবে জড়িযে ধরল। তার ঘন অন্ধকার চুলের মধ্যে মুখ ছুঁইয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল অবিন্দম—সুপ্রিয়া, এই মুহূর্তে আমার মন-প্রাণ আকুল হোয়ে তোমাব কাছ থেকে যা পেতে চাইছে, অকৃপণভাবে আমাকে সেটাই পেতে দেও।

—অরিন্দম, কিচ্ছুটি বুঝলাম না। খুলে বল তুমি আমার কাছ থেকে কি চাইছ। বল, নিশ্চয়ই তা পাবে। তোমাকে কিছু দিতে সুপ্রিয়া কখনো কৃপণতা করবে না।

সুপ্রিয়ার পিঠেতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল—সুপ্রিয়া, আমি বড় নীচু হোয়ে পড়ছি তোমার কাছে। কেন জান, আমার মনে মানুষের চিরন্তন ইচ্ছা জাগছে। আজ নয়। মাসখানেক ধরেই আমি দারুণ ভাবে ভুগছি এই ইচ্ছা কি করে মেটান যেতে পারে, তাই নিয়ে। এ ইচ্ছা হলো দেহের ইচ্ছা। দিনরাত আমার শরীর ও মন এর অপ্রাপ্তিতে আগুনের মত জলছে ও পুড়ছে। এ মেটাতে না পারলে আমার সমূহ পতন-স্খলন হোতে বাধ্য। আমি বড় দুর্বল, বড অসহায় এ মুহূর্তে। সুপ্রিয়া, লক্ষ্মীটি, তুমিই একমাত্র আমাকে এর স্খলনের হাত থেকে বাঁচাতে পার। তা ছাড়া আর কেউ নয়। সত্যি, তুমি, তুমিই আমার তপ্ত দেহের অবাধ্য উশৃঙ্খল ইচ্ছাকে পূর্ণ করাতে পার। আমার মনের এই অভিলাষ দেখে কি তুমি আমাকে অবহেলা করতে চাইছ ? দুর্বল বলে কি আমাকে অসহায় ভাবে পতনের দিকেই এগিয়ে দিতে চাও ? বল,

বল সুপ্রিয়া, আমার দেহের এই প্রোজ্জ্বল আগুনকে কি তুমি নিজেকে দিয়ে নির্বাণ করাবে না? নিজের দেহের স্নিগ্ধতা উজার ক'রে কি আমার তপ্ত-তৃষিত শরীরকে ঠাণ্ডা করাবে না?

ও কথা বলতে বলতে অরিন্দম সুপ্রিয়ার কাঁধেতে হাত রেখে জোরে ঝাঁকানি দিতে লাগল আর বলল—বল, বল সুপ্রিয়া, বল একবার নিজের মুখে, যে তুমি আমাব এই অবাধ্য ইচ্ছাকে মেটাতে বাজী আছ। লক্ষীটি, একবার মুখ ফুটে জানাও তুমি তা মেটাবে কি না?—এ মুহূর্তে আমার কাছে তুমি দেবী—আর আমি হোয়ে পড়ছি অতি নীচ। অতি অধম।

সুপ্রিয়া সব শুনলো। শুনলো অরিন্দমের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা কাঁপা কাঁপা গলার কথায়। শুনে শুনে বোঝার চেষ্টা করল সুপ্রিয়া! চেষ্টা করান বুঝলো ধীরে সুস্থিরে। অরিন্দমের মনের এই অবাধ্য ইচ্ছা যা অসম্ভব রকম বেহায়া হোয়ে পাগলের মতন দিক হারিয়ে ছুটে চলেছে একটি কন্যাকুমারীকার প্রেমিক শরীরের মধ্যে জড়ানো লজ্জাকে ভেঙ্গে বিপর্যস্ত করবাব অভিলাষে—তার জন্য সুপ্রিয়া বিন্দুমাত্র কিন্তু আশ্চর্য হলো না। এমন কি বিস্মিতও না। সে জানে আজ সে বিশটা বসন্তের রূপ-সাগরে ডুব দিয়ে ওঠা যৌবনেব পলাশ রঙে ঢল ঢল যুবতী।

আনচান কোরে দোল দিয়ে সুপ্রিয়াব মনে জাগরুক হলো—এটা যুক্তি দিয়ে বোঝার বয়েস। এটা প্রেম দিয়ে রূপ দিয়ে সুধা দিয়ে কোন এক যুবকের ভালোবাসার জীবনকে ভালোবেসে সুন্দর করে সার্থক করে যৌবনের শতদলে ফুটিয়ে তোলবার বয়েস। এটা একটি ভালোবাসার ছেলের দেহগত অতৃপ্তির কামনাকে সুন্দর চোখে পবিত্র মনে কাণায় কাণায় ভরাট করে সুতৃপ্ত ও সুশান্ত করাবার বয়েস। আরো বেশী করে এটা হলো, ঐ ছেলের প্রগলভ যৌবনের মধ্যে ভালোবাসার মেয়ে হোয়ে তার মধুর আসঙ্গ লিপ্সার জন্য নিজেকে লাজহীনা আর নিরাবরণারূপে দেহেতে দেহেতে মিতালি পাতাবার আশায় এগিয়ে দেবার বয়েস।

অপার হাসিতে খিল খিল করে ভেঙে পড়ে বলল সুপ্রিয়া—হ্যাঁ, অরিন্দম। আমি মেটাব তোমার এই মধুর ইচ্ছাকে। তোমার সুন্দর অভিলাষটিকে পূর্ণ করাব নিজেকে দিয়ে। কিন্তু, কিন্তু অরিন্দম তা কি তুমি এখনি চাও। এই, এই মুহূর্তেই?—কথার শেষের কথাগুলো বলার সময় একরকম জড়িয়ে গেল

কেমন যেন একটা বাধা আসায়। তার কুমারী জীবনের সলজ্জরূপ রাঙিয়ে তুলল সমস্ত দেহরুচিকে।

সুপ্রিয়ার মসৃণ কাঁধের শিহরণ দেওয়া জায়গায় অস্থিরভাবে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল অরিন্দম—হ্যাঁ। এখনি।—এই ছোট্ট দুটি কথা ছাড়া আর কিছু উচ্চারণ করা চলল না আবেগে চঞ্চল দিশেহারা হোয়ে থাকায়।

অন্ধকারের মধ্যেই মুখ তুলে অস্থিরমতি অরিন্দমের মুখেতে খুশী হোয়ে ওঠার রভসে সুপ্রিয়া তার লালাভ ঠোঁটের মধ্যে সাজানো মিষ্টি সুখভরা চুম্বন নিবিড়ভাবে এঁকে দিতে দিতে বলল—আমি প্রস্তুত। লক্ষ্মী অরিন্দম, দেরী করো না। তোমার মনের এই সুন্দর ইচ্ছার পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য আমার দেহ-মনও বড় অস্থির, বড বেশী বেহায়া হয়ে পড়েছে। চল, লক্ষ্মীটি কোথায় তুমি আমাকে নিয়ে যাবে। ওগো, তোমার অভিলাষ মেটাতে যেয়ে আমিও বাঁধনহারা হচ্ছি।

কোন কথা বলল না দু-জনেই। নিজেকে ঠিক করে নিয়ে অরিন্দম গাডীতে স্টার্ট দিয়ে মাঠ পার হোয়ে রাস্তায় এলো। হেড লাইট দুটোকে ক্ষুধিত আগুনের মত দপ দপ করে জ্বালিয়ে রেখেছে। গাডী ছুটে এসে মিনিট দুয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পডল ব্রেক কষে একটা অভিজাত হোটেলের সামনে। রাতের অন্ধকারকে এক অপরূপ আলোকমালার মায়াজালে ফুটিয়ে তুলেছে চৌরঙ্গীর চারধারের নিওন লাইটের বাহারে রঙ। ঐ দেখতে দেখতে দুজনেরই কামনার জোয়ারে ডুব দেওয়া চোখ ধাঁধিয়ে গেল। গাডী একধারে লক্ করে হাত ধরাধরি করে দুজনেই হোটেলে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে হাসির খুশী ছড়ানো রভসে মুখর হোয়ে তর্ তর্ করে উঠে গেল। ওপরের করিডোরে উঠে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামনে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল একজন হোটেলের ওয়েটার। চোখে-মুখে তার এই নবাগত যুবক ও যুবতী কি চায় সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ভাব। এ দেখে দেখে তার এক রকম অভ্যাস হোয়ে গেছে কে কোনটা চায় বা না চায়। আজও ওদের দুজনকে দেখে তার বুঝতে দেরি হোল না। অরিন্দমের কিছু বলার অপেক্ষা না করেই সে তাদের ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বলল। নিশ্চুপভাবেই তারা তাকে অনুসরণ করে বারান্দা ঘুরে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটি তাদের জন্য এই ঘরখানি দেখিয়ে দিয়েই বিদায় নিয়ে চলে গেল।

হেসে জানিয়ে গেল পরে আবার দেখা হবে। লোকটির মুখের ঐ পেশাদারী হাসিকে বড় অদ্ভুত বলে ঠেকল সুপ্রিয়ার।

লোকটি চলে যেতেই তারা একটু ইতস্তত করবার পর ঘরের ভেতরে ঢুকলো। ঘরটি আগা-গোড়া ইংরাজী স্টাইলে সাজানো। ওর একধারে ডিভানের মত ছোট একখানা খাট। নতুন ভাজ ভাঙ্গা সাদা ঢপঢপে ভেলভেটের চাদরে ঢাকা। রঙীন কার্পেটে সমস্ত মেঝেটা মোড়া। ওপরের ঝাড়-লণ্ঠনের চারধারের এলো-মেলো আলোর ঝলক ঘরময় স্বপ্নময় কোরে তুলেছে। দেওয়ালে দেওয়ালে ডিস্‌টেম্পার রঙের ওপরে শিল্পীর তুলির কমার্শিয়াল টানে টানে আঁকা মদালসা দেহবিলাসিনী অভিসারিকাদের ছবি। চোখের মদিরেক্ষণ দৃষ্টি যেন শুধু শরীরী লিপ্সা নিয়ে ফুটে আছে। ছবিতে ছবিতে তাদের ঘন বুকের তমসা-কুহেলীর প্রকাশ লাজাঞ্জলি দিয়েছে। একদিকের দেওয়ালে ঝুলছে রূপ-জ্ঞানী জেরার্ডের আঁকা সেই বিখ্যাত ছবি—যার মধ্যে স্বর্গের শুধু পবিত্র রূপ ঝরছে ইরস নগ্ন পুরুষ রূপ থেকে, যে বরপুরুষ দেবিকা সাইকির যুবতী লজ্জাকে পোশাকের আবরণ থেকে ধীরে সুস্থিরে মুক্ত করাচ্ছে অধর থেকে অধরে তুলে ধরা চুম্বনাতিশয্যেব অজস্র বিহ্বলতায়।—সুপ্রিয়াও তেমনি এক বিহ্বলতা জড়ানো চোখের দৃষ্টিতে তা দেখতে দেখতে হয়ে পড়েছে মুগ্ধা। প্রগল্‌ভিতা। অরিন্দমও তাই দেখছে। দেখতে দেখতে সুপ্রিয়াকেও এক একবার দেখছে। ভাবছে অরিন্দম হঠাৎ—সুন্দর ইরস শিশুর অশেষ প্রবিত্রতায় ভরানো সহাস দেবিকার যুবতী ধর্মকে এভাবে স্নিগ্ধ কবোষ্ণ চুম্বনালিঙ্গনের ভেতরে আহ্বান জানিয়ে মধুরিকার মহত্ত্বকেই অভিনন্দিত করাচ্ছে। পুরুষ তার অনন্য সরল মাধুর্যে ভরা ভালোবাসার আকুতি দিয়ে রূপবতীর যৌবন অলঙ্কৃত দেহের সঘন রেখায় রেখায় পারিজাত কাননের পরাগ রেণুতে সাজিয়ে দিচ্ছে। রাঙিয়ে দিচ্ছে। লজ্জা মুক্ত করাচ্ছে। হাসি দিয়ে হাসি ফুটিয়ে তুলছে রূপধন্যার মুখেতে। চুম্বন দিয়ে দেবিকার অধরে থরে থরে সাজাচ্ছে নিজেরই জন্য ঐ মধুর প্রাপ্তি।—ঐ দেখতে দেখতে অরিন্দমের মনকে যেন ইরস বোঝাতে চাইল,—আর সত্যি কোথায় যেন সে নিজেই তা পড়েছিল বইয়ের কোন এক পাতায়—ডু নট রেপ বাট সিডিউস হার!—সত্যি, এ কি কোরতে চাইছে অরিন্দম দেবিকারই মত মধুরিকা কন্যার সঙ্গে! তার মনের সুখ আর তৃপ্তি এই সুপ্রিয়ার সঙ্গে! হঠাৎ আসা ভাবনা চুপ করিয়ে দিল তার ব্যঞ্জনা পেতে চাওয়া মনোলোকের অভিলাষকে।

কিছু বুঝতে পারলো না সে। স্থাণুর হোয়েই দাঁড়ীয়ে থাকল।—ওদিকে সুপ্রিয়া তার সহাস সলজ্জতার রক্তিমাভাকে ঝরিয়ে দিতে চাইল দেবকন্যা সাইকির মতই এই মুহূর্তে ইরস পরিচয়ে পরিচায়িত সুন্দর মনের অরিন্দমের জন্য। এ কি হোলো তার! প্রিয়তমের মন আলোড়িত করা, প্রাণকে যুবতী সঙ্গমে অবগাহন করিয়ে যৌবনের রূপসাগরে ভাসতে চাওয়া অরিন্দমকে শান্ত করাতে চাইল সুপ্রিয়া তার স্নিগ্ধতাকে লজ্জার আবরণ থেকে পরিহার কোরে। এক সাহসিকার মূর্তি তার মধুরিকা রূপকে দারুণ ভাবে দোলা লাগাল। যা কোন দিনও সে ভাবতে পারে নি, আজ নিজে থেকেই তাই কোরে বসলো। অরিন্দমের কাছে আজ তার লজ্জা মোটেই লজ্জা বলে মনে হোল না। মিথুন রূপ একদিন না একদিন ভালোবাসাবাসির যুবক ছেলে ও যুবতী মেয়েকে যৌবনের সোনা ঝরা আঙ্গিনায় এনে অন্তরঙ্গতায় পীনোদ্ধ হওয়ার সময় শরীরী লজ্জাকে একেবারে চরম অস্বীকারের মধ্যে তুলে ধরে। সুপ্রিয়া এই অস্বীকারকে মেনে নিয়েই অরিন্দমকে স্নিগ্ধ করাবার জন্য প্রস্তুত হলো। এখনো কিন্তু অরিন্দমের পেছনেই দাঁড়ীয়ে আছে সে। হঠাৎ, হ্যাঁ, সত্যি হঠাৎই যেন কেমন দোতুল-মৃদুল রবাবে মুখর-সুন্দর হোয়ে উঠল অরিন্দম। কেঁপে ওঠা ছন্দ নেওয়া শরীরে মুখোমুখী হোয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। তীব্র ঝলকিত চোখের সজল রূপ নিয়ে অরিন্দম সুপ্রিয়াকে গভীর ভাবে বুকেতে টেনে জড়িয়ে ধরলো। তখনি মধুক্ষরা মেয়ের সুমসৃণ কাঁধের ইষৎ তপ্ত ছোঁয়াচের মধ্যে মুখ চেপে ধরে মৃদুলভাবে কেঁদে ফেলল যুবক ছেলের সরল মন। ঘাড়ের পাশে নিজের অধর ঘষতে ঘষতে চোখের জলে ব্লাউজের একটি ধার সিক্ত কোরে বলল—আমি, আমি এত ছোট মনের হোয়ে পড়েছি! সুপ্রিয়া! প্রিয়া, বল তুমি ভুলে যাবে আমার এমন আচরণ কোরতে যাওয়ার কথাকে? বল, ভুলে যাবে? মনে রাখবে না?—ঐ বলতে বলতে ব্লাউজের অনেকটা জায়গাকেই ভিজিয়ে দিল অরিন্দম তার চোখের তপ্ত জলের মৃদুল হয়ে ঝরে পড়া অবস্থায়।

—ধ্যুৎ! তুমি বড় দুষ্টুমি কোরতে পার। ছিঃ, এ সব আমি শুনতে চাই না।—এই বলে মধুরিকা তার কাঁধেতে রাখা অরিন্দমের মুখের এক ধারের জলে ভেজা গালেতে কোন রকমে নিজের রভস সুখ ছড়িয়ে দেওয়া ঠোঁট লাগিয়ে তৃপ্তির স্পর্শ এঁকে দিতে লাগল।—তুমি, তুমি অরিন্দম কোন ভুল

কোরে কিছু কোরতে চাও নি। তুমি যা চেয়েছ, তা আমার কাছ থেকে তুমি নিশ্চয়ই পাবে। আমিও নিশ্চয় পেতে দেব।

শেষে নিজের স্নিগ্ধতা দিয়ে অশেষভাবে স্নিগ্ধতা-মুখর কোরে তুলেছিল অরিন্দমকে নিজেরই তাগিদে সুপ্রিয়া। দেবিকার মত মধুরিকা মেয়ে সেদিন সত্যিই তার ক্ষমাসুন্দর মনেতে আনচান করা সুন্দরী দেহের আরাম ঝরান দরিয়ায় টেনে নিয়ে সেখানকার সুশীতল রূপাভায় অরিন্দমকে বন্দনা কোরেছিল। প্রেমের রূপতৃষ্ণাকে পূজো কোরতে পেরেছিল বলে নিজেও খুব বেশী তৃপ্তা হোযেছিল দেহরতিকার আরাধিকা পরিচয়ের উচ্ছল উজ্জলাভায়।

তারপর? কেন জানি, দু'জনে একটু একটু কোরে দূরে দূরে সরে গেছিল। কেউই তার কৈফিয়ৎ একজনের কাছেও তলব করে নি। সুপ্রিয়াও না। অরিন্দমও না। কেউই না। লজ্জা? না, লজ্জা নয়। ভয়? না, ভয় নয়। ইচ্ছাকৃত? না, তা নয়। আসল কথা, বুঝতে পেরে বা চেয়ে, কেউ-ই তা বুঝতে চায় নি। এমনি। মিথুনরূপে রূপস্নান কোরেও, ভালোবাসার অশেষ প্রাপ্তির পরেও কেন এমন হোল? অরিন্দমও জানল না। সুপ্রিয়াও না। এমনি। শুধু এমনি বুঝি। ভুল? না, তা হোলেও কোন অঘটন ঘটতে পারে নি। যদিও, এটা খুব সত্যি—"অঘটন আজও ঘটে।"

' আলোড়ন তুলে সমস্ত পুরণো কথাই সুপ্রিযাকে এলোমেলো কোরবার চেষ্টা কোরেছে। সেটা সে ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে। দেবিকার মত সেদিন সে ব্যবহারে আর প্রকাশে হয়ে উঠলেও, ভুলে যায় নি সে মধুরিকা। সত্যি অরিন্দম কি ভীষণ দুষ্টুমি কোরত তার সঙ্গে! তা ভাবলে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্য হোতে হয় না। হতে হয় মদালসার মত মুগ্ধা। প্রেমবিহ্বলা। মনে এলো, প্রথম যেদিন অরিন্দম তার অধরের ওপব থেকে চুম্বন লুট করে নিয়েছিল নিজের মীন-পিয়াস মেটাতে—সেদিনই সে তার সুপ্রিয়াকে সম্বোধন কোরেছিল এই মধুরিকা নামে।

আজ এই মুহূর্তে সুপ্রিয়ার মনে হচ্ছে অভিসারিকার মত হয়ে উঠতে। পঁচিশ বছরের সবুজাভায় সমুজ্জলা যৌবন নিয়ে সে হোতে চাচ্ছে ছোট্ট মেয়ের মতনই উচ্ছল-মুখর। এখনও তার হাতের মুঠোয় নরম তুলতুলে পরশের মধ্যে ধরা রয়েছে আজকের ডাকে আসা সুদূরের লিপিখানা। মুখ থেকে লেগে যাওয়া ভেজা দাগ কাগজের ওপরে শুকিয়ে আছে। ঠোঁটের লাল পরাগ আবছা আবছা ছোপে ফুটেছে তার মধ্যে। চোখের কাজল রঙ বিন্দু বিন্দু জলের

ধারায় স্নিগ্ধতা ভরিয়ে রেখেছে। সব চাইতে এলোমেলো হয়ে পড়ছে তা
বুকের অনিন্দ্য শোভা এক একটা দীর্ঘ-শ্বাসের দমকে। মুক্তোর মত ঘামে
কণা জমে উঠেছে কপোলে, লাল ঠোঁটের ওপরে, সুমসৃণ গলায়, বুকে
বসন্ত-স্তবকে, পিঠের অনেকখানি জুড়ে। তনু পসেবে পসাহনি ভেসে যাচ্ছে
পুলক তাই জাগছে। কি লজ্জা! এ যে প্রায় চুনি চুনি ভএ কাঁচুও কাটলি।

—ত্যুৎ!—সুপ্রিয়া আড়মোড়া ভেঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—আচ্ছা, ভাল কথা, অরিন্দম তা হোলে আর মাত্র সাত দিন বাদে
এখানে আসছে। কলকাতা ছুঁয়ে একেবারে এই হাজারীবাগেই আসছে।-
ছোট্ট মেয়ের মতনই হাসিতে খুশীতে উপছে পড়ে বলে উঠল মনে মনে—ক
মজা। কত সুখ। আসছে, অরিন্দম আসছে। তারই কাছে আসছে
তারই জন্য।

লাজহীনার মত ভাবল—এবার, হ্যাঁ এবার সে নিজেই রক্তাভা ছড়া
ঠোঁটের ওপরে মুঠো মুঠো মিষ্টি পরশ সাজিয়ে রাখবে আর তা উজাড় কো
ঢেলে দেবে ঐ ক্ষমাসুন্দর মনের যৌবন-মুখর অধরে কাণায় কাণায় ভরিয়ে
তারপর? হ্যাঁ, তারপর সে অরিন্দমের কবোষ্ণ বুকের সুখকর আশ্রয়ে
মধ্যে লুটিয়ে পড়ে মিথুন রূপের অন্তরঙ্গতায় পৌছতে অভিসার করবে।

সে মধুরিকা! তবু হবে অভিসারিকা। কার মত? কার জন্য!

অরিন্দমের জন্য শ্রীমতী রাধার মত।

বরনারী সুপ্রিয়ার অধরে লাল আভামাখা হাসি ঝকমকিয়ে উঠছে
কাজল রঙীন ডাগর চোখেতে বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে। কপোলে গড়াচ্ছে হাসি
গমকে টোল। গলার নীচে বসন্ত-স্তবক থেকে উঁকি দিচ্ছে জমাট বাঁধা মুক্ত
সদৃশ স্বেদ-কণা। ঘন কালো কেশদামে বিন্যস্ত বেড়া-বিনুনী থেকে লাল রিব
বাঁধন খুলে মৃদু হাওয়ায় একটু একটু উড়ছে। সর্বোপরি তার দেহ পুলকে তৈস
জাগু। এই ত অভিসারিকার পূর্বরাগ। সুপ্রিয়া মনে মনে ঠিক কোরলো
এবার কোন অভিমান নয়। কোন রাগ নয়। এবার শুধু বহুত মিনতি জানি
অরিন্দমকে বরণ কোরবে তিল-তুলসী দিয়ে।

অভিসারিকা সুপ্রিয়া মধুরিকার মতই বাসরসজ্জায় নিজেকে সাজাবে। শ্রীরাধার মত এবার সে তার আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে প্রিয়তমকে। আর হারিয়ে যেতে দেবে না। নিজেও হার মানবে না। মহাকবি বিদ্যাপতির কথা তার মধুক্ষরা গলায় মৃদুল ছন্দে দোল দিয়ে গুনগুনিয়ে উঠল—

শীতের ওড়নী পিয়া গিরিষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥

খিল খিল হাসিতে ভেঙ্গে পড়লো সুপ্রিয়ার মধুরিকা রূপ। অরিন্দমের চিঠিখানাকে আবার আদর কোরে অধরের হাসির মধ্যে চেপে ধরে গুনগুন কোরল—

ভণে বিদ্যাপতি, শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি॥

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় ভাগ

সুহৃদয়-হৃদয় সংবাদ

সাহিত্য ভালোবাসা নায়ক-নায়িকা

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য কথাটা তিন অক্ষরে তৈরী হোলেও এরই ব্যাপক প্রকাশ ভূমার সন্ধান এনে দেয়। এ যেন বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ। তাই বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরেকার সিন্ধু আর পর্বতমালা দেখবার জন্য বহু ব্যয় করে যাওয়া সত্ত্বেও কবিসম্রাট আক্ষেপ করে বলেছিলেন—

"দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু!
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের ওপরে একটি শিশির বিন্দু।"

কি সুন্দর অভিব্যঞ্জনা! কেন না এমনি এক নিটোল ভাবনাই সাহিত্যের ধ্যান-সাধনায় সফলতা লাভে জানাতে পারে—চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ! এই চেতনা থেকেই সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা আসে স্বাভাবিকভাবে বলেই প্রথম যুগের মানসিকতা সাহিত্যের কারবারীদের সম্বোধন কোরত কবির নাম-ভূমিকায়। ভাষা ছন্দ আর কল্পনা নিয়ে যাঁরাই সৃষ্টি কাজে কারিকুরি দেখাতেন, এককথায় তাঁরাই কবি—অর্থাৎ তাঁরাই আজকের দিনে এককথায় সাহিত্যিক, এই নামের সমগ্রতার মধ্যে সমাসীন। তাই আজকের আধুনিক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আরেকবার জানাতে চাই মহাকবি শেলীর ভাষায়—Poets are unacknowledged lgislators.—আমাদের দৃঢ় ধারণা এখানে "পোয়েটস্" বলতে সাহিত্যের রূপদক্ষদের কথাই বলা হোয়েছে। এককথায় সাহিত্যিকদেরই অভিনন্দন করা হোয়েছে।

সাহিত্যিক অন্য অনেক কিছুর মতই ভালোবাসাকে ভালোবাসে সাহিত্য সৃষ্টির ভেতরে। চারটি ছোট ছোট সুমসৃণ মেজাজের অক্ষরে সাজানো কথা—এই ভালোবাসা কি তা মহাকবি শেলীর 'লাভস্ ফিলজফি'তে এক মনোরম দর্শন হোয়ে উঠেছে—

The fountains mingle with river,
And the rivers with the ocean ;
The winds of heaven mix forever
With a sweet emotion ;
Nothing in the world is single ;
All things by a law divine
In one another's mingle ;—
Why not I with thine ?
See the mountains kiss high heaven,
And the waves clasp one another ;
No sister flower would be forgiven,
If it disdained its brother.
And the sunlight clasps the earth,
And the moonbeams kiss the sea :
What are all these kissings worth,
If thou kiss not me ?

—আচ্ছা, এটা কি ঠিক নয়, এর পরে আর কিছু বলার থাকে না ?

নায়ক-নায়িকারাই হলো সাহিত্যের কর্মকাণ্ডে ভালোবাসাকে নাচের ছন্দে গানের কাকলিতে কল্পনার সুন্দরতায় ভরিয়ে তোলে। তারাই গল্পের গতি, উপন্যাসের ব্যাপকতা। এরা না থাকলে সব যেন কেমন অন্ধকার হোয়ে আসে ! উমা তপস্বিনীর বেশবাসে সেজে যাচ্ছেন মহাদেবের ধ্যান-ভঙ্গ করাতে, কুমারসম্ভবের সম্ভবনাকে সার্থক করাতে, ঠিক তখন উমা ভাষায় ছন্দে গানে আমাদের চোখের মণিকোঠায় হোয়ে উঠেছেন বর্ণনায় বর্ণনায় সমর্থা নায়িকা—

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং।
বাসো বসানা তরুণার্করাগম ॥
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা।
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥

—এই হোল নায়িকা। এই হোল আধুনিকা। এই হোল নায়কের উপস্থিতির সহাস প্রেরণা ও উৎস। এরাই গল্প-উপন্যাসের চিত্র-বিচিত্রা।

সত্য, শিব আর সুন্দরের বন্দনা করার জন্যই সাহিত্য।—আর সাহিত্যের সব চাইতে উজ্জ্বলতম আর প্রত্যক্ষ প্রকাশ কথাসাহিত্যে—গল্পে আর উপন্যাসে। আজকের দিনে পৃথিবীর সব দেশে গল্প-উপন্যাস পড়াটা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে। তবে আগের দিনে গল্প-উপন্যাস পড়ার চাইতে গল্প শোনার প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে ছিল প্রবল। তখন গল্প ছিল বনের সব পশুপাখীদের নিয়ে। তারপরে এল নীতিকথা। এরই কিছুকাল পর থেকেই দেবচরিত্র নিয়ে গল্পের সৃষ্টি হলো। তারপর ইতিহাসের পটভূমি পালটিয়ে পালটিয়ে এসে পৌঁছাল লৌকিক কাহিনীতে। দেবতারা বিদায় নিলেন। আর বাস্তবের পাত্রপাত্রীরাই হলো তখন থেকে কাহিনীর নায়ক-নায়িকা।—এই নতুন উপায়ে মানুষের মনে আনন্দদানের যে প্রচেষ্টা দেখা গেল তাই ছিমছাম গল্পের ছোট মতন সুতনুকার রূপ থেকেই সৃষ্টি হলো নভেল বা উপন্যাসের। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আকৃতিগত বিরাটত্বের ও প্রকৃতিগত ব্যাপকতার। এরই মধ্য দিয়ে কল্পনার সঙ্গে যে বাস্তবের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে তা আমরা দেখতে পাই মানুষের সামাজিক জীবনাবলী থেকে। এখন থেকে গল্প-উপন্যাস তার আধার খুঁজে নিল নরনারীর বিশেষ করে জীবনের নানান রঙে রাঙান প্রেমের আধারে। নায়ক-নায়িকারাই হলেন যে কোন গল্প-উপন্যাসের সব রকম বৈচিত্র্যের মূল।

চিরন্তন কাল থেকে আমরা দেখতে পাই অজানাকে জানবার যে সহজাত প্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে তিলে তিলে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল, তাই-ই এখন বিরাট আকার ধারণ করেছে গল্প-উপন্যাসের মধ্যে। তাই আজ মানুষ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তার মনের এতটুকু আশার সমাধানের জন্য। সাহিত্য তাদের অতৃপ্তির কিছুটা সমাধান করেছে এবং গল্প-উপন্যাস তাদের মনোবাসনার সমস্ত রকম রসব্যঞ্জনার রসদ যোগান দিয়ে যাচ্ছে—আজও। সেইজন্য সাহিত্যে গল্প-উপন্যাস আজ আমাদের বড় আদরের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তাই গল্প-উপন্যাস পড়াটা একটা বড নেশার মত আমাদের আকর্ষণ করে চলেছে। কারণ সাহিত্য ভিন্ন অগ্রগতির কোন সম্ভাবনা নেই। কেউ কেউ আবার গল্প-উপন্যাস পড়াটাকে শখ হিসাবে ধরে নিয়েছেন। কাজেই তা পড়া ভিন্ন সাহিত্যচর্চা হয় না। দেশ-দশ, সমাজ-ধর্ম, রীতি-নীতি কিছুই জানা যায় না। সেইজন্য পাঠকের মন চায় আরও—আরও অনেক কিছু জানতে ও শিখতে—এই গল্প-উপন্যাসের ভেতর দিয়ে।—কেন না এমন প্রত্যক্ষভাবে মানুষের জীবনের

অজস্র ছবিকে প্রাণ-চঞ্চল অবস্থায় গল্প-উপন্যাসই ফুটিয়ে তুলতে পারে অপরের "সহৃদয় হৃদয়-সংবাদের' পরিবেশনের মধ্যে। এরাই এনে দেয় তীক্ষ্ণভেদী আবেদন মানুষের অন্তরে অন্তরে।

মানবতাবাদী মানুষের অন্তরের সঙ্গে অন্তরের নিগূঢ় আলাপ আলাপনের কথা কেবল সাহিত্য একাই জানতে পারে না, গল্প-উপন্যাসও মনের সেই অরূপ রূপ ও রসের সন্ধান সহজ করে দেয়। এই গল্প-উপন্যাসই আবার এমন সহজ স্বচ্ছ ভাষায় মানুষের জীবনকাহিনীকে হুবহু অনুকরণ করে পুস্তকের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত করে—যাতে পাঠকের চোখে মানুষের ও সমাজের সত্যকার রূপটি ফুটে ওঠে এবং সেটি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের মত মনে হয়—যেন চোখের সামনে তারা বাস্তবের অভিনয় করছে। সেইজন্য গল্প-উপন্যাস এত সহজে লোকপ্রিয় হ'য়ে ওঠে। এই গল্প-উপন্যাস মানবতাবাদের রাজদণ্ড। গণমানসের দর্পণ। এই অত্যাধুনিক যুগের গণতান্ত্রিক মানস গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে এর আবেদন চরম ও পরম পর্য্যায়ের।

সব গল্প-উপন্যাসই কিছুটা পুরাকালের ঐতিহাসিক ঘটনা ও বেশীর ভাগই সমাজের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাহিনীকে নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। এটি আগেও হয়েছে—আজও হচ্ছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নায়ক-নায়িকাকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাবহুল পরিবেশ, সুন্দর সুন্দর মিলনকাহিনী এবং নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশায় ভরা বিচিত্র জীবন চরিত্রের সৃষ্টি হয় ও যে সব স্বার্থত্যাগী অথবা কুৎসিৎ পার্শ্বচরিত্রের সমাবেশ হয়, তা পাঠকসাধারণকে সচকিত করে তোলে এবং পাঠকসাধারণকে নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে সহায়তা করে। যেমন—সাধারণভাবে আমরা শরৎচন্দ্রের "দেনাপাওনা" উপন্যাসটিতে দেখতে পাই তারাদাস চক্কোত্তি, শিরোমণিমহাশয়, জনার্দন রায় এরা হচ্ছে গ্রাম্য সমাজের এক একটা কুৎসিত স্বার্থান্ধতার ছবি। অপর পক্ষে হেম-নির্মল ও ফকির সাহেবের চরিত্র এবং ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষে"-র শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির ছবি আমাদের মনে এক অভিনবত্বের মধ্যে দিয়ে হাসিখুশীতে অহরহ উদ্বেল দাম্পত্য জীবনের সুন্দর-মধুর রূপকে ফুটিয়ে তোলে। তাঁর *"ইন্দিরা"র নায়িকা* বহু বিদগ্ধ সমালোচকের মতে আদর্শ প্রেমিকা স্ত্রী। আর সে অনন্যা।

গল্প-উপন্যাসের কাহিনীগুলির মধ্যে কোনটা মিলনান্ত ও কোনটা বিয়োগান্ত হয়। মিলনান্ত কাহিনীগুলি সহজে পাঠকের হৃদয় জয় করতে পারে। কারণ

সেখানে প্রেমিক-প্রেমিকার সহজাত মিলন দেখে পাঠকের মনও আনন্দে নেচে ওঠে। সেইজন্য তারা এই ধরনের গল্প-উপন্যাস পাঠ করতে বেশী ভালবাসে। কারণ তার মধ্যে থাকে এক নতুন আশার আলোক, আরও থাকে এক অপূর্ব স্থিতিশীল জীবন-বন্ধন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পশিল্পী ও ঔপন্যাসিকেরা অনেকেই 'কমেডি'কে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি বলে অভিহিত করেন। কেন না তাঁদের মতে একটি মিলনান্ত গল্প-উপন্যাস রচনা করা খুবই কঠিন কাজ। সব লেখকের পক্ষে তাই 'কমেডি' রচনা করা সম্ভব হয় না। বিশেষ ভাবে 'কমেডি' রচনা করতে গেলে জীবন সম্বন্ধে লেখকের গভীর দৃষ্টিভঙ্গির এক বলিষ্ঠ রূপায়ণ দরকার। কিন্তু বিয়োগান্তের বেলায় তার প্রযোজন হয় না। তাই বিয়োগান্ত কাহিনীগুলি মর্মদায়ক, হৃদয়বিদারক বলে অনেকেই সেটা পছন্দ করে না। কারণ তাতে তাব হৃদয়বীণার তারে একটা বেসুরো সুর বেজে ওঠে—একটা কিসের যেন ফাঁক থেকে যায়। সেইজন্য পাঠকের মনও ব্যাকুল ও চঞ্চল হয়ে ওঠে নায়ক-নায়িকাব মধ্যে মিতালি পাতাবার আশায়—কিন্তু লেখক তার সমাধান করেন না।—অনেক লেখক ইদানীংকালে পাঠকের মনে এইরূপ আক্ষেপ রেখে যাওয়া এবং একটা ক্ষীণ আশার আলোকসম্পাতের সূচনা মনে রেখে যাওয়াটাই গৌরবের বিষয় বলে মনে করেন। কিন্তু অনেক ঔপন্যাসিকের মতে এ ধারণা ভ্রান্ত। তাঁরা বলেন এভাবে পাঠককে ঠকান হয়।—

কেন না, লিখতে বসে হঠাৎ একটা চমক দেওয়া ঝলক তুলে পাঠকের চোখকে ধাঁধানো যায় সহজেই—তাই বলে মনকে খুশী করানো যায় না। আজকের দিনে এদেশে-ওদেশে, দুই দেশের সাহিত্যেই "স্ট্যাণ্ট" কথাটার প্রচলন প্রকোট হোয়ে উঠেছে। গল্প উপন্যাসে স্ট্যাণ্ট দিয়ে আর যাই করা যাক্ না কেন,—করা যায় না শুধু চিরন্তনতাকে অটুট রাখা। তপ্ত-তৃষিত ক্লান্ত আবার তৃপ্ত-মুগ্ধ-খুশীবিভোর মানুষের দুই ধারার আপন কথাকে, গোপন কথাকে, রভস কথাকে আবেগ মুখর ভাষায় রূপদান করে যে সাহিত্য,—তা কথাশিল্পীর দর্শনের অভিজ্ঞায়, কল্পনার প্রখর প্রজ্ঞায় আনন্দ লোকের সৃষ্টি হোয়ে ওঠে। আনন্দ আর আনন্দ—তারই মধ্যে আছে চিরন্তনত্ব। সেখানে ফাঁকি নেই। স্ট্যাণ্ট নেই। আছে চির-নতুনত্ব।—তা কমেডি-ই হোক আর ট্র্যাজেডি-ই হোক না কেন। আমাদের সাহিত্যের বর্তমান সমীক্ষা থেকে অনেক দেবার মত উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও, আমি এই 'স্ট্যাণ্টে' মুখরিত সাহিত্যের উদাহরণ হিসাবে ও-দেশের "ললিটা"র কথায়

জানাতে চাই—এর লেখক ভ্লাডিমির নবোকভ তাঁর এই উপন্যাসে 'স্ট্যান্টে'র আদান-প্রদানে বারো বছরের কিশোরী ললিটার সঙ্গে মধ্য বয়সী হাম্বার্ট-হাম্বার্টের যে অস্বাভাবিক যৌন জীবনের ছলা-কলা প্রদর্শন কবিয়েছেন,—আর "Sceptre of Love" নামে যে প্রতীক-ভাষ্য দিয়েছেন,—তা আর যাই সমাধান করুক না কেন, এই "ললিটা" সাহিত্যের রূপলোক আর আনন্দলোক থেকে পথভ্রষ্ট হোয়েছে। অনেকে ফতোয়া দিয়েছেন, নবোকভ "ললিটা"র মানুষের সামাজিক জীবন, প্রেম জীবন তথা যৌন-জীবন নিয়ে যা বলেছেন —তা প্রকারন্তরে আজকেব মার্কিন সভ্যতাকেই নাকি ব্যঙ্গ করা হোয়েছে! কিন্তু একথা মানতে পারা যায় না এ জন্য যে, একজন অস্বাভাবিক নায়কের আচবণে বা গুপিজমেব মানদণ্ডে অত বড একটা দেশ, তাব জাতি আর তাব সভ্যতাকে বিশেষিত করা যায় না। তাই "ললিটা" লক্ষ পাঠককে তার স্ট্যান্টের যাদুতে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু "অফ্ হিউম্যান বণ্ডেজে"ব ক্ল্যাসিক শিল্পী সমাররেট মম্‌কে কিন্তু বিন্দুমাত্র নাড়া দিতে পারে নি। নবোকভ শক্তিমান কথাশিল্পী—তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি অসুস্থ মানসিকতার ওপরে জোর দিয়ে যে শিল্প সৃষ্টি কোরতে প্রয়াসী তা-ই কিন্তু তার আদর্শ। কিন্তু তা খণ্ড-আদর্শ। স্ট্যান্টে ভরা। সমগ্র রূপ নেই। সাহিত্যের মহতি সৃষ্টিব কর্মশালায় তা এলোমেলো হোয়ে গেছে। এতে ট্র্যাজেডি আছে। আর আছে তা খুবই। কিন্তু এতে তার করুণ আবেদন, বিষাদময় তৃপ্তি নেই— যেহেতু তা মানুষের প্রেমজীবন তথা যৌন-জীবনকে পুতুল-পুতুল খেলায় মাতিয়ে রেখে ব্যঙ্গ করেছে। একদিকে নবোকভের এই চিন্তার চমক যখন সহ্য করা যায় না,—তখন আপনা থেকেই মাথা নত হোয়ে আসে আমাদেব "গীতাঞ্জলি"র সমস্ত সুরে সুরে আপ্লুত মনীষী আঁদ্রে জিদের জীব-দর্শনের আর প্রেম দর্শনের শান্ত সমাহিত চিন্তারাজির অশেষ স্নিগ্ধতার কাছে। প্রেম তার ঋষি-প্রতিম দৃষ্টিতে 'নিকষিত হেম'। প্রেমে ত্রুটি আছে। কিন্তু ত্রুটি থাকাই বড কথা ও শেষ কথা নয়। বড কথা বা শেষ কথা হলো— তার সুসমাধান, তাব সুসমঞ্জস রূপেতে। তাঁর মধ্যে 'স্ট্যান্ট' নেই।— তবু ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রেব মানস-কন্যা মেঘকুন্তলা বরবর্ণিনী কপালকুণ্ডলাব মত কি তীব্র ঝলকিত চমক দিয়ে বলতে পেরেছে—"পথিক। তুমি কি পথ হারাইয়াছ?" সবাই পারেন নি। কেউ কেউ পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথের এলা পেরেছিল। এলা-অতীনের প্রেম জীবনের এক সঙ্কীর্ণতম মুহূর্তে

যবনিকা পাতের পাতায় এলা তাই পেরেছিল। সে চমক অনন্ত। অন্ততঃ সবলা হোয়ে ওঠা নারীর দৃষ্টি-কোণ থেকে। পথ হারাতে গিয়েও এলা পথ হারায় নি। অতীনকেও হারাতে দেয় নি। না দেওয়ার কারণ, এলা ভাল কোরেই জানত পুরুষ মাত্রেই হোল স্বভাবে—অগোছালো! তার ওপরে আবার কূট রাজনীতির ছোঁয়াচ যখন অতীনের বিপ্লবাত্মক জীবনের প্রতি প্রভাব ছড়াতে প্রস্তুত,—আর এ হেন কারণে আপনার পদস্খলনের হেতু রূপে অতীন যখন তার অন্তরঙ্গা এলাকেই দায়ী ভেবে ভুল পথেতে ভ্রান্তিবিলাসকেই সত্য মনে কোরে এই বরকন্যার ভালবাসতে চাওয়ার ব্যাপক অস্তিত্বটিকে হত্যা করাতে চেয়েছিল—ঠিক তখনি স্বভাব-গোছালো নারীর রমণীয় চিন্তায় এলা তার প্রিয় প্রতিম অতীনকে এমন সর্বনাশা ইচ্ছা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করাতে পেরেছিল যুবতীর দেহময় সুরার মধ্যে ঝল্‌মল্ করা অস্ত্রটিকে অনাবৃত করানোর মধ্যে। যুগে যুগে থেকে, আজকের আধুনিক মনঃসমীক্ষার জগতে পর্য্যন্ত এটা স্বীকৃত যে যৌবনের সবুজে রাঙানো যুবকের প্রেমময় দৃষ্টিতে অকারণ অথচ অনিবার্য্যতায় যাদু ছুঁইয়ে যায় মধুরা যুবতীর মঞ্জুলা তনুর লজ্জাকে আবরণ মোচন করানোর মধ্যে—যদি সেই সুতনুকা নিজের হাতেই আপন মধুরিমাকে সহজ সাহসে মুক্ত করাতে পারে রূপের রেখায় রেখার মুক্তার ঝলক দেখিয়ে। আমার ধারণায়, ভালোবাসার কাছে লুকোচুরির কোন কিছুকে বরদাস্ত করা কোন বড় দোষেরই একটা অঙ্গ। ভালো যে বাসে ভালোবাসা দেবে ও নেবে বলে—তেমনি দুটি অন্তরঙ্গতম সবুজ প্রাণের কাছে অযথা রক্ষণশীলতার বিন্দুমাত্র স্থান নেই। তাই এলা তার প্রিয় অতীনকে সংহারজনক অভিপ্রায় থেকে নিবৃত্ত করাতে আপনার বুকের যৌবনকে আবরিতা রাখা ব্লাউজখানাকে এক লহমার ঝট্‌কায় ছিঁড়ে ফেলে সেখানকার সলাজভরা সুষমাকে নির্লাজে পেশল কোরে তুলে ধরেছিল শুধু একটি শুভ প্রচেষ্টায়—যাতে আপন প্রিয়ার এই নতুন বিভাসে স্পেলবাউণ্ড হোয়ে অতীন ভুল পথ থেকে অনায়াসে ফিরতে পারে। হয়েছিলও তাই। ঠিক ঐ মুহূর্তে বাড়ীর বাইরে পুলিশের বাঁশী বেজে ওঠে। ওরা ঘেরাও করেছে। মুক্তির আর উপায় নেই। বিপ্লবাত্মক কাজের জন্য অতীন সমেত এলাও আজ হতে চলল আর একটু পরেই ওদের হাতে বন্দী। তাই জীবনের মরণ নিয়ে ঝুলন খেলায় বাঁচার তাগিদে এলা তার রূপেতে স্পেলবাউণ্ড হয়ে থাকা অতীনকে সজোরে বুকেতে টেনে নিয়ে অজস্র চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিতে দিতে প্রিয়তমের অস্তিত্বের সরব ঘোষণা সমেত হয়ে উঠেছিল পাগলপারা।

তার পরের কথার কি হল না হল সেটা সূক্ষ্ম উপলব্ধির বিষয়। কবি-সম্রাট শেষ করেছেন তাঁর কাহিনীকে ঐ পর্য্যন্তই। এর পর থেকে আমাদের ভাবতে ভাবতে এ কথার রত্নত্বকে বুঝতে হবে। আমি বলব, এলার মত মেয়ের পক্ষে এমনটা না করে গেলে পর ভালোবাসার বিপ্লব মাখা কথায়, একটা বড় ফাঁকি থেকে যেত। আরও বলব, এর মধ্যে 'অবসিন্' কণামাত্র নেই। যা আছে তার একটাই নাম দেওয়া যায় 'লাভস্ প্যাশন্' বলে। এত বড় মধুরিম চমক সাহিত্যের খুব অল্প জায়গাকেই আবেশে ভরাতে পেরেছে।—কিন্তু অনেক আধুনিক লেখক-ই আজ "টেক্সাস" সাহিত্যের চোখ ধাঁধানো চমক তুলে ধরতে অভিলাষী। কিন্তু ক'জন ও-দেশের গল্প যাদুকর ও' হেনরী হোতে পেরেছেন—সেটাই ভাববার বিষয়। ও' হেনরীর অনন্যরূপী চমক ধর্মীতার আশেপাশে গভীর ভাবেই জড়ানো তাঁর জীবন ও প্রেম সম্পর্কিত বুদ্ধিদীপ্ত দর্শন ও চিন্তা। তাঁর 'লাস্ট লীফ্' কি আজও চির নতুন রূপে মনের দরজা পার হয়ে প্রেমের সবুজ ঘরের আঙ্গিনা ছুঁয়ে যায় না ?

তবু এই চমক-ধর্মী সাহিত্যের অতি আধুনিক কথায় আমি একজন মেয়ে রূপে মেয়ের মন নিয়েই মন্দ এবং ভাল দুদিক থেকেই মন্তব্য কোরব একজন আধুনিকা মার্কিনী ঔপন্যাসিকার ওপরে। তিনি বিখ্যাত উপন্যাস 'পিটন প্লেসে'র রচয়িতা শ্রীমতী গ্রেস মেটালিয়াস্। আমার কাছে মন্দত্ব হল—এ কাহিনীতে বর্ণিত স্ট্যাণ্টমুখর যৌন-পিপাসায় বেশরম্ হয়ে ওঠা চঞ্চল ও অস্থির জীবন-দর্শনটি। ওখানে বর্ণিত জীবন ও যৌবন নারী ও পুরুষ সমেত মুখরিত রেস্টলেস্ ও রেক্লেস্ স্বভাবেতে। কিন্তু আমি বলব, যৌবনময় জীবনের রঙীন সুখের মাতাল করা অনুসন্ধানগুলো যদি কিছু কিছু বিধি-নিষেধ না মেনে চলতে চায়—তা হলে সামাজিক জীবনের মধ্যে ভাঙ্গন সহজেই ধরে বসে। লেখিকা তাঁর সহানুভূতির জগত কোরেই এই কাহিনী রচনা করেছেন। নারীমনের শান্ত আবেগময়তাকে এগুতে না দিয়ে; তিনি কঠোরে-নির্মমে যে সাহসিকতায় ও-দেশের দিনকে দিন সামাজিকতা থেকে ছিন্ন হয়ে চলা বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের নিছক যৌনময় যৌবন-বিলাসের ইতিকথা শোনাতে পেরেছেন—আমার ধারণায় শ্রীমতী মেটালিয়াসের ভালত্ব ব্যঞ্জক শ্রেষ্ঠত্ব এই তারই মধ্যে নিহিত আছে। এ গ্রন্থের স্টান্টভরা যৌনকলার ছবি-বিহ্বল বর্ণনাচাতুর্য্যের কথাবিবেক আমার কাছে নিন্দনীয় ঠেকলেও—লেখিকার অসম সাহসিক সাহিত্যায়ণের মূল্যায়ণে আমি তাঁকে শক্তিময়ী

সাহিত্যিকা রূপে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য দুটি সুন্দর কারণে,—এক তিনি নারী— আর দুই, তিনি সাহসিকা লেখিকা। তুলনা করে বলতে পারি—শ্রীমতী পাং বাকের লেখা আমার প্রিয় "কাম্ মাই বিলাভেড্" যেমন যৌবনের আর প্রেমের সুস্থ চিন্তায় "অসদো মা সদ্‌গময়"র জ্যোতির্ময় আস্বাদন দেয়—তেমনি শ্রীমতী গ্রেসের 'পিটন্ প্লেস' অমাময় রহস্যে ভরা অসুস্থতাব জীবন নিয়েই সাহিত্য হয়েছে।

বাংলা কথাসাহিত্যের জনক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর অনিন্দ্য রোমান্টিক সাহিত্য আজও আমার কাছে আদরের প্রিয় প্রসঙ্গ। বাঙালী চিরকালই রোমান্টিক কাহিনীর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। আজকে কিন্তু অনেকে বঙ্কিম রচনাবলীকে ভাষার অত্যধিক পারিপাট্যবশতঃ দুর্বোধ্য কঠোর বলে মনে করেন। অবশ্য এটা তথাকথিত কিছু শিক্ষাভিমানীর একটা ফ্যাশানেবল্ ধারণা। তাঁর লেখার মধ্যে এমন এক নবাবী মেজাজের আমেজটুকু আছে, যা প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত গুরুগাম্ভীর্য্যের সঙ্গে দরবারী চালে প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ে অপূর্ব রোমান্সের সৃষ্টি করে চলে। এমন ভাবে তিনি মাতৃভাষা বাংলাকে অপূর্ব মর্য্যাদায় মহিমান্বিত কোরে শ্রেষ্ঠত্বের চরম শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন গল্প উপন্যাসের মধ্যে। "দুর্গেশনন্দিনী" "কপালকুণ্ডলা" "বিষবৃক্ষ" "কৃষ্ণকান্তের উইল" "ইন্দিরা" "রাজসিংহ" "আনন্দমঠ" "দেবী চৌধুরাণী" "সীতারাম" "রজনী" "যুগলাঙ্গুরীয়" "রাধারাণী" "চন্দ্রশেখর" প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি তাঁর রোমান্টিকসুলভ মন আর ঐতিহাসিক, পারিবারিক ও সামাজিক পটভূমির মধ্যে দিয়ে নিজের কবিকল্পনা ও অসম বাস্তববোধের অপূর্ব সমন্বয়ে বাংলা ভাষা তথা উপন্যাসশিল্পে অনন্যতা দেখিয়ে গেছেন। তাঁর সাহিত্যে পরিকল্পিত পাত্র-পাত্রীকে আমাদের সামনে বিভিন্ন রূপে রূপায়িত করে তুলে ধরেছেন যা আমাদের মনে অভিনবত্বের সৃষ্টি করে, আজও। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রোমান্টিকতার মধ্যে কল্পনাকেই বিশেষ ভাবে গ্রহণ করেছেন। গল্প বা উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ সম্পদই হলো—এই কল্পনা। তাঁর উপন্যাসের কাহিনী মাত্রেই এজন্য জনপ্রিয় যে, সে সবের বেশীর ভাগই 'কমেডি' অর্থাৎ তাঁর নায়ক-নায়িকারা জীবনের রোমান্সের ভেতরের রভসতায় শেষে মিলিত হয়ে পাঠকের মনে অপরূপ সহাস-সলাজ রোমান্সের সৃষ্টি করে। এজন্যে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস চিরশ্রেষ্ঠ হ'য়ে থাকবে সকলের হৃদয়ে।—তাই তাঁর উপন্যাস মাত্রেই আবালবৃদ্ধবনিতায় আজও আদরের

জিনিস। তাঁর উপন্যাসের মানবিকতা ঋষির দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়ে Classic হয়ে আছে। তিনি এক কথায় সাহিত্য সম্রাট। আজকেও। কেন না এমন সৃষ্টি যাঁর, তাঁর অননুকরণীয় বিরাট সত্তাকে প্রণাম জানিয়ে মনীষী রমেশ দত্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই লিখেছিলেন—The greatest man of nineteenth century.

বঙ্কিমচন্দ্রের ঋষির ঋদ্ধিযুক্ত দর্শনে প্রেম রূপ নিয়েছিল অসাধারণ আদর্শ-বাদীতার অনুরণনে। প্রেম আদর্শের হেমকান্তি সৌন্দর্য্যে সাজানো আর গোছানো—এই ছিল সাহিত্য সম্রাটের ধ্যান। সাহিত্যে রূপায়ণ করেছেন তাকেই সূর্য্যমুখী ও ইন্দিবার জীবনের সুন্দর শিক্ষা, রুচি ও অবিশ্বাস্য রকম অত্যাগ্র আধুনিকার পরিচয়ে,—নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালের মানস-দ্বন্দ্বের কখনো এলোপাতাড়ি বা কখনো সুসমঞ্জস জীবন-জিজ্ঞাসার সহাস চঞ্চলতায়,—আদরের "ভোমরা" ওরফে ভ্রমরের নিকষ প্রেমের আকুতি ও মিনতিতে ভরাট অনিন্দ্য 'অভিমানে'তে—'মালঞ্চের মালাকরে'র ভূমিকা থেকে পরিণয়ের পরিতৃপ্ততায় পৌঁছে যাওয়া স্থৈর্য্যবতী রজনীর মধুরা স্বভাবেতে,—জগত সিংহের রূপ খুঁজে ফেরা অন্তরেতে দেখা দিয়েছিল দেব মূর্তির পশ্চাৎপট থেকে ম্লান প্রদীপ শিখার অপাঙ্গে অপাঙ্গে তাকিয়ে থাকা শিখাময়ী তিলোত্তমায়—আর তারপরে অন্তরতমা হোয়ে ওঠায় আর প্রিয়তমকে 'অ্যাডোনেস' ভেবে দূরে দূরে চলতে চলতে প্রেমের অর্ঘ্য তুলে ধরা দেবিকা আয়েসার প্রখর ব্যক্তিত্ব-ময়ীতায়,—পার্শ্বচরিত্র হিসাবে অনন্যতায় সৃষ্ট কমলমণির স্বামী শ্রীশচন্দ্রকে নিয়ে একে ও অপরের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে তৈরী করা সোনার ছোট সংসারের কথায়, যা আজ এই মুহূর্তেও বস্তুনিষ্ঠ অবিবাহিত কি বিবাহিত, প্রত্যেকের পরম সাধের, পরম চাওয়ার 'এতটুকু বাসা'র 'একটুকু সুখে'র অভিলাষকে বড় বেশী করে রাঙিয়ে যায়। আর দোদুল করে নাকি? আরো আছে।—ব্রীড়া ছেড়ে ফেলা প্রফুল্লর সাহসিকা রূপ তাকে দুর্ধর্ষ দলের নেত্রীর পদে বসিয়ে দেবী চৌধুরানী পর্য্যন্ত কোরেছিল। কিন্তু এততেও খুশী হোয়ে উঠতে পারেনি তার প্রেম-বুভুক্ষু হৃদয়ের অপূর্ণতা। তাই শেষ পর্য্যন্ত প্রেমের নিকষ ছোঁয়াচ পাওয়ায় তাকে ফিরে এসে বরণ কোরে নিতে হয় স্বামী ব্রজেশ্বরের হৃদয়ালিঙ্গনকে। এতে হয় ত নারীর স্বাধীনতা সেদিন একটু কেঁপে গেছিল, অলক্ষ্যে হয় ত চোখের জলও ঝরিয়েছিল,—তবু ফুটে উঠেছিল সেখানে অনিবার্য্য চিরন্তনতাকে নিয়ে, যখন প্রফুল্ল নতুন

কোরে বিবাহের লাল চেলির উচ্ছলতার ভেতর থেকে নিজের শ্রেয়সী রূপকে টেনে নিয়েছিল জননীর গরীয়সী সত্যের আধারে।—ওদিকে দেখি মেঘকুন্তলা মৃন্ময়ী 'কপালকুণ্ডলা' নামের আড়ালে থেকেও প্রেমের নতুনত্বকে পলাশ রঙে রাঙিয়ে রেখে গেছে। মৃন্ময়ীর সঙ্গে নবকুমারের পরিচয় হয় এক সঙ্কটময় মুহূর্তে, যখন সে নিজেও বনানীর আঁধারে পথ ফেলেছে হারিয়ে। দারুণ চমকে মাতানো প্রশ্ন কোরে সে নবকুমারকে তার স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছিল প্রথম পরিচয়ের পথপ্রদর্শিকা রূপে। বনে বনে মানুষ এই বনানীকন্যা। গাছ পালা পশু-পাখী পথ-ঘাট সবই তার জানা। প্রকৃতির মুক্ত আঙ্গিনার নীচে তার উদ্ভিন্ন-যৌবনের সৌন্দর্য্য এক ঝলকে পথ ভুলে যাওয়া পথিককে ভালোবাসা বাসতে বাধ্য করালো। কেন না—"সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী। রমণী সুন্দরী। ধ্বনিও সুন্দর। হৃদয় তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যেও লয় মিলিতে লাগিল।' সত্যি এমন আকুতিভরা আহ্বানকে নবকুমারের যৌবন বন্দনা না জানিয়ে থাকতে পারে নি। 'বি-বা-হ'—এই তিনটা অক্ষরের উচ্চারণ বিস্ময়-বিমুগ্ধ কোরেছিল যে লাজভীতাকে, একদিন তাকেই বিবাহের সাত পাকে বেঁধে বন প্রান্তর থেকে শহুরে লোকালয়ের মধ্যে এনেছিল নবকুমার। প্রকৃতির সব রকম সরলতা ও মাধুর্য্যতায় তৈরী মৃন্ময়ী আস্তে আস্তে নিজেকে সমাজের অনেকতর সামাজিকতার সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে নিচ্ছিল। স্বামীকে দেবতুল্য রূপে ভালবাসতে লাগল। কিন্তু বাদ সাধল সামাজিক নীচতা আর ঈর্ষা। প্রকৃতি-পালিতা মৃন্ময়ীর ভেতরকার সরল শিশুটি শেষ অবধি হয়রানির চরম পর্য্যায়ে এসে সামাজিক মানুষ নবকুমারকে ফাঁকি দিয়ে একদিন বাধ্য হলো হারিয়ে যেতে অরণ্যের কুহেলিমুক্ত প্রাঙ্গণে। মৃন্ময়ী আস্বাদন কোরতে চাইল, —আর চাইল প্রকৃতির অপার উচ্ছল উদারতার মধ্যে পুনর্বায় অবগাহনের জন্য। —মনে হয় ভালোবাসার জীবনে এর চেয়ে বড় কোন ট্র্যাজেডি আর নেই। কেন না এর স্বাভাবিকতা দারুণ, আর সেই সঙ্গে অশেষ। সমাজ-বদ্ধ মানুষ হওয়ায় নবকুমারের ভালোবাসা ছিল সন্দেহ, ঈর্ষায় ভরা, আর কামনার্ত দেহবাদীর। তাই সরল মনের মৃন্ময়ীর লাজভীতা শরীরের আসমানী রাগে সাজানো যৌবন স্নিগ্ধতার মধ্যে দিয়ে ভালোবাসা দেবার ও পাবার জন্য ক্ষত-বিক্ষত হওয়াতেই, সরে যেতে বাধ্য হয়।—ঠিক এই রকম সামাজিক তুচ্ছতা, অকারণ সন্দেহ-পরায়ণতা, ঈর্ষাকুটিল প্রকাশ, আর দেহের দেহলিতে ফুটিয়ে তোলা এলোমেলো বল্গাহারা ইচ্ছার চাহিদা-পুরণ—তিন দিক থেকে রোহিণী-ভ্রমর-গোবিন্দলালের

ভেতরে ভেতরে খুঁজে খুঁজে ফেরা অসম পিপাসা নিয়ে ডাক দিয়ে চলে যাওয়া প্রেম একই কারণে তাদের প্রত্যেককেই দারুণ বিচ্ছেদের নির্মমতার মধ্যে টেনে আনতে একযোগে সহযোগী হোয়েছিল। ভ্রমর যদি একটু বুদ্ধি খরচ করে দাম্পত্য-জীবনের এ হেন কুয়াশারূপকে বোঝার চেষ্টা কোরত, তা হলে বোধ হয় এমন অসহ্য মর্মদায়ক হোত না এর পরিণতি। "Love and Attention are not luxuries They are essential foods of Marriage."—শুধু প্রেম দিয়ে নিজের পতি-দেবতাকে মুগ্ধ কোরতে চেয়েছিল ভ্রমর, আর তা থেকে ভুলের উৎপত্তি—প্রেম তাকে কানে কানে শোনায়নি "অ্যাটেনশন্ প্লীজ!" এই 'মনোযোগ' দিয়ে গোবিন্দলালের মানস-অতৃপ্তিকে যদি একান্ত ভাবে পূর্ণ করাতে মনোযোগী হোতে পারত আদরের 'ভোমরা', তা হোলে নিশ্চয়ই বরনারী রোহিণীর ভালোবাসা পেতে ও বাসতে আকুল মিনতি ভরা জীবন 'বসন্তের কোকিলে'র কুহু কুহু মূর্ছনায় ঝলমলিয়ে উঠা সত্বেও—নিষ্ঠুর নিয়তি-তাড়িতা হোত না। 'নেমেসিস'কে হেসে-খেলে অস্বীকার কোরতে পারত অনায়াসে এই বরনারী। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর ভালোবাসাকে তার শেষ পরিণতিতে দেখিয়ে অবিচার কি সুবিচার কোরেছেন কি না, তা আজকের মানবতাবাদের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে বুঝতে পারি—এ অবিচার স্রষ্টার নয়, তা তখনকার সমাজেরই মনের কথা। কাহিনীর রোহিণী লোকান্তর মনে করিয়ে দেয়—সমাজেরই শাসিত আর দণ্ডিত ঘরেতে তারই মত মেয়েদের জীবনের প্রেমতৃষ্ণাকে চিরতরে আলো-বাতাসের নেশা ছেড়ে মৃত-মূক হোতে হয়েছিল। কেন না, বাস্তবে আমাদের ঠাকুমা আর দিদিমা'দের দল আজও রোহিণীর জীবনেতিহাসের কথায় সজল চোখেতে কি ঐ কথাকেই আরো জোরালো সত্য কোরে তোলে না কি?—অন্যদিকে এমন হওয়া সত্বেও পাঠকের মনকে আবার রাঙা করে তোলে ছোট্ট শিশুর দেয়ালা হাসিতে মুখ ভরভর করা, আর ভুঁইমি কোরে চোখের ঝরঝর করে ভেসে যাওয়া জলেতে ভ্রমর যখন গোবিন্দলালের বুকেতে বন্দিনী থেকে অভিমানের রঙ্ ছড়ায়, ছিটিয়ে দেয়। প্রেমের ব্যাপারে 'ভোমরা' বাস্তব 'অভিমান'।—মনেতে বড় বেশী ঝিলিমিলি আভার রূপাঞ্জন মাখিয়ে যায় 'আনন্দমঠ' তার পুরুষ-সত্তম জীবানন্দ ও নারী-সত্তম শান্তির অবিশ্বাস্য রকম ভাবে দুঃখ-জর্জর অবস্থাকে জয় করা—সীতারামসুন্দর দম্পতি রূপটা। বিদেশী রাজপুরুষ লর্ড জেটল্যাণ্ড যে বইকে 'এ প্যারাবল্ অফ্ পেট্রিওটিজম্' বলে তাঁর লেখা "হার্ট অফ্ আর্য্যাবর্তে" প্রণাম জানিয়েছিলেন, আর যে মহা-

উপন্যাস হিমকান্তা গিরিরাজির পাদদেশ থেকে সহস্র সাগর তরঙ্গে উচ্ছ্বলিত কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতবাসীকে স্বাধীনতার মন্ত্র হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, "বল—বন্দে মাতরম্"—সেই উপন্যাসের মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের ঋষিমন পুরুষ ও রমণীর ভালোবাসা ও পরিণয়ের জয়গানে মুখর হোতে দ্বিধামাত্র করে নি। —যে শান্তি বীরাঙ্গনা, যে কবিৎকর্মতায় বিদেশীকেও লজ্জা পাওয়ায়, যে স্বামী জীবানন্দের দেশহিতব্রতী জীবনের পাশে কাজের কঠোরতা ও প্রেরণার উৎস হয়ে থাকত—সেও আপন মিথুন রূপের আমেজে এসে পর অসম্ভব রকম রোমান্টিকা হোয়ে উঠত। আর তাদের দাম্পত্য সুখের ছবিকে বঙ্কিমচন্দ্র ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হোতেন রোমান্টিক ছন্দে ঘেরা ভাষার ঝিলিমিলিতে,—

"অপ্সরাগণের ভ্রূবিলাসযুক্ত কটাক্ষের জ্যোতি লইয়া অতি যত্নে নির্মিত যে সম্মোহন শর, পুষ্পধন্বা তাহা পরিণীত দম্পতির প্রতি অপব্যয় করেন না।... যেখানে গাটছড়া বাঁধা হইল—সেখানে আর তিনি পরিশ্রম করেন না, প্রজাপতির উপর সকল ভার দিয়া, যাহার হৃদয়শোণিত পান করিতে পারিবেন, তাহার সন্ধানে যান। কিন্তু আজ বোধহয় পুষ্পধন্বার কোন কাজ ছিল না—হঠাৎ দুইটা ফুলবান অপব্যয় করিলেন। একটা আসিয়া জীবানন্দের হৃদয় ভেদ করিল—আর একটা আসিয়া শান্তির বুকে পড়িয়া, প্রথম শান্তিকে জানাইল যে সে বুক মেয়ে মানুষের বুক—বড় নরম জিনিস। নবমেঘনির্মুক্ত প্রথম জলকণা-নিষিক্ত পুষ্পকলিকার ন্যায়, শান্তি সহসা ফুটিয়া উঠিয়া, উৎফুল্লনয়নে জীবানন্দের মুখপানে চাহিল।...জীবানন্দ বলিল—'আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ তুমি দাঁড়াইয়া থাক।"...শান্তি বলিল 'তুমি ফিরিয়া আসিবে ত?'

জীবানন্দ কিছু উত্তর না করিয়া, কোন দিক না চাহিয়া, সেই পথিপার্শ্বস্থ নারিকেল কুঞ্জের ছায়ায় শান্তির অধরে অধর দিয়া সুধাপান করিলাম মনে করিয়া, প্রস্থান করিলেন।"

মূর্তিমতী আধুনিকা শ্রীমতী শান্তি তার স্বামী জীবানন্দকে দেশ-জ্ঞানে দেখিবার অনুপ্রেরণা দিয়ে সাজিয়ে তুলতে চেয়েছিল। আর তাই বন্দনা কোরে বলেছিল প্রেমভরা আকুতিতে—"তুমি বীর। আমি তোমাকে বীরব্রত শিখাইব।" এমন স্ত্রী হওয়া যার ভাগ্যকে অশেষ মহিমায় রাঙিয়ে রেখেছিল, কবি বঙ্কিমচন্দ্র তাকে পটে আঁকা ছবি কোরে বাঁধিয়ে রেখেছেন ভালোবাসার আর ভালোলাগার আলিম্পনায়, যেখানে লিখেছেন—

"সে স্ত্রীলোকের (শান্তির) বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে··· অধিক বয়স বলিয়া বোধ হয় না। মলিন, গ্রন্থিযুক্ত বসন পড়িয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, বোধ হইল যেন, গৃহ আলো হইল। বোধ হইল, পাতায় ঢাকা কোন গাছের কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল। বোধ হইল, কোথায় গোলাপ জলের কার্ব্বা মুখ আঁটা ছিল, কে কার্ব্বা ভাঙ্গিয়া ফেলিল. যেন কে নিবান আগুনে ধূপধূনা গুগগুল ফেলিয়া দিল। সে রূপসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিল, প্রথমে ও দেখিতে পাইল না। তারপর দেখিল, গৃহপ্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ আছে, আম্রের কাণ্ডে মাথা রাখিয়া জীবানন্দ কাঁদিতেছেন। সেই রূপসী তাঁহার নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। ·জীবানন্দের হাত হাতে লইয়া বলিল,—ছি, কাঁদিও না। আমি জানি, তুমি আমার জন্য কাঁদিতেছ। আমার জন্য তুমি কাঁদিও না।—তুমি যে প্রকারে আমাকে রাখিয়াছ, আমি তাহাতেই সুখী।'· জীবানন্দ মাথা তুলিয়া চক্ষু মুছিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'শান্তি! তোমার এ শতগ্রন্থি মলিন বস্ত্র কেন? তোমার ত খাইবার পরিবার অভাব নাই!"·· শান্তি বলিল—'তোমার ধন, তোমারই জন্য আছে। আমি টাকা লইয়া কি করিতে হয়, তাহা জানি না। যখন তুমি আসিবে, যখন তুমি আমাকে আবার গ্রহণ করিবে—"···জীবানন্দ—'গ্রহণ করিব—শান্তি! আমি কি তোমায় ত্যাগ করিয়াছি?'·· শান্তি—'ত্যাগ নহে—যবে তোমার ব্রত সাঙ্গ হইবে, যবে আবার আমায় ভালবাসিবে—।

কথা শেষ না হইতেই জীবানন্দ শান্তিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শেষে বলিলেন,—কেন দেখা করিলাম!

শান্তি—কেন করিলে—তোমার ত ব্রত ভঙ্গ করিলে?

জীবানন্দ—ব্রতভঙ্গ হউক—প্রায়শ্চিত্ত আছে। তাহার জন্য ভাবিনা·· আমি কেবল ধর্মের জন্য দেশে দেশে, বনে বনে, বন্দুক ঘাড়ে করিয়া প্রাণীহত্যা করিয়া এই পাপের ভার সংগ্রহ করি? পৃথিবী সন্তানদের আয়ত্ত হইবে কিনা জানি না,—কিন্তু তুমি আমার আয়ত্ত। তুমি পৃথিবীর অপেক্ষা বড়। তুমি আমার স্বর্গ।"· তাই শেষ পর্য্যন্ত বরবর্ণিকার মহান রূপ মধুরে মধুর হয়ে উঠল, যখন থেকে—"স্বামীসহবাসে শান্তির চরিত্রের পৌরুষ দিন দিন বিলীন বা প্রচ্ছন্ন হইয়া আসিল। রমণীয় রমণী চরিত্রের নিত্য নবোন্মেষ হইতে লাগিল।"

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-সম্রাট আর তিনি ঋষি। তাই বলে তাঁর গল্প উপন্যাসের রূপ, আর মিষ্টি সুষমা একটুও এদিক-সেদিক হোতে পারে নি সে-কাল এ-কাল—দুই-ই তাঁর সুদূর প্রসারী শিল্পী-সত্তার বাহির-ভেতর মহলেরই ঘরে ঘরে বন্দী হোয়ে পড়েছিল। রোমান্টিক সৃষ্টি মানেই চিরন্তন সৃষ্টি। একেবারে অসম্ভব এবং ভাবনাতীত জিনিস সৃষ্টি করার জন্যেই যে শ্রীমধুসূদন—রোমান্টিক পাইওনীয়ার, ঠিক তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র। তেম তাঁর ভালোবাসার দৃপ্ত ও দীপ্ত রূপায়ণ। এতে প্রতীক-ধর্মীতাও আছে আর তা আছে বলেই বঙ্কিমচন্দ্রের বীরাঙ্গনার সাজে রাঙানো মানস-কন্যা ও প্রেমদীপ দেখিয়ে আরাধিত বর পুরুষের কাছ থেকে রোমান্টিক কথা নিশ্চয় জানতে পারে, যদি সে জানায়—

"আঁচলখানি পড়িছে খসি পাশে, কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি,
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি।"

আমার মতে, এ দেহবাদের কথা নয়। এ হলো ভালোবাসার তত্ত্ব আকাঙ্খার সারিমেশান—এরই প্রতীক। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকা তাঁরই নায়কের জন্য আপন হৃদয়ের প্রেম দরিয়ায় সাজিয়ে রেখেছে—একধারে 'ভক্তি' আরেকধারে 'শ্রদ্ধা'কে। ভক্তি দিয়ে আর শ্রদ্ধা দিয়ে সে পুরুষের ভুল বোঝাকে, ভুল করাকে—ভুল-শূন্য করাতে চায়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছে—ভালোবাসে যে, ভালোবাসা পেয়েছে যে, সে—"মেয়ে মানুষের বুক বড় নরম জিনিস।" যেহেতু সেখানে হৃদয় আছে। আছে হৃদয়ের কারুকাজ। আর তা 'ভক্তি' ও 'শ্রদ্ধা'—এই দুই অপার শক্তির সামঞ্জস্যে পুরুষকে ভালোবাসতে ভালোবাসা দেওয়াতে আরতি করে। বন্দনা করে।—সৃষ্টিতে উচ্ছল প্রভাতে প্রথম লগ্নে যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন 'পোয়েট' ও 'স্টাইলিস্ট'—তিনিই সন্ধ্যালগ্নে শ্রীঅরবিন্দর শ্রদ্ধায় অনুরণিত "the latter is a nation builder and a seer." জাতির তিনি সংগঠনা কোরেছিলেন, স্বাধীনতার তিনি মন্ত্রদাতা তবু—সবোপরি তিনি 'সোয়ান সঙে' মুখরিত কোরে গেছেন প্রেমের কথাকে যুবক ও যুবতীর যৌবন ধর্মকে, যৌবনের চোখে তাকিয়ে ভালবাসতে চাওয়া—যুবতীকে। যুবতীর জন্য যুবকের আনন্দ কথাকে। প্রেমের রিমঝিম কথাকে যুবকের জন্য যুবতীর ছান্দসী সাজে তুলে ধরে বন্দনা কোরতে আসা প্রেমারতিকে তাঁর প্রেমতত্ত্বের শেষ কথায় শুনতে পাই—"Where actions are rooted in love, nothing but goodness can flower therefrom."

অপরপক্ষে সাহিত্যসম্রাটের এই ঔপন্যাসিক চিত্র-বিচিত্রাকে, পুরুষ-রমণীর ভালোবাসার অশেষ চাওয়া ও অশেষ পাওয়ার কথাকেই 'আপন মনের মাধুরী'তে রাঙিয়ে, সাজিয়ে, সুরভিত কোরে এগিয়ে এসেছিলেন কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ। কবিতা রাণীর মঞ্জিলে বসে বসে মানুষের কথাকে ছবিতে আর গানেতে শুধু কাব্যময় কোরে তুলেছিলেন। কবির মনেতে ছাপিয়ে ওঠা বাস্তবের সুখ-দুঃখ আপন 'কবি-মানসী'র বসন্ত বাতাসে কেঁপে যাওয়া আঁচলের ঝাপটায় চোখের কল্পনা রঙকে ধাঁধিয়ে তুলেছিল। কবি তাঁর নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে উপন্যাসের মধ্যে ভালোবাসার ধর্মকে স্বাধীনতার আস্বাদনে ফুটিয়ে তুলতেই চেয়েছিলেন। যিনি 'মহুয়া'তে সবলা নারীর বন্দনা-গান গেয়ে মুখর হোয়েছিলেন, তিনি স্বাভাবিকভাবেই কথা-সাহিত্যের ব্যাপকতার ভেতরেও সেই ধারণাকে পরিস্ফুট কোরে গেছেন। মনে হয়, মহা-উপন্যাস "গোরা" শুধু যে মানুষের মুক্তির জয়গানেই মুখরিত, তাই একমাত্র কথা নয়। শেষ কথায় মনে হয়, পুরুষ ও নারীর আসঙ্গ-অভিলাসিত যুগল সত্তারও এক ললিত-মধুর সরব ভাষ্যকে রবীন্দ্রনাথ সুচরিতা-গোরা ও ললিতা বিনয়ের আধারে আধারে পরিষ্কার কোরে দেখিয়েছেন। "গোরা"য় তত্ত্ব আছে, উদ্দেশ্য আছে, আরো আছে সমসাময়িক ভারতীয় আদর্শ, স্বাধীনতা-সংগ্রামের কথা, ধর্ম বড় না জাতি বড়—অনেক কিছুই। তবু মনন কোরে চলা সত্ত্বেও, এই এপিক্ উপন্যাস কোথাও আনন্দ আর তৃপ্তিকে অস্বীকার করে নি। গোরা চরিত্রের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার ছোঁয়াচ লাগলেও, সেখানে অস্বাভাবিকতা নেই। সে সংগ্রামী, কর্মিষ্ঠ, [illegible]য়ের ব্যাপারে নিশ্চল নিথর নয়। কাজের মধ্যে [illegible]য়ে, সংগ্রামের ভেতরে থেকেও প্রেমের পরশ পেয়েছিল। আর গোরা তা পেতেও [illegible]ছিল সুচরিতাকে। "বিস্বাদ, সমস্তই বিস্বাদ"—এই চিন্তা কর্মিষ্ঠ গোরার মনকে দোদুল কোরে তুলেছিল বননারী সুচরিতাকে কাছে দেখতে না পাওয়ায়। অন্যদিকে স্টীমারে চলতে চলতে হঠাৎ ঝলকিত আভাময় প্রেমালোকে রূপস্নান সেরে ওঠা লাজুকা ললিতা আর প্রেমময় বিনয়ের জীবনকে কাকলি-কথায় মাতোয়ারা কোরে তোলা সেই একটি ছবিকে কি আমরা ভুলতে পারি ?—তাই মহা-উপন্যাস "গোরা"র অনেক কিছুর মধ্যেই কেন্দ্রবিন্দু হোয়ে ফুটে আছে মানবিক আকাঙ্খার তৃপ্তি। আর তা প্রেম দিয়ে ঘিরে রেখেছে সুচরিতাকে, ললিতাকে,—গোরা ও বিনয়ের অশেষ নির্ভরতার হৃদয়-রাজ্যে। প্রেম এখানে মুক্ত—নায়িকারা স্বাধীনা বলে। কিন্তু কিছু

ব্যাপকতা এলো-মেলো হয়ে পড়াতেই বুঝি কবির গাথা কথারূপ "যোগাযোগ" অনেক মহৎ ভাবনাকে টেনে আনা সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠ হোয়ে দাঁড়াতে পারলো না "গোরা"র পাশটিতে। "যোগাযোগে"র তত্ত্বে প্রেম আছে। তবে সে প্রেম স্বাভাবিকভাবে জাগরূক হয় নি। শতদলে বিকশিত ত মোটেই নয়। এ যেন মনে হয়, বাঙলা দেশের আরো অনেক সুকন্যার মতই স্বামী মধুসূদনকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর কোরে ভালবাসতে হয়েছিল কুমুকে। প্রাক-বিবাহিত ভালোবাসার জীবনের কথা বাদ দিলাম, বিয়ের পরও ভালোবাসার আমেজ এলো না কুমুর জীবনে আপন স্বামীর কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথের ধারণাতে বলতে চাই, কুমুর স্বামী হোল সে ধরনের মানুষ— যারা বর্ষার সময়ে গলাবন্ধ কোট পরে হিসাবের খাতাতেই মনোনিবেশ করে থাকে। ওদের কর্মব্যস্ততার কাছে রিমঝিম সঘন বর্ষার কোন দাম নেই। 'বরষা' দিতে পারে না তাদের সাংসারিক 'ভরসা'। তারা ভাবে, এটাই আমাদের বাহাদুরি। কিন্তু জানে না, টের পায় না—পৃথিবীর কত মঙ্গল মধুর প্রাপ্তি থেকে তারা বঞ্চিত। এরা সবাই সব হারানোর দেশের মানুষ। প্রেমের সুরভিতে কুমুদিনী বেপথুমনা হোতে না পারলেও—তার সামনে খোলা ছিল যৌন-জীবনেরই হিসেব করা কতকগুলো নিচকড়া। যৌন-জীবনেতে পৌঁছে স্বাভাবিকভাবেই প্রেম-বুভুক্ষা এই নারী নিজে তৃপ্তা হোয়েছিল কিনা জানি না,—তবু সে তার স্বামী মধুসূদনকে সুখ দিয়েছিল। দেহী আবর্তির পূর্ণতিতে আকুল করা নয় এই বর্তিব প্রাপ্তিযোগটুকু। বোধ হয় তা সন্তান-সুখ। প্রেমের জন্য তন্ময়তা, মিথুন-জীবনের পূর্ণতা পেতে উচ্ছলা কুমুদিনী শেষ [illegible] বাস্তবের অনেক লজ্জাবতীর মতই সুখী হোতে পেরেছিল স্বামী-স্ত্রীর সেতু-বন্ধনরূপী "যোগাযোগ" কোরে তোলা, আপন সন্তানের আশ্রয়টুকু বুকে রেখে [illegible]জননীর মহিমাকে কুমুদিনী উজ্জ্বল কোরলো। কিন্তু নিজেকে ফাঁকি দিল। প্রেম কি—তার পাঠ জীবনেতে না নিয়েই। নিছক "যোগাযোগে"র মধ্যেই তার জীবন সঙ্গমেতে পৌঁছে যেতে হোয়েছে এই নারীকে।— কোন ভুল না থাকা সত্ত্বেও কুমুর জীবন এক বড় ট্র্যাজেডি হোয়ে থাকল। কিন্তু হাজার ভুল, ত্রুটি থাকলেও বা এলেও—প্রেমের জীবন যে সুখ আর প্রশান্তিকে টেনে আনতে পারে তার উদাহরণ "শেষের কবিতা" "দুই বোন" আর "মালঞ্চ"। বাংলার 'চম্পূ-কাব্য', বহু আলোচিত "শেষের কবিতা"র প্রেম নিয়ে কিছু বলতে চাই না। তবে বাস্তব সংসারের সমঝদার সুতনুকা লাবণ্য-র জীবন-

দর্শনকে আরেকবার স্মরণ না কোরে পারি না—

ওগো তুমি নিরুপম, হে ঐশ্বর্যবান,

তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান,

গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।···হে বন্ধু, বিদায়।

—তাই, অনেক সময় ভাবি মহাকবি শেলীর দার্শনিক মানস এ ভাবেই অমিত-লাবণ্যর জীবনের "saddest thought" কে তখনি পেরেছে "sweetest song"-এ তে রূপান্তরিত কোরতে—যখন বুদ্ধিমতী লাবণ্য প্রেমদগ্ধ অমিতকে তারই প্রেমভিলাষিনী কেতকীর হৃদয়-দরিয়ায় আশ্রয় নেওয়াতে বাধ্য কোরেছিল, আর যখন সেই লাবণ্য নিজে বরণ কোরে নিতে পেরেছিল তার-ই সুখের কথা ভেবে নিজেরই কাছ থেকে বহু দূরে সরে যাওয়া নিশ্চুপ শোভনলালের তৃষিত বুকের আনচানানো ছন্দগুলোকে।—রবীন্দ্রনাথ এ প্রেমজীবনের কথাতেই আরেক দিকের কথা জানিয়েছেন তাঁর ছোট উপন্যাস "দুই বোন" আর "মালঞ্চ"তে। এখানে ভালোবাসা নারী-জীবনের কোন এক ব্যাপক চাওয়া-পাওয়ার অতৃপ্তিতে পুরুষের জীবনকে অনেক সময় কাঁদিয়ে তোলে, কাঁপিয়ে দেয় বেপমান কোরে। "দুই বোনে"র প্রারম্ভেই আছে :—

"মেয়েরা দুই জাতের।···এক জাত প্রধানত মা। আর এক জাত প্রিয়া।

ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন। ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে। [illegible]বেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চ[illegible]কে তোলে তরঙ্গ, পৌছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায় যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।"

—ঠিক এমনি কোরেই প্রেম নারীকে তার দু'ধারের টালবাহনার সময়ে অস্থির চঞ্চল কোরে তোলে। তার মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধে--মা বড, না প্রিয়া বড! এ প্রশ্ন চিরন্তন। এর সমাধান নারী মাত্রেই কোরতে পারে। কেন না এর সমাধান তার-ই হাতে। তাই প্রিয়া বধূ সত্ত্বেও শর্মিলার অপুত্রকা অবস্থা তাকে এলোমেলো কোরেছিল সাময়িকভাবে। আর তাই সন্তান আজও না পাওয়ায় স্বামীর প্রতি তার অবুঝ মন হাহাকার কোরে আপন সন্তানের

মতই শশাঙ্ককে প্রিয়ার ভালোবাসার চাইতেও মায়ের সচকিত প্রীতি
চারধার থেকে আষ্টে-পৃষ্ঠে ঘিরে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু শশাঙ্কের চপ
মুক্ত মন হাঁপিয়ে উঠেছিল প্রিয়া স্ত্রীর এহেন ব্যতিব্যস্ততায়। ভুল বুঝল। ভু
কোরতে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে শর্মিলাই বুঝতে পারলো—নিজেরও তা
ভুল হোয়েছে। তখনি আপন নারীত্বের মাধুর্য্যে সে সমস্যার জটিলতাে
এড়াতে পারলো সহজেই। আর তা পারলো বলেই প্রিয়ার প্রগলভতা
আবার সে ফিরে আসতে পেরেছিল, অন্তত শশাঙ্ক যে তাই চেয়েছিল—শর্মি
তার ছোট বোন উর্মিলারই মতন হোয়ে উঠুক হাসিতে খুশীতে ঝলমলানি
রুমঝুম মনের। আর তাই দেখলাম, যখন কাহিনী তার উপসংহার টানছে—

"শর্মি, ভেবো না আমি কাপুরুষ। দায়িত্ব ফেলে পালাব আমি, এ
অধঃপতন কল্পনা কোরতেও পার?"···শর্মিলা কাছে গিয়ে ওর হাত ধরে বলে
"কি হোয়েছে। আমাকে বুঝিয়ে বলো।"···শশাঙ্ক বললে, আবার ঋণ করেছি
তোমার কাছে, সে কথা ঢাকা দিয়ো না।

শর্মিলা বললে, আচ্ছা বেশ। · শশাঙ্ক বলল—সেদিনকার মতই আজ থেকে
আবার ঋণ শোধ করতে বসলুম। যা ডুবিয়েছি আবার তাকে টেনে তুলবই
এই রইল কথা। শুনে রাখ। একদিন যেমন তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে
তেমনি আবার আমাকে বিশ্বাস করো।

শর্মিলা স্বামীর বুকের ওপরে মাথা রেখে বলল, "তুমিও আমাকে বিশ্বা
করো। কাজ বুঝিয়ে দিয়ো আমাকে, তোমার কাজের যোগ্য যাতে হতে
পারি সেই শিক্ষা আজ থেকে আমাকে দাও।"

অপর অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে অপরূপ
মানবিকতার আভাস পাই। তিনি তাঁর গল্প ও উপন্যাসে প্লটকে উচ্ছাস
দিয়েছেন। তাঁর লেখায় আটপৌরে অথচ বিশিষ্ট ভাবেই গল্পের রস আপন
আপনি জমে উঠেছে। তিনি পারিবারিক জীবনের কিঞ্চিৎকর ও অকিঞ্চিৎকর
ঘটনাগুলির মধ্যে সমাজের সাধারণ নরনারীর হৃদয়ের ভালবাসার অপরূপ
লীলা প্রদর্শন করিয়েছেন। তাতে তিনি নারীকে আদর্শরূপে কল্পনা করেছেন
"দত্তা" "গৃহদাহ" "শ্রীকান্ত" "শেষ প্রশ্ন" "বিপ্রদাস" "চরিত্রহীন" "চন্দ্রনাথ"
"অনুরাধা" "দেনা পাওনা" "অরক্ষণীয়া" "পথের দাবী" প্রভৃতি গল্প ও
উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার সহজাত মিলন ঘটাতে গিয়ে তিনি যেসব সুন্দর ও
গভীর কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাতে পাঠক-পাঠিকার হৃদয়কে সহজেই

বিগলিত করে দেয়। বিশেষতঃ এ রকম হৃদয়োচ্ছ্বাসপূর্ণ রোমান্টিকতা আজকালকার কিশোর-কিশোরীর মনকে রোমান্সের আরও গভীরতম ভাব-রাজ্যের দিকে নিয়ে যায়। তখন তারা কল্পনায় ভাসতে থাকে। শরৎচন্দ্রের এই রকম অত্যধিক ভাববাহুল্যের জন্য তাঁর অনেক গল্প ও উপন্যাস ট্র্যাজিক না হয়ে প্যাথেটিক হয়ে উঠেছে। তাঁব গল্প-উপন্যাসের সহজ সরল ভাষা সহজেই পাঠকের মনকে জয় করতে পাবে। সেজন্য আধুনিক লেখকেরা যা সহজ ও সরল এবং হৃদয়গ্রাহী হয়—সেই ভাষারই আশ্রয় গ্রহণ কোরেছেন।

মনে পড়ে, কবিসম্রাটের কোন কবিতার নায়িকা নভেলিষ্ট শবৎ চাটুজ্জেকে মিনতিতে আকুল করা অনুরোধের মধ্যে জানিয়েছিল—তার মর্মস্পর্শী নাবী-জীবনের করুণ গাথাটিকে যেন গল্পে রূপায়িত করেন। বুঝতে দেবী হয় না, এটা ছিল শবৎচন্দ্রেব প্রতি নিবেদিত রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ অভিনন্দন। এই বকম অভিনন্দনের আলোকেই ঐ সমসাময়িক কথাশিল্পীদের সাহিত্য-সাধনাকে নন্দিত কবা যায় অশেষ আন্তবিকতাব অন্তঃশীলা রূপাধাব থেকে। —চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আজীবন রবীন্দ্রনাথের সহচর। সে দিক থেকে তাঁব বচনা-ধাবা তৈরী হয়েছিল কাব্যিক সুষমাব ব্যবহারে। আর এমন যোগাযোগের জন্যই রোমান্টিক হয়ে ফুটেছে তাঁব বহু সৃষ্টি। বিশেষ ভাবে "যমুনা পুলিনে ভিখারিণী"র কথা সবার আগে মনে পড়ে। তা ছাড়া "বায়ু বহে পুরবৈয়া" "বিষেব ফল" ও "প্রবাসে" নামক গল্প জীবনেরই কান্না-হাসিব রোমান্স মুখরতায় আশ্লিষ্ট। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়েব কৃতিত্ব সেখানটিতে, যেখান থেকে তিনি তাঁব রচনার আধুনিক জটিলতাময় জীবন-যৌবনের রঙীন প্রণয়েব অবৈধতাকে সামাজিক প্রয়োজনেই বৈধ প্রতিপন্ন কবাতে পেরেছেন। এ হেন নতুন ভাবের জগতে তুমুল আলোড়ন তুলেছিলেন ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। আপন ব্যবহারিক জীবনে হওয়া প্রখ্যাতনামা আইনজ্ঞের বাস্তব অভিজ্ঞতাব যুক্তি-বিযুক্তিব আইন দিয়ে চেরা-ফাড়া করায সমাজ দেহের বহু জায়গায় যে সব 'ইল্‌লিগ্যাল্' আর 'ইম্‌মরাল' অকাজগুলো চাগিয়ে উঠেছিল—সে ছুনিয়াবই অন্ধকার ঘন কাহিনী বুনোন করে গেছেন নরেশচন্দ্র। সাইকো-এনালিসিস্—মুখর হয়েছিল তাঁর লেখায়। যুগোপযোগী সাহিত্য তৈবী করায় তখনকার সমাজ আজও বর্ণালী হয়ে ফুটে আছে তাঁর "রবীন মাস্টার" "অভয়ের বিয়ে" "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" "বিয়ের খাতা"য়। অন্যদিকে নিরুপমা দেবী ও উপেন গঙ্গোপাধ্যায় রোমান্টিক জীবনবিচিত্রার অলঙ্করণে বাংলা

কথাসাহিত্যকে মিতালিমধুরতায় ফুটিয়েছেন। নারী শিল্পীরূপে নিরু দেবীর তুলনা আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বিনীর মত। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রূপায়ণ "দিদি"। আর কোন লেখিকার এই বইটির মত একাধারে মননশীল ও হৃদয়গ্র রচনা খুবই কম আছে বলে মনে করি। সেকালিনী হওয়া সত্ত্বেও নিরু দেবী বিদেশী শিক্ষায় ও রুচিতে অভ্যস্ত থাকায় আপনার সাহিত্যে পুরাতন আধুনিকের একটা সুন্দর যোগাযোগ সাধন করেছিলেন—যা ভাবতে গে অনিন্দ্য মনে হয়। নিরুপমাতে ছিল এক ব্যাপক গাম্ভীর্য্য, শিল্পচিন্তা ও-দিকে একটা সহাস ও সলাজ প্রণয়লোক তৈরী হয়েছিল উপেন্দ্রনা "দিক্‌শূল" "আশাবরী" "যৌতুক" "বিদুষী ভার্য্যা" "অভিজ্ঞান" প্রভৃতিতে।

কিন্তু আজকে এই লেখনপদ্ধতি দিনে দিনে এত সহজ হয়ে উঠেছে আধুনিক কাহিনীগুলো সব পাঠকের মনে তেমন দাগ কেটে যেতে পারে ন 'Classic' গল্প-উপন্যাসের মত গভীরতম দাগ কাটাকে তো বাদই দিলা মানুষের জীবনও দিনে দিনে এত বৈচিত্র্যহীন হয়ে উঠছে এই সংকীর্ণ সমাবেশে মধ্যে যে, তা নিয়ে অনেক আধুনিক লেখকেরা মনের বেশ কিছু খোরাকে উপযুক্ত সন্ধান করে উঠতে পারছেন না।

আমরা জানি গল্প-উপন্যাস নরনারীর শাশ্বত প্রেমের স্বর্গীয় ও মানবি চাওয়া-পাওয়া, আর তার যে কোন পরিণতিকে ফুটিযে তোলার কাে নিজেদের শিল্পীর হাতে সৃষ্টি করায়। নরনারীর প্রেমই গল্প-উপন্যাসের প্রাণ আর যে উপন্যাসে এই কাহিনী চির নতুন প্রেমের সজীব কামনা, মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যে ভরপূর এবং যা শেষ পর্যন্ত নায়ক-নায়িকার জীবন সম্বন্ধে একটি সু দিগ্‌ নির্দেশ করে,—যা শুধু মাত্র একটা নিছক পথপ্রদর্শকের কাজ করে না— বন্ধুর মত পাঠকের জীবনের সঙ্গে মিতালি পাতায়—তার জীবনেরই যে কো এক ঘটনার সঙ্গে,—তাই হলো গল্প-উপন্যাসের প্রকৃত ধর্ম। বাঙলার কয়েকজ আধুনিক লেখক প্রেমকে তাঁদের রচনার মধ্যে একটা অতি নিছক নীচু পর্য্যায়ে টেনে এনেছেন। তাঁরা প্রেম বলতে বোঝেন নায়ক-নায়িকার আশাহত জীবনে উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করাকে—যা অধিকাংশ পাঠকের মনোবিকারের কারণ হ'য়ে আজ উঠেছে। আর সুস্থ চিন্তার অভাব ঘটিয়েছে। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের দরবারী মেজাজ, আর রবীন্দ্রনাথের শান্ত-সমাহিত চরিত্রায়ণ, আর শরৎচন্দ্রের অশেষ রকম মানবদরদী মনের সরব ঘোষণা, "স্বর্ণলতা"র তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, "কঙ্কাবতী"র ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত,

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্ছল-চপল রোমান্স ধর্মীতার ঘরোয়া কথা ঝলমলিয়ে ওঠে না আমার পাঠক মনের কাছে আজকের অত্যাধুনিক এঁদের থেকে।

প্রেম, প্রত্যয় আর পরিধি ও তার পরিমণ্ডলের জীবন দর্শনে, যৌবন কথার সুস্থ ও শুভ্র বিতানে, রূপচর্চায়, বহু তত্ত্ব ও তথ্যের শৈল্পিক কারুকাজে আজকের বাংলা সাহিত্য তার কথাসাহিত্যের পরিবেশনায় বিশ্বের অন্যান্য শ্রেষ্ঠীদের সভায় আপন বৈশিষ্ট্যে নিজের একটা আসন অনায়াসে কোরতে পারে—এতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এটা একমাত্র সম্ভব পরস্পরের সহযোগিতায় —লেখক-পাঠক-প্রকাশক ও সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায়। আজকের যুগও যে কথাসাহিত্যে ক্ল্যাসিক সুর নিয়ে ঝলক্ ফুটিয়ে চলতে পেরেছে, এ মস্ত সুখের কথা। এই আধুনিক কথাশিল্পীদের দর্শনে প্রজ্ঞা আছে, প্রমিতি বোধ আছে, আর আছে শ্রীময় পরিকল্পনার রূপ ও আরতি। বৈচিত্র্যে স্বনিষ্ঠ। সমাধানে আত্মনিষ্ঠ। এই তাদের ও তাঁদের শিল্পসৃষ্টির রূপরেখায় মনে এঁকে ওঠে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মহাস্থবির জাতক, গোকুল নাগের পথিক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালি, অপরাজিত, ইছামতী, আরণ্যক, দেবযান ও দৃষ্টি প্রদীপ; মণীন্দ্রলাল বসুর রমলা, জীবনায়ন ও সহযাত্রিণী; বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্বর্গাদপি গরীয়সী, নীলাঙ্গুরীয়, রাণুর প্রথমভাগ, নব সন্ন্যাস, কাঞ্চন মূল্য, উত্তরায়ণ ও নয়ান বৌ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাত্রীদেবতা, কবি, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, রাধা, রাইকমল, আরোগ্যনিকেতন ও নাগিনী কন্যার কাহিনী; অন্নদাশঙ্কর রায়ের সত্যাসত্য, রত্ন ও শ্রীমতী, সুখ, কন্যা, না, গল্প ও রূপের দায়; 'বনফুলে'র জঙ্গম, কষ্টিপাথর, মৃগয়া, ত্রিবর্ণ, হাটে বাজারে, লক্ষ্মীর আগমন, ডানা ও স্থাবর; দিলীপকুমার রায়ের দোলা, তরঙ্গ রোধিবে কে ও দু ধারা; মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি, জননী, পুতুল নাচের ইতিকথা, মাশুল, হরফ, প্রাগৈতিহাসিক, দিবারাত্রির কাব্য, চতুষ্কোণ ও মাশুল, শচীন্দ্র মজুমদারের লীলামৃগয়া; আশালতা সিংহের অমিতাব প্রেম; প্রবোধকুমার সান্যালের মহাপ্রস্থানের পথে, হাসুবানু, প্রিয় বান্ধবী, আঁকাবাঁকা ও বিবাগী ভ্রমর; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বেদে, বিবাহের চেয়ে বড়, যতনবিবি, প্রথম কদম ফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ধূলিধূসর, জলপায়রা, পুতুল ও প্রতিমা, ডাঃ নবগোপাল দাশের অনুচ্চারিত, সাগর দোলায় ঢেউ; লীলা মজুমদারের ঝাঁপতাল, চীনে লণ্ঠন; শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালের

নন্দিয়া, গৌড়মল্লার ও তুমি সন্ধ্যার মেঘ ; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপনি
ও পদসঞ্চার ; সরোজ রায়চৌধুরীর ত্রি-লজি 'নতুন ফসল' ; ডাঃ মুজ
আলীর চাচা কাহিনী, শবনম্ ; নজরুল ইস্লামের ব্যথার দান ; সীতা দে
পরভূতিকা ; নবেন্দু ঘোষের আজব নগরের কাহিনী ; সতীনাথ ভাদুড়
জাগরী ; সুবোধ ঘোষের ফসিল, ত্রিযামা, ভারত প্রেমকথা, শতকি
কিংবদন্তীর দেশে ও সুজাতা ; সুবোধ বসুর পদ্মা প্রমত্তা নদী ; অ
মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম, রমাপদ চৌধুরীর প্রথম প্রহর ও
পলাশির পদাবলী ; সন্তোষকুমার ঘোষের কিনু গোয়ালার গলি প্রভৃতি।

এঁদের সৃষ্টিকে ভালবাসতে প্যারি চিরায়ত সাহিত্য হিসাবে। এই
গল্প-উপন্যাসের রোমান্টিক চিন্তাধারা ও আদর্শ আমার মনে নতুন ন
প্রেরণা সঞ্চার করেছে। তাঁদের গল্প-উপন্যাসের নায়িকারা রণরঙ্গিনী রু
নারীর আদর্শকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছে। প্রেমের ব্যাপারে তা
সবলা। মহুয়া ফুলের গন্ধে সুরভিতা।

একটা কথা। গল্পে বা উপন্যাসের মধ্যে সেকালেও ভালোবাসার বাস্ত
ছবিকে রূপায়ণ করাতে পারতেন, আর পেরেছেনও তখনকার মনী
শিল্পীরা। আগের কাল বলে আমরা অনেক সময়ই ভাবি—ওরা বোধ হ
ভিক্টোরীয় যুগের মত রক্ষণশীল ছিলেন। কিন্তু তা বিন্দুমাত্র সত্য নয়
ভালোবাসার মধুর মুহূর্ত যেখানে ফুটিয়ে তোলা অপরিহার্য্য হোয়ে উঠত এব
যা না হোলে পর স্বাভাবিকভাবেই রসহানি ও শিল্প-ত্রুটি ঘটতে পা
অনায়াসেই—সেখানে তারা সেকালের হোয়েও বেশী আধুনিক ছিলেন
মনে হয় আজকের অনেকের চাইতেও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র
অনুজ পূর্ণচন্দ্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশ চট্টোপাধ্যায়, মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিকা স্বর্ণকুমারী দেবী, মহাত্মা কালীপ্রস
সিংহ প্রভৃতি প্রত্যেকেই উগ্র আধুনিকপন্থী ছিলেন। তাই আমি আজকে
রূপদক্ষ কথাকারদের ভেতর থেকে ভালোবাসার বাস্তব রূপায়ণকে তারা কেমন
কোরে সাজিয়ে রাঙিয়ে তোলেন তার একটি সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছি মনীষী
অন্নদাশঙ্কর রায়ের "আগুন নিয়ে খেলা" থেকে—

"সোম পেগীর আরো নিকটে সরে এলো। পেগী বিনা বাক্য-ব্যয়ে তার
হাতে হাত রাখল। একান্ত নির্ভরের সহিত। সোম নিজেকে ধন্য জ্ঞান
করল। তার অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ। সূর্য্যাস্তচিহ্ন সুন্দর। ট্রেনটি মন্থর।

প্রতিবেশীগুলি সহৃদয়। আর তার সাথীটি? সে পোষা পাখীর মত তার হাতের মুঠোয় নিজের প্রাণটি ভরে দিয়েছে।...আপেল ও কমলালেবু ওরা ভাগ করে খেল। পেগী আধখানা খায়। সোম বাকীটা শেষ করে। সোম কিছুটা খায়, বাকীটা পেগীকে খাইয়ে দেয়। আদর করে তার মাথাটি বুকের কাছে আনে। একটি হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে অন্য হাতটি তার মুখের কাছে নেয়। পেগী চটে গিয়ে বলে, চাইনে আমি খেতে।—মুখে কুলুপ লাগায়। সোম তার মুখ খুলবার ভান করে গাল টিপে দেয়। পেগী হাসি চেপে থাকতে পারে না। মুখ খোলে। সেই সুযোগে সোম তার মুখে খাবার গুঁজে দেয়।

পেগী সোমের কপালের উপরে ঝুঁকে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে একটি চুমু খেল। যেন খাওয়া আর ফুরোয় না। এক মিনিট যায়। দুমিনিট যায়। পাঁচ মিনিট যায়। সোম ভাবল, পেগী ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? ...সোম বল্ল, "পেগ?"

পেগী চমক দমন করে সহজভাবে বল্ল, "ডিয়ার?"—ক্ষণেকের জন্যে মুখ তুলে আবার তেমনভাবে রাখল। না জানি কত মধু পেয়েছে। শেষ না করে উঠে যেতে চায় না।...সোম বল্ল, "পেগ স্বার্থপরের মত একা খেয়ো না। আমাকেও অংশী হতে দাও।"

পেগী বসবার ভঙ্গী বদল করে সোমের ওষ্ঠের ওপর ওষ্ঠ ও সোমের অধরের উপর অধর স্থাপন করল। তার বুকের একাংশ সোমের বুকের একাংশ চুম্বন করছিল।—"

আরেকটা কথা আছে—কথাটা হয়ত কানেতে এক রূঢ় সত্য হোয়ে বাজবে। না বেজে উপায় নেই। তার কারণ আজকের দিনে গল্প-উপন্যাসের নায়ক আর নায়িকারা বড় বেশী ইগোটিষ্ট টাইপের। আর আত্মকেন্দ্রিক হওয়ার দরুণ আজকের বর্তমান মুহূর্তে অধিকাংশ কাহিনীতে বিশেষ একজনের উপস্থিতি দেখা যায় না। সে হোল শিশু। নায়ক নায়িকারা স্বামী-স্ত্রীর মিথুন রূপেতে অবগাহন করা সত্বেও—ঐ শিশুর কথায় কাহিনীকার নির্বাক থাকেন। শিশুর সন্তান হোয়ে আগমনকে তাঁরা একরকম পরিহার করেই রেখেছেন। শিশুর সন্তান-রূপকে অভিনন্দিত করা হোয়েছে—দি চাইল্ড ইজ ফাদার অব দি ম্যান—বলে। কিন্তু গল্প-উপন্যাসে তাদের স্থান নেই। বোধ হয় বাস্তবের পরিবার পরিকল্পনাকে কাহিনীর ভেতরে ভেতরে প্ল্যানিং করা হোচ্ছে। বেশ লাগে, যুবক-যুবতী

কাছে আসে, ভালবাসে, তারপর তারা মধুক্ষরা পরিণয়ের মায়াজালে বন্দী হয়—তবুও তারপর একটি ছোট্ট ফুটফুটে সন্তানের স্থান নেই তাদের প্রেমের সে ছোট তরীতে। কিন্তু ভাবতেও ভাল লাগে আধুনিকার শুধু নিজের তরে, আর প্রিয় মানুষটির জন্যে সাজানো ছিমছাম নিরিবিলি সংসারের দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু, "Dream Children" এর চার্লস ল্যাম্‌ আজ বেঁচে থাকলে বোধ হয় এ পরিকল্পনা সহ্য কোরতে পারতেন না!

একটা বিষয়ে অনেকবার ভেবেছি এই সাহিত্য-জগতের রূপকারদের নিয়ে। তাঁরা সাহিত্যের নানান রূপলোকের কল্পনার কারুকাজে কোন কিছুকেই উপেক্ষা করেন নি। তাঁদের ভাব-বিহ্বল উদার আঙ্গিনার মধ্যে সবাই সুন্দর হোয়ে ফুটেছে। কিন্তু এত সত্ত্বেও মনে হয় একটা না বোঝা উপেক্ষা তাঁরা কোরে থাকেন এমন একজন বিশেষের প্রতি। বোধহয় বাস্তবে ভালোবেসে কল্পনায় অভিসার করা প্রকৃতির প্রতি। প্রকৃতির কাছ থেকে মুঠোভরে শিল্পকর্মের পরিকল্পনা রূপায়ণ কোরতে হয়। তা করেন বলেই স্রষ্টা শিল্পী কল্পনার শতরঙ আলপনায় সাজানো নিসর্গরাণীর প্রেরণাকে অস্বীকার কোরতে পারেন না। এখানে প্রেরণার মানসী হোলেন অনেক কিছুতে মিলানো আনন্দ-খুশী-সুখের একীভূত রূপ। সমস্তর এক হওয়া স্বভাবেই তার সত্যতা। আপন-পর পক্ষপাতিত্ব নেই।—কিন্তু প্রকৃতি যখন জাগতিক ও পারমার্থিক প্রয়োজনে সব কিছু থেকে আলাদা হোতে হোতে স্রষ্টা সাহিত্যরথীর জন্য মর্ত্যের বিশিষ্ট-বিশিষ্টার ভূমিকায় এগিয়ে আসেন শুধু প্রেরণা ও সহযোগীতা নিয়ে,—এই তাঁদের কথায় রূপলোকের রূপকারেরা যেন নির্বাক। আর তা বড় বেশী রকমই।—আমি পাঠিকা,—তাই নারীর স্বভাব ধর্মানুসারেই আজ লিখতে বসে আমাদেরই মনের উত্তর খুঁজে ফেরা কথাই জানালাম সম্ভ্রমতার সঙ্গে। (সেই সঙ্গে ক্ষমাপ্রার্থনা কোরে।)—কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ একদিন কাব্যে উপেক্ষিতা উর্মিলা ও আরো কয়েকজনকে নিয়ে নারী-জাতির হোয়ে সুদূর কালের সুদূরিকাদের জন্য স্রষ্টার সৃষ্টিকে জেরা কোরেছিলেন। যেদিন স্কুলের উঁচু ক্লাসে ঐ নিবন্ধটি পড়েছিলাম টীকা-টিপ্পনি সমেত,—আর তারপর কলেজের জীবনে যখন আস্তে আস্তে সাহিত্য পাঠের ভেতরে পরিচিতা হলাম একে একে এদেশের জয়দেব-পদ্মাবতী, চণ্ডীদাস-রামী, মাইকেল শ্রীমধুসূদ-হেনরিয়েটা, বঙ্কিমচন্দ্র-রাজলক্ষ্মী দেবী, বীরবল প্রথম চৌধুরী-ইন্দিরা চৌধুরাণী আর সাগর পারের শেলী দম্পতি, ব্রাউনিং দম্পতি, ওয়ার্ড

কীটস্‌ ও ফেণী ব্রনে, সেরিডন, রসেটি, ওয়াল্টার স্কট, লর্ড বায়রণ, লর্ড টেনিসন প্রভৃতির সাহিত্য, জীবন ও প্রকৃতির প্রেমিকা-রূপ,—এই তিনে মিলানো ছন্দবদ্ধ কাহিনী অশেষ রকম বিস্ময়-বিমুগ্ধ কোরেছিল।—তাঁদের প্রত্যেকেরই জাগ্রত বিদ্রোহী সত্বায় ঘেরা অননুকরণীয় দৃপ্ত প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ছিলেন এক একজন মহিয়সী রমণী—যাঁরা বধূ ও বঁধু—দুইই ছিলেন।—কিন্তু বর্তমানে সাহিত্য ও জীবন যাঁদের সৃষ্টিতে এক, দ্বিধাবিভক্ত নয়,—তাঁরাই যেন তাঁদের জীবনের 'এক অঙ্গে এত রূপ' ভরানো পরিকল্পিতার 'স্পাউজ' পরিচয়ে নির্বাক। নিথর। যাই হোক, তাঁদেরও বিচিত্র-পিয়াসী মনেতে সময়ে সময়ে নিশ্চয়ই গুনগুনিয়ে ওঠে:—

Bright star! would I were steadfast as thou art –
Not in lone splendour hung aloft the night,
And watching, with eternal lids apart,
Like Nature's patient, sleepless Eremite.
No – yet still steadfast, still unchangeable,
Pillowed upon my fair love's ripening breast,
To feel forever its soft fall and swell,
Awake forever in a sweet unrest,
Still, still to hear her tender taken breath,
And so live ever, or else swoon to death.

বিদেশের কাছে এবং বিদেশীর মনের রূপতৃষ্ণার কাছে আমাদের আধুনিক কথা সাহিত্য কেমন মর্য্যাদা পেয়েছে, তা সন্ধান কোরলে দেখি জ্ঞানী-গুণীর মহলে তার পরিচয় ঠিকই পৌছেছে। আমাদের শরৎচন্দ্রের অতি ঘরোয়া কথায় সাজানো কাহিনী ও-দেশেরও অনেকের প্রিয় হোয়ে আছে। তাই শরৎচন্দ্রের অমর রূপায়ণ "শ্রীকান্তে"র ভেতরকার কথায় একটিবার আসছি। শুধু একটিবার স্মরণ কোরতে চাই এর অসামান্যা নায়িকা রাজলক্ষ্মীর চরিত্রকে ঘিরে প্রকাশ পাওয়া মানবতাবাদী শরৎচন্দ্রের প্রেম দর্শনের কথাকে। আর তাই —মহামনীষী রোঁমা রোঁলাকে শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত" বড় বেশী মুগ্ধ করাতে পেরেছিল। রোঁলা সে কথা অকপটেই জানিয়ে গেছেন। গানের রাজা দিলীপকুমার রায় ও অন্নদাশঙ্করের ভ্রমণ-লিপির মধ্যে সে কথা আছে। এই উপন্যাসের কাব্য-ধর্মীতা অসাধারণ কোরে তুলেছে এর কাহিনীকে। আমার তো হয় 'শ্রীকান্ত' আগা-গোড়া মিলিয়ে একটি বিরাট কবিতাকে প্যানোরা-মায় তুলে সাজিয়ে রেখেছে। রাজলক্ষ্মীর চরিত্র চরম ব্যক্তিত্বের রূপায়ণ।

তুলনা হয় না। এক কথায় রাজলক্ষ্মী পারিজাত ফোটা দেশের গরবিনী ক
যখন সে বুঝতে পেরেছিল—মহৎ প্রেম যে শুধু কাছেই টানে, তা নয়। তা দূরে
সরিয়ে দেয়!—এমন এক অমূল্য উপলব্ধির মতই রাজলক্ষ্মীর জীবনের স
আকুতি ভালোবাসা পেতে ও দিতে বহুত মিনতিতে নিঝরিত হোয়েছি
"শ্রীকান্ত" সম্পর্কে আর কিছু না বলে যুগন্ধর কবি-সমালোচক মোহিতল
মজুমদারের ভাষাতে জানালাম :—

"এই উপন্যাসে ("শ্রীকান্ত") তিনি সমাজের অন্যায় অত্যাচা
বিরুদ্ধে যতই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া থাকুন না কেন, তৎসত্ত্বেও, নর-নারীর
বিশেষ নারী-হৃদয়ের যে অসীম ঐশ্বর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই দুঃখকে
করিবেন না বলিয়াই যেন—প্রেমকে অস্বীকার করার ছলে তাহার
অনির্ব্বচনীয় মাধুরী উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কবিধর্ম ও কবি
সার্থক হইয়াছে। তাই শ্রীকান্ত উপন্যাস এমন রোমান্স হইয়া উঠিয়াছে।
রোমান্স যে মিথ্যা নহে—শরৎচন্দ্রের এই কবি-কীর্তি তাহারই সাক্ষ্য দিতে
জীবনে রোমান্স আছে, খুব বেশীই আছে।—তার কারণ—ঐ নারী চরি
উহাদের ঐ স্বভাবই সংসারকে নিত্য-রোমান্সে ভরিয়া রাখিয়াছে। শ্রেষ্ঠব
ঊর্দ্ধতম কল্পনাও এই রোমান্সের কূল পায় না।—ঐ নারী-স্বভাবের বিকা
বিকার জগৎটাকে—অর্থাৎ, পুরুষের জীবন-ক্ষেত্রকে—হয় অগ্নিক্ষেত্র,
পুণ্যক্ষেত্র করিয়া তোলে।"

—শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু প্রেমিক রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে আপনার মিনতি
জীবন-বন্ধনেই বন্দী কোরেছিল এবং নিজেদের ভালোবাসাকে কোরে তুলে
পুণ্যক্ষেত্র।—আমার মতে রাজলক্ষ্মীর সমান ব্যক্তিত্ব নিয়েই এসেছিল ক
'শেষপ্রশ্ন'তে। যতই সেখানে থাকুক না কেন তত্ত্ব আর তথ্য আর চটক
কথার উডন্ত তুবড়ির ছুড়াছুড়ি—তবুও সে মননের চার ধারেই ঘিরে অ
কমলের নারীমনের স্বতঃস্ফূর্ততা, তার ভালোবাসার আকুতি ভরা ক
মিনতি—বিশেষ ভাবে শিশুর মত সরল স্বভাবেতে ঘেরা সুন্দর সহাস ম
ইন্‌জিনীয়ার অজিতের জন্য। 'শেষ প্রশ্ন' নিয়ে শেষ বারের মত একটা
শোনাতে চাই—কথাশিল্পী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন কোরেছিলেন "আপ
কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে অজিত আর কমল যখন কাছাকাছি এসে পড়ে
আপনারা তখন তাদের লক্ষ্য করেছেন?" ঐ প্রশ্নতেই আছে উত্তর।

গল্প বা উপন্যাসে যে আগাগোড়া প্রেমের কথাকেই

নিয়ে যেতে হবে, তার বেলায় আইনের রাজত্বে এমন কোন কড়া নিয়মকানুন নেই। খেয়াল-খুশী মতনই তাকে আঁকা যায়। এর উদাহরণও আছে উইলিয়াম ম্যাকপীস্ থ্যাকারের 'ভেনিটি ফেয়ারে'তে যেমন কোন পুরুষ চরিত্রে প্রত্যক্ষ আবির্ভাব না হওয়াতেও তার রসসম্ভোগ বিন্দুমাত্র নষ্ট হয় নি, তেমনি বলতে পারা যায় কোন নায়িকা পুরুষ জীবনের চলমান ছবির কাছে-পিঠে না থাকলেও তার আপন গোপন কথাকেও তীক্ষ্ণ করেই জানাতে পারে।

সত্যি আরনেষ্ট হেমিংওয়ে তাঁর যুগান্তকারী উপন্যাস—"The Old Man and the Sea" রচনা কোরলেন এক নিভৃতে-পড়ে-থাকা নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ ধীবরে জীবনবর্ণন তথা জীবনদর্শনকে নিয়ে—ঠিক নিজেব জীবনের বেলাভূমিতে বসে। এই গ্রন্থ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি পেল 'নোবেল প্রাইজে' পুরস্কৃত হয়ে। এই বহুপঠিত উপন্যাসের মধ্যে কোন নায়িকা নেই। কিন্তু আমার আনন্দ উঠলে ওঠে, যখন দেখি হেমিংওয়ের অপূর্ব সৃষ্টি ঐ বৃদ্ধ ধীবর দিনান্তের শেষে সাগরতীরের গোল পাতায় ছাওয়া ছোট্ট কুটিরের নিঝুম নির্জনতাব মধ্যে নিজেকে টেনে এলিয়ে দিচ্ছে বিছানায়, আর ছোট্ট প্রদীপের আলো ঠিকরে পড়ছে তার সামনের দেওয়ালে। দেখি সেখানে একটি ফোটো ঝুলছে। তা দেখতে দেখতে অশীতিপর বৃদ্ধের চোখ দুটো জলে থৈ থৈ করে উঠছে, বলে উঠছে একটি ছোট্ট কথা—"প্রিয়া"। এই ফোটোটিই হলো উপন্যাসের নায়িকা, তার স্বর্গগতা স্ত্রী—যার সঙ্গে নিভৃতে চলে ভালবাসাবাসির মধুর খেলা।—সত্যি ফোটোটির যৌবনান্বিতা মুখটি প্রেমের কল্পনায় আমাকে মশগুল করে তোলে। বইটিতে প্রেম নেই আগাগোড়া—কথায় আর ভাষ্যে—তবু ত ভরা আছে কল্পনায় কল্পনায়। তাই এটি শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। মানুষের শ্রেষ্ঠ জীবন-দলিল। সহজ মানুষের সহজ গল্প।

শেষে আরেকটুকু বলতে চাই। সাহিত্য আর ভালবাসা আর তার নায়ক-নায়িকারা পাঠকের কাছে বড় বেশী আপন প্রিয়। পাঠকের মনের চোখেতে এদের সম্পর্ক যেন—

হাথক দরপণ, মাথক ফুল। হৃদয়ক মৃগমদ, গীমক হার।
নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বুল॥ দেহক সরবস, গেহক সার॥
পাখীক পাখ, মীনক পানি।
জীবক জীবন, হাম ঐছে জানি॥